কলা অনুষদ পত্রিকা

খণ্ড : ১১ ॥ সংখ্যা : ১৬ ॥ জুলাই ২০২০ – জুন ২০২১

সম্পাদক

অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন

ডিন

কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক

অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কলা অনুষদ পত্রিকা

প্রকাশক
ডিন
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

প্রকাশ
জানুয়ারি ২০২২

অক্ষরবিন্যাস, মুদ্রণ ও বাঁধাই
বিসিএস প্রিন্টিং, রাফিন প্লাজা (৩য় তলা)
নিউ মার্কেট, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১৭১০-৮৮০৭২৮
ই-মেইলঃ bcsprinting123@gmail.com

পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য লেখকের নিজস্ব গবেষণার ফল। এর দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে লেখকের, সম্পাদনা পরিষদ কিংবা প্রকাশকের নয়।

মূল্য
১০০ টাকা
US$ 5.00

ISSN : 1994-8905

কলা অনুষদ পত্রিকা

সম্পাদনা-পরিষদ

[৩০ জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১ পর্যন্ত]

অধ্যাপক ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী
চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ

অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ

অধ্যাপক ড. নেভিন ফরিদা
চেয়ারম্যান, ইংরেজী বিভাগ

অধ্যাপক ড. মো. আবদুল কাদির
চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ

অধ্যাপক ড. মোঃ আবুল কালাম সরকার
চেয়ারম্যান, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন
চেয়ারম্যান, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ড. রশিদ আহমদ
চেয়ারম্যান, উর্দু বিভাগ

ড. মো. রেজাউল করিম
চেয়ারম্যান, উর্দু বিভাগ

মিসেস নমিতা মন্ডল
চেয়ারম্যান, সংস্কৃত বিভাগ

অধ্যাপক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া
চেয়ারম্যান, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

অধ্যাপক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামাল
চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ

অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
চেয়ারম্যান, ইতিহাস বিভাগ

অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. হারুনার রশীদ
চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ

অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম
চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

অধ্যাপক ড. মো. মোশাররফ হোসাইন
চেয়ারম্যান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক
চেয়ারম্যান, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ

অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ

ড. আহমেদুল কবির
চেয়ারম্যান, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ

জনাব মো. আশিকুর রহমান (লিয়ন)
চেয়ারম্যান, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ

অধ্যাপক ড. সালমা নাসরীন
চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
চেয়ারম্যান, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ

মিসেস টুম্পা সমদ্দার
চেয়ারম্যান, সংগীত বিভাগ

ড. দেবপ্রসাদ দাঁ
চেয়ারম্যান, সংগীত বিভাগ

ড. ফাজরীন হুদা
চেয়ারম্যান, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ

জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম
চেয়ারম্যান, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ

অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী
চেয়ারম্যান, নৃত্যকলা বিভাগ

প্রবন্ধসূচি

আব্বাসি খলিফাদের পশ্চিমমুখী নীতি ১
এস.এম. মফিজুর রহমান

রুমির কাব্যে পবিত্র কোরআনে উল্লখিত মানব সৃষ্টির প্রতিফলন ১৫
মুহাম্মদ শাহজালাল

সংরক্ষিত প্রাকৃতিক এলাকার (Natural Protected Areas) পুঁজিবাদী পরিপ্রেক্ষিত : প্রকৃতির ভোগ্যপণ্যায়ন (Commodification of Nature) এবং মানব-পরিবেশ সম্পর্কের ভূখণ্ডীকরণ (Territorialization of Man-Environment Relations)-এর একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ৪৩
জামাল খান

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতচর্চা ও তার প্রাসঙ্গিকতা ৫৭
ময়না তালুকদার

রোকেয়ার সাহিত্যকৃতি : বাঙালি নারীর মুক্তধারা ৭৩
মনিরা বেগম

সোনালি কাবিন : প্রসঙ্গ নারী ৮৭
সোহানা মাহবুব

তাওফিকুল হাকিম ও তাঁর নাটক আহলুল কাহফ ১০৭
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

জসীমউদ্‌দীনের *বোবা কাহিনী*তে লোকজীবনের রূপায়ণ ১২৭
তাশরিক-ই-হাবিব

শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত অবাচনিক ভাষিক উপাদান বিশ্লেষণ ১৪৭
নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম

নিমা ইউশিজের কাব্যে সমাজ দর্পণের চিত্রকল্প : একটি পর্যালোচনা ১৬১
মো. মুমিত আল রশিদ

স্পেনের উমাইয়া ও ফাতেমি সম্পর্ক : আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গ ১৭৭
মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান

পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষা : প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ১৯৫
মোছা. রূপালী খাতুন

সেলিম আল দীনের *চাকা* : এক মহাযাত্রা ২১৩
লাবণ্য মণ্ডল

ওরা রাবেয়া নয়, *ওরা কদম আলী* ২২৩
উম্মে সুমাইয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনয় ও অভিনয় ভাবনা : ভাবসত্যের অন্বেষণ ২৩১
তানভীর নাহিদ খান

অবরুদ্ধ সময়ের কবিতায় বঙ্গবন্ধু : সাহসী উদ্যোগসমূহের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ২৩৯
ইসমাইল হোসেন সাদী

দ্য আগলি আমেরিকান বনাম *দ্য আগলি এশিয়ান* : 'নব্য উপনিবেশবাদ' প্রশ্নের উত্তর-ঔপনিবেশিক মীমাংসা ২৫৭
মাফরুহা সিফাত

আব্বাসি খলিফাদের পশ্চিমমুখী নীতি

এস.এম. মফিজুর রহমান*

সারসংক্ষেপ : আব্বাসি খলিফাদের পশ্চিমমুখী নীতি বলতে বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চল তথা মাগরিব অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন রাজবংশের শাসকবর্গের জন্য তারা যে প্রশাসনিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের প্রতি খলিফাগণ যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন, সে বিষয়গুলোকে বুঝানো হয়েছে। মধ্যযুগের মুসলমানদের ইতিহাসে আব্বাসি বংশের শাসনামল একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে যাবের যুদ্ধে উমাইয়াদেরকে পরাজিত করে আব্বাসিরা মুসলিম বিশ্বের ক্ষমতা দখল করেন এবং ১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৫০০ বছরেরও কিছু বেশি দিন তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। অর্থাৎ মুসলিমদের ইতিহাসে তারাই সবচেয়ে দীর্ঘকালব্যাপী সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছেন। বাগদাদ ছিল তাদের রাজধানী। এছাড়া কুফা, সামাররা ও রাক্কা স্বল্প সময়ের জন্য তাদের রাজধানী ছিল। আটলান্টিক মহাসাগর থেকে সিন্ধুনদ এবং কাস্পিয়ান সাগর থেকে নীলনদ পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যে বাগদাদ থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। তাই সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য আব্বাসি সাম্রাজ্যকে ৩৫টি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। (Husaini, 1949, p. 180-181) ঐতিহাসিক P.K. Hitti অবশ্য আব্বাসি সাম্রাজ্যে ২৪টি প্রদেশ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। (Hitti, 1970, p. 330-331) এই প্রদেশগুলোতে আব্বাসি খলিফাগণ তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে শাসনকার্য চালাতেন। কিন্তু এই প্রতিনিধিরা অনেক সময় তাদের নিজ বংশীয়দের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে বাগদাদের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক রাজবংশের উত্থান ঘটান। এসকল রাজবংশের শাসকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই প্রদেশসমূহের শাসনকার্য চালাতেন। কখনো কখনো অবশ্য এর ব্যতিক্রমও হতো। বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ আল-মাগরিব অঞ্চলে এসময় ৫টি আঞ্চলিক ক্ষুদ্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আলোচ্য প্রবন্ধে পশ্চিমাঞ্চলের এই রাজবংশগুলোর শাসকবর্গের জন্য খলিফাদের গৃহীত শাসননীতিই তাদের পশ্চিমমুখী নীতি হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

ভূমিকা

আব্বাসি খলিফাগণ তাদের শাসনকালের প্রথম ১০০ বছর দুর্দান্ত প্রতাপের সঙ্গে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছেন। কিন্তু নবম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে তাদের সাম্রাজ্যে বিভিন্ন রকম সংকট দেখা দেয়। এসময় থেকে তাদের সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় খলিফার কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে থাকে। মূলত খলিফা হারুন-অর-রশিদের শাসনকালের পর-পরই আব্বাসি খিলাফতের রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। বিশেষ করে খলিফা আল-আমিন ও আল-মামুনের দ্বন্দ্বে কেন্দ্রীয় খিলাফতের অভ্যন্তরীণ সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। এছাড়া এসময় বহিরাক্রামণের ফলে খিলাফতের নিরপত্তা বিঘ্নিত হয়। সর্বোপরি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, আল-মামুন পরবর্তী খলিফাদের দূরদর্শিতার অভাব, কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনীতে অব্যবস্থাপনাসহ নানাবিধ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বাগদাদের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে তখন বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ক্ষুদ্র রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। এসময় পশ্চিমাঞ্চলে যে কয়টি ক্ষুদ্র রাজবংশের উত্থান হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল- ইদ্রিসি

* অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বংশ (৭৮৮-৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ), আঘলাবি বংশ (৮০০-৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ), তুলুনি বংশ (৮৬৮-৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ), ইখশিদি বংশ (৯৩৫-৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) ও হামদানি বংশ (৯৪৪-১০০৩ খ্রিষ্টাব্দ)। (Hitti, 1970, p. 450-460) এসকল রাজবংশের মধ্যে ইদ্রিসি বংশ ছাড়া বাকি বংশগুলোর শাসনকর্তাগণ বাগদাদের খলিফাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মনোনয়নের মাধ্যমেই নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তারা সকলেই স্বাধীনভাবে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজবংশ প্রতিষ্ঠার ধারা প্রবর্তন করেন। উল্লেখ্য যে, তাদের শাসিত অঞ্চলসমূহের মসজিদের খুৎবায় খলিফার নাম পাঠ এবং মুদ্রায় খলিফার নাম উৎকীর্ণ করে তারা খিলাফতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন। তাদের অনেকেই বাগদাদে নিয়মিত কর ও উপঢৌকন পাঠাতেন। পশ্চিমাঞ্চলের এই সকল রাজবংশের প্রতি আব্বাসি খলিফাদের গৃহীত প্রশাসনিক নীতি ও পদক্ষেপসমূহ এবং উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়গুলো বর্তমান প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আব্বাসিদের ইতিহাস সম্পর্কে ইতোমধ্যে বেশকিছু গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ গবেষক হলেন- M. A. Saban (1970), P. K. Hitti (1970), S. Lane –Poole (1977), C.E. Bosworth (1967), Syed Ameer Ali (1961), Masudul Hasan (1995), T. W. Arnold (1967), মুসা আনসারী (১৯৯৯) প্রমুখ। এছাড়া ইসলামী বিশ্বকোষেও এ বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য সন্নিবেশিত আছে। তবে তাঁদের গবেষণাকর্মে আব্বাসিদের রাজনীতি, দরবার ও সভ্যতায় তাদের অবদান সম্পর্কিত ইতিহাসই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া আব্বাসিদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মুসা আনসারী রচিত *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি* গ্রন্থটিও বেশ তথ্যবহুল। আব্বাসিদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যে অনেকগুলো প্রদেশ ছিল। তাদের শাসনামলে বাগদাদের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে বেশ কিছ ক্ষুদ্র আঞ্চলিক রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। বিশেষ করে মাগরিব তথা পশ্চিম অঞ্চলে (উত্তর আফ্রিকায়) এসময় পাঁচটি ক্ষুদ্র আঞ্চলিক রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। এসকল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতাগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আব্বাসি খলিফা কর্তৃক গভর্নর মনোনীত হয়ে,পরবর্তীকালে নিজ নিজ বংশের গোড়াপত্তন করেন। উক্ত বংশসমূহের শাসকবর্গের জন্য আব্বাসি খলিফাগণ কী ধরনের নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তাদের প্রতি খলিফাদের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল, আবার খলিফাগণের প্রতিও ঐ সকল আঞ্চলিক শাসকবর্গ কি ধরনের আনুগত্যের নীতি মেনে চলতেন, এসকল বিষয়ে বাংলা ভাষায় তেমন কোন গবেষণা পরিলক্ষিত হয় না। এ জন্য আমি মনে এই সূত্রে এ বিষয়ে একটি নতুন গবেষণার সুযোগ রয়েছে।

আল মাগরিব অঞ্চল বরাবরই আব্বাসি খলিফাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। তবে মিশর, তিউনিশিয়া ও সিরিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রায় ২০০ বছর টিকে ছিল। আব্বাসি খলিফাগণ এই সকল দূরবর্তী প্রদেশসমূহে গভর্নর নিয়োগ ও শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কী ধরনের নীতি প্রয়োগ করেছিলেন, সে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরাই বর্তমান প্রবন্ধটি রচনার উদ্দেশ্য।

সুনির্দিষ্টভাবে এই প্রবন্ধটি রচনার উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

- মাগরিব বা পশ্চিমাঞ্চলে এ বংশগুলো প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত পটভূমি পর্যালোচনা এবং এক্ষেত্রে আব্বাসি খলিফাদের কোন ধরনের সংশ্লিষ্টতা ছিল, তা অনুসন্ধান করা ।
- পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে গভর্নর নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা ।
- পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বংশগুলোর প্রতি আব্বাসি খলিফাদের অনুসৃত নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষণ করা ।

- খলিফাদের প্রতি এই আঞ্চলিক বংশগুলোর শাসকবর্গ কী ধরনের আনুগত্যের নীতি মেনে চলতেন, সে বিষয়টি মূল্যায়ন করা।

বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটি বিশ্লেষণধর্মী। মূলত দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে তথ্য, উপাত্ত নিয়ে প্রবন্ধটি রচনা করা হয়েছে। এই দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে পূর্বোল্লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থ ও বিশ্বকোষসমূহ। উল্লিখিত উৎসসমূহে আব্বাসিদের রাজনৈতিক ইতিহাসের বর্ণনার মধ্যে বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত কিছু কিছু ইঙ্গিত রয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের এই বিভিন্ন পর্যায়ের বর্ণনাগুলো বিশ্লেষণ করে নতুন কাঠামোয় বর্তমান প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

আব্বাসি খলিফাদের পশ্চিমমুখী নীতি

আলোচনার সুবিধার্থে পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বংশগুলোর প্রতি খলিফাগণের অনুসৃত নীতি ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সময়ক্রম অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইদ্রিসিদের প্রতি আব্বাসি খলিফাদের অনুসৃত নীতি

বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলে আব্বাসি খলিফাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। খলিফা আল-হাদির সময়েই উত্তর আফ্রিকার মরক্কোতে ইদ্রিসি বংশের শাসন কায়েম হয়। ইদ্রিসিরা ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর বংশধর। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ২০০০, পৃ. ৩৯৫) খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরের সময় আলি বংশীয়দের প্রতি চরম অত্যাচার, নির্যাতন চালানো হয়। আল-মনসুরের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে খলিফা হযরত আলি (রা.)-এর একজন বংশধর আবদুল্লাহর পুত্র ইদ্রিস উত্তর আফ্রিকার মরক্কোতে পালিয়ে যান। উল্লেখ্য যে, আবদুল্লাহ ছিলেন হযরত আলি (রা.)-এর প্রপৌত্র এবং ইমাম হাসানের পৌত্র। পরবর্তীকালে সেখানকার আওরাবা গোত্রপতি আবু লায়লা ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল হামিদ-এর সমর্থনে ৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্থানীয় গোত্রসমূহের ইমাম নির্বাচিত হন। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ২০০০, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬) মূলত এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ইদ্রিস ইবনে আবদুল্লাহ মরক্কোতে ইদ্রিসি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে Syed Ameer Ali বলেন— হাদির রাজত্বকালে প্রথম হাসানের জনৈক বংশধর ইদ্রিস পশ্চিম মৌরতানিয়ায় পালিয়ে যান এবং সেখানকার বার্বার গোষ্ঠী তাকে তাদের নেতা ও ইমাম বলে গ্রহণ করেন। তাদের সহয়তায় তিনি সেখানে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। এ রাজ্যটি উত্তর আফ্রিকায় দীর্ঘকাল বিদ্যামান ছিল। (Ali, 1961: 581) ইদ্রিসের নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয়েছে ইদ্রিসি বংশ। এ বংশের মোট ১৫ জন শাসক ছিলেন এবং তারা ৭৮৮-৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর মরক্কো শাসন করেন। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ২০০০, পৃ. ৪০৬-৪০৮) এছাড়া আলজেরিয়ার কিছু অংশও তাদের দখলে ছিল। তাদের রাজধানী ছিল ফেজ নগরী। মূলত ইদ্রিসিরাই প্রথম আব্বাসি খিলাফতের শক্তিবলয়ের বাইরে যেয়ে একটি স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সৃষ্টি করেন। আর এই বংশটি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মাগরিবুল আকসা আব্বাসি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (শেখ মুহম্মদ লুৎফর, ১৯৭৬, পৃ. ২৩৯) ঐতিহাসিক P.K. Hitti ইদ্রিসি বংশকে প্রথম শিয়া রাজবংশ বলে অভিহিত করেছেন। (Hitti, 1970, p. 450)

ইদ্রিসি বংশের উত্থান ও তৎকালে তাদের প্রতি আব্বাসি খলিফাদের যে আচরণ তা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ইদ্রিসি শাসকদের প্রতি আব্বাসি খলিফাদের নীতি মোটেই ইতিবাচক ছিল না। বিশেষ করে খলিফা আবু জাফর আল-মনসুর এ বংশটি প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ইদ্রিসের অপর দু'ভাই মুহাম্মদ ও ইব্রাহিমকে হত্যা করান। পাশাপাশি আলিপন্থিদের গণহারে গ্রেফতার করেন ও তাদের প্রতি নির্যাতন অব্যাহত রাখেন। (শেখ মুহম্মদ লুৎফর, ১৯৮৪, পৃ. ১০১-১০৩) ইদ্রিস এসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী ছিলেন। খলিফা আবু জাফর আল-মনসুরের আগের খলিফাগণও আলিপন্থিদের প্রতি রূঢ় আচরণ করেছেন। অর্থাৎ একথা বলা যায় যে, আব্বাসিরা ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকে সর্বদাই আলিপন্থিদের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করেছেন। এমতপরিস্থিতিতে এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম ইদ্রিস নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও প্রতিকূলতা পেরিয়ে মরক্কোতে পৌছান এবং ইদ্রিসি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কখনোই আব্বাসি খলিফাদের সহ্য করতে পারেননি এবং সঙ্গত কারণেই তাদের প্রতি কোনো প্রকার আনুগত্য প্রকাশ করেননি। বরং বাগদাদের খিলাফতের জন্য তিনি ছিলেন চ্যালেঞ্জস্বরূপ। বিদ্রোহ দমন, রাজ্যজয় বা শাসনব্যবস্থা পরিচালনা কোনো বিষয়ে তিনি বাগদাদের খলিফার কোনোরূপ অনুমতির প্রয়োজন মনে করেননি। আর তখন আব্বাসি খলিফা হারুন অর-রশিদের পক্ষে ইদ্রিসের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক অভিযান পরিচালনা করা ছিল বেশ কঠিন ব্যাপার। কিন্তু খলিফা হারুন অর-রশিদ থেমে থাকার পাত্র নন। তিনি ইদ্রিসকে হত্যার জন্য একটি ষড়যন্ত্রের নীতি গ্রহণ করেন এবং সে পরিকল্পনা মাফিক শামমাক নামক তাঁর একজন প্রতিনিধিকে মরক্কোর দরবারে পাঠান। শামমাক ধীরে ধীরে ইদ্রিসিদের বিশ্বস্ততা অর্জন করে এবং একদিন সুযোগ বুঝে ইদ্রিসকে বিষ প্রয়োগে হত্য করে। এ কাজের উপহারস্বরূপ খলিফা হারুন অর-রশিদ তাকে মিশরের প্রাদেশিক গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। (Hasan, 1995, p. 524) এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর আব্বাসিদের সঙ্গে ইদ্রিসিদের সম্পর্ক আরো বেশি বিরোধপূর্ণ হয়ে উঠে। এ ঘটনার জন্য ইদ্রিসি বংশের পরবর্তী শাসকগণ কোনো অবস্থাতেই আব্বাসি খলিফাদেরকে কোন দিন বিশ্বাস করেননি। এছাড়া ইদ্রিসি বংশের শাসকগণ শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে সুন্নি মতবাদে বিশ্বাসী বাগদাদের খলিফাদের সঙ্গে তাদের ধর্মীয় দিক থেকেও দূরত্ব ছিল।

মূলত আব্বাসিরা রাজনৈতিক আধিপত্যবাদের নীতি হিসেবে আলিপন্থিদেরকে মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা ও বাগদাদ থেকে বিতাড়িত করার কারণেই ইদ্রিসিদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অথচ আব্বাসি আন্দোলন চলাকালে ইদ্রিসিরাই (আলিপন্থিরা) ছিল তাদের সবচেয়ে বড় মিত্র। কিন্তু আব্বাসিদের সিংহাসনে অধিষ্ঠান-পরবর্তী কার্যক্রমে আলিপন্থিরা চরমভাবে হতাশাগ্রস্ত হন। কেননা তাদের প্রতি আব্বাসি খলিফাদের আচরণ ছিল চরম প্রতারণামূলক ও অত্যন্ত নির্মম।

উপরিউক্ত এসব কারণে ইদ্রিসিরা মরক্কোর শাসনকার্য পরিচালনার সময় আব্বাসি খলিফাদের নিকট থেকে কোনো প্রকার স্বীকৃতি পেতে চাননি। আর খলিফাদের নাম তাদের মুদ্রা ও খুৎবায় কখনো উল্লেখ করেননি। এসকল বিষয় পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে প্রমাণিত হয় যে, ইদ্রিসিদের প্রতি আব্বাসি খলিফাদের নীতি কখনোই ইতিবাচক ছিল না। ফলে ইদ্রিসিরাও বাগদাদের সঙ্গে কোনো প্রকার সম্পর্ক রক্ষা করতেন না। মূলত প্রথম ক্ষুদ্র রাজবংশ হিসেবে ইদ্রিসিরা মরক্কোতে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নতুন শাসনব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা আব্বাসি খলিফাদের প্রভাবমুক্ত হয়ে সত্যিকার অর্থেই স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছেন।

আঘলাবি বংশের প্রতি খলিফাদের গৃহীত নীতি

উত্তর আফ্রিকার ইফ্রিকিয়াতে দ্বিতীয় যে রাজবংশটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, সেটি ছিল আঘলাবি বংশ। ইব্রাহিম ইবনে আঘলাব ছিলেন এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আরব বংশোদ্ভূত বনু তামিম গোত্রের লোক ছিলেন। আব্বাসি খলিফা হারুন অর-রশিদের অনুমতিক্রমে কিছু শর্ত সাপেক্ষে ইব্রাহিম ইবনে আঘলাব ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ইফ্রিকিয়াতে (বর্তমান তিউনিশিয়া) এ বংশের গোড়াপত্তন করেন। তাদের রাজধানী ছিল কায়রোয়ান। ইব্রাহিমের পিতা আঘলাবের নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয়েছে আঘলাবি বংশ। এ বংশের মোট ১১ জন শাসক ১০৯ বছর (৮০০-৯০৯ খ্রিষ্টাব্দ) ইফ্রিকিয়ায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন।(আ.ফ.ম. আবদুল হক, ১৯৮৬, পৃ. ১৩৫-১৩৬) এ বংশের শাসকগণ 'আমির' উপাধি ব্যবহার করতেন।

আঘলাবি শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইফ্রিকিয়ায় মুহাল্লাবি রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মুহাল্লাবিদের পতনের পর সেখানে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটে। রাজ্যের সর্বত্র লুটতরাজ, হত্যা ও জোরজবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় যাব প্রদেশের গভর্নর ইব্রাহিম ইবনে আগলাব তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে কায়রোয়ানে উপস্থিত হন। তিনি নিজ দক্ষতা ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর দ্বারা সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি খলিফা হারুন অর-রশিদের নিকট ইফ্রিকিয়ার স্বাধীন গভর্নর হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবে ইব্রাহিম উল্লেখ করেন যে, তিনি বাগদাদের খলিফার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করবেন এবং প্রতিবছর মিশরের রাজস্ব আয় থেকে যে ১ লক্ষ দিনার ভর্তুকি ইফ্রিকিয়াতে পাঠাতে হতো, তা আর পাঠাতে হবে না। বরং তিনি কেন্দ্রীয় কোষাগারে বছরে ৪০০০০ দিনার প্রদান করবেন। উল্লেখ্য যে, আঘলাবি শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ইফ্রিকিয়ায় অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আব্বাসি খলিফার পক্ষে মিশরের রাজস্ব আয় থেকে প্রতিবছর এক লক্ষ দিনার আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হতো। আব্বাসি খলিফা সার্বিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, তার কাছে ইফ্রিকিয়ার জন্য এটি সবচেয়ে ভালো প্রস্তাব। তিনি এ প্রস্তাবে রাজি হন এবং ইব্রাহিমকে উপরিউক্ত শর্তসাপেক্ষে ইফ্রিকিয়ার আমির হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। মূলত এভাবেই ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ইফ্রিকিয়ায় আঘলাবি শাসনের গোড়াপত্তন ঘটে। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ১৯৮৬, পৃ. ১৩২; Hasan, 1995, p. 527) ইব্রাহিমের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি অত্যন্ত বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, পরিশ্রমী ও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি তার সাহস ও কূটনৈতিক দক্ষতা বলে ইফ্রিকিয়াতে সুশাসন কায়েম করেন। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ১৯৮৬, পৃ. ১৩৫) এরপর থেকে আগলাবি আমিরগণ স্বাধীনভাবে ইফ্রিকিয়া শাসন করতে থাকেন। বিশেষত উত্তরাধিকার নিয়োগে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। তারা নিজেদের ইচ্ছামতো পুত্র বা ভাইকে উত্তরাধিকার নিয়োগ করতে পারতেন। আর এই নিয়োগে বাগদাদ কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করত না। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ১৯৮৬, পৃ. ১৩৫) অর্থাৎ প্রদেশের অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনায় আঘলাবিরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। এ প্রসঙ্গে T. W. Arnold বলেন- আঘলাবি বংশের প্রতিষ্ঠাতা (ইব্রাহিম) গভর্নরের অধীনে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে উত্তর আফ্রিকা একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয় এবং তিনি তার পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে এ বংশের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করার পদ্ধতি চালু করেছিলেন। (Arnold, 1967, p. 57) মিশরের ফাতিমি খলিফার প্রতিনিধি আবু আবদুল্লাহ ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে এ বংশের পতন ঘটান।

আঘলাবিদের প্রতি আব্বাসি খলিফাদের নীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আব্বাসি খলিফার মনোনীত প্রতিনিধি রূপেই ইব্রাহিম ইফ্রিকিয়াতে এ বংশের গোড়াপত্তন করেছিলেন। কোনোরূপ বিদ্রোহ করে তিনি এ ক্ষমতা লাভ করেননি। আব্বাসি খলিফা কিছু শর্ত সাপেক্ষে ইব্রাহিমকে ইফ্রিকিয়ার আমির হিসেবে নিয়োগ দান করেন। ইব্রাহিম তাঁর ১২ বছরে শাসনকালে সে শর্তের কোনো ব্যত্যয় ঘটাননি। আব্বাসি খলিফার সার্বভৌমত্ব তিনি সর্বদাই স্বীকার করতেন, চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রে রাজস্ব পাঠাতেন। এ বংশের অন্যান্য শাসকবৃন্দ ইব্রাহিমের নীতকেই অনুসরণ করেছিলেন। তবে আব্বাসি খলিফার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলেও মূলত তারা স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করতেন। অভ্যন্তরীণ প্রশাসন পরিচালনা ও উত্তরাধিকার নির্বাচনে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। আব্বাসি খলিফাগণ এ ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না। (Hasan, 1995, p. 527-528) আঘলাবিয়া তাদের মুদ্রা ও খুৎবায় যথানিয়মে আব্বাসি খলিফার নাম উল্লেখ করতেন। কখনো এতে ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি। তাদের ১০৯ বছরের শাসনকালে শুধু একবার একটি ব্যত্যয় ঘটেছিল। সেটি ঘটেছিল— ২য় ইব্রাহিমের সময়। উল্লেখ্য যে, প্রজা-সাধারণের প্রতি ২য় ইব্রাহিম নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতেন। এমনকি তার পরিবারের লোকেরাও তার নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি। এছাড়া তিনি বালাজমার দুর্গে জুন্দদের প্রতি নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলেন। এসব কাজের জন্য খলিফা মুতাজিদ ২য় ইব্রাহিমকে পদচ্যুত করে তার পুত্র আবুল আব্বাস আবদুল্লাহকে তদস্থলে আমির নিযুক্ত করেছিলেন। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ১৯৮৬, পৃ. ১৩৪) এছাড়া অন্যান্য উত্তরাধিকার নির্বাচনের সময় আঘলাবি আমিরদের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। এ সবকিছুর বিচারে বলা যায় যে, এই বংশের শাসকদের প্রতি আব্বাসি খলিফাগণ ইতিবাচক নীতি প্রয়োগ করেছেন এবং আঘলাবি আমিরগণও আব্বাসি খলিফাদের প্রতি আনুগত্যের নীতি মেনে চলেছেন। মূলত আব্বাসিরা ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হাতে রেখে আঘলাবিদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন।

তুলুনি বংশের শাসকবর্গের প্রতি খলিফাদের গৃহীত নীতি

পূর্বেই উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চল উত্তর আফ্রিকায় খলিফাদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সর্বোপরি আব্বাসি খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাত্র ২৮ বছরের মাথায় তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা আলি (রা.)-এর একজন বংশধর ইদ্রিস ইবনে আবদুল্লাহ মরক্কোতে ইদ্রিসি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মূলত তখন থেকেই উত্তর আফ্রিকা স্পষ্টতই বাগদাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তবে মিশর বরাবরই তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এজন্য বলা হয় যে, উত্তর আফ্রিকায় আব্বাসি খলিফাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল মিশর। আব্বাসি খলিফার মনোনীত গভর্নরের প্রতিনিধি হিসেবে আহম্মদ ইবনে তুলুন নামক একজন তুর্কি যুবক ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মিশরে এ রাজবংশটি প্রতিষ্ঠা করেন। সিরিয়ার উপরও তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আহম্মদের পিতা তুলুন ছিলেন বুখারার সামানি বংশের একজন ক্রীতদাস। ৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে বুখারার প্রশাসক তাকে আব্বাসি খলিফা আল-মামুনের নিকট উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেন। খলিফা আল-মামুন তার যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রহরীদলের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। পরবর্তীকালে নিজ প্রচেষ্টায় তুলুন আব্বাসি বিচার বিভাগের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তুলুনের পুত্র আহম্মদের নেতৃত্বে ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে মিশরে তুলুনি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ২০০০, পৃ. ২৫৩; Hitti, 1970, p. 452) আহম্মদ তার পিতার নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করেন তুলুনি বংশ। তাদের রাজধানী ছিল ফুস্তাতের 'আল-

কাতাই' নগরী। তুলুনি বংশের মোট ৫ জন শাসক ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩৭ বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। (Lane-Poole, 1977, p. 68)

আহম্মদ যখন শৈশবে পদার্পণ করেন তখন তার পিতা তুলুন মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তার মা তুর্কি সেনাপতি বায়াকবেককে বিবাহ করেন। আহম্মদের বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন আব্বাসি খলিফা মুতাজ বায়াকবেককে খলিফার প্রতিনিধিরূপে মিশরে জায়গীর প্রদান করেন। বায়াকবেক তখন সৎপুত্র আহম্মদকে তার প্রতিনিধি (গভর্নরের প্রতিনিধি অর্থাৎ সহকারী গভর্নর) করে মিশরে প্রেরণ করেন। মিশরের জায়গিরদারি পেয়ে আহম্মদ ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফুস্তাত গমন করেন। মূলত এটাই ছিল তুলুনি বংশ প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ। ইতোমধ্যে সেনাপতি বায়াকবেক মৃত্যুবরণ করেন। আব্বাসি খলিফা তখন আমির ইয়ারজুখকে মিশরের কর্তৃত্ব প্রদান করেন। এসময় ঘটনাক্রমে আহম্মদ আমির ইয়ারজুখ-এর কন্যাকে বিবাহ করেন। ফলে ইয়ারজুখ তাকে মিশরের সহকারী গভর্নরের পদে বহাল রাখেন। ৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ারজুখ মৃত্যুবরণ করলে আব্বাসি খলিফা মুতামিদ আহম্মদকে মিশরের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এ প্রক্রিয়াকে তুলুনি বংশ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় ধাপ বলা হয়। আহম্মদ মিশরের কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেন এবং ধীরে ধীরে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকেন। তিনি তুর্কি ক্রীতদাস ও নিগ্রোদের নিয়ে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন। এসময় একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে খলিফার সঙ্গে তার বিরোধ বাঁধে। ঘটনাটি ছিল এরকম — খলিফার নিকট জাং নামক একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী অর্থ দাবি করলে তিনি আহম্মদের নিকট উক্ত অর্থ চেয়ে পাঠান। কিন্তু আহম্মদ অর্থ দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে খলিফা মুতামিদ রাগান্বিত হয়ে তার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে আহম্মদ জয়লাভ করেন। এর ফলে মিশরে তার অবস্থান আরো সুসংহত হয় এবং তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তারপর তিনি ক্রমান্বয়ে মিশরে তার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং একটি স্বাধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেন। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ২০০০, পৃ. ২৫৩; শেখ মুহম্মদ লুৎফর, ১৯৭৬, পৃ. ৪০১; Hitti, 1970, p. 453) মূলত এই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্য দিয়েই মিশরে তুলুনি বংশের গোড়াপত্তন ঘটে। এই ঘটনাটি মিশরের ইতিহাসে একটি দিক-পরিবর্তনকারী ঘটনা। এর মধ্য দিয়ে নীলনদের উপতক্যায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠে এবং গোটা মধ্যযুগ জুড়ে এই সার্বভৌম রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব বজায় ছিল। (সূত্রঃ Hitti, 1970, p. 453)

মূলত খলিফা আল-মুতামিদের পরোক্ষ অনুমতিক্রমে (খলিফার মনোনীত একজন গভর্নরের সহকারী হিসেবে) আহম্মদ ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ফুস্তাতে যান। সেখানে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ের সংগ্রাম ও কৌশলের মাধ্যমে এ বংশটি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। প্রথম পর্যায়ে আব্বাসি খলিফার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। এসময় আহম্মদ খলিফার দরবারে রাজস্বও প্রেরণ করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে অর্থ প্রদান সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে খলিফার সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এরপর থেকে তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনায় ব্রতী হন। মৃত্যুর পূর্বে (৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে) তিনি বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারী (পুত্র খুমারাওয়াহকে) মনোনীত করে যান। সিরিয়া বিজয়ের পর আহম্মদ তার স্বর্ণমুদ্রায় খলিফার নামের সঙ্গে নিজের নাম প্রকাশ করতে থাকেন। তবে আহম্মদ কৌশল হিসেবে খলিফা আল-মুতামিদকে সবসময় বাহ্যিকভাবে মান্য করতেন। উল্লেখ্য যে, এসময় খলিফার রাজনৈতিক শক্তি একেবারেই নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল এবং দরবারের অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র প্রকট আকার ধারণ করেছিল। এ কারণেই হয়তো ৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে

আহম্মদ খলিফা মুতামিদকে তার নিকট আশ্রয় গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তবে এ আমন্ত্রণের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল মিশরে পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ ও খলিফার ত্রাণকর্তা হিসেবে নিজের কৃতিত্ব জাহির করা। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ২০০০, পৃ. ২৫৩) যদিও খলিফা তার সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। তবে এ বিষয়টি আহম্মদের কূটনৈতিক দূরদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে। এছাড়া মিশরে নিজ ক্ষমতা সুসংহত করার পর আহম্মদ বাগদাদের কেন্দ্রীয় কোষাগারে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করে দেন। বরং এ অর্থ দ্বারা তিনি মিশরে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটান এবং 'আল-কাতাই' নগরীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ২০০০, পৃ. ২৫৪; শেখ মুহম্মদ লুৎফর, ১৯৭৬, পৃ. ৪০২) এ বিষয়টি খিলাফতের প্রতি তার আনুগত্য ও খলিফার সঙ্গে তার সুসম্পর্কের প্রমাণ বহন করে না।

আহম্মদের মৃত্যুর পর ৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র খুমারাওয়াহ সিংহাসনে বসেন। ক্ষমতা গ্রহণ করার পর তাকে প্রথমে আব্বাসি খলিফার বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়। অবশেষে ৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি চুক্তির মাধ্যমে খলিফা মুয়াকফাকের সঙ্গে তার বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে। খুমারাওয়াহ আব্বাসিদের সার্বভৌমত্বের প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করেন। বিনিময়ে তিনি ও তার পরবর্তী বংশধরগণ ত্রিশ বছরের জন্য মিশর ও সিরিয়ার আইনসম্মত গভর্নরের পদ স্থায়ীভাবে লাভ করেন। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ১৯৯১, পৃ. ১৪৫) ৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে আল-মুতামিদ খিলাফতে অধিষ্ঠিত হলে খুমারাওয়াহ-এর সঙ্গে তার নতুন চুক্তি সম্পাদিত হয়। সে চুক্তির শর্ত ছিল— খলিফাকে বছরে ৩ লক্ষ দিনার এবং খুমারাওয়াহ এর শাসনকালের পূর্ববর্তী প্রত্যেক বছরের জন্য ২ লক্ষ দিনার দিতে হবে। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ১৯৯১, পৃ. ১৪৫) তবে খুমারাওয়াহ কৌশলে মুতামিদের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চালান। এক পর্যায়ে মুতামিদের পুত্রের সঙ্গে নিজের কন্যার বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খলিফা মুতামিদ নিজেই খুমারাওয়াহ-এর কন্যাকে বিবাহ করেন। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ১৯৯১, পৃ. ১৪৫) অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এ বিয়েটি সম্পন্ন হয়েছিল। [যদিও স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এটি একটি শিষ্টাচার বহির্ভূত ও অনভিপ্রেত কাজ। কারণ, নিজ পুত্রের জন্য যে কন্যার বিবাহ প্রস্তাব আসে, সেই কন্যাকে পিতার বিবাহ করাটা নিশ্চয়ই দৃষ্টিকটু ব্যাপার]। যাই হোক এ বিবাহের ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। খুমারাওয়াহ তার পিতার মতো মুদ্রায় নিজের নাম ও খলিফার নাম উৎকীর্ণ করতেন। কিন্তু খুমারাওয়াহ পরবর্তী শাসকগণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন না হওয়ায় এবং দরবারের অভ্যন্তরীণ গোলযোগে ব্যস্ত থাকার জন্য বাগদাদের সঙ্গে সুসম্পর্কের নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি। বাগদাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ধারাবাহিকতা না থাকার ফলে খলিফার পক্ষ থেকে তারা কোন পদবী বা উপাধি পেয়েছিলেন কি-না তা জানা যায় না। তবে আহম্মদ ও খুমারাওয়াহ উভয়েই বাগদাদের খলিফাকে রাজস্ব প্রেরণ করতেন। যদিও তা নিয়মিত ছিল না।

এসকল বিষয়াধি পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, খুমারাওয়াহ ব্যতীত এ বংশের অন্য সকল শাসকদের সঙ্গে আব্বাসি খলিফাদের সুসম্পর্ক ছিল না। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম শাসক আহম্মদের সঙ্গে খলিফার সম্পর্ক শুরুর দিকে ভাল থাকলেও পরে তা খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পর্যায়ে উপনিত হয়। তবে খিলাফতের প্রতি আহম্মদ ও খুমারাওয়াহ উভয়ের বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। বিশেষ করে মুদ্রায় ও খুৎবায় খলিফার নাম সবসময় প্রকাশ করা হতো। যদিও দ্বিতীয় শাসক খুমারাওয়াহ প্রথম দিকে জু'মার নামাজের খুৎবায় খলিফার বিরুদ্ধে বিষেদাগার

করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাদের উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের সমন্বয় ঘটে এবং মোটামুটি একটি ভালো সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু খুমারাওয়াহ পরবর্তী তিন জন শাসকের সঙ্গে বাগদাদের খলিফার সম্পর্ক ভালো ছিল না।

অতএব, মিশরের তুলুনিদের প্রতি বাগদাদের আব্বাসি খলিফাদের গৃহীত প্রশাসনিক নীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আব্বাসি খলিফাগণ সম্পদশালী এ প্রদেশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতেই প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু উক্ত প্রতিনিধি নিজে মিশরে না গিয়ে আরেকজনকে (আহম্মদকে) তার পক্ষে সেখানে প্রেরণ করেন। আহম্মদ শুরুতে আব্বাসি খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও পরবর্তীকালে এতে ব্যতয় ঘটে। তবে এ বংশের দ্বিতীয় শাসকের সঙ্গে বাগদাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটেছিল। তখন কেন্দ্র ও মিশরের মধ্যে একটি সমঝোতামূলক নীতির ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছিল।

ইখশিদিদের প্রতি আব্বাসি খলিফাদের গৃহীত নীতি

ইখশিদি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে তুগুজ আল-ইখশিদ নামের একজন তুর্কি দাস। তার পূর্বপুরুষগণ মধ্য এশিয়ার ফারগানা থেকে বাগদাদে এসেছিলেন। তার পিতা ও পিতামহ আব্বাসি খলিফাদের সেনাবাহিনীতে চাকুরী করতেন। পরবর্তীকালে তার পিতা তুগুজ তুলুনি শাসক খুমারাওয়াহর সেনাবাহিনীতে অত্যন্ত দক্ষতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। মুহাম্মদ ইবনে তুগুজ সাধারণ সৈনিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীকালে নিজের যোগ্যতায় সেনাবাহিনীর কমান্ডার পদে উন্নীত হন। তিনি ৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি খলিফা আল-রাযি কর্তৃক মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং সেখানে এ বংশের পত্তন ঘটান। এর দু'বছর পর তিনি (৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফার নিকট থেকে ইরানি রাজকীয় উপাধি 'ইখশিদ' গ্রহণ করেন। 'ইখশিদ' অর্থ রাজাধিরাজ। এই 'ইখশিদ' উপাধি অনুযায়ী এ বংশের নামকরণ করা হয়েছে ইখশিদি বংশ। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ২০০০, পৃ. ৩৫৯; Hasan, 1995, p. 475) মূলত তুলুনি বংশের পতনের পর আব্বাসি খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে ইখশিদিরা মিশর শাসন করতেন। মিশর ছাড়াও সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মক্কা এবং মদীনায় কিছু সময় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (Hitti, 1970, p. 456) তারা সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন। তাদের রাজধানী ছিল ফুস্তাত। প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তারা 'ওয়ালি' পদবী ব্যবহার করতেন। ৯৩৫-৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩৪ বছর মিশরে এ বংশের শাসনকাল স্থায়ী হয়েছিল। এ বংশের মোট শাসক ছিল ৫ জন। (Lane-Poole, 1977, p. 69)

ইখশিদি বংশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও তাদের প্রতি আব্বাসি খলিফাদের নীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের প্রতি আব্বাসি খলিফাগণের সুদৃষ্টি ছিল। তুলুনি বংশের পতনের পর মূলত আব্বাসি খলিফার অনুমোদনক্রমেই এ বংশটি মিশরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইবনে তুগুজের সামরিক সক্ষমতা বিবেচনায় খলিফা আল-রাযি তাকে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। কারণ, তুলুনি বংশের পতনের পর মিশরের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চরম আকার ধারণ করেছিল। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে মিশরের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। মুদ্রা ও খুৎবায় তিনি খলিফার নাম যথারীতি প্রকাশ করতেন। তার অধীন এলাকাসমূহ থেকে যে রাজস্ব আদায় করা হতো, স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যয় মেটানোর পর বাকি অর্থ বাগদাদে প্রেরণ করা হতো। তবে প্রতি বছরই যে তিনি বাগদাদে রাজস্ব প্রেরণ করতে পারতেন এমন নয়। মুহাম্মদ আল-ইখশিদি

তার ১১ বছর রাজত্বকালে খলিফাদের সঙ্গে কোনোরূপ বিবাদ-বিসংবাদে জড়াননি। বরং খলিফাগণকে সবসময় সহায়তা করেছেন। উল্লেখ্য যে, খলিফা মুতাওয়াক্কিল যখন হামদানি নেতা সাইফ উদ- দৌলা এবং আমির তুজুন ও আল-বারাদির সঙ্গে দ্বন্দ্বের ফলে বাগদাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন, তখন তিনি মুহাম্মদ ইবনে তুগুজের সাহায্য কামনা করেন। মুহাম্মদ ইবনে তুগুজ এ সময় যথারীতি রাক্কায় গিয়ে খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে তার সঙ্গে মিশর অথবা সিরিয়ায় যাওয়ার প্রস্তাব দেন। যদিও খলিফা তখন এ প্রস্তাবটি গ্রহণ করেননি। (Hasan, 1995, p. 475) এছাড়া তিনি তৎকালীন উদীয়মান হামদানি নেতা সাইফ উদ- দৌলার বিরুদ্ধে দুই-দুইটি যুদ্ধে (রাসতান ও কিন্নিসিরিনের যুদ্ধ) অবতীর্ণ হন এবং চূড়ান্তভাবে দামেস্ক ও আলেপ্পোতে নিজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তবে কিন্নিসিরিনের যুদ্ধের পর (৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে) উভয়পক্ষের মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইখশিদিরা যথারীতি দামেস্কের নিয়ন্ত্রণে বহাল থাকেন এবং হামদানিদের হাতে উত্তর সিরিয়া ও আলেপ্পো ছেড়ে দেন। (Hasan, 1995, p. 475-476)

৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ আল- ইখশিদির মৃত্যুর পর তার দু'জন নাবালক পুত্রের পক্ষে দরবারের উজির মালিক কাফুর ২০ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এসময় তিনি (মালিক কাফুর) উত্তর সিরিয়া ও আলেপ্পোর হামদানি শাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মিশর ও সিরিয়াকে (দামেস্ককে) সাফল্যের সঙ্গে রক্ষা করেছেন। (Hitti, 1970, p. 456) তখন তিনি আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে কোনোরূপ বিরোধে জড়াননি। খলিফাদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি তার প্রভু মুহাম্মদ আল-ইখশিদির নীতি মেনে চলতেন। আর বাগদাদও সবসময়ই তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছে, সমর্থন জুগিয়েছে। ৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ মুহাম্মদ আল-ইখশিদের দ্বিতীয় পুত্রের মৃত্যুর পর আব্বাসি খলিফা আল-মুতি তাকে (মালিক কাফুরকে) সরকারিভাবে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এরপর মাত্র দু'বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে ৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ২০০০, পৃ. ৩৫৮) উল্লেখ্য যে, ইখশিদিরা বাগদাদের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য প্রকাশ করতেন, আর এর বিনিময়ে তারা স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা ও উত্তরাধিকারী নির্বাচন করতে পারতেন। এ ব্যাপারে বাগদাদ কোনো প্রকার মাথা ঘামাতো না। মূলত ইখশিদিদের প্রতি বাগদাদের নীতি ছিল— মিশরে খলিফার নিযুক্ত বৈধ শাসনকর্তা হিসেবে ইখশিদিরা যেন খলিফার প্রতি আনুগত্যের নীতি মেনে চলে ও বাগদাদে নিয়মিতভাবে রাজস্ব প্রেরণ করে।

তবে ইসলামী বিশ্বকোষে মুহাম্মদ ইবনে তুগুজ আল-ইখশিদি সম্পর্কে একটি ব্যতিক্রমী তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই অঞ্চলে তখন আব্বাসি-ফাতিমি বংশের দ্বন্দ্ব শুরু হলে তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ লাগানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। মনে করা হয়, তিনি আন্তরিকভাবে ফাতিমিদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু আব্বাসি খলিফার অত্যধিক বিশ্বস্ত হওয়ায় পরিচিতিটাই বেশি প্রকাশ করতেন। (আ.ফ.ম. আবদুল হক, ২০০০, পৃ. ৩৫৯) কারণ, তখন পর্যন্ত আব্বাসি খলিফাদের প্রভাব (বিশেষত ধর্মীয় প্রভাব) অনেকটাই অক্ষুণ্ণ ছিল। যদিও মালিক কাফুর ফাতিমিদের প্রতি কিছুটা নমনীয় মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি ফাতিমি দূতকে দরবারে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। এছাড়া ফাতিমিদের প্রচারণার তিনি কখনো কোনোরূপ বাধা প্রদান করেননি। মূলত ফাতিমিদের সঙ্গে তিনি একটি কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এছাড়া কাফুরের ক্ষমতা সুসংহত করার অন্য কোনো উপায় ছিল না।

কেননা তখন এইঅঞ্চলে ফাতিমিদের রাজনৈতিক শক্তি প্রচণ্ড মাত্রায় বিকাশ লাভ করেছিল। আর আব্বাসিদের রাজনৈতিক শক্তি তখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়েছিল। যদিও ফাতিমি খলিফা আল-মুইজ এক পর্যায়ে মালিক কাফুরকে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে এই ইখশিদি শাসক কোন সাড়া প্রদান করেননি। (শেখ মুহম্মদ লুৎফর, ১৯৭৬, পৃ. ৪০৭-৪০৮) এসব বিষয় বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, এ বংশের শাসকবর্গ আব্বাসি খলিফাদের প্রতি আনুগত্যের নীতি মেনে চলতেন।

উল্লেখ্য যে, ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার পর থেকে আব্বাসি খলিফাদের প্রভাবাধীন ইফ্রিকিয়া ও মিশর হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তখন থেকে এতদাঞ্চলে ফাতিমিদের সমর্থক ব্যাপক আকারে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের রাজনৈতিক শক্তির চরম বিকাশ সাধিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় ইখশিদি দরবারের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে ফাতিমি খলিফাকে মিশর আক্রমণের আহ্বান জানানো হয়। ফাতিমি খলিফা আল-মুইজ মিশরের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সেনাপতি জওহর আল-সিকিল্লিকে ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মিশর অভিযানে প্রেরণ করেন। এসময় মিশরে ইখশিদি শাসনকর্তা ছিলেন আবুল ফাওয়ারিস আহম্মদ ইবনে আলি ইবনে আল-ইখশিদ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অন্যান্য কারণে সেসময় ইখশিদি শাসনকর্তার খুব দুরবস্থা চলছিল। আর আব্বাসি খলিফাদের রাজনৈতিক শক্তিও তখন প্রায় শূন্যের কোঠায়। এজন্য জওহর আল-সিকিল্লিকে মিশর বিজয়ে কোন বেগ পেতে হয়নি। জওহর প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। এখানে তিনি অল্প কিছু বাধার সম্মুখীন হন, কিন্তু তাঁর সুদক্ষ রণনৈপূণ্যে সহজেই তিনি সেটি অতিক্রম করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার পতনের সংবাদে ফুস্তাতে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে জওহর তার সেনাদলসহ ফুস্তাতে উপস্থিত হন এবং প্রায় বিনা বাধায় ফুস্তাত দখল করেন। ইখশিদি শাসক আবুল ফাওয়ারিসকে বন্দি করা হয়। এর মধ্য দিয়ে ইখশিদিদের পতন ঘটে এবং মিশর চূড়ান্তভাবে ফাতিমি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। (শেখ মুহম্মদ লুৎফর, ১৯৭৬, পৃ. ৪০৮-৪০৯; Ali, 1961, p. 599-600)

হামদানিদের প্রতি আব্বাসি খলিফাদের গৃহীত নীতি

আব্বাসি খলিফাদের শাসনামলে বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলে সর্বশেষ যে ক্ষুদ্র রাজবংশটি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটি হলো হামদানি বংশ। এ বংশটি দু'টি স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। প্রথম পর্যায়ে বংশটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মেসোপটেমিয়ায় (আল-জাজিরা) এবং এর রাজধানী ছিল মসুলে (৯২৯-৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ)। দ্বিতীয় পর্যায়ে যে স্থানে বংশটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেটি ছিল সিরিয়ার আলেপ্পো (৯৪৫-১০০৪ খ্রিষ্টাব্দ)। (মুহম্মদ রেজা-ই-করীম, ১৯৭২, পৃ. ৪১৩; Hitti, 1970, p. 456) হামদানি বংশের প্রধান নেতা ছিলেন বনু তাগলিব গোত্রের হামদান ইবনে হামদুন। হামদান নামের অর্থ 'প্রশংসনীয়'। উক্ত হামদানের নাম অনুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয়েছে হামদানি বংশ। মসুলে আনুষ্ঠানিকভাবে হামদানি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন হামদানের পুত্র আবদুল্লাহ আবুল হায়জা। যদিও তার পিতা হামদান ৮৮৫-৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আল-জাজিরা ও মারিদিন এলাকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর আলেপ্পোতে হামদানি বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবদুল্লাহ আবুল হায়জার ছোট পুত্র আলি। যিনি সাইফ উদ-দৌলা নামে ইতিহাসে অধিক পরিচিত। উল্লেখ্য যে, তিনি ছিলেন এ বংশের সর্বপেক্ষা খ্যাতিমান শাসক। (সিরাজুল হক, ১৯৯৬, পৃ. ২৪৩, ২৪৫,

২৪৭) তিনি ইখশিদিদের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে আলেপ্পোতে এই বংশটির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মসুল কেন্দ্রে হামদানিদের মোট শাসক ছিলেন ৭ জন। (তাদের প্রধান নেতা হামদান ইবনে হামদুনের সময় থেকে ধরে) তাঁরা ৮৮৫-৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য চালিয়েছিলেন। আর আলেপ্পো কেন্দ্রে হামদানিদের শাসক ছিলেন মোট ৫ জন। তাঁরা ৯৪৫-১০০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। (Lane-Poole, 1977, p. 112-113)

এই বংশের আদি পুরুষ হামদান মূলত জাজিরা অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। খলিফা আল-মুতামিদ তাকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের একেবারে শুরুর দিকে আব্বাসি খলিফার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো ছিল না। কিন্তু হামদানের পাঁচ পুত্র হুসায়েন, আবদুল্লাহ আবুল হায়জা, ইব্রাহিম, দাউদ ও সাঈদ সকলের সঙ্গেই আব্বাসি খলিফাদের ইতিবাচক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। হামদানের পাঁচ জন পুত্রের মধ্যে একমাত্র সাঈদ ব্যতীত সকলেই জাজিরা, মসুল ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলসমূহে আব্বাসি খলিফাদের মনোনীত গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এদের মধ্যে কেউ-কেউ বারবার গভর্নর নিযুক্ত হন। বিশেষ করে হামদানের পুত্র হুসায়েন আব্বাসি খলিফার পক্ষে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি খারিজি ও কারামাতিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মিশরের শেষ তুলুনি শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এসব বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, হুসায়েনের সঙ্গে খলিফা মুতামিদের সম্পর্ক খুবই সোহার্দ্যপূর্ণ ছিল। তিনি খলিফা কর্তৃক ৯১০ খ্রিষ্টাব্দে দিয়ার রাবিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। হুসায়েন অবশ্য দু'বার খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। একবার ৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি খলিফা আল-মুতাজকে সিংহাসনে বসানোর ব্যর্থ ষড়যন্ত্র করেন। তখন খলিফা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার ৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যখন খলিফার দরবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তখন তাকে গ্রেফতার করা হয়। অর্থাৎ শেষ দিকে বাগদাদের সঙ্গে তার সম্পর্কে অবনতি ঘটে।

হামদানের অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে আবদুল্লাহ আবুল হায়জাকে আব্বাসি খলিফা আল-মুকতাফি ৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে মসুলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। আর ইব্রাহিম ও দাউদ উভয়েই যথাক্রমে ৯১৯ এবং ৯২০ খ্রিষ্টাব্দে দিয়ার রাবিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন। তারা সকলেই আব্বাসি খলিফার নামেই উক্ত অঞ্চলসমূহ শাসন করতেন। বাগদাদের প্রতি তারা যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতেন। খলিফাদের প্রতি আনুগত্যের নীতি মেনে চলতেন। যদিও আবদুল্লাহ আবুল হায়জা জীবনের শেষ দিকে বাগদাদের দরবারের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়েন। খলিফা আল-মুক্তাদিরের স্থলে তার ভাই আল-কাহিরকে খিলাফতে বসানোর ষড়যন্ত্রে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এ কারণেই অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটে। এর পরবর্তীকালে মসুলের গভর্নর আল-হাসান নসর উদ-দৌলা অবশ্য ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খিলাফতের প্রতি যথারীতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের পর বাগদাদের দরবারে প্রবল মাত্রায় অভ্যন্তরীণ সংকট দেখা দিলে হামদানিরা ৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদে প্রবেশ করেন। ৯৪১-৯৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাগদাদে হামদানি কর্তৃত্ব বজায় ছিল। খলিফা মুত্তাকি এসময় হামদানি আমির আল-হাসানকে 'নাসির উদ- দৌলা' ও আলিকে 'সাইফ উদ-দৌলা' উপাধি প্রদান করেন। (সিরাজুল হক, ১৯৯৬, পৃ. ২৪৩-২৪৫) এ সময়কাল পর্যন্ত ঘটনাবলির বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দু'একটি ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ছাড়া আব্বাসি খলিফাদের সঙ্গে মসুলের গভর্নরদের সম্পর্ক খুবই ইতিবাচক ছিল। অর্থাৎ এ সময়কাল পর্যন্ত উভয় পক্ষই সমঝোতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

কিন্তু ৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে বুয়াইয়ারা বাগদাদে প্রবেশ করে খলিফার সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। এসময় বুয়াইয়ারা হামদানিদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করলে সাইফ উদ-দৌলা বুয়াইয়াদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ফলে প্রথম দফায় বুয়াইয়াদের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। এসময় আমির সাইফ উদ-দৌলা উত্তর সিরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করে আলেপ্পো কেন্দ্রিক একটি নতুন শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। আব্বাসি খলিফা প্রথমে এ অঞ্চলে মিশরের ইখশিদিদের সমর্থন করলেও পরবর্তীকালে (৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে) সাইফ উদ-দৌলাকে তার সামরিক শক্তি বিবেচনায় আলেপ্পোর বৈধ শাসনকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। এরপর থেকে ১০০১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ধর্মীয়ভাবে আব্বাসি খলিফাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও রাজনৈতিকভাবে বুয়াইয়া শাসকদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে হামদানিয়া আলেপ্পোতে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। যদিও বুয়াইয়ারা ৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মসুল দখল করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে মসুলের হামদানি গভর্নর বুয়াইয়াদের সঙ্গে সমঝোতা করে নেন। এসময় অবশ্য আলেপ্পোতে ফাতিমিদের প্রভাব বলয় গড়ে উঠে। সাদ উদ-দৌলা এ সংকট মোকাবেলায় বাইজান্টাইনদের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাদ উদ-দৌলা বুয়াইয়া, ফাতিমি ও বাইজান্টাইনদের সঙ্গে কৌশলে কাজ করায় নীতি গ্রহণ করেছিলেন। (সিরাজুল হক, ১৯৯৬, পৃ. ২৪৮) সাদ উদ-দৌলার উত্তরাধিকারী আলেপ্পোর সর্বশেষ আমির সাইদ উদ-দৌলাও সমসাময়িককালের প্রতিদ্বন্দ্বী উক্ত তিনটি শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে তার পিতার নীতিকেই অনুসরণ করেন।

উক্ত ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, আব্বাসি খলিফাগণ ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত হামদানিদেরকে নিজেদের অধীন করে রাখতে পেরেছিলেন। এসময় ইখশিদিরা খলিফার আনুকূল্যে সিরিয়ার শাসনকর্তা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু উক্ত অঞ্চলে ইখশিদি ও হামদানিদের সংঘাত শুরু হলে শেষ পর্যন্ত খলিফা হামদানিদের সামরিক শক্তি বিবেচনায় আলেপ্পোতে তাদেরকে বৈধ শাসনকর্তার স্বীকৃত দেন। কিন্তু ৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে দাইলামি বুয়াইয়ারা বাগদাদ দখল করে খলিফার সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা কারায়াত্ত করেন। এ অবস্থায় খলিফার পক্ষে হামদানিদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। সর্বোপরি হামদানিরা এসময় আলেপ্পো কেন্দ্রিক রাজনীতিতে সমসময়ের অন্য দু'টি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ বাইজান্টাইন ও ফাতিমিদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে কৌশলগত সম্পর্কের নীতি গ্রহণ করেন।

উপসংহার

উপরিউক্ত বিষয়গুলো আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে বলা যায় যে, আব্বাসি খলিফাগণ মাগরিব তথা বাগদাদের পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত রাজবংশগুলোর শাসকদের জন্য যে প্রশাসনিক নীতিমালা প্রয়োগ করেছিলেন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে যেসকল পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেগুলো তৎকালীন বিচারে মোটামুটি যথার্থ ছিল বলে প্রমাণিত হয়। কারণ, প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতিকেই আব্বাসি খলিফাগণ শুরু থেকে চালু রেখেছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ ছিল মিশর। মিশরে তারা গভর্নর নিয়োগের মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন, রাজস্ব আদায় করতেন। এছাড়া ইফ্রিকিয়ার কিছু অঞ্চলে আব্বাসিদের প্রভুত্ব বজায় ছিল। মূলত উত্তর আফ্রিকার মরক্কো ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে আব্বাসিরা রাজনৈতিক আধিপত্যের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, মরক্কোতে কখনো আব্বাসিদের

কোনো প্রকার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেখানে আব্বাসিদের প্রতিদ্বন্দ্বী ইদ্রিসি বংশের রাজত্ব ছিল। এছাড়া আঘলাবি, তুলুনি, ইখশিদি ও হামদানি বংশের শাসকবর্গের সঙ্গে আব্বাসি খলিফাগণ মোটামুটি সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। অনেক সময় শক্তিশালী গভর্নরদের সঙ্গে সমঝোতার নীতি গ্রহণ করতেন। উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত চারটি বংশের গভর্নরগণই প্রাথমিকভাবে আব্বাসি খলিফা কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে সকল গভর্নরগণ খলিফাদের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শন করেননি। তবে তারা কখনোই খলিফার ধর্মীয় নেতৃত্বকে ছোট করে দেখেননি। উক্ত অঞ্চলসমূহের খুৎবা ও মুদ্রায় খলিফাদের নাম তারা যথারীতি প্রকাশ করতেন। সার্বিক বিচারে বলা যায় যে, তৎকালীন যুগপ্রবণতায় যেখানে যেকোনো সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদের উদ্ভব হওয়া বা কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার রাজনীতি ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার, সেখানে এত বিস্তৃত সাম্রাজ্যে সুদূর আফ্রিকাতে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে প্রায় দু'শ বছর রাজ ক্ষমতা পরিচালনা করে তারা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ফাতিমিদের উত্থানে তাদের প্রভাববলয়ে ধীরে ধীরে ফাতিমিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব রাজনৈতিক বাস্তবতায় খলিফাদের নিয়োগকৃত গভর্নরগণ সেখানে শেষ পর্যন্ত সুবিধা করতে পারেননি। মূলত উক্ত অঞ্চলসমূহে ফাতিমিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে আব্বাসি খলিফাদের পশ্চিমমুখী নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং এরপর থেকে মিশর চূড়ান্তভাবে তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়।

উল্লেখপঞ্জি

আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য [সম্পাদিত] (১৯৮৬)। *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আ.ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য [সম্পাদিত] (১৯৯১)। *ইসলামী বিশ্বকোষ, ১০ম খণ্ড*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আ. ফ.ম. আবদুল হক ফরিদী ও অন্যান্য [সম্পাদিত] (২০০০)। *ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড*, (দ্বিতীয় প্রকাশ)। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

মুহম্মদ রেজা-ই-করীম (১৯৭২)। *আরব জাতির ইতিহাস*। বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা

মুসা আনসারী (১৯৯৯) । *মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান (১৯৭৬)। *আরব জাতির ইতিহাস*। (তৃতীয় সংস্করণ), স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান (১৯৮৪)। *ইসলাম : রাষ্ট্র ও সমাজ*। (পুনর্মুদ্রন), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সিরাজুল হক ও অন্যান্য [সম্পাদিত] (১৯৯৬)। *ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫শ খণ্ড*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

Ali Syed Ameer (1961). *A Short History of the Saracens*. Macmillan and Co. Limited, London

Arnold T.W. (1967). *The Caliphate*. (reprint), (Routledge & Kegan Paul Ltd. , London

Hasan Masudul (1995). *History of Islam, Classical Period (571-1258 C.E), Vol.-1. (*revised edition), Adam Publishers & Distributers, Delhi

Hitti P.K. (1970). *History of the Arabs.(*10th edition)The Macmillan Press Ltd., London

Husaini S.A.Q. (1949). *Arab Administration.* Solden & Co., Madras

Lane-Poole S. (1977). *The Mohammadan Dynasties Chronological and Genealogical Tables with Historical Introduction.* (reprint), Jayyed Press, Delhi

রুমির কাব্যে পবিত্র কোরআনে উল্লখিত মানব সৃষ্টির প্রতিফলন

মুহাম্মদ শাহজালাল*

সারসংক্ষেপ : সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে বিশ্ব এবং বিশ্বের অণু থেকে পরমাণু প্রতিটি বস্তু ও জীব সৃষ্টির সীমাহীন কৌশল সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমেই জানিয়েছেন। মানবজাতির আদিপিতা হলেন হযরত আদম (আ.)। তাঁর সৃষ্টি থেকে শুরু করে এ মানবজাতি সৃষ্টির শেষ প্রক্রিয়াও সুস্পষ্টভাবে ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনে। মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনে মানবজাতি সৃষ্টির এ গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনে যে ক'জন দার্শনিক তাঁদের অমর অবদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন দার্শনিক রুমি(র.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাই 'রুমির কাব্যে পবিত্র কোরআনে উল্লখিত মানব সৃষ্টির প্রতিফলন' এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করাই হলো আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

ভূমিকা

মহান আল্লাহ্ তা'আলার অমীয়বাণী হলো মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন। এ কোরআন সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত এবং সকল মানদণ্ডে অকাট্যভাবে বিশুদ্ধ ও সত্য বলে প্রমাণিত। পবিত্র কোরআনই মানব জাতির সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতিকে বিশ্ব এবং বিশ্বের অণু থেকে পরমাণু প্রতিটি বস্তু ও জীব সৃষ্টির সীমাহীন কৌশল সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের মাধ্যমেই জানিয়েছেন। তিনি মানবজাতি সৃষ্টির পূর্বে তাদের জীবন-যাপন ও বসবাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন এ বিশ্বজগত। আর এ সৃষ্টির মাঝে রয়েছে ধারাবাহিক নিয়মতান্ত্রিকতা। যেভাবে তিনি পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মানবজাতিকে জানিয়েছেন বিশ্বসৃষ্টির তথ্যসমূহ সেভাবে জানিয়েছেন মানবজাতি সৃষ্টির প্রক্রিয়া। মানবজাতির আদিপিতা হলেন হযরত আদম (আ.)। তাঁর সৃষ্টি থেকে শুরু করে এ মানবজাতি সৃষ্টির শেষ প্রক্রিয়াও সুস্পষ্টভাবে ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনে। মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনে মানবজাতি সৃষ্টির এ গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনে যে ক'জন দার্শনিক তাঁদের অমর অবদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন দার্শনিক রুমি[১](র.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাই 'রুমির কাব্যে পবিত্র কোরআনে উল্লখিত মানব সৃষ্টির প্রতিফলন' এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করাই হলো আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

মানবজাতির পরিচিতি

সৃষ্টিজগতে মানবজাতি হলো মহান প্রভূ আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট এক প্রকার বাকশক্তি সম্পন্ন প্রাণী। এ ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত অসংখ্য জীবজগত, জড়জগত ও প্রাণীজগতের ন্যায় মানবজাতিও এক প্রকার সৃষ্টিজীব। মানবদেহ হলো–

> কিছু মাংস, রক্ত, অস্থি-মজ্জা, শিরা-উপশিরা, স্নায়ুতন্ত্রী-পেশী, রজ্জু বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, জোড়া-গিরা ও কোষ-তন্ত্রী সমন্বিত। মানব সত্তায় যে বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা, শক্তি রয়েছে, তাও নিছক 'বস্তু' ও মগজের ক্রিয়া মাত্র। যকৃত থেকে যেমন পীতরস নিঃসৃত হয় কিংবা মূত্র থলি থেকে যেমন প্রস্রাব পরিত্যক্ত হয়, এও ঠিক তেমনি। বস্তুবাদীদের দৃষ্টিতে মানুষ এই পৃথিবীর

* অধ্যাপক ও পরিচালক, মডার্ন ল্যাংগুয়েজ সেন্টার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

> একমুষ্ঠি মৃত্তিকা ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ এই পৃথিবী থেকে উঠেছে, এই পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করে, পৃথিবী থেকেই খাদ্য সংগ্রহ ও গ্রহণ করে এবং পৃথিবীর মাটিতেই শেষ পরিনতি লাভ করে। (আবদুর রহীম, ১৯৯৩, পৃ. ৭৮)

দেহ ও শরীর সর্বস্ব মানুষ মানুষ নয়,

> দেহ এবং আত্মা নিয়েই মানুষ। দেহকে আশ্রয় করে আত্মা থাকে। দেহ থেকে আত্মার বিয়োগ ঘটলে দেহ নিষ্ক্রিয় ও অসার হয়ে পড়ে। সে অবস্থায় দেহকে কেউ মানুষ হিসাবে ভাবে না। তখন আবদুল করিম হয়ে যায় আবদুল করিমের লাশ। এ থেকে ভাবা হয় দেহ মানুষের সারসত্তা নয়। বরং অত্মা হচ্ছে মানুষের সারসত্তা। আত্মা থাকার কারণেই মানুষ 'মানুষ'। এ সত্যকে প্রায় সকল ধর্মে গ্রহণ করে। প্রায় সব ধর্মই মনে করে মানুষের মধ্যে একটা শাশ্বত আত্মা রয়েছে। এ আত্মা মানুষের চালক ও নিয়ন্ত্রক। হিন্দু ও ইসলাম, উভয় ধর্ম মনে করে এ আত্মা মানুষের সারসত্তা। এ সারসত্তা দেহের বাইরে থেকে অর্থাৎ, পরমাত্মা থেকে আসে। পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যা মানুষের সারসত্তা হিসেবে বাইরে থেকে আসা আত্মাকে বোঝে না। যুক্তিবিদ্যা অনুসারে মানুষের সারসত্তা হচ্ছে- 'প্রাণিত্ব' এবং 'প্রজ্ঞা'। প্রাণিত্ব হচ্ছে তার জাতি আর প্রজ্ঞা হচ্ছে তার বিভেদক লক্ষণ। অ্যারিস্টটল মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'প্রজ্ঞাসম্পন্ন প্রাণী' বলে। (আবুল খায়ের মোঃ ইউনুছ, ২০০২, পৃ. ১২৩)

এ বিশ্বের সব কিছু সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের উদ্দেশে ঘোষণা দিলেন যে, এ সৃষ্টিজগতে আমি আমার প্রতিনিধি বানাতে চাচ্ছি। এ সৃষ্টিজগতে মানুষ আল্লাহ্র খলিফা বা আল্লাহ্র প্রতিনিধি। অতএব সৃষ্টিজগতের সবকিছুই মানুষের অধীন। মানুষের কর্তৃত্ব চলবে সৃষ্টিজগতের সবকিছুর ওপর। মানুষ আল্লাহ্র খলিফা হিসেবেই সৃষ্টিজগতের পরিচালক, সৃষ্টিজগতের কোনো কিছুই মানুষের পরিচালক বা মানুষের ওপর কর্তৃত্বকারী হতে পারে না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

> واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

> স্বরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতেছি', তারা বললো, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।[২] (সুরা বাকারা ০২, পৃ. ৩০)

> খলিফা অর্থ প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধি হচ্ছেন হযরত আদম (আ.)। খলিফা প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্ পাকের বিধানাবলি ও বিধানুসারী সম্পর্কিত বিষয়ের প্রচলন, পথ-প্রদর্শন হল সত্য পথের আহ্বান। আল্লাহ্র নৈকট্যার্জনের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি। (সানাউল্লাহ, ১৯৭৯, পৃ. ৯৫)

> এর ভাবার্থ হচ্ছে হযরত আদম (আ.) এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের ব্যাপারেও সৃষ্টি জীবের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর স্থলবর্তীগণ। কিন্তু বিবাদীরা ও খুনাখুনকারীরা খলিফা নয়। খলিফা এক যুগীয় লোকের পরে অন্য যুগীয় লোকের আগমন। (ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির, ১৯৭৯, পৃ. ২১৯)

ইবনে জারীর বলেন "এখানে আল্লাহ্ তা'আলার ব্যবহৃত খলিফা শব্দের অর্থ হল যুগের পর যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে চলা।" (ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির, ১৯৭৯, পৃ. ২৭৫)

তাই রুমি বলেন-

অ'নকে অ'দাম রা' বাদান দীদে উ রামীদ	آنکه آدم را بدن دید او رمید
অ'নকে নূরে মো'তামেন দীদে উ খামী	وآنکه نور مؤتمن دید او خمید
নাক্‌শ কায মায দিদাম আন্দর অ'বো গেল	نقش کژ مژدیدم اندر آب وگل
চোন মালা'য়েক এ-তেরা'য কারদে দেল	چون ملائك اعتراض کرددل

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৪৭৭ ও ২৫২)

যখন আদমের শরীর দেখে আতংকিত হয়ে উঠল তারা
নূরের সত্যতা দেখে নত হয়ে গেল তারা।
মাটি ও পানির মধ্যে যখন তাঁর দেখেছে আকৃতি
ফেরেশতারা আন্তরিকভাবে জানিয়েছে আপত্তি।

মাটি থেকে মানব সৃষ্টি

মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলেন তোমরা মাটি আন তাঁরা আল্লাহ্‌র আদেশে মাটি নিয়ে এলেন। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে- والله خلقكم من تراب "আল্লাহ্ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে।" (সুরা ফাতির ৩৫ : ১১)

প্রথমে মাটি থেকে বাবা আদমকে (আ.) ও বিশেষ পদ্ধতিতে হযরত মা হাওয়াকে (আ.) সৃষ্টি করার পর মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা যে বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন পবিত্র কোরআনে সে সম্পর্কে ঘোষণা দিচ্ছে–

> ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العاظام لحماً ثم انشأنا خلقاً اخر فتبارك الله احسن الخالقين.
>
> আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে, অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আঁধারে; পরে আমি শুক্রবিন্দুকে করি আলাক-এ, অতঃপর আলাক্‌কে পরিণত করি পিন্ডে এবং পিন্ডকে পরিনত করি অস্থি-পঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশ্‌ত দ্বারা; অবশেষে তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ্ কত মহান। (সুরা মু'মিনূন ২৩:১২-১৪)
>
> يايهاالناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبينلكم.ونقر فى الارحام مانشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلاثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى
>
> হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান কর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা হতে, তারপর শুক্র হতে, তারপর আলাকা হতে তারপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাঙ্গকৃতি গোশ্‌তপিন্ড হতে–তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য, আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয়। (সুরা হাজ্জ ২২:০৫)
>
> আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম যেদিন সমস্ত মানুষের আদিপিতা আদমকে (আ.) সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই তার প্রকৃতিতে একমুষ্ঠি মৃত্তিকা ও রূহের একটা ফুঁক একত্রিত করে দিয়েছেন। অতঃপর তারই রসজাত সন্তান হিসাবে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এই মানব বংশ–কোটি–শত–কোটি মানুষ। (আবদুর রহীম, ১৯৯৩, পৃ. ১০০)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

> ذالك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذى احسن كل شيئ خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون-
>
> তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, যিনি তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তমরূপে, এবং কর্দম হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে। পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর রূহ হতে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সুরা সাজদাঃ ৩২:০৬-০৯)

এ পরিপ্রেক্ষিতে রুমি বলেন আমরা মাটির অধিবাসী। আমাদের মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে তাই আমাদের মাঝে নীচতা ও হীনতা প্রকাশ পাচ্ছে । তিনি বলেন–

চোন খালাকনা'কুম শুনোদী মিন তুরা'ব	چون خلقناکم شنودی من تراب
খা'ক বা'সী জুস্‌তো আয তো রো মাতা'ব	خاك باشی جست از تو رومتاب
কায কোজা' অ'ভারদেমাত আই বাদ নিয়্যাত	کز کجا آورد مت ای بد نیت
কে আয অ'ন অ'য়াদ হামী খুফরীক্বী আস্ত	که از آن آید همی خفریقی ا ست
(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৩৫৭ ও ৫৯০)	

শোন তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে
মাটির অধিবাসী মাটিই খোঁজ।
হে অসৎ নিয়ত! তোমাকে কোথা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে
যা থেকে তোমার হীনতা, নীচতা প্রকাশ পাচ্ছে।

মানবজাতির অস্তিত্ব সৃষ্টি

মানুষ তার নিজের অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে, তার সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

> هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً.
>
> কালপ্রবাহে মানুষের উপর তো এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এইজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন। (সুরা দাহ্‌র ৭৬, পৃ. ০১-০২)
>
> প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ ছিল এক বিন্দু শুক্র মাত্র। তাতে দৃষ্টিশক্তি বুদ্ধি, মস্তিস্ক, মস্তক, হাত-পা, জিহ্বা, চক্ষু স্নায়ূ, মাংশ, অস্থি, চর্ম কিছুই ছিল না। পরে তার মধ্যে উক্ত আবশ্যকীয় অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং বিচিত্র কৌশলময় যন্ত্রগুলি ক্রমে ক্রমে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখন ভাববার বিষয় এই যে, এই পরবর্তীকালে সৃজিত ও সংযোজিত অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলি কি সেই শুক্র নিজেই সৃষ্টি করেছে, না অপর কোন সৃষ্টিকর্তা নিজ অনুপম ক্ষমতাবলে এ সমস্ত সৃষ্টি করেছেন? জন্মের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ এক বিন্দু শুক্র মাত্র ছিল। যদিও এখন পূর্ণাবয়ব মানবে পরিণত হয়েছে, তথাপি সহস্র চেষ্টা করলেও মানুষ এক গাছি কেশ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না।

> এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করলে অবশ্যই বুঝা যাবে যে, মানুষ যখন এক বিন্দু শুক্র মাত্র ছিল, তখন ইহা অপেক্ষা অনেক দূর্বল এবং অক্ষম ছিল। তদবস্থায় নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি কেমন করে নিজে সৃষ্টি করবে? সুতরাং মানুষ নিজের অস্তিত্বের আদি কথা চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারবে যে, এক মহা শক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা মানুষকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। (গাযযালি, ২০০৬, পৃ. ৬৩)

উপরোক্ত পদ্ধতিতে মানুষের সৃষ্টির ক্রমধারা বিরাজমান। আজকে যারা মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন তাদের উদ্দেশে রুমি বলেন তোমরা কি ভুলে গেছ যে মহান প্রভূ তোমাদের সৃষ্টি করতে কত শিল্প কৌশল অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন–

চান্দ সানয়াত রাফত আই এনকা'রেতা — چند صنعت رفت ای انکارتا
অ'বো গেল এনকা'র যা'দ আয হাল আতা' — آب وگل انکار زاد ازهل اتی
(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৫৯১)

হে অস্বীকারকারী কত শিল্পই অতিবাহিত হয়েছে
তুমি কি ভুলে গেছ পানি ও মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছ।

মানব প্রজনন : বংশ প্রক্রিয়া

মানব জীবন একক কোষ থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ ও সুসংবদ্ধ দেহ পর্যন্ত পৌঁছানোর কার্যক্রম কিভাবে সম্ভবপর হচ্ছে, পবিত্র কোরআনে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে একক কোষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে– وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين "এবং কর্দম হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।" (সুরা সাজদাঃ ৩২, পৃ. ০৭-০৮) মানব সৃষ্টি একক কোষ সম্পন্ন জীবন থেকে কোনরূপ উত্তাপ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা প্রসব করছে। উইলিয়াম বেক বলেন–

> একক কোষ থেকে ভ্রূণের ক্রমশ বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ শক্তিতে পরিণত হওয়া এবং দেহ সংস্থার এক সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত উদ্দেশ্যপূর্ণ 'একক' হিসেবে কাজ করা। জীবন-সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং জীবনের প্রাণ-শক্তির (Vital Force) মূলতত্ত্ব। (আবদুর রহীম, ১৯৯৭ :১৬১)

রুমি বলেন–

তাফাররোকে দার রুহে হেইভা'নি বুদ — تفرقه در روح حيوانی بود
নাফসে ভা'হেদ রুহে ইনসা'নি বুদ — نفس واحد روح انسانی بود
(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৫৯১)

বিক্ষিপ্ত আত্মা হলো প্রাণীকুলের
একক আত্মা হলো মানব কুলের।

> এ একক কোষ কোনো আকস্মিক দূর্ঘটনার ফসল নয়, এ একক কোষ থেকেই প্রাপ্ত বয়সে নর ও নারীর যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়ার পর দাম্পত্য জীবন যাপন ও দৈহিক মিলন জগতে মানব প্রজনন ও বংশ বিস্তার লাভ করে অব্যাহতভাবে। আধুনিক বিজ্ঞানও আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, ডিম্বাণুর উর্বরতা প্রাপ্তি বা প্রজননের কাজটা সাধিত হয় একটি মাত্র 'সেল' বা জীবকোষ

> দ্বারা। এই কোষ দারুণভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে। মেপে দেখা গেছে যে, এক মিলিমিটারে এর বিস্তৃতি দশ সহস্রাধিক। সাধারণ অবস্থায় একজন পুরুষের উৎক্ষিপ্ত বীর্য এরকম কয়েক কোটি 'সেল' থাকে। এরমধ্যে একটিমাত্র 'সেল' বা শুককীট ডিম্বাণুতে অনুপ্রবেশ করে। বাদবাকি বিপুল সংখ্যক শুককীট তথা জীবকোষ পেছনে পড়ে থাকে এবং এরা আর কখনো ডিম্বাণুতে প্রবেশ করতে পারে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষের তরল বীর্য– যা বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ায় নানা উপাদানে গঠিত– তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক সুক্ষ্মতম অংশের দ্বারা এই প্রজনন তথা বংশধর বিস্তারের কাজটি সম্পাদিত হয়ে থাকে। হিসাব করে দেখা গেছে, এক কিউবিক সেন্টিমিটার বীর্যে প্রায় আড়াই কোটি শুককীট থাকে; এদিকে স্বাভাবিক অবস্থায় একজন পুরুষ একবার যে বীর্যপাত ঘটায়, তার পরিমাণ কয়েক কিউবিক সেন্টিমিটার। (মরিস বুকাইলি, ১৯৮৯ : ৩২৬)

> প্রজনন-ক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণটি থাকে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পিন্ডের মত। এরপর সেই পিন্ডটি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৃদ্ধির বিশেষ পর্যায়ে এটাকে খালি চোখে দেখায়– যেন অবিকল চিবানো গোশতের একটি টুকরা। ভ্রূণের দেহের হাড়ের কাঠামো গড়ে উঠে এই চিবানো মাংস পিন্ডের ভিতরেই। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয়– 'মোসেনচাইমা'। এভাবে এর ভিতরে ভ্রূণের যে হাড়-হাড্ডি, গঠিত হয় তা আবৃত করা হয় পেশী দ্বারা। আরবি 'লাহাম' শব্দটি এই মাংসপেশীর ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মাতৃগর্ভে বৃদ্ধির কালে ভ্রূণের দেহের কোন কোন অংশ কি রকম অসম ও বেমানান থাকে। এই অসম অবয়বই পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ একটা মানুষে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে, গর্ভস্থ শিশুর দেহাবয়বের এই অসম বেমানান অংশের পাশাপাশি কোন কোন অংশ থাকে আবার পুরাপুরিভাবেই সুষম ও মানানসই। (মরিস বুকাইলি, ১৯৮৯ : ৩৩০)

এ প্রসংগে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–اقرا باسم ربك الذى خلق- خلق الانسان من علق "পাঠ কর তোমার পতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন– সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে।"(সুরা আলাক্ব ৯৬ :০১-০২)অন্য আয়াতে আরো বলা হয়েছে– وهو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلعوا اشدكم ثم لتكنوا شيوخا "তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, পরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর আলাকাঃ হতে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর হয়ে যাও বৃদ্ধ।" (সুরা মু'মিন ৪০:৬৭)

মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণের ক্রমবিকাশের ব্যাপারে আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেন :

> মানব প্রজননের জন্য যে সব উপাদানের প্রয়োজন সেগুলি একত্রিত হয় ৪০ দিনে; দ্বিতীয় ৪০ দিন লাগে ভ্রূণটি যখন 'আলাক' বা 'আটকানো অবস্থায়' পৌঁছে; তৃতীয় ৪০ দিনে ভ্রূণটি উপনীত হয় 'চিবানো গোশতের টুকরার অবস্থায়'। এই সময়ে একজন ফিরিশতা আসেন,– শিশুর তকদিরে কি আছে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্য এবং ভ্রূণটির মধ্যে আত্মাকে ফুঁকে দেওয়া হয়। (বুখারী, অধ্যায় ৬ : ৪৩০)

মানবজাতির বংশ বিস্তার লাভ করেছে আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.) এর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে- ياايهاالناس اتقواربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুইজন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।"(সুরা নিসা ০৪:০১) এরপর মহান আল্লাহ্ সকল মানব জাতিকে একজন

পুরুষ ও একজন নারী অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে- يايهاالناس انا خلقناكم من ذكر او انثي. "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে।" (সুরা হুজরাত ৪৯:১৩) পবিত্র কোরআনে আরো ইরশাদ হচ্ছে- سبحان الذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون "পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানে না, তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া-জোড়া করে।"(সুরা ইয়াসীন ৩৬:৩৬)هوالذى انشاءكم من نفس واحدة"তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন।"(সুরা আন'আম ০৬:৯৮)من كل شيئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون "আর প্রত্যেক বস্তু আমি সৃষ্টি করেছি জোড়ায়-জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"(সুরা যারিয়াত ৫১:৪৯) পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে আল্লাহ্ এ বিশ্বের সব কিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। রুমিও এ ঘোষণা অনুযায়ী নিম্নোক্ত মাসনাভি রচনা করেছেন–

হাক্ব যে হার জেন্ছি চো যাওজাইন অ'ফারিদ	حق زهر جنسى چو زوجين آفريد
পাছ নাতা'য়েয শোদ যে জামীয়াত বেদিদ	پس نتايج شد زجميعت بديد

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৯৩৭)

আল্লাহ্ প্রত্যেক প্রজাতিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন
তাই বিশাল সৃষ্টি তাঁরই ফল দৃশ্যমান।

> একক ভ্রূণ-কোষ থেকেই অস্থি, মাংস, রক্ত, স্নায়ু ও বিভিন্ন প্রধান অঙ্গ-প্রতঙ্গের বিছিন্নতাবাদী কোন সৃষ্টি এবং প্রত্যেকটির এক একটি বিশেষ কাজে নিযুক্ত হয়ে দৈহিক আকার-আকৃতির পূর্ণত্ব দান বাস্তবিকই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তা থেকে কি এক মহাশক্তিমান স্রষ্টার অসীম কুদরতের পরিচয় পাওয়া যায় না? (আবদুর রহীম, ১৯৯৭, পৃ. ১৫৪)
>
> যৌনক্রিয়া অতিশয় স্বাদপূর্ণ ও তৃপ্তিদায়ক হওয়ার কারণে প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির কাজ তো অব্যাহতভাবে চলার ব্যবস্থা হয়েছে; কিন্তু সন্তানের জন্যে পিতা-মাতার অন্তরে গভীর অপত্যস্নেহ মমতা-বাৎসল্য– বিশেষ করে মায়ের হৃদয়ে না থাকলে প্রসূতিদের চরমভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হওয়া এবং পরিণতিতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছিল অবধারিত। আর তার ফলে বংশ রক্ষা ও বংশবৃদ্ধির কাজটি সম্পূর্ণ অচল হয়ে যেত। এ কারণেই মা-বাবার অন্তরে এই গভীর স্নেহ-বাৎসল্যের উদ্রেক করা হয়েছে। যা সন্তানের লালন-পালন ও বড় হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার বা উপযোগী হওয়া পর্যন্ত তাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করতে পিতা-মাতাকে বাধ্য করেছে। জীব-বংশ রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্যে স্বভাবগত এই ব্যবস্থা কি আপনা-আপনিই কার্যকর হয়েছে? এই বিরাট ব্যবস্থাও কি একটা দূর্ঘটনা মাত্র? একটা পূর্ব পরিকল্পনাহীন ব্যাপার? (আবদুর রহীম, ১৯৯৭, পৃ. ১৫৩)

রূহ বা আত্মার সৃষ্টি

মানুষের বাহ্যিক অবয়বের অভ্যন্তরে রয়েছে এমন একটি শক্তি যাকে বলা হয় অন্তরাত্মা। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (র) বলেন,

> আল্লাহ্ তা'আলা দ্বিবিধ উপাদানে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। যথা-(১) সাধারণ চক্ষে দৃশ্যমান এ প্রকাশ্য দেহ। (২) আভ্যন্তরীণ পদার্থ-রূপ, দেল বা আত্মা। পরমাত্মা যা জ্ঞান চক্ষু ব্যতীত চর্মচক্ষে দেখা যায় না। মানব সৃষ্টির সে আভ্যন্তরীন পদার্থটিই তুমি বা তোমার মুল উপাদান। এতদ্বীত আর যত কিছু তোমার সহিত বিদ্যমান রয়েছে তৎসমুদয়ই উক্ত মূল পদার্থের অধীনস্থ লস্কর, খেদমতগার বা আজ্ঞাবহ। আমরা সে আভ্যন্তরীণ উপাদানটিকে 'দিল' নামে অভিহিত করি। (আবদুর রহীম, ১৯৯৭, পৃ. ২৯)

এ অন্তরাত্মা ফারসি ভাষায় দেল دل আরবি ভাষায় রূহ روح ইংরেজি ভাষায় Spirit, আর বাংলায় আত্মা। রুমি তাঁর মাসনাভী কাব্যে دل কে আত্মা অর্থে ব্যবহার করেছেন। পবিত্র কোরআনে আত্মা সম্পর্কে বলা হয়েছে- يسئلونك عن الروح. قل الروح من امر ربى وما اوتيتم من العلم الا قليلا "তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ্ আমার প্রতিপাকের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া করা হয়েছে সামান্যই।"(সুরা বনী ইসরাঈল ১৭:৮৫) আত্মা হল মহান আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মাত্র, এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা রাখা প্রয়োজন। কিন্তু পবিত্র আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মা সংক্রান্ত আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয়নি; বলা হয়েছে সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে। সেখানে অন্ততঃপক্ষে সামান্য চিন্তা ভাবনার সুযোগও রয়েছে। রাসলূ (সা.) সাধারণ লোকের সামনে আত্মার ব্যাখ্যা দেননি। তবে বিশেষ ক্ষমতাশালী মানুষের জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়ে দিয়ে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। "ইবনে কাসীর, ইবনে জারীর, কুরতুবী, বাহরে মুহীত, রূহুল মা'আনী প্রমুখ তাফসীরবিদদের মতে আয়াতে রূহ বা আত্মা বলতে জৈব রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল।"(শাফি, ১৪১৩হি., পৃ.৭৯০) অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন- ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون "পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন তাঁর রূহ্ হতে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"(সুরা সাজ্‌দাঃ ৩২:০৯) অন্য আয়াতে আরো বলা হয়েছে-فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين "'যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার পক্ষ হতে রূহ সঞ্চার করব। তখন তোমরা তার প্রতি সিজ্‌দাবনত হয়ো।" (সুরা হিজর ১৫, পৃ. ২৯) এরপর আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করে তার মধ্যে রূহ ফুৎকার করে দেন। রূহ আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের এক মহান নিদর্শন। মানবজাতিকে মাটি দিয়ে তৈরী করে এর মধ্যে রূহ সঞ্চালনের মাধ্যমে জীবিত করে তুলেছেন যেমন মাটির মধ্যে বীজ বপন করে তিনি ফল উত্তোলন করে থাকেন। এ সম্পর্কে রুমি বলেন–

চোন নাফাখাত বুদাম আয লোতফে খোদা'
নাফাখে হাক্ক ব'শাম যেনা'ঈ তান জোদা'
(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৯৩৭)

چون نفخت بودم از لطف خدا
نفخ حق باشم زنای تن جدا

যেহেতু খোদার দয়ার ফুৎকারে ছিলাম
সেহেতু শরীর ও আত্মা আলাদা হলাম।

আত্মা সম্পর্কে দার্শনিকদের ধারণা

روح রূহ (আত্মা) যৌগিক না মৌলিক পদার্থ– এ সম্পর্কে পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীণকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। ইমাম গাযযালী, ইমাম রাযী এবং অধিক সংখ্যক সূফী ও দার্শনিকদের উক্তি রূহ (আত্মা) কোন যৌগিক পদার্থ নয় বরং একটি সুক্ষ্ম মৌলিক পদার্থ। কাযি সানাউল্লা পানিপথি তাফসিরে মাযহারিতে লিখেছেন–

> রূহ (আত্মা) দুই প্রকার স্বর্গজাত রূহ ও মর্তজাত রূহ। স্বর্গজাত রূহ আল্লাহ্ তাআলার একটি একক সৃষ্টি। এর স্বরূপ জুর্জ্ঞেয়। অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন মনীষীগণ এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা এটা আরশের চাইতে সুক্ষ্ম। স্বর্গজাত রূহ অর্ন্তদৃষ্টিতে উপর নীচে পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর হলো। কালব, রূহ, সির, খফী, আখফা, এগুলো আদেশ

> জগতের সুক্ষ্ম তত্ত্ব। মর্ত্যজাত রূহ হচ্ছে ঐ সুক্ষ্ম বস্তু, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন। (শাফি, ১৪১৩হি., পৃ. ৭২৯)
>
> মানব সৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টি জগতের আর পাঁচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টি জগতের চার উপদান-আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাস্প যাকে মর্ত্যজাত রূহ বা নফস বলা হয়। আদেশ জগতের পাঁচটি উপকরণ হলো কালব, রূহ, সির, খফী ও আখফা। এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ খোদার প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা'রেফাতের নূর ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্য পাত্র বলে বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ। এছাড়া তার মধ্যে আল্লাহ্র নূর গ্রহণ করার এমন যোগ্যতা রয়েছে যা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের আত্মার মধ্যে নেই। (শাফি, ১৪১৩হি., পৃ. ৭৩০)

"আত্মা পবিত্র কুরআনে (রূহ) জীবের ক্ষেত্রে আত্মা এবং আল্লাহ্র ক্ষেত্রে আদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়।" (মুস্তাফিজুর রহমান, ১৯৮৪, পৃ. ৩৫)

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতে আত্মা

সক্রেটিসের মতে; মৃত্যুর পর আত্মা অন্য জগতে প্রস্থান করে। দেহ ও আত্মার সম্পর্ক জানার জন্য "Know thyself" তত্ত্ব তিনিই ব্যক্ত করেছিলেন। প্লেটোর (খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) মতে, আত্মা অমর, আত্মা যেহেতু দোতিরিক্ত এক অধ্যাত্ম সত্ত্বা সেহেতু আত্মা অবিনশ্বর ও শ্বাশ্বত। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিক দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০ খ্রি.) বার্কলি (১৬৮৫-১৭৫৩ খ্রি.) হেগেল (১৭৭০-১৮৩১খ্রি.), কান্ট (১৭২৪-১৮০৪খ্রি.), স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭ খ্রি.) সকলেই আত্মার অমরত্ব স্বীকার করেন এবং আত্মা অজড়ীয় আধ্যাত্মিক দ্রব্য বা পদার্থ বলে বর্ণনা করেন। (জেহাদুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম, ২০০৩ :৭৭)

তাছাড়া "ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.), ইবনে আল হায়সাম (৯৬৫-০১০৩৯ খ্রি.), ইবনে হাজম (৯৯৪-১০৬৪ খ্রি.), ইবনে রুশদ, আল ফারাবী, ইবনে মাশকাওয়ার মতে-আত্মা আধ্যাত্মিক সত্ত্বা।" (জেহাদুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম, ২০০৩, পৃ. ৭৭)

ইমাম গায্যালী (র) এর মতে–

> অন্তর্চক্ষু বাহ্যিক চক্ষু অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এবং বাহ্যিক চক্ষুর দৃষ্টি অপেক্ষা অন্তদর্শন অধিকশক্তি রাখে। বুদ্ধির দ্বারা যে সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় ও তৃপ্তি পাওয়া যায় তা বাহ্যিক চক্ষুর দর্শন থেকেও অনেক অধিক। দুনিয়ার সৌন্দর্য চর্মচক্ষে দেখতে যেরূপ ভাল লাগে। আল্লাহ্র অস্তিত্ব দর্শনও তাঁর কারুকার্য দর্শনে তদপেক্ষা সহস্রগুণ হৃদয়ে আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়া যায়। (গায্যালী, ২০০৬, পৃ. ৩৯৩)

আত্মা হতে দেহ সৃষ্টি, দেহ থেকে আত্মার সৃষ্টি হয় না। রুমির মতে আত্মা প্রথমে অগ্নি বা নিহারীকা মন্ডলের মত মহাশূণ্যে পরিব্যাপ্ত অগ্নিময় দ্রুতগতি সম্পন্ন বাস্পরূপে প্রকাশ পায়। আত্মার গতি উর্ধ্বদিক দিয়ে এবং উর্ধ্বগতির জন্য আত্মা বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সেগুলো হলো নফস, কালব, রূহ, সির, খফী ও আখফা নাম ধারণ করে। এগুলো পবিত্র হলে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করে সৌভাগ্যবান হওয়া যায়। আর এ আত্মা অপবিত্র হলে দুর্ভাগ্যের অধিকারী হবে। এ আত্মার আলো বা অন্ধকারের কারণেই মানুষের সৎ, অসৎ, গুণ, সভ্যতা-অসভ্যতা বাহ্যিকভাবে প্রকাশিত হয়।

> মানস-প্রকৃতি ও মানস-পরিবেশই মূলত মানুষের সমগ্র চিন্তা চেতনা ও হৃদয়াবেগের প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু এবং তার সমস্ত কর্মতৎপরতা ও গতিবিধির উৎসমুখ। বর্তমান বস্তুজগতে আত্মা দেহের সঞ্জীবনীও চালিকা শক্তি। তার সমস্ত দায়িত্ব ও কাজ দেহ দ্বারাই আঞ্জাম পেয়ে থাকে। দেহ তার একমাত্র হাতিয়ার উপায়-উপকরণ। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মার জন্যে দেহ উপায় ও হাতিয়ার মাত্র। এর বেশী কিছু নয়। বস্তু নশ্বর উপাদান। কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর শাশ্বত ও চিরন্তন সত্য।(আবদুর রহীম, ২০০০, পৃ. ৮০)

যেমন রাসূল (সা.) বলেছেন-

> ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله فسدت فسد الجسد كله الا و هی القلب و اذا অবশ্যই তোমাদের প্রত্যেকের শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক থাকে, পুরো শরীরই তখন ঠিক থাকবে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, পুরো শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরাটি হল কালব। (আল্লাহ ইয়ার খান ২০০২, পৃ. ৪৩)

হযরত আলী (রা.) বলেন-

> মানুষের কলিজার সাথে একটি গোশতের টুকরা ঝুলে আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর জিনিস হলো এটি। এর নাম কৃলব। কৃলবের মধ্যে হিকমত ও প্রজ্ঞার উপাদান আছে। তার বিপরীত জিনিসও আছে। কাজেই কৃলবে যদি কোন আশার সঞ্চার হয়। লোভ এসে তাকে অপদস্থ করে। লোভ যদি তার উপর আক্রমণ করে, মোহ তাকে ধ্বংস করে। নিরাশা যদি তাকে পেয়ে বসে তাহলে আফসোস তাকে ধ্বংস করে। তার উপর যদি ক্রোধ প্রভাবশালী হয়, তাকে উত্তেজিত করে। আনন্দের সৌভাগ্য যদি তার ভাগ্যে জুটে, তাহলে সংযমের লাগাম হাতছাড়া হয়ে যায়। তার কাজে যদি প্রশস্ততা দেখা দেয়, তবে অবহেলা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ভয় যদি পেয়ে বসে আতংক তাকে ব্যস্ত করে রাখে। যদি সম্পদ তার হস্তগত হয়। ধনাঢ্যতা তাকে অবাধ্যতায় বাধ্য করে। যদি কোন দুঃখ-মুসীবতে পতিত হয় অধৈর্য্য তাকে অপমানিত করে। যদি দারিদ্রে পতিত হয়, বালামুসীবাতে বন্দী হয়ে পড়ে। ক্ষুধা যদি তাকে শক্তিহীন করে দূর্বলতায় সে অচল হয়ে পড়ে। যদি উদরপুর্তি হয়ে যায়। উদরপুর্তি তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। কাজেই প্রত্যক দোষ ও গুণাহের মাঝে ক্ষতি আছে এবং যে কোন সীমা অতিক্রম করা হলে তার পরিণামে ধ্বংস আছে। (মাহ্দি জা'ফারি, ২০০৬, পৃ. ১৫৭)

রুমি বলেন-

দেল নাবা'শাদ গেইরে অ'ন দারইয়া'য়ী নূর	دل نباشد غیر آن دریای نور
দেল নাযরে গা'হে খুদা' অ'ন গা'হে কুর	دل نظر گاه خدا وآنگاه کور

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২: ৪৩৭)

অন্তর যেন নূরের দরিয়া ছাড়া অন্য কিছু না হয়
অন্তর হল আল্লাহ্কে দেখার স্থান; অন্ধ কি তা বুঝবে?

এখানে রুমি বাহ্যিক দৃষ্টিহীনতার কথা বলেননি বরং অন্তর্দৃষ্টি শক্তির কথা বলেছেন। যার অন্তর্দৃষ্টি অর্থাৎ আত্মা খোলা নেই সে কি করে আল্লাহ্র নূর বা আলোর খবর নিবে। তার হৃদয় বা অন্তর যদি স্বচ্ছ, শুভ্র ও পুতঃপবিত্র হয় তাহলে কোনরূপ বাধাবিপত্তি ও মাধ্যম ব্যতীতই আল্লাহ্র আহবান সে শুনতে পাবে। রুমির ভাষায়-

অ'ঈনে দেল চোন শাভাদ সা'ফীও পা'ক	آئینه دل چون شود صافی وپاك
নাকশেহা' বীনী বেরুন আয অ'বো খা'ক	نقشها بینی برون از آب وخاك

রোওযানে জা'নাম গোশা'দাস্ত আয সাফা'	روزن جانم گشاده ست از صفا
মী রাসাদ বী ভা'সেতেহ না'মেহ খোদা'	مي رسد بی واسطه نامه خدا

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৪৪২)

দিলের আয়না যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে
মাটি ও পানি বহির্ভূত অন্য কিছুর চিত্র দেখতে পাবে।
দিলের দ্বার যদি উদার, উন্মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন থাকে
মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ্‌র আহবান এসে পৌঁছে যাবে।

রুমি দিল বা আত্মা সম্পর্কে বলেন, হে মানব মন্ডলী তোমরা এমন এক অন্তর ক্রয় কর যাতে তোমরা সদা সর্বদা তরুণ থাকতে পার। সেই অন্তর হবে প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় প্রফুল্ল। তাহলেই তোমাদের অন্তর আল্লাহ্‌র নূরের তাযাল্লীতে প্রদীপ্তমান হবে। যার নূরের আঁভায় তোমাদের বাহ্যিক চেহারাও আলোকিত হবে। তিনি বলেন-

দেল বে-খোর তা' দা'য়েমান বা'শী জাভা'ন	دل بخورتا دائما باشی جوان
আয তাযাল্লী চেহেরেহা'ত চোন আরগাভা'ন	از تجلی چهرهات چون ارغوان

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ২৫৮)

এমন দিল ক্রয় কর, যাতে সর্বদা চির সতেজ থাকতে পার
তোমার চেহারায় থাকবে আল্লাহ্‌র নূরের তাযাল্লী।

রুমি অন্তরকে একটি পুষ্পোদ্যানের সাথে তুলনা করে বলেন, পুষ্পোদ্যান যেমন মানুষের বিশ্রাম বা আরাম-আয়েশের স্থান। সেখানে রয়েছে নিরাপদ আবাস-ভূমি ও পানির প্রস্রবন। মানুষের অন্তরও তেমন একটি শান্তিময় দূর্গ। অন্তর শান্তি ও নিরাপদ থাকলে মানুষের গোটা জীবনই শান্তিময় হয়। তাইতো রুমি বলেন-

ঈমা'ন অ'বা'দ আসত আই দোসতা'ন	ایمن أباد است ای دوستان
চেশ্‌মে হা' ও গোলেস্তা'ন দার গোলেস্তা'ন	چشمه ها وگلستان در گلستان

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৩৬১)

হে বন্ধু! মানুষের দিল এমন এক নিরাপদ আবাসভূমি

যেখানে আছে প্রস্রবন আরো আছে পুষ্পোদ্যান আর পুষ্পোদ্যান।

> আত্মার কোন ক্ষয় নেই, শেষ নেই, বরং এ জীবনের পর তার আরও জীবন আছে এবং তাকে সে জীবন যাপন করতে হবে। তাই এতে কোন সন্দেহ নেই দ্বিমতও নেই যে, সকল কালের, সকল দেশের, সকল জাতির, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রী ও পুরুষ, গ্রামীণ ও শহুরে সকল মানুষের মনে আত্মার এই অবিনশ্বরতার চেতনা রয়েছে, থাকবে চিরকাল। কোনো অবস্থায়ই এ চেতনা বিলুপ্ত হয় না, হবে না। কেননা এ চেতনা মানব-প্রকৃতি সঙ্গত। মানুষের এই চেতনা যেমন মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি কর্মশক্তি এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার দুটি প্রধান অবলম্বন, তেমনি মানুষের এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি মানব মনে এই চেতনা তীব্রভাবে জাগিয়ে দিয়েছে যে, এখানকার এই জীবন অত্যন্ত স্বল্পায়ু সম্পন্ন। এইটুকুই মানব জীবনের চূড়ান্ত সময়কাল নয়। মানুষ এখানে এই দেহকে খুলে আলাদা করে রেখে দিয়ে এখান থেকে চলে যাবে, যেমন মানুষ স্বীয় পরিধানের বস্ত্র নিত্য খুলে ফেলে ভিন্নতর পোশাক পরিধান করে। (আবদুর রহীম, ১৯৯৩, পৃ. ৭৮)

তাই রুমি বলতে চাচ্ছেন সৃষ্টিজগতের ফুলবন যতই সুন্দর চাকচিক্যময়ই হোক না কেন তা স্বল্প সময়ের জন্য আর দিলের ফুলবন চিরকালের জন্য চিরহরিৎ ও চিরস্থায়ী। বাহ্যিক বাগান কয়েক বছরের জন্য সতেজ থাকে আর অন্তরের বাগান সর্বদা স্থায়ী ও আনন্দ মূখর। তাঁর ভাষায়–

গোলশানী কা'য গেল দামাদ গেরদাদ তাবা'হ	گلشنی کز گل دمد گردد تباه
গোলশানী কা'য দেল দামাদো আফরোখতা'হ	گلشنی کز دل دمد وافرختاه

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ১১১০)

মাটির দেহ থেকে উদগত ফুলবন হয় ধ্বংসশীল
অন্তর থেকে উদগত ফুলবন হয় আনন্দশীল।

মানবজাতি সৃষ্টির সেরা

মানব জাতিকে সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ্ এদের সর্বোৎকৃষ্ট জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এ সৃষ্টিজগতে তাঁর সেরা সৃষ্টি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

> তিনি মানুষকে মানুষ বানিয়েছেন মনুষ্যত্ব দিয়ে ধন্য করেছেন, এটা তাঁর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। তিনি নিজেই ইচ্ছা করে সেরা সৃষ্টিরূপে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এই বিশ্বভূবনে মানুষকে আল্লাহ্র খলিফা বানিয়েছেন, অন্যান্য সব সৃষ্টির উপর বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, এটাই তাঁর একটা বিশেষ অবদান ছাড়া কিছু নয়। (আবদুর রহীম, ১৯৯৩, পৃ. ১৬৩)

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাক ঘোষণা দিয়েছেন– ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.

আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমূদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭, পৃ. ৭০)

> আয়াতের ঘোষণায় চারটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (১) মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন সব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব দান করেছেন, যা এই সৃষ্টিলোকের অপর কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। (২) মানুষকে জলে ও স্থল পথে অবাধে চলাচলে সক্ষমতাদান করেছেন। মানুষের ন্যায় এরূপ চলাচল ও যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রাণী এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই। (৩) মানুষকে যে রিযিক দেয়া হয়েছে তা যেমন উত্তম, তেমনি উৎকৃষ্ট ও পবিত্র। মানুষের খাদ্য ও পশুর খাদ্যবস্তুর দিক দিয়ে এবং পদ্ধতির দিক দিয়েও অভিন্ন নয় এবং (৪) আল্লাহ্র বহু সৃষ্টির উপর মানুষকে কর্তৃত্ব করার সুযোগ ও যোগ্যতা দিয়ে খুব বেশী মর্যাদা সম্পন্ন বানানো হয়েছে। বলতে গেলে এ সৃষ্টি লোকে মানুষের মত মর্যাদা সম্পন্ন প্রাণী আর কেউ নেই। (আবদুর রহীম, ১৯৮৩, পৃ. ১২)
>
> এ সৃষ্টিলোকে মানুষের চাইতেও বহু বড় বড় ও সূক্ষতম সৃষ্টি রয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও সমগ্র সৃষ্টিলোকের উপর মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতা কেন? তার একমাত্র কারণ হল, মানব-সত্তায় নিহিত রয়েছে আল্লাহ্র জ্যোতির একটা অংশ এবং মানুষের দেহে রয়েছে সেই রূহ, যা আল্লাহ্ নিজে তাঁর রূহ্ থেকে তার দেহে ফুঁকে দিয়েছেন। (আবদুর রহীম, ১৯৯৩, পৃ. ৮৮)

তাই রুমি বলেন–

পাস বানি অ'দাম মুকাররাম কেই বুদী	پس بنی آدم مکرم کی بدی
কেই বে হুসনে মুশতারেক মুহাররাম শোদী	کی به حسن مشترک محرم شدی
তো যে কাররামনা' বানিঅ'দাম শাহি	توز کرمنا بنی آدم شهی
হাম বে খুশকি হাম বে দারইয়া' পা' নাহি	هم به خشکی هم به دریا پانهی
নুর ইন দা'নি কে হেয়ভা'ন দীদে হাম	نور این دانی که حیوان دیدهم
পাস চে কাররামনা' বুদ বার অ'দামাম	پس چه کرمنا بود بر آدمم
হিচ কাররামনা' শেনিদ ইন আ'সেমান	هیچ کرمنا شنید این آسمان
কে শেনিদ ইন অ'দামিয়ে পোরগোমা'ন	که شنید این آدمی پرغمان
তা'যে কাররামনা'সত বার ফারক্বে সেরাত	تاج کرمنا ست بر فرق سرت
তোগ্বে আ'তাইনা'কা আভীয বারাত	طوق اعطینک اویز بر

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ১৮৩, ৩৩৪, ৪৪৩,৯২০ও ৮৮০)

আদম সন্তান সম্মানিত কখন ছিলে?
কখন তুমি অভিন্ন রূপদানে অভিষিক্ত হলে?
তুমিই বনি আদমকে সম্মানিত করেছ
তুমিই উভয় জগতে স্থান দিয়েছ।
জীবের মাঝে তুমিই নূর (জ্যোতি) দান করেছ
বনি আদমকে তুমিই মর্যাদার আসনে বসিয়েছ।
এ আকাশবাসী কি শুনেছে মর্যাদার ধ্বনি
দুঃখ জর্জরিত মানুষই শুনেছে এ ধ্বনি।
মর্যাদার মুকুট তোমার মাথায় স্থাপন করা হয়েছে
আ–তায়না'কা-এর মর্যাদা তোমাকেই দেয়া হয়েছে।

বিশ্বের সকল সৃষ্টির মধ্যে আদম সন্তানকেই দেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদার খেতাব। তাই রুমির প্রশ্ন কে তাদের এ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তিনি এর জবাবে বলেন মহান আল্লাহ্‌ই তাদের এ সুন্দর রূপ, সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের সাথে সাথে জীবনের স্থায়ী কল্যাণ ও সৌন্দর্যের জন্য দান করেছেন ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি। নিম্নে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে- المال والبنون زينة الحيوة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا"ধনৈশ্বর্য্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা; এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরুস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসাবেও উৎকৃষ্ট।" (সুরা কাহ্‌ফ ১৮, পৃ. ৪৬)

রুমি বলেন–

বা'ক্বীআ'তুস সা'লেহা'তু অ'মাদ কারীম	باقیات الصالحات آمد کریم
রেস্‌তে আয সাদ অ'ফাতো এখতা'রো ভীম	رسته از صد آفت واخطار وبیم

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৩৪২)

দিবেন দয়াময় সৎ কাজের প্রতিদান
দিবেন ভয়-ভীতি শংকা থেকে পরিত্রাণ।

উত্তম অবয়বে মানবজাতি সৃষ্টি

সৃষ্টিজগতে মহান আল্লাহ্ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাদের থেকে উত্তম আকৃতিতে তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। "ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসেবে তার স্বভাব ও গুণাবলির দিক থেকে প্রকৃতির এক মহান কৃতিত্ব। বাহ্যিক অবয়ব ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলি উভয় বিচারেই সে বিশ্ব-জাহানের এক সম্মানিত সত্তা দুনিয়ার কোন সৃষ্টি, শক্তি মর্যাদা ও মহত্বে তার সাথে তুলনীয় হওয়ার যোগ্য নয়।" (উমরী, ১৯৯৭:৫১)পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে : لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।" (সুরা ত্বীন ৯৫, পৃ. ০৫)

> আরবী تقویم এর অর্থ কোন কিছুকে সুপরিকল্পিতভাবে সুসংগঠিত করা। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার জন্য আগে থেকেই সুনির্ধারিত একটা পরিকল্পনা ছিল এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাও ছিল সুনির্দিষ্ট ও স্থিরকৃত। আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সাংগঠনিক পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ডারউইনের কথিত বিবর্তন নয়; বরং আধুনিক সৃষ্টিশীল বিবর্তনের ক্ষেত্রে যারা বিশেষজ্ঞ তাঁরা তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে অভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। এমনকি সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে মানব জাতির রূপান্তর সাধনের ব্যাপার তাঁরা অনেকেই অর্গানাইজেশনাল বা সাংগঠনিক পরিকল্পনা এই টার্মটি ব্যবহার করেছেন। বলা আবশ্যক যে, মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সাংগঠনিক পরিকল্পনার এই বিষয়টি এখন বিজ্ঞানের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রমাণিত তত্ত্ব। অথচ প্রায় দেড় হাজার বছর আগে অবতীর্ণ কোরআনে আরবী তাকবীম শব্দের দ্বারা ঠিক এই টার্মটিই একই অর্থে ও একই তাৎপর্যে উল্লেখ আছে। (মরিস বুকাইলি, ১৯৮৯, পৃ. ১৬৭-১৬৮)

এ বিশ্ব জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্। তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর হলো মানুষ। ফকিহ আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেছেন–

> ليس لله تعالى خلق احسن من الانسان-فان الله تعالى خلقه حياعالما قادرا متكلما سميعا بصيرا مدبرا حكيما وهذه هى صفات الرب دل وعلى- আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিকুলে মানুষের চাইতে সুন্দর কেউ নেই–কিছু নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জীবন্ত, জ্ঞানী, শক্তিমান, বাকশক্তি- শ্রবণশক্তি- দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, সুব্যবস্থাপক ও বিচক্ষণ হিসেবে। আর এগুলোই হচ্ছে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের গুণাবলী। (আবদুর রহীম, ১৯৯৩, পৃ. ৯০)

এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন--ان الله خلق آدم على صورته "নিশ্চই আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে (আ.) তাঁর নিজস্ব অবয়বে সৃষ্টি করেছেন।" (আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ, ১৯৮০:২৭১) এর অর্থ এটাই হতে পারে যে আল্লাহ্ তা'আলার কতিপয় গুণাবলী কোন না কোন পর্যায়ে তাকেও দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ যেমন মহান তাঁর সৃষ্টিও তেমন। তিনি যেমন প্রজ্ঞাময় তাঁর সৃষ্টিও তেমনি সুনিপুণ ও কৌশলপূর্ণ। আয়াতে احسن تقویم এর উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জা ও স্বভাবকে অন্যান্য সৃষ্টি জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব, আকার-আকৃতিকে বিশ্বের সকল প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে। এ সম্পর্কে জালালুদ্দিন রুমি বলেন–

আহ্সানুত তাক্বভিম দরোত্তিন বেখা'ন	احسن التقویم در والتین بخوان
কে গেরা'মী গাওহার আসত আই দোস্তে জা'ন	که گرامی گوهر است ای دوست جان
আহসানুত তাক্বভীম আয আরশে উ ফাযুন	احسن التقویم از عرش او فزون
আহসানুত তাক্বভীম আয ফিকরাত বেরোন	احسن التقویم از فکرت برون

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৯৫৮)

আত্-ত্বিনের احسن تقویم পাঠ কর
হে বন্ধু এ প্রাণ অতি মূল্যবান রত্ন।
সুন্দরতম অবয়বের উচ্চতা আরশে
সুন্দরতম এ অবয়ব তোমার চিন্তার উর্ধ্বে।

"জনৈক বিজ্ঞানীর স্বতঃস্ফূর্ত জিজ্ঞাসা : মানবদেহ একটা বিউটিফুল স্ট্রাকচার মায়ের গর্ভের ভেতর থেকে কে এই ড্রইং আর ডিজাইন, রক্ত মাংসের এমন নিখুঁত ব্যালেন্স স্থির করে দিয়েছে? ... ইজ দেয়ার এনি আর্কিটেক্ট?" (আবদুর রহীম, ১৯৯৭, পৃ. ১৫৪)আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় এমন বৈশিষ্ট্য দান করছেন যেগুলো তাদের মধ্যে নেই। যেমন-সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ছাড়াও বাকশক্তি ও পারস্পারিক বোঝাপড়ার যে নৈপূণ্য মানুষ লাভ করেছে তা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তার নিজের কৃতকর্মের কারণে নিম্নস্তরে অবস্থান করান। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে- ثم رددنه اسفل سافلين "অতঃপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্থদের হীনতমে পরিণত করি।"(সুরা ত্বীন ৯৫:০৬) অপর অর্থ হতে পারে বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক গঠন নষ্ট হয়ে যাওয়া।

> আয়াতটি সাধারণ মানুষের জন্যে নয়; বরং কাফের ও পাপাচারীদের জন্যে বলা হয়েছে, যারা খোদা প্রদত্ত সুন্দর অবয়ব, গুনগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দের পেছনে বরবাদ করে দেয়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসেবে তাদেরকে হীনততম পর্যায়ে পৌছে দেয়া হবে। (শাফি, ১৪১৩হি., পৃ. ৭২০)

রুমি বলেন–

লা'জারাম আসফাল বুভাদ আয সা'ফেলিন	لاجرم اسفل بود از سافلین
তারকে উ কুন লা'ইউহেব্বুল আ'ফেলিন	ترك او کن لا یحب الافلین

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৬১৭)

সুতরাং নিম্নস্তরে রয়েছে যারা নিম্নেই থাকবে তারা
অস্তনিমিতকে পছন্দ করো না বরং তাকে বর্জন কর।'

তাফসিরে রূহুল বয়ান গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে,

> মানুষ প্রকৃত সৃষ্টির দিক দিয়ে সমস্ত জীব-জানোয়ারের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ফেরেশতা অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু যখন সে তার অধ্যবসায়, আমল ও সত্যানুগত্যের সাধনায় ব্রতী হয়, তখন ফেরেশতা অপেক্ষাও উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি সত্যানুগত্যে বিমুখ হয়, তখন নিকৃষ্টতার সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয় এবং জানোয়ার অপেক্ষাও অধম হয়ে যায়। (শাফি, ১৪১৩হি., পৃ. ৫২৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ভাবে ইরশাদ করেন-

> ولقد ذرأنا لجهنم كثرامن الجن والانس. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها. ولهم اذان لا يسمعون بها. اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون.
>
> আমি তো বহু জিন্ন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তদ্বারা তারা উপলব্দি করে না, তাদের চক্ষু আছে তদ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তদ্বারা শ্রবণ করে না; তারা পশুর ন্যায়, বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট, তারাই গাফিল। (সুরা আ'রাফ ০৭: ১৭৯)

মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানিত জাতি হিসাবে সৃষ্টি করে থাকলেও কতিপয় মানুষকে তাদের স্বীয় কৃতকর্মের কারণে নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করা হবে। কারণ তারা লোভের বশীভূত হয়ে এমন অবস্থায় উপনীত হবে তাদের কান থাকা সত্ত্বেও তারা সত্য শুনে না, চোখ থাকা সত্ত্বেও সত্য দেখে না। তাদেরকে পবিত্র কোরআনে চতুষ্পদ জন্তু হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এদের সম্পর্কে রুমির বক্তব্য নিম্নরূপ–

হার কেহ রা' বা'শাদ তাময়ে আলাকুন শাভাদ	هرکه را باشد طمع الكن شود
বা' তাময়ে কেই চাশমো দেল রাওশান শাভাদ	باطمع کی چشم ودل روشن شود
পাস বেগোইয়াদ খারকে ইয়েক বান্দাম বাস আসত	پس بگوید خرکه يك بندم بس ا ست
খোদ মুদা'ন কা'ন দো যেফে'ল অ'ন খাস আসত	خود مدان کان دوز فعل آن خس ا ست
আয রাহে সারে সাদ হেযা'রা'ন দিগার	از ره سرصد هزاران دگر
গাশ্তে আয তো বে শেকাস্তান খোকো খার	گشته از توبه شکستن خوك وخر
না যাবা'ন না গুশ না আক্লো বাসার	نه زبان نه گوش نه عقل وبصر
না হোশো না বিহোশিও না ফিক্র	نه هش ونه بيهشی ونه فکر
গুশো খার বেফোরুশো দীগার গুশে খার	گوش خر بفروش وديگر گوش خر
কাইন সুখান রা' দার নিয়া'বাদ গুশে খার[৩]	کاین سخن را در نيابد گوش خر

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ২০৪, ৬১৬, ৮৩৭, ৯৬৮ও ৪৯)

লোভের বশীভূতিতে তোতলা হয়েছে যারা
লোভী চোখ ও দিল উজ্জ্বল করবে কিভাবে তারা।
তাই বলা হয় গাধার এক আওয়াজই যথেষ্ট
সে জানে না তার কাজ কত নীচু।
সত্য পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে যারা লাখ পথ ধরেছে
তওবা ভেঙ্গে গাধা ও শুকুরের ন্যায় পরিবর্তিত হয়েছে।
নাই তাদের শুনা নাই তাদের বুঝা
নাই হুশ নাই চিন্তা দিশেহারা তারা।
গর্দভের কান (গাফেল কান) বর্জন কর এবং অন্য কান ক্রয় কর
কেননা গর্দভের কান দ্বারা এ বিষয়টি করতে পারবে না শ্রবণ।

মানবজাতির জ্ঞান

আল্লাহ্‌ তা‘আলা মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে সঠিক পথে চলার জন্য জ্ঞান এবং কলম দ্বারা শিক্ষা দানের কথা বলে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন- الرحمن. علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. “দয়াময় আল্লাহ্‌, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই তাকে শিখায়েছেন ভাব প্রকাশ করতে।”(সুরা রাহ্‌মান ৫৫:০১-০৪) الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم “যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন– শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।”(সুরা ‘আলাক্ব ৯৬:০৪-০৫)

> আল্লাহ্‌ তা‘আলা মানুষকে সর্বাধিক জ্ঞান ও চেতনা দান করেছেন এবং তাকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সমগ্র পৃথিবী, পাহাড়, পর্বত নদ-নদী এবং এগুলোতে সৃষ্ট বস্তু সমূহ মানুষের কল্যাণে ও উপকারের জন্য সৃজিত হয়েছে কিন্তু এগুলোর দ্বারা পুরোপুরি ও বিভিন্ন প্রকার কল্যাণ লাভ করা এবং বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে নতুন জিনিষ সৃষ্টি করা অত্যধিক জ্ঞান ও নৈপুণ্যসাপেক্ষ কাজ। আল্লাহ্‌ তা‘আলা প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে এমন সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন যে, সে পর্বত খনন করে এবং সাগরগর্ভে ডুবে গিয়ে শত প্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক সামগ্রী আহরণ করতে পারে এবং কাঠ, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদির সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন বস্তু নির্মাণ করতে পারে। জগতের আদিকাল থেকে অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তিরাও এসব কাজ করে আসছে। প্রকৃতিগত এ বিজ্ঞানই আল্লাহ্‌ তা‘আলা মানুষকে দান করেছেন। অতঃপর শাস্ত্রীয় ও শিক্ষাগত গবেষণার মাধ্যমে এতে উন্নতি লাভ করার প্রতিভাও আল্লাহ্‌ তা‘আলারই দান। (শাফি, ১৪১৩হি., পৃ. ৭৫৫)

এ প্রসঙ্গে মাওলানা রুমি বলেন–

অ’দামে খা’কী যে হাক্ব আ’মুখত ইলম	أدم خاکی زحق أموخت علم
তা’ বেহাফতোম অ’সেমা’ন আ’ফরুখত ইলম	تا به هفتم أسمان افروخت علم

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৪৯)

মাটির মানুষ যখন আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শিখেছে জ্ঞান
তখন সপ্তম আকাশ পর্যন্ত আলোকিত করেছে সে জ্ঞান।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ আরো ইরশাদ করেন– وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما “‘রাহ্‌মান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে ‘সালাম,।”(সুরা ফুরকান ২৫:৬৩) মানুষ আল্লাহ্‌ তা‘আলার এক মহান সৃষ্টি। তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন, সচ্চরিত্র ও সৎকর্ম শিক্ষাদানের আরেকটি মহৎকর্ম হল পবিত্র কোরআন নাযিল করা। মানব সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ হল পবিত্র কোরআন শিক্ষা করা এবং কোরআন নির্দেশিত পথে চলা। এ প্রসঙ্গে রুমি বলেন-

মুস্তাফা’য়ে কো কে জেসমাশ জা’ন বুভাদ	مصطفایی کوکه جسمش جان بود
তা’কে রাহমা’ন এলমাল কোরআন বুভাদ	تاکه رحمن علم القرآن بود
আহলে তান রা’ জুমলে আল্লামা বিলক্বালাম	اهل تن را جمله علم بالقلم
ওয়া’সেতে ইফরা’শত দার বাযল কারাম	واسطه افراشت در بذل کرم
গোফতে হাক্ব কে বান্দেগা’ন জুফতে আউন	گفت حق که بندگان جفت عون
বার যামীন অ’হেস্তে মীরা’নান্দো হাভুন	برزمین آهسته میرانند وهون

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৩৬৪ ও ৩৭৪)

শরীরের মাঝে প্রাণকে মনোনীত করে
পবিত্র কোরআন দ্বারা শিক্ষা দিলেন দয়াময় তাঁকে।
সকল মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন কলম দ্বারা
সমুন্নত করেছেন দয়া ও বদান্যতা দ্বারা।
বলা হয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্যের ধারা নেমে আসবে
পৃথিবীতে আস্তে ও নম্র ভাবে চলাফেরা করলে।

মানুষের এ ক্ষুদ্র দেহের বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন এবং তার মধ্যেকার সামঞ্জস্য রক্ষা ও পরস্পরের সহযোগীতার ব্যবস্থা এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থা করা এবং এদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রতিভার সৃষ্টি এক মহা শক্তির অস্তিত্ব বিরাজমান। আর এ মহা শক্তি যে একমাত্র মহান আল্লাহ্ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মানবজাতির বৈশিষ্ট্য

মানুষ সমগ্র সৃষ্টিজগতের সার-নির্যাস এবং সর্বগুণের অধিকারী। ক্ষুদ্র এ মানুষের মাঝে লুক্কায়িত রয়েছে এক বিরাট বৈচিত্র্যের সমাহার। এ ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মাঝে গোটা বিশ্বই যেন লুকিয়ে আছে।

> মানব প্রকৃতিকে নির্ভূলভাবে চিনতে ও জানতে পারাও ইসলামী আকীদা- বিশ্বাসের একক কৃতিত্ব। কেননা ইসলাম তো আল্লাহ্র বাণী, আর মানুষ সেই আল্লাহ্রই সৃষ্টি। প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টাই যে তার সৃষ্ট জিনিসের স্বভাব-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ঠ্য-বিশেষত্ব সম্পর্কে সর্বাধিক অবহিত, তার অপেক্ষা অধিক সত্য ও নির্ভূলভাবে অন্য কেউ সে বিষয়ে জানতে পারে না, তা সর্বজন স্বীকৃত। দেহের এমন কতগুলি দাবি রয়েছে যা জন্তু জানোয়ারের দাবির অনুরূপ। আর মানবাত্মার চাহিদা ও প্রবণতা হচ্ছে তাই, যা ফেরেশতাদের রয়েছে। (আবদুর রহীম, ১৯৯৩:১০০)

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে– الايعلم من خلق وهواللطيف الخبير "যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না ? তিনি সূক্ষদর্শী, সম্যক অবগত?" (সুরা মুল্ক ৬৭:১৪)

> আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে দিয়েছেন একটা ভারপূর্ণ দেহ, আর একটা সূক্ষ শরীরবিহীন রূহ-আত্মা। দেহ মানুষকে নিম্নের দিকে টানে। আর রূহ বা আত্মা মানুষকে ঊর্ধ্বপানে নিয়ে যেতে চায়। মানব দেহের অভ্যন্তরেই রয়েছে প্রতিরোধ শক্তি, আছে লালসা-বাসনা-প্রভৃতি। মানবাত্মার সমুখে বিশাল উদার দিগন্ত। (আবদুর রহীম, ১৯৯৩, পৃ. ১০০)

মানুষ আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের সংক্ষিপ্তসার। দৈহিক বিচারে মানুষ ক্ষুদ্র বিশ্ব, কিন্তু আত্মিক বিচারে সে সমগ্র সৃষ্টিজগতের অধিক তাৎপর্য ও অর্থ বহন করে। তাই রুমি বলেন-

অ'ফতা'বি দার ইয়াকি যাররে নেহা'ন	آفتا بی دریکی ذره نهان
না'গেহা'ন অ'ন যাররে বোগশা'ইয়াদ দেহা'ন	نا گهان آن ذره بگشاید دهان
যাররে যাররে গারদাদ আফলা'কো যামিন	ذره ذره گردد افلاک وزمین
পিশে অ'ন খোরশিদ চোন জুসত আয কামিন	پیش آن خورشید چون جست از کمین
বাহরে ইল্মি দার নামী পিনহা'ন শোদেহ	بحر علمی درنمی پنهان شده
দার ছেহ গাযীন অ'লামী পীনহা'ন শোদেহ	در سه گزین عالمی پنهان شده

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ১১০৬ ও ৮৮০)

বিশাল সূর্য এ ক্ষুদ্র (অবয়ব) অণুতে লুক্কায়িত
হঠাৎ যখন ঐ ক্ষুদ্র অণু মুখ খুলবে।
ভূ-মণ্ডল ও নভো-মণ্ডল হতে প্রতিটি অণু-পরমাণু
স্বীয় স্থান হতে ঐ সূর্যের সম্মুখীন হবে।
ক্ষুদ্র এ অণুতে জ্ঞানের এক মহাসমুদ্র লুকায়িত
তিন হাতের এ অবয়বে লুকিয়ে রয়েছে এক মহাবিশ্ব।

এ বিশ্বজগত সৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল মানুষ। সৃষ্টি জগতের সব কিছুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন তিনি। সব কিছুই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। আর মানুষ থেকেই বিশ্বের রূপ রস-গন্ধ-বর্ণ ও জীবনের সম্ভ্রম রক্ষা হয়। তাঁরই আনুগত্য করা সমস্ত অস্তিত্বশীল প্রাণিজগতের উপর বাধ্যতামূলক। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

الله الذى خلق السموات ولارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقالكم- وسخرلكم الفلك لتجرى فى البحر بامره وسخرلكم للانهار- وسخرلكم الشمس والقمر دائبين- وسخرلكم اليل والنهار- واتاكم من كل ما

سالتموه- وان تعدوا نعمت الله لاتحصوها

> তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্দারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমূদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন চন্দ্র ও সূর্যকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিবসকে। এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ তা হতে। তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। (সুরা ইবরাহীম: ৩২-৩৪)

মানুষের নিজের অস্তিত্বই স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ্ তা'আলার অন্তহীন নেয়ামত নিহিত রয়েছে। শত শত সূক্ষ্ম নাজুক ও অভিনব যন্ত্রপাতি সজ্জিত এই ভ্রাম্যমান কারখানাটি সর্বদা কাজে মশগুল রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু, সমুদ্র ও পাহাড়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু। আধুনিক গবেষণা ও তাতে আজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষজ্ঞও এগুলোর কুল-কিনারা করতে পারেনি। (শাফি, ১৪১৩হি., পৃ.৭২০) এ সবই মানুষের অধীন করে মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। রুমি বলেন–

জাওহার আসত ইনসা'নো চারখে উ রা' আরয	جوهر است انسان وچرخ اورا عرض
জুমলে ফারয়ো পা' বে আন্দো উ গারয	جمله فرع و پا به اند و او غرض
খিদমাতাত বার জুমলে হাসতী মুফতারায	خدمتت بر جمله هستی مفترض
জাওহারি চোন নাযদে খাহাদ আয আরয	جوهری چون نجده خو اهد از عرض
ইলম জোয়ী আয কুতুবেহা' আই ফসোস	علم جویی از کتبها ای فسوس
জুওক্বে জোয়ী তু যে হালভা' আই ফসোস	ذوق جویی توز حلوای فسوس
হার শরা'বী বান্দে ইন ক্বাদ্দোখাদ	هرشرابی بنده این قدوخد
জুমলেহ মাস্তা'ন রা' বুভাদ বার তো হাসাদ	جمله مستان رابود بر توحسد

হীচ মুহতা’জ মী গোলগুনে না আই	هیچ محتاج می گلگون نه ای
তারাক কোন গোলগুনে তো না গোলগুনে আই	ترک کن گلگونه تو گلگو نه ای
(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৮৮০)	

মানুষ এমন এক মর্যাদাশীল স্বভাবজাত সত্ত্বা
সমগ্র সৃষ্টি জগতের লক্ষ্য এবং সবাই তার করতলগত।
তুমি পুস্তকের পাতায় জ্ঞান অনুসন্ধান কর
আফসোস! তুমি শুধু রুটি-রুজির পেছনেই ঘুরে বেড়াচ্ছ।
তোমার সেবা করা সকল সৃষ্টির উপর কর্তব্য
তুমি এমন শত্ত্বাধিকারী! সকল সত্ত্বা তোমার নির্ভরশীল।
প্রতিটি সৃষ্টি জীব (নেশাগ্রস্ত বস্তু) এ মানুষের কাছে নত
সব ধরনের মস্তান (সমগ্র বিশ্ব) তোমার ঈর্ষা রত।
তুমি কোন গোলাপী রঙ্গের মুখাপেক্ষী নও,
বরং তুমিইতো গোলাপ ঐ গোলাপী রং ছেড়ে দাও।

অতএব তুমি সকল আধুনিকতা ছেড়ে দাও। মানুষের মনুষ্যত্ব ও মর্যাদা লাভে ধন্য হও। কেননা তোমাকে উত্তম ও মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন– كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله “তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর এবং অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহে বিশ্বাস কর।”(সুরা আলে ‘ইমরান ০৩: ১১০) অন্য আয়াতে তিনি আরো ইরশাদ করেন– وكذالك جعلناكم امة وسطالتكونوا شهداء على الناس “এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।”(সুরা বাকারা ০২: ১৪৩) এছাড়াও মহান আল্লাহ্ মানব জাতিকে তাঁর নিজের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর রাসূলের সম্মান ও মর্যাদার সাথে সাথে মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। যদিও নিম্লোক্ত আয়াতে মুমিনদের সম্মান ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হলেও মুমিনরাও মানুষেরই অর্ন্তভূক্ত। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله “কিন্তু শক্তি তো আল্লাহ্রই, আর তাঁর রাসূল ও মুমিনদের।” (সুরা মুনাফিকুন ৬৩: ০৮)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেছেন–

> জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর সৃষ্টিলোকের মধ্য থেকে মানব জাতির সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এভাবে যে, তিনি তাকে সম্লানিত করেছেন, তার প্রতি বিপুল অনুগ্রহ দান করেছেন, তাকে মর্যাদাবান করেছেন এবং বানিয়েছেন নিজের জন্য। আর অন্যান্য সব কিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। আর বিশেষভাবে তাকে তাঁর পরিচিতি, ভালবাসা, নৈকট্য ও মর্যাদা দিয়েছেন, যা অন্য কাউকে দেয়া হয়নি। আর আকাশমণ্ডল, পৃথিবী এবং এ দুয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে সবই তিনি তারই জন্য নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন– এমনকি তাঁর ফেরেশতাগণকে পর্যন্ত, যারা তার অতীব নিকটবর্তী। তাদের নিদ্রা-জাগরণ বিদেশ যাত্রা ও বাড়ীতে উপস্থিতি সর্বাবস্থায় ফেরেশতাগণকে তাদের হেফাজতের কাজে লাগিয়েছেন। মানুষের প্রতি ও মানুষের উপর তিনি তাঁর কিতাব নাযিল করেছেন। মানুষকে রাসূল বানিয়েছেন, মানুষের প্রতি রাসূল পাঠিয়েছেন। মানুষকে সম্লোধন করে কথা বলেছেন, মানুষের প্রতি কথা পাঠিয়েছেন। অতএব মানুষের এমন একটা উচ্চ মর্যদা রয়েছে যা সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে কারোর নেই। (আবদুর রহীম, ১৯৯৩, পৃ. ৯২)

তাইতো রুমি বলেন-

অ'দাম উসতুরলা'বে আওসা'ফে উলুসত	آدم اسطرلاب اوصاف علوست
ভাসফে অ'দাম মাযহারে অ'য়া'তে উসত	وصف آدم مظهر آيات اوست
হারচে দার ভয়ী মী নামা'ইয়াদ আকসে উসত	هرچه دروی می نماید عکس اوست
হামচো আকসে মা'হ আন্দার অ'বে জোসত	همچو عکس ماه اندر آب جوست
খালক্ব রা' চোন অ'বেদা'ন সা'ফো যোলা'ল	خلق راچون آب دان صاف وزلال
আন্দার অ'ন তা'বা'ন সেফা'তে যুলজালা'ল	اندر آن تابان صفات ذوالجلال
ইলমেশা'নো আদলেশা'নো লুৎফেশা'ন	علمشان وعد لشاولطفشان
চোন সেতা'রে চারখ দার অ'বে রাভা'ন	چون ستاره چرخ در آب روا ن

'মানুষ উচ্চ মহত্ত্বের গুণাবলীর টেলিস্কোপ
মানুষের গুণাবলী আল্লাহ্র নিদর্শনেরই বহিঃপ্রকাশ।
মানুষের ভেতর যা কিছু রয়েছে তা মহান সত্তারই প্রতিবিম্ব
যেমন নদীর পানিতে চাঁদের প্রতিবিম্ব দৃষ্টিগোচর হয়।
সমগ্র সৃষ্টি জগতকে সচ্ছ-নির্মল পানির মত মনে কর
তাঁদের ভেতর যুল জালালের গুণাবলী প্রতিফলিত হবে স্পষ্টরূপে।
তাঁদের জ্ঞান, ন্যায়-নিষ্ঠা এবং দয়াদ্রতা এমনি পরিদৃষ্ট হয়
যেমনি পরিদৃষ্ট হয়, প্রবাহিত পানির ভেতর আকাশের তারকারাজী।'
(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ১০৪৬-১০৪৭)

তাই রুমি বলেন এই উচ্চ মর্যাদাশীল মানুষের মূল্য আমার পক্ষে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন-

গার বেগোইয়াম ক্বীমাতে অ'ন মুমতানেয়	گربگويم قيمت آن ممتنع
মান বেসোযাম হাম বেসোযাদ মুসতামেয়	من بسوزم هم بسوزد مستمع
আইগুলা'মাত আকলো তাদবীরা'তো হোশ	ای غلامت عقل وتد بيرات وهوش
চোন চুনীনী খীশরা' আরযা'ন ফোরুশ	چون چنينی خويش را ارزان فروش

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২:৯৫৮ ও ৮৮০)

মানুষের মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নয়
তাহলে আমিও শেষ হয়ে যাবো শ্রোতারাও শেষ হয়ে যাবে।
হে মানুষ! জ্ঞান, হুশ-বুদ্ধি ও কৌশল সব তোমারই অধীন
তুমি এমন এক রত্ন কেন নিজেকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করছ।

সৃষ্টিজগতে সকল সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সবচাইতে সম্মানিত ও উচ্চমর্যাদাশীল জাতি। এ জাতির মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ অবহিত। এজন্য তিনি তাদের উচ্চ মূল্যে ক্রয় করতে চান। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন- ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে লয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে।"(সুরা তাওবাহ ০৯ :১১১)

> মোমেনদের জন্য এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? মানুষের প্রাণ, মানুষের ধন-সম্পদ সবই আল্লাহ্ পাকের মহান দান আর সে মহান দাতা আল্লাহ্ পাকই ক্রয় করে নিচ্ছেন মানুষের থেকে, তাঁর দান বিশেষত বেহেশতের অনন্ত অসীম নেয়ামতের বিনিময়ে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এখনই জানমাল তাঁর নিকট অর্পণ করতে হবে বরং জান এবং মাল তারই কাছে থাকবে। শুধু এতটুকু কথা যে, প্রয়োজনের সময় আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক জানমাল উৎসর্গ করার জন্য মোমেনকে প্রস্তুত থাকতে হবে। (আমিনুল ইসলাম, ১৯৯০, পৃ. ৫৩)

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির ভাষায়—

মুশ্তারী মান খোদা'ইয়াস্ত উ মারা'	مشتری من خدای است اومرا
মীকুশাদ বা'লা'কে আল্লা'হ্ এশতারা'	میکشد بالاکه الله اشتری
মা'লো তান বারফনাদ রীযা'ন ফানা'	مال وتن برفند ریزان فنا
হাক্ব খারীদ্দা'রাশ কে আল্লা'হ্ এশতারা'	حق خریدارش که الله اشتری
আই খোদা'ভান্দ ইন খামো কুযে মারা'	ای خداوند این خم وکوزه مرا
দার পাযীর আয ফাযলুল্লাহ্ এশতারা'	در پزیر از فضل الله اشتری
মুশতারীয়্যে মা'সত আল্লাহ্ এশতারা'	مشتری ماست الله اشتری
আয গাম হার মুশ্তারী হীনে বার তোরা'	از غم هر مشتری هین برترا
মুশতারী জো কে জোইয়া'নে তো আসত	مشتری جوکه جویان تواست
অ'লাম অ'গাযো পা'য়া'নে তো আসত	عالم آغاز وپا یان تواست

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ২৭৮, ৫১৭ ও ১২২)

আমার ক্রেতা তো আল্লাহ্
আমাকে টেনে নিয়ে উচু মূল্যে ক্রয় করবেন।
জান এবং মাল লয়ের পরে লয়তে হারিয়ে যাবে
আল্লাহ্ যার ক্রেতা তার লয় হবে না।
হে আল্লাহ্! আমার যা আছে তা গ্রহণ কর
তোমার অনুগ্রহে আমাকে ক্রয় কর।
একমাত্র আল্লাহ্ই ক্রেতা আমাদের
তুমি নিজেকে স্থাপন কর অন্য ক্রেতার উর্ধ্বে।
এমন ক্রেতা খোজ যিনি স্বয়ং তোমায় চায়
যিনি তোমার সমগ্র জগতের আদি-অন্তের খবর জানেন।'

মানবজাতির পার্থিব জগতের এ ধন-সম্পদ সব অস্থায়ী এগুলো সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ মহান আল্লাহ্ তাদের টেনে নিয়ে উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে চাচ্ছেন। তাই তাঁর নির্দেশিত পথে আমাদের এ ধন-সম্পদকে খরচ করে তা গ্রহণ করা উচিত। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জান্নাতবাসীর উক্তি পবিত্র কোরআনে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে– ইরশাদ হচ্ছে- قیل ادخل الجنة قال يليت قومی يعلمون. بما غفرلی ربی وجعلنی من المكرمين. "তাকে বলা হল, 'জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বলে উঠল, 'হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত– 'কিরূপে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।'" (সুরা ইয়াসীন ৩৬: ২৬-২৭)

> হাবীবে নাজ্জার তাঁর জাতির কল্যাণের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। যে জাতি তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। তাদের জন্য তাঁর দরদের অন্ত ছিল না। তাই জান্নাতের নেয়ামত দেখে তিনি বলছেন, যদি আমার জাতি জানত যে, কি কারণে আমাকে ক্ষমা করছেন এবং আমাকে জান্নাতের এত অগণিত নেয়ামত দান করছেন তাহলে তারাও আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনত এবং রাসূলগণের অনুসরণ করত। (আমিনুল ইসলাম, ১৯৯০, পৃ. ০৬)

রুমির ভাষায়-

খালক্বে গুইয়াদ মুরদেহ মেসকীন অ'ন ফুলা'ন	خلق گوید مرد مسکین آن فلان
তো বেগোয়ী যেন্দেআম আই গাফেলা'ন	توبگویی زنده ام ای غافلان
মীযানাদ জা'ন দার জাহা'ন অ'বগোন	میزند جان درجهان ابگون
নায়রে ইয়া'লাইতা ক্বাওমী ইয়া-লামোন	نعرة یالیت قومی یعلمون

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২:৭৯৭)

হে জনগণ! সৃষ্টিকর্তা বলছেন, মৃতব্যক্তি তো অসহায়
তুমি বলেছো হে গাফেলরা আমি তো জীবিত।
এ বিশ্ব জগতে প্রাণতো পানির মত ঘূর্ণায়মান
হায় আফসোস! যদি আমার সম্প্রদায় জানতে পারত।

মানুষের জীবন অসহায় হলেও তার কৃতকর্মের কারণে সে সজীবতা লাভ করবে। হাবীবে নাজ্জার এর সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। সে জান্নাতে প্রবেশ করে তার জাতির জন্য আফসোস করছে যে, কেন তারা আল্লাহ্র পথে জীবনকে বিসর্জন দিয়ে জান্নাতি নেয়ামত গ্রহণ করছে না। রুমি বাহ্যিক আকৃতির মানুষকে প্রকৃত মানুষ বলে মনে করেন না, তিনি মনে করেন এরা মানুষ নামের প্রতিকৃত। বাহ্যিক আকৃতি বিশিষ্ট মানুষ প্রবৃত্তির শিকার এরা জীবিকার জন্য প্রাণ বির্সজনকারী। মাসনাভির ভাষায়–

ইন নাহ মারদা'নান্দ ইনহা' সোরাতান্দ	این نه مردانند اینها صورت اند
মারদেহ না'নানদো কাশতেহ শাহভাতান্দ	مرده نانندو کشته شهوت اند

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২:৮৫০)

বাহ্যিক আকৃতির মানুষ, মানুষ নয়, মানুষের প্রতিকৃত
এরা প্রবৃত্তির পূজারী, জিবিকার জন্য প্রাণ বিসর্জনকারী।

বাহ্যিক আকৃতি পূজারী মানুষ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে– ومن الناس من يعجبك قوله فى الحيواة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو الد الخصام "আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ্কে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহপ্রিয়।"(সুরা বাকারা ০২:২০৪)

হযরত আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন-

> বাইরের রং দেখে গরু বা জন্তু জানোয়ার চেনা যায়। লাল না হলুদ বর্ণ ফারাক করা যায়। কিন্তু মানুষ। মানুষ চিনতে হয় তার ভিতরের রং দিয়ে। তার প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় গুণ ও চরিত্র দেখতে হবে। (ঈসা শাহেদী,২০০৮: ২৩৬)

এ প্রসঙ্গে রুমি বলেন-

গাভরা’ রাঙ্গ আয বেরোনো মার্দ রা’	گاو را رنگ از برون ومردرا
আয দারোন জো রাঙ্গে সুর্‌খো যার্দ রা’	از درون جو رنگ سرخ و زرد را

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৩৭)

গরু চেনা যায় বাহিরের রং দেখে আর মানুষ
ভিতর থেকে পার্থক্য কর লাল ও হলুদ রংগের।

(ঈসা শাহেদী, ২০০৮: ২৩৬)

মানুষের বাহ্যিক আকৃতি ও গঠন প্রকৃতিকে যদি প্রকৃত মানুষ ধরা হতো, তাহলে সৃষ্টিজগতের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও আবু জেহেল এক সমান হতো। কারণ বাহ্যিক আকৃতিতে উভয়ই মানুষ। অথচ আভ্যন্তরীণ বা রূহানীভাবে স্বভাব ও চরিত্রে পরস্পর ছিল ভিন্ন। অথবা মানুষের ছবি বা প্রতিকৃতিতে হুবহু মানুষের আকৃতিই বুঝা যায়, কিন্তু তাতে কিসের শূন্যতা বিদ্যমান। রুমি বলেন–

গার বেসোরাত অ’দামী ইনসা’ন বুদী	گر به صورت أدمی انسان بدی
আহমাদো বোজেহেল খোদ ইয়াকসা’ন বুদী	احمدوبوجهل خودیکسان بدی
নাক্বশ বার দীভার মেসলে অ’দামাস্ত	نقش بردیوارمثل أدم است
বেনাগার আয সোরাত চে চীযে উ কামাস্ত	بنگرازصورت چه چیزاوکم ست
জা’ন কামাস্ত আ’ন সোরাতে বা’তা’ব রা’	جان کم است أن صورت باتاب را
রোও বেজো অ’ন গাওহারে কামইয়া’ব রা’	رو بجو أن گوهر کمیاب را

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ৪৯)

আকৃতি দিয়ে যদি মানুষ মানুষ হতো
তাহলে আহমাদ (সা.) ও আবু জেহেল এক সমান হতো।
দেয়ালের গায়ে মানুষের ছবি, দেখতে মানুষের মতো
দেখ সেই ছবিতে আসল মানুষের কমতি কতো।
সেই উজ্জল ছবিতে কমতি আছে একটি প্রাণ
যাও খুজে নাও সেই দুর্লভ রত্ন দানা।

(ঈসা শাহেদী, ২০০৮, পৃ. ৩১০-৩১১)

এরপর রুমি বাহ্যিক আকৃতি পূজারীদের সম্পর্কে আফসোস করে বলেন–

চান্দ সোরাত অ’খের আই সোরাত পারাস্ত	چندصورت أخر ای صورت پرست
জা’নে বিমানিয়াত আয সোরাত নারাস্ত	جان بی معنیت ازصورت نرست
ওয়াসফে সোরাত নিস্ত আন্দার খা’মহা’	وصف صورت نیست اندر خامها
আ’লেমো আ’দেল বুভাদ দার না’মহা’	عالم و عادل بود در نامها
আ’লেমো আ’দেল হামে মা-নিস্তো বাস্‌	عالم و عادل همه معنی ست و بس
কাশ নায়া’বী দার মাকা’নো পিশো পাস্‌	کش نیابی در مکان وپیش و پس

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২:৪৯)

ওহে আকৃতি পূজারী ! আকৃতির পেছনে আর কতো কাল
আত্মাবিহীন তোমার প্রাণ যে আকৃতি মুক্ত হলো না।

আকৃতির বর্ণনা থাকে না, কলমের লিখনে
জ্ঞানী ও ন্যায় বিচারক কিনা থাকে পত্রের বিবরণে।
জ্ঞানী ও ন্যায় বিচারক, বাতেনী মর্মের নাম
কোনো স্থানে বা সামনে পেছনে পাবে না তাকে।
(ঈসা শাহেদী, ২০০৮: ৩১০-৩১১)

রুমির সময়ে একদা এক ব্যক্তি প্রকৃত মানুষের সন্ধানে প্রদীপ হাতে শহরের অলি-গলিতে ঘোরাফেরা করছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তুমি এই দিবালোকে প্রদীপ হাতে নিয়ে কি খুঁজছ? সে উত্তর দিল আমি মানুষ খুঁজছি। তিনি বলেন–

অ'ন ইয়াকী বা'শাময়ে বার মী গাশত রোজ	أن يكى باشمع بر مى گشت روز
গেরদে বা'জা'রী দেলাশ পুর ইশ্‌কো সুয	گردبازارى دلش پرعشق وسوز
বোলফোযুলি গোফতে উ রা' কায় ফুলা'ন	بوألفضولى گفت اورا كاى فلان
হীন চে মী জোয়ী বে সুয়ে হার দোকা'ন	هين چه مى جويى به سوى هردكان
হীন চে মী গারদী তো যোইয়া'ন বা' চেরা'গ	هين چه مى گردى توجويان باچراغ
দার মিইয়া'নে রোযে রাওশান চীস্ত লা'গ	درميان روزوروشن چيست لاغ
গোফ্‌ত মী জোইয়াম বে হার সু অ'দামী	گفت مى جويم به هر سوأدمى
কে বুদ হাইয়া আয হায়া'তে অ'ন দামী	كه بودحى ازحيات أن دمى
হাস্ত মারদী গোফ্‌ত ইন বা'জা'র পোর	هست مردى گفت اين بازارپر
মারদুমা'নান্দ অ'খের আই দা'না'ঈ হোর	مردمانندأخراى داناى حر

(জালালুদ্দিন, ১৩৭২:৮৫০)

একদা এক ব্যক্তি প্রদীপ হাতে দিবা লোকে
ঘুরছে বাজারে অন্তরে ভালবাসার দহন নিয়ে।
এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো তোমার কি হয়েছে
কি খুঁজছ এদিক ওদিক প্রতিটি দোকানে।
কি খুঁজা-খুঁজি করছ প্রদীপ হাতে
কিসের আনন্দে দিনের এ আলোতে।
সে বললো আমি একজন মানুষ খুঁজছি চারিদিকে
এখানেতো জীবন্ত অনেক মানুষ দেখা যাচ্ছে।
সে বললো ! বাজার তো পূর্ণ মানুষ
কোথায় সে স্বাধীন বিচক্ষণ মানুষ?

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (র.) এর মাসনাভির ভাষ্য অনুসারে যে আলোকিত মানুষ খোজা হচ্ছে এ মানুষই প্রকৃত মানুষ। আর এ প্রকৃত মানুষরাই মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে একাগ্রচিত্তে। পবিত্র কোরআনে এদেরকে ঈমানদার বা মুমিন হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلواة ومما رزقناهم ينفقون "যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি, তা হতে ব্যয় করে।"(সুরা বাকারা ০২: ০৩)

রুমি বলেন–

ইউমেনোনা বিল গাইবে মী বা'ইয়াদ মারা'	یومنون بالغیب می باید مرا
যে অ'ন বেবাসতাম রোযান ফা'নি সারা'	زان ببستم روزن فانی سرا
(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ১৫৯)	

গায়েবের ওপর ঈমান তখনই হতে পারে
যাখন এ দুনিয়ার সকল জানালা বন্ধ করে দেয়া হবে।

মু'মিনরাই মহান আল্লাহ্র প্রকৃত বন্ধু। পবিত্র কোরআনের ভাষায় এদের ওলী (ولی) বলা হয়। ওলী শব্দটি আরবি এক বচন, শব্দটির বহু বচন হলো আওলিয়া 'اولیاء'। আরবি ভাষায় ওলী অর্থ নিকটবর্তী, অভিভাবক, দোস্ত, বন্ধু ইত্যাদি। মহান আল্লাহ্র প্রেম ও নৈকট্যের একটি সাধারণ স্তর এমন রয়েছে যে, তার আওতা থেকে পৃথিবীর কোনো মানুষ, কোন জীব-জন্তু এমনকি কোনো বস্তু সামগ্রীই বাদ পড়ে না। কিন্তু আওলিয়া বলতে নৈকট্য, প্রেম,ও ওলিত্বের এমন স্তরকে বুঝায় যা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ বিশেষ বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। এ নৈকট্যকে মুহাব্বত বা প্রেম বলা হয়। যারা এ নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হন তাদেরকেই বলা হয় ওলিআল্লাহ্ তথা আল্লাহ্র ওলি। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে–

الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون- الذين امنوا وكانوا يتقون

لهم البشرى فى الحياوة الدنيا وفى الاخرة لاتبديل لكلمات الله ذالك هو

الفوز العظيم

> জেনে রাখ! আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমান আনে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখিরাতে, আল্লাহ্র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই; ইহাই মহাসাফল্য। (সুরা ইউনুস ১০:৬২)

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি (র.) বলেন–যারা মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করতে চায় তারা যেন এ আওলিয়াদের সান্নিধ্যে বসে। তিনি বলেন–

হারকে খা'হাদ হাম নেশীনী বা' খোদা'	هر كه خواهد همنشینیبا خدا
তা' নেশীনাদ দার হোযুরে আওলিয়া	تا نشیند در حضوراولیا
আওলিয়ারা' হাস্তে কুদরাত আয এলাহ	اولیارا هست قدرت از اله
তীরে জুসতেহ বা'যে আরান্দাশ যে রা'হ	تیر جسته باز ارندش زراه
(জালালুদ্দিন, ১৩৭২, পৃ. ২৬৭ও ৭৭)	

যে কেহ চায় আল্লাহ্র সান্নিধ্যে বসতে
সে যেন আওলিয়াদের সান্নিধ্যে বসে।
আওলিয়ারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন ক্ষমতাবান
নিক্ষিপ্ত তীর ফিরিয়ে আনতে তারা সামর্থবান।
(ছৈয়দ আহম্মদুল হক, ২০০৪, পৃ. ৫৮)

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, পবিত্র কোরআনের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির মাসনাভিয়ে মানাভি গ্রন্থ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। আরবি ভাষায় পবিত্র কোরআন যেমন শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ তেমন ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে রুমির মাসনাভিয়ে মানাভিও শ্রেষ্ট গ্রন্থ। এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব বিবেচনা করে এ গ্রন্থকে ফারসি ভাষার 'কোরআন' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন ঐশী জ্ঞানে পারদর্শী, আল্লাহ্ প্রেমিক-জ্ঞানী দার্শনিকরা। বিগত প্রায় আটশ বছর ধরে বিশ্বের জ্ঞান পিপাসু মানুষের কাছে শান্তি, সমৃদ্ধ ও উদারতার উজ্জ্বল নক্ষত্র রুমি। তাঁর রচিত মাসনাভিয়ে মানাভি কাব্য গ্রন্থের মাধ্যমে মানব সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা প্রতিফলিত হয়েছে তা আধুনিক ও অত্যাধুনিকতার বিচারে কালোত্তীর্ণ এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। দুনিয়ার বুকে যে আসমানি কিতাব তুল্য মাসনাভিয়ে মানাভি রচিত হয়েছে তা নিয়ে কথা বলা আসলেই কঠিন। তবুও 'রুমির কাব্যে পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত মানব সৃষ্টির প্রতিফলন' শীর্ষক প্রণীত এ প্রবন্ধের লব্ধ ফল মানব সৃষ্টির সঠিক দিক নির্দেশনা দানে সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

টীকা

১. মাওলানা মুহাম্মদ জালালুদ্দিন রুমি বালখি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জগতে অতি পরিচিত এক আধ্যাতিত্মক সাধক ও মানবতাবাদী কবি। তিনি ১২০৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মুতাবিক ৬০৪ হিজরি ৬ রবিউল আউয়াল বর্তমান আফগানিস্তানের বালখ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সুলতান বাহাউদ্দিন ওলাদ, দাদা হোসাইন ইবন আহমদ বালখি। জন্মের ৫ বছর পর পিতা তাকে তৎকালীন আধ্যাত্মিক ওস্তাদ খাজা ফরিদুদ্দিন আত্তারের সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যান। খাজা সাহেব তাঁর রচিত 'গওহর নমেহ্' গ্রন্থখানা তাঁকে উপহার দিয়ে বলেন, অদূর ভবিষ্যতে এই ছেলে সমাজের বিজ্ঞ ও বিদ্বানদের সচেতন আত্মাকে আলোকিত করবে। তিনি শৈশবে পিতার সান্নিধ্যেই লেখা-পড়া শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী, সা'দুদ্দিন হামুবি, ফাখরুদ্দিন ইরাকি, আওহাদুদ্দিন কিরমানি ও সাদরুদ্দিন কাওনাভি (র.) এর সাহচার্যে হাকীকাত ও মা'রিফাতের উচ্চ জ্ঞান অর্জন করেন। ৬২৩ হিজরিতে বিবাহ করেন। তাঁর তিন পুত্রসন্তান ও এক কন্যা। ৬৪২ হিজরি সালে তাবরিযের বিখ্যাত সূফী সাধক খাজা শামসে তাবরিযির সাথে সাক্ষাত ঘটে। তাঁর সংস্পর্শে রুমির জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়। তাঁর রচিত মূল্যবান কাব্যগ্রন্থ দু'টি মাসনাভিয়ে মানাভি ও দিওয়ানে শামসে তাবরিযি। গদ্য সাহিত্য ফিহি-মা ফিহ, রুবাইয়্যাত ও মাকামাত। এ সব গ্রন্থে রয়েছে আধ্যাত্মিক চিন্তা দর্শন ও মানব অস্তিত্বের মূল পরিচয়। ১২৭৩ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

   (সূত্র: আলি আকবর দেহখোদা (১৩৩৮)। *লোগাত নমেহ্ দেহ্খোদা*। সিরুস প্রকাশনী তেহরান, ইরান, ৪৬ তম খন্ড, পৃ. ১২০; আহমদ তামীমদারী (২০০৭)। *ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস*, (অনু:) সিরাজী, তারিক জিয়াউর রহমান ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, পৃ. ১৮০; রেযা যাদেহ সাফাক (১৩৬৯)। *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান*, পৃ. ৫; মনসুর উদ্দীন (১৯৭৮)। *ইরানের কবি*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৩৯।)

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক "আল-কুরআনুল করীমের" আয়াতের অনুবাদ সাধু ভাষা হতে চলিত ভাষায় উপস্থান করা হলো। পরবর্তী প্রত্যেক আয়াতের অনুবাদ একইভাবে উপস্থান করা হয়েছে।

৩. 'গূশে খার' এর শাব্দিক অর্থ গাধার কান। একে আগে পরে করলে হয় খারগূশ। খরগোশ একটি ছোট্ট প্রাণীর নাম। কবিতায় শব্দের খেলা, অর্থ ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। গাধার কান দেহগত ইন্দ্রিয় কানের রূপক। মওলানা বলেছেন: খরগোশের গল্পে যেসব তত্ত্বকথা ও আধ্যাত্মিক রহস্য বর্ণনা করা হবে। তা বুঝার সাধ্য এই ইন্দ্রিয় কানের নেই, কাজেই প্রাণের কানের সাহায্য নাও। তাহলেই তত্ত্বকথার গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে। (সূত্র: মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (২০০৮)। *মসনবী শরীফ।* বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা: খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩১২।)

উল্লেখপঞ্জি

গ্রন্থ

আবদুর রহীম (১৯৯৩)। *আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ।* খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা

আবদুর রহীম (১৯৯৭)। *বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব*। খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা

আবদুর রহীম (২০০০)। *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি*। খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা

আবদুর রহীম (১৯৮৩)। *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*। খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা

আল-কুরআনুল করীম (২০০৮)। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আলি আকবর দেহখোদা (১৩৩৮)। *লোগাত নমেহ্ দেহ্খোদা*। সিরুস প্রকাশনী তেহরান, ইরান

আল্লাহ্ ইয়ার খান (২০০২)। *ইসলামী তাছাউফের স্বরূপ*। অনুবাদঃ মুহিউদ্দীন খান, ঢাকা

আমিনুল ইসলাম (১৯৯০)। *তাফসীরে নূরুল কোরআন*। আল-বালাগ পাবলিকেশন্স ১১শ খণ্ড, ঢাকা

আহমদ তামীমদারী (২০০৭)। *ফারসি সাহিত্যের ইতিহাস*। অনুবাদঃ সিরাজী, তারিক জিয়াউর রহমান ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

আহমাদ ইবনু মুহাম্মদ (১৯৮০)। *মুসনাদুল-ইমাম আহমদ*। দারুল মা'আরিফ, মিশর

ইব্‌ন ইসমাঈল (১৯৮৭)। *আসসহিহুল বুখারি*। বৈরুত

ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসির (১৯৭৯)। *তাফসিরে ইবনে কাসির।* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

ঈসা শাহেদী (২০০৮)। *মসনবী শরীফ বাংলা অনুবাদ ও ব্যখ্যা*। খায়রুন প্রকাশনী, ঢাকা

সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসারী উমরী (১৯৯৭)। *ইসলামী সমাজে নারী*। আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা

গায্যালি (২০০৬)। *কিমিয়ায়ে সাআদাত* **১**। অনুবাদঃ নূরুর রহমান এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা

ছৈয়দ আহম্মদুল হক (২০০৪)। *মসনবী শরীফের পয়গাম ও তফসির বাণী ও ভাষ্য।* আল্লামা রুমী সোসাইটি, চট্রগ্রাম

জালালুদ্দিন (১৩৭২)। *মাসনাভিয়ে মানাভি।* হারামাস প্রকাশনী, তেহরান, ইরান

মনসুর উদ্দীন (১৯৭৮)। *ইরানের কবি*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মরিস বুকাইলি (১৯৮৯)। *বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান।* রূপান্তরঃ আখ্‌তার-উল্‌-আলম, রংপুর পালিকেশন্স লিঃ, ঢাকা

মাহ্‌দি জা'ফারি (২০০৬)। *নাহ্‌জুল বালাগাহ্ পরিচিতি*। অনুবাদঃ ঈসা শাহেদী, আলহুদা আর্ন্তজাতিক সংস্থা,

মুস্তাফিজুর রহমান (১৯৮৪)। *কোরআন* ঢাকা *পরিচিতি*। খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা

রেযা যাদেহ সাফাক (১৩৬৯)। *তারিখে আদাবিয়্যাতে ইরান*। ইরান

সানাউল্লাহ (১৯৭৯)। *তাফসিরে মাযহারি খণ্ড ১ম*। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সম্পাদিত গ্রন্থ

জেহাদুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম [সম্পা.] (২০০৩)। *দিওয়ানে-ই মুঈনুদ্দিন*। খাজা মঞ্জিল, ঢাকা

মুহিউদ্দীন [সম্পা.] (১৪১৩হিঃ)। *তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*। খাদেমুল– হারামাইন বাদশা ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প

পত্রিকা

আবুল খায়ের মোঃ ইউনুছ (২০০২)। *মরণোত্তর জীবন : হিন্দু ও ইসলামি বিশ্বাসের একটি বিচারমূলক পর্যালোচনা।* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বিংশ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা

সংরক্ষিত প্রাকৃতিক এলাকার (Natural Protected Areas) পুঁজিবাদী পরিপ্রেক্ষিত : প্রকৃতির ভোগ্যপণ্যায়ন (Commodification of Nature) এবং মানব-পরিবেশ সম্পর্কের ভূখণ্ডীকরণ (Territorialization of Man-Environment Relations)-এর একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

জামাল খান*

সারসংক্ষেপ : পরিবেশ অবক্ষয়, বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, বিভিন্ন প্রজাতির জনসংখ্যা হ্রাস বা বিলুপ্তির প্রেক্ষাপটে ১৯৮০ সালের মধ্যভাগে সংরক্ষণবাদী জীববিদ্যায় পৃথিবীর জীব বৈচিত্র্য রক্ষার একমাত্র উপায় হিসেবে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল একটি শক্তিশালী ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারা রূপে বিকাশ লাভ করে। উত্তর গোলার্ধের শিল্পন্নত দেশগুলোর ধারণা ও অর্থায়নে দক্ষিণের দরিদ্র বিশ্বের এইসব সংরক্ষণ কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এভাবে নব্বই দশকের উন্নয়নশীল বিশ্বে বহুসংখ্যক সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল গড়ে উঠে এবং এসব দেশের গ্রামীণ ভূদৃশ্যের বিশাল অংশ সংরক্ষণভুক্ত হয়ে পড়ে। এসব প্রকল্প নানান দিক নিয়ে জটিলতা ও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়। সংরক্ষিত এলাকাগুলোর অভ্যন্তরে ও চারপাশে বসবাসকারী বা আর্থনীতিক-সাংস্কৃতিকভাবে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পতিত হয়। ফলে হিসেবে সংরক্ষিত এলাকা নিয়ে সবদেশেই সংশ্লিষ্ট জনগণের সাথে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় এবং এ ঘটনা বিশ্বব্যাপী একটি গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয় এবং সমস্যার সমাধানে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার বিশেষজ্ঞরা এর সাথে যুক্ত হয়। সংরক্ষিত এলাকার ধারণার বিকল্প পদ্ধতি ও উপায় সম্পর্কে নানান বিশ্লেষণ, দিক-নির্দেশনা গড়ে উঠে। বস্তুত পশ্চিমা বিশ্বে গড়ে ওঠা মানব-বিবর্জিত সংরক্ষণ জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ধারণার উন্নয়নশীল বিশ্বে অকার্যকারিতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষিত এলাকা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা শুরু হয়। আবার এর স্থানীয়, আঞ্চলিক, রাষ্ট্রিক-জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যায়ক্রমের ভূমিকা ও ক্ষমতার-সম্পর্ক, আধিপত্যমূলক ডিসকোর্স ও রাজনীতির মিথস্ক্রিয়াও বিশ্লেষিত হয়। লক্ষণীয় যে, এসব সংরক্ষিত এলাকা অনুন্নত বিশ্বের নিজস্ব প্রয়োজন বা চেতনা থেকে গড়ে উঠেনি; বরং উন্নত বিশ্বের তৈরি পরিবেশবাদ, রাজনীতিক-আর্থনীতিক-বাস্তুতান্ত্রিক ধারণা থেকে উদ্ভূত। এই তাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়টিও আধিপত্যের নিয়মানুসারেই অনুন্নত বিশ্বের উপর প্রয়োগ ও কার্যকর হয়েছে। সুতরাং উন্নয়শীল বিশ্বে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক এলাকার পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা তত্ত্ব সাপেক্ষ একটি বিষয়। অনুন্নত বিশ্বের সংরক্ষিত এলাকার পরিপ্রেক্ষিত অনুসন্ধানে পুঁজিবাদ এবং এর অনুসঙ্গ রাজনীতিক-বাস্তুতান্ত্রিক তাত্ত্বিক বিষয়াবলি এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক সংরক্ষণকে কীভাবে পুঁজিবাদী স্বার্থে তত্ত্বায়ন করা হয়েছে, তা আলোকপাত করা হয়েছে। এর সাথে বাংলাদেশের ঘটনাও এখানে স্থান পেয়েছে।

ভূমিকা

অধুনা পরিবেশ ভাবনায় সংরক্ষিত প্রাকৃতিক এলাকা (Natural Protected Area) একটি বহুল প্রচলিত ও আলোচিত পদ। পরিবেশ অবক্ষয়, বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, বিভিন্ন প্রজাতির জনসংখ্যা হ্রাস বা বিলুপ্তির প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা বাস্তুতান্ত্রিকরা এবং সংরক্ষণবাদী জীববিদরা প্রথম

* সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এগিয়ে আসেন। জ্ঞানের এ দুটো শাখায় বাস্তুসংস্থান ও প্রজাতি রক্ষায় বৈপ্লবিক ধারণার বিকাশ লাভ করে এবং ১৯৮০ সালের মধ্যভাগে সংরক্ষণবাদী জীববিদ্যায় তা একটি শক্তিশালী চিন্তাধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর মূল ধারণাই ছিল পৃথিবীর জৈববৈচিত্র্য রক্ষার একমাত্র উপায় হলো সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল গড়ে তোলা। (MacArther, 1972) এই পদ্ধতি কার্যকর হতে হলে একে অবশ্যই মানবীয় জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ও মানব প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ আবদ্ধ একটি এলাকা হতে হবে। অর্থাৎ আদর্শ সংরক্ষিত এলাকা হবে মানবসমুদ্রে বিচ্ছিন্ন ও পরিবেষ্টিত এক-একটি দ্বীপীয় ভূখণ্ড। (Wilson, 1988) জীববিদ ও বাস্তুসংস্থানবিদরা তাদের এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করলে ক্রমে জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে সংরক্ষিত এলাকা গড়ে উঠতে শুরু করে।

International Union for Conservation of Nature (IUCN) এর সংজ্ঞা মতে, এটি এমন একটি ভূমি বা সামুদ্রিক এলাকা, যা কোনো আইনগত ও অন্যান্য কার্যকর উপায়ে (যেমন, প্রতিষ্ঠান তৈরি করে) সংরক্ষণ করা হয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। Chape at al., 2003 পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ও পদ্ধতি সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলোতে মানবীয় কর্মকাণ্ডের অনুমোদন এক একটিতে এক-এক রকম। IUCN-এর হিসাব মতে, বিভিন্ন দেশে কোনো-না-কোনোভাবে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল বোঝাতে ১,৩৮৮ টিরও বেশি নাম ব্যবহার করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আদর্শায়নের জন্য সংরক্ষিত এলাকাগুলো ১০টি প্রকরণে বিভক্ত করেছে। মূলত এসব সংরক্ষিত এলাকায় মানব-পরিবেশ সম্পর্কের মাত্রা নির্ধারণ করে এরূপ প্রকরণ প্রস্তুত করা হয়েছে। (Grombridge, 1992)

নব্বুই দশকের প্রথম থেকে মাঝামাঝি সময়ে উন্নয়নশীল বিশ্বে বহুসংখ্যক সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল (Natural Protected Areas) গড়ে উঠে। এসব অঞ্চলগুলোর আয়তন বিরাট। ফলে এসব দেশের গ্রামীণ ভূদৃশ্যের বিশাল অংশ সংরক্ষণভুক্ত হয়ে পড়ে। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্পের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, পৃথিবীতে কমপক্ষে ৪৪,০০০ সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে এবং এর আয়তন ১৪ মিলিয়ন (১ কোটি ৪০ লক্ষ) বর্গ কিলোমিটার। এই বিশাল সংখ্যক অঞ্চলের অর্ধেকেরও বেশি গত ত্রিশ-পয়ত্রিশ বৎসরে সংরক্ষিত হিসেবে রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোতে সংরক্ষিত এলাকা গড়ে ওঠার হার অপেক্ষাকৃত বেশি। পৃথিবীর সংরক্ষিত এলাকাগুলোর এক-চতুর্থাংশই আবার ১৯৯০ এবং ২০০০ সনের মধ্যে গড়ে উঠে এবং এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ল্যাটিন আমেরিকা উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশে সংরক্ষিত এলাকা ঐ সময়ের মধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। UNEP, 2006 উল্লেখ্য উত্তর গোলার্ধের শিল্পোন্নত দেশগুলোর (Northen Industrial Countries) অর্থায়নেই দক্ষিণ-বিশ্বের এইসব সংরক্ষণ কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।

সংরক্ষণবাদী জীববিদদের এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ছিল একমুখী। তারা জীববৈচিত্র্যের রক্ষণের কথাই শুধু ভেবেছে এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের কারণে সংরক্ষিত এলাকার নীতিমালা তৈরিতে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু যখন এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে শুরু হলো, তখন এর নানান দিক নিয়ে জটিলতা ও প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। সংরক্ষিত এলাকাগুলোর অভ্যন্তরে ও চারপাশে বসবাসকারী মানুষ ও তার কর্মকাণ্ড জীববিদদের ধারণা থেকে তা বাদ পড়েছিল এবং পরিণতিতে উন্নয়নশীল প্রায় সকল দেশেই এরূপ অঞ্চলে বসবাসকারী বা আর্থনীতিক-সাংস্কৃতিকভাবে নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পতিত হয়। ফলে হিসেবে সংরক্ষিত এলাকা নিয়ে সবদেশেই সংশ্লিষ্ট

জনগণের সাথে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সংরক্ষিত অঞ্চল ঘিরে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, আদিবাসী ও উপজাতীয় লোকজনের বিক্ষুব্ধ হওয়ার ঘটনা বিশ্বব্যাপীই একটি আলোচ্য ও গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার বিশেষজ্ঞরা এর সাথে যুক্ত হয়। এই অবস্থায় সংরক্ষণবাদী ধারণা কেবল জীববিদদের তৈরি বৈজ্ঞানিক বিষয় (scientific matter) হিসেবেই থাকল না, সমাজবিজ্ঞানের একটি বিষয় হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে এবং সংরক্ষণ এলাকার সাথে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ও ভূগোলের নানাবিধ তত্ত্ব-বিশ্লেষণ তৈরি হয়। পরিবেশ, বাস্তুসংস্থান ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জীববিদদের তৈরি সংরক্ষিত এলাকার ধারণার বিকল্প পদ্ধতি ও উপায় (alternative method) সম্পর্কে ননান বিশ্লেষণ, দিক-নির্দেশনা গড়ে উঠে। বস্তুত পশ্চিমা বিশ্বে গড়ে উঠা একপেশে ও মানব-বিবর্জিত সংরক্ষণ জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ধারণার উন্নয়নশীল বিশ্বে অকর্যকারিতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে সংরক্ষিত এলাকা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা শুরু হয়, যা রাজনীতিক-বাস্তুতান্ত্রিক (Political ecology) তত্ত্ব হিসেবে অভিহিত। এই ধারায় পরিবেশ ইস্যু রাজনীতিক-অর্থনীতিক-সামাজিক সামগ্রিক প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্লেষিত হয়ে থাকে। আবার স্থানীয় পরিবেশ সমস্যার সাথে আঞ্চলিক, রাষ্ট্রিক-জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পর্যায়ক্রমের (scale) ভূমিকা ও ক্ষমতার-সম্পর্ক (power ralations), আধিপত্যমূলক ডিসকোর্স ও রাজনীতির মিথস্ক্রিয়াও বিশ্লেষিত হয়।

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এসব সংরক্ষিত এলাকা অনুন্নত বিশ্বের নিজস্ব প্রয়োজন বা চেতনা থেকে গড়ে উঠেনি; বরং উন্নত বিশ্বের বিরাজমান পরিবেশবাদ, রাজনীতিক-অর্থনীতি (Political economy), রাজনীতিক-বাস্তুতন্ত্র (Political ecology) বিষকধারণা থেকে উদ্ভূত এবং অনুন্নত বিশ্বে এসব তাত্ত্বিক (theoritical), জ্ঞানতাত্ত্বিক (epistomological) বিষয়ও তদের আর্থ-রাজনীতিক ইস্যুর (politico-economic agenda) মতোই আধিপত্যের (hagemony) নিয়মানুসারেই চাপিয়ে দেয়া ও কার্যকর করা হয়েছে। (Zimmerer, 2000; Zimmerer & Young) সুতরাং উন্নয়শীল বিশ্বে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক এলাকার পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা তত্ত্ব-সাপেক্ষ একটি বিষয়। অনুন্নত বিশ্বের সংরক্ষিত এলাকার পরিপ্রেক্ষিত অনুসন্ধানে পুঁজিবাদী পরিপ্রেক্ষিতে এর রাজনীতিক-বাস্তুতান্ত্রিক তাত্ত্বিক বিষয়াবলি এই প্রবন্ধে মূলত আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক সংরক্ষণ কীভাবে পুজিবাদীয় স্বার্থে তত্ত্বায়ন করা হয়েছে, তা আলোকপাত করা হয়েছে। এর সাথে বাংলাদেশের ঘটনাও এখানে স্থান পেয়েছে।

রাষ্ট্র, পুঁজিবাদ ও প্রাকৃতিক সংরক্ষণাঞ্চল

স্বাভাবিক নিয়মে প্রকৃতি সবার জন্য উন্মুক্ত। এগুলোর মালিকানা হতে পারে না। কোনো কিছু উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের দরকার হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের জন্য পুঁজি সঞ্চয়ন দরকার এবং এজন্য প্রয়োজন প্রাকৃতিক সম্পদ। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ পুঁজি সঞ্চয়নের অন্যতম শর্ত। (O'connor, 1998) আবার, এ ধরনের শর্ত পূরণের জন্য রাষ্ট্র বিধি-বিধানের মাধ্যমে পুঁজির সঞ্চয়নের জন্য পথ করে দেয়। পানি, মাটি, খনিজ, বনজ প্রভৃতি সম্পদ ব্যবহারের বিধি-বিধান ও নীতিমালা রয়েছে। এসবের মাধ্যমে প্রকৃতি পুঁজি হিসেবে পুনঃ-রুৎপাদনের উপযোগী হয়। এক্ষেত্রে প্রকৃতিকে পুঁজি বহির্ভূত একটি বিষয় (External Nature) হিসেবে ধরা হয়েছে। কারণ প্রকৃতি নিজেই এখানে ভোগ্যপণ্যে পরিণত হচ্ছে না, বরং পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে, অর্থাৎ প্রকৃতিকে পুনরুৎপাদন করা হচ্ছে। মূলত এধারার অর্থবিদরা হলো 'উদারনীতিবাদী' এবং

কেন্সীয়-ফরডিস্ট তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু প্রকৃতি ব্যাপকভাবে ব্যবহারের ফলে অবক্ষয় ও দূষণ হতে বাধ্য। ফল হিসেবে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় এটি একটি স্ব-বিরোধী অবস্থা (Contradiction to Capital)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রকৃতির অবাধ ব্যবহারে ব্যাপক উন্নয়ন হলেও ১৯৭০ সালের দিকে এই স্ব-বিরোধী অবস্থার সৃষ্টি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত প্রকৃতি থেকে কাঁচামাল সরবরাহ ব্যহত হয়। এই সংকটে অর্থনীতি টেকসই হতে ব্যর্থ হলে প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণে রাষ্ট্র ও পুঁজি বাধ্য হয়। প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পূর্বে এটি উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই সময় ছিল পুঁজির আধুনিক স্তর (Modern Phase of Capital)। ৭০ দশকে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক পরিবেশবাদী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে সেখানে জাতীয় পরিবেশ নীতি প্রণীত হয়; ১৯৭০ সালে বিশুদ্ধ বায়ু আইন; এবং ১৯৭৩ সালে বিলুপ্ত-প্রায় প্রজাতি রক্ষা আইন প্রণীত হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রকৃতির সাথে পুঁজি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক পুনর্নির্মিত হয়, যা পুঁজির বাস্তুতান্ত্রিক পর্ব (Ecological Phase of Capital) নামে পরিচিত। এসময় প্রকৃতিকেই পুঁজিতে পরিণত করা হয় (Internal to Capital)। পুঁজির আধুনিক পর্বে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করা হতো, কিন্তু পুঁজির বাস্তুতান্ত্রিক পর্বে প্রকৃতি নিজেই পণ্যে পরিণত হয়েছে। একেই প্রকৃতির পণ্যায়ন (Commodification) বা পুঁজিকরণ বলা যায়। (Bridqe, 2006) ইকোট্যুরিজম এর চমৎকার উদাহরণ। এর মাধ্যমে প্রকৃতি দেখিয়ে আয় করা যাবে এবং সংঙ্গত কারণেই এই আয়ের ধারা ধরে রাখার জন্য বা টেকসই করার জন্য প্রকৃতি সংরক্ষণ করা হবে। এই পর্যায় প্রকৃতি অন্যান্য পণ্যের মতো আয়-ব্যয়ের বা লাভ-ক্ষতির হিসাবে চলে আসবে এবং অন্যান্য পণ্যের মতো নির্ধারিত হবে কোন প্রকৃতির মূল্য কত। অর্থনীতির এই ধারা 'নব্য-উদারপন্থি' হিসেবে পরিচিত। রিগ্যান-থ্যাচারের সময়ে এর বিকাশ। এর ফলে প্রকৃতি স্বত্বাধিকার, মালিকানা, লাভ-ক্ষতি, বিকি-কিনি এবং প্রাইভেটাইজেশন প্রক্রিয়ার আওতায় চলে আসে এবং রাষ্ট্র বিধি-বিধানের মাধ্যমে এসব সম্ভবপর করে তোলে এবং কার্যকর করার জন্য মানব-পরিবেশ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা দরকার হয়, যার স্থানিক কৌশলই হলো ভূখণ্ডীকরণ (Territorialization)। এই প্রবন্ধে প্রকৃতি-সংরক্ষণ কীভাবে পুঁজিবাদী স্বার্থে তত্ত্বায়ন (theorizing) করা হয়েছে তা-ই আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রকৃতির পণ্যায়ন এবং সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রকৃতিকে পণ্যে পরিণত করার কৌশল বহুবিধ। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটো প্রক্রিয়া হলো যথাক্রমে : প্রকৃতি-নির্ভর পর্যটন শিল্প (Natural Tourism) এবং জৈবসম্ভবায়ন (Bioprospecting) ও বনজ উৎপন্ন দ্রব্য।

প্রকৃতি-নির্ভর পর্যটনের বিভিন্ন নাম আছে, তবে ইকোট্যুরিজম (Ecotourism) বহুল ব্যবহৃত শব্দ। নব্বই দশকের প্রথম দিকে এর প্রচলন শুরু হলেও অল্প দিনেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, বিশেষত উন্নত বিশ্বে। বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (World Tourism Organization) এক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৯৩ সনের মধ্যেই পৃথিবীর পর্যটন খাতের মোট ব্যয়ের ৭%-ই ছিল ইকোট্যুরিজম এর জন্য। বিশ্বব্যাপী সামগ্রিকভাবেই পর্যটন শিল্পের ৪% হারে বিকাশ ঘটছে, কিন্তু ইকোট্যুরিজমের ক্ষেত্রে এই প্রবৃদ্ধি বার্ষিক ১০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত। (WTO, 2008) বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই ইকোট্যুরিজমের দ্রুত বিকাশ ঘটছে। সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চলে জাতীয় উদ্যান (National Park), ইকোপার্ক, গেইম-রিজার্ভ ইত্যাদি

নামে ইকোট্যুারিজমকে উৎসাহ দিচ্ছে (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। বেসরকারি পর্যায়ে বহুসংখ্যক ইকোট্যুরিজম পরিচালনাকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এই খাতে দেশে কর্মসংস্থানও বাড়ছে প্রতি বৎসর।

সারণি ১: বাংলাদেশে সংরক্ষিত এলাকা (GOB, 2006)

নং	সংরক্ষিত এলাকা	বনভূমির ধরন	জেলা	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিষ্ঠাকাল
১	সুন্দরবন (পূর্ব) অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuary)	গড়াণ অরণ্য	বাগেরহাট	৩১,২২৬	১৯৬০
২	সুন্দরবন (পশ্চিম) অভয়ারণ্য	গড়াণ অরণ্য	সাতক্ষীরা	৭১,৫০২	১৯৯৬
৩	সুন্দরবন (দক্ষিণ) অভয়ারণ্য	গড়াণ অরণ্য	খুলনা	৩৬,৯৭০	১৯৯৬
৪	লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি অরণ্য	মৌলভীবাজার	১,২৫০	১৯৯৬
৫	রেমা কেলাঙ্গা অভয়ারণ্য	পাহাড়ি অরণ্য	হবিগঞ্জ	১,৭৯৫	১৯৯৬
৬	সাতছরি জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি অরণ্য	হবিগঞ্জ	২৪২	২০০৬
৭	চুনাটি অভয়ারণ্য	পাহাড়ি অরণ্য	চট্রগ্রাম	৭,৭৬১	১৯৮৬
৮	টেকনাফ গেইম-রিজার্ভ	পাহাড়ি অরণ্য	কক্সবাজার	১১,৬১৫	১৯৮৩
৯	ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান	শাল বন	গাজীপুর	৫,০২২	১৯৭৪
১০	মধুপুর জাতীয় উদ্যান	শাল বন	টাঙ্গাইল	৮,৪৩৬	১৯৬২
১১	রামসাগর জাতীয় উদ্যান	শাল বন	দিনাজপুর	২৭	২০০১
১২	হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি অরণ্য	কক্সবাজার	১,৭২৯	১৯৮০
১৩	কাপ্তাই জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি অরণ্য	রাঙামাটি	৫,৪৬৪	১৯৯৯
১৪	নিঝুম দ্বীপ জাতীয় উদ্যান	উপকূলীয় গড়াণ অরণ্য	নোয়াখালী	১৬,৩৫২	২০০১
১৫	মেধা কাচ্ছপিয়া জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি অরণ্য	কক্সবাজার	৩৯৫	২০০৪
১৬	চর কুকড়ি-মুকড়ি অভয়ারণ্য	উপকূলীয় গড়াণ অরণ্য	ভোলা	৪০	১৯৮১
১৭	পাবলাখালি অভয়ারণ্য	পাহাড়ি অরণ্য	রাঙামাটি	৪২,০৮৭	১৯৬২
১৮	বাঁশখালী ইকো-পার্ক	পাহাড়ি অরণ্য	চট্রগ্রাম	১২০০	২০০৩
১৯	মাধবকুণ্ড ইকো-পার্ক	পাহাড়ি অরণ্য	মৌলভিবাজার	২৫৩	২০০০
২০	কুয়াকাটা ইকো-পার্ক	উপকূলীয় গড়াণ অরণ্য	পটুয়াখালি	৫,৬৬১	২০০৬
২১	সীতাকুণ্ড ইকো-পার্ক	পাহাড়ি অরণ্য	চট্রগ্রাম	৪০৩	২০০০
২২	মধুটিলা ইকো-পার্ক	শাল বন	শেরপুর	১০০	১৯৯৯
২৩	ডুলহাজারা সাফারি পার্ক	পাহাড়ি অরণ্য	কক্সবাজার	৯০০	১৯৯৯
২৪	খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান	পাহাড়ি অরণ্য	সিলেট	৬৭৯	২০০৬

উৎস: *GOB, 2006.Protected Areas of Bangladesh: A visitor's Guide, Nishorgo Protected Area Management Programme, Forest Department, Ministry of Forests, Govt. of Bangladesh, Dhaka, 2006.*

প্রশ্ন হলো ইকোট্যুরিজম কীভাবে কাজ করে এবং প্রকৃতিকে পণ্যায়ন করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা কী? অর্থাৎ ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে কীভাবে এবং কী প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির পণ্যায়ন সম্পন্ন হয়?

সত্তর দশকের শেষ এবং আশির দশককের প্রথম দিকে প্রকৃতি সংরক্ষণের নামে জাতীয় উদ্যান (National Park) ধারণা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। কারণ এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ বিশেষত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রতিরোধ শুরু করে দেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থনীতি ও উন্নয়নের সাথে প্রকৃতি সংরক্ষণের বিরোধ প্রকাশ্যে ও প্রকট আকার ধারণ করে। এই প্রেক্ষাপটে একটি ভারসাম্যমূলক পন্থা হিসেবে আশির দশকের গোড়ার দিকে টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) নামে 'নতুন পরিবেশবাদী' ডিসকোর্স পুঁজিবাদী বিশ্বে জনপ্রিয় হয় বা জনপ্রিয় করে তোলা হয়। (Bpout land, 1987) এর হাত ধরে ইকোট্যুরিজমের জন্ম। ইকোট্যুরিজমের প্রচলিত সংজ্ঞার মধ্যেই এই ব্যাপারটি স্পষ্ট। সাধরণভাবে ইকোট্যুরিজম হলো প্রকৃতি-নির্ভর একটি পর্যটনশিল্প। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্য উপভোগ ও জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত প্রকৃতি-প্রেমিক পর্যটকের জন্য এই পর্যটনের ব্যবস্থা। এতে অন্যান্য পর্যটনের ফলে পরিবেশ দূষণ ও স্থানীয় সংস্কৃতির উপর যে বিরূপ প্রভাব পড়ে, তা কমে যায় এবং এ ধরনের পর্যটনশিল্পে যেহেতু স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হয়, সেহেতু স্থানীয় জনগণের আর্থনীতিক উন্নয়নও এর মাধ্যমে সম্ভব। অর্থাৎ এর মাধ্যমে প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং অর্থনীতির মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার একটি প্রয়াস লক্ষণীয়, যা টেকসইবাদীদের মূল সুর। (Place, 1995) এতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উন্নয়ন ও প্রকৃতির মধ্যে যে দ্বন্দ্বের উপস্থিতি, তা নিরসনে একটি নির্দেশনা নিহিত আছে। এর ফলে টেকসই উন্নয়নের একটি হাতিয়ার হিসেবে ইকোট্যুরিজম গৃহীত হয় এবং পুঁজিবাদী গোষ্ঠীগুলো এ-ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেও যে প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্ভব তার বৈধতা (legitimacy) প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসও লক্ষণীয়। যেমন, ইকোট্যুরিজম থেকে প্রাপ্ত আয় প্রকৃতি সংরক্ষণে ব্যয় করা যাবে। সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী প্রাণী ও বন ধ্বংসের পরিবর্তে সংরক্ষণ করে পর্যটকদের কাছ থেকে আয় করতে পারবে। সুতরাং সংরক্ষিত এলাকার ব্যাপারে স্থানীয় জনগণ উৎসাহী হয়ে উঠবে, সরকারও পর্যটন কর বাবদ আয় থেকে সংরক্ষণের ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে। যেহেতু প্রকৃতি উপভোগের জন্য পর্যটকের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, সেহেতু এ খাতে পুঁজি বিনিয়োগ বৈধতা পাবে। এভাবে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল সর্বমহলের কাছে আয়-ব্যয়ের বিষয় হয়ে উঠবে। কার্যত ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে প্রকৃতিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যান্য উৎপাদনযোগ্য পণ্যের মতোই এক ধরনের ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং ইকোট্যুরিজম প্রকৃতিকে ভোগ্যপণ্যে পরিণত করার একটি পথ মাত্র। (Schroeder, 1995) অবশ্য এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী ধবংসাত্মক প্রক্রিয়ার পরিবর্তে টেকসই প্রক্রিয়ায় প্রকৃতিকে ভোগের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রকৃতি এভাবে টেকসই পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। যদিও অনেক সংরক্ষণবাদীর মতে, ইকোট্যুরিজমে সংরক্ষণের বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং সংরক্ষণ ব্যয় উঠানোর ব্যাপারটি এখানে গৌণ। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাবে, পুঁজি বিনোয়োগকারী সংরক্ষণের চেয়ে আয়ের ব্যাপারেই উৎসাহী। ভাওয়াল ও মধুপুর জাতীয় উদ্যানে ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে পিকনিকসহ নানান বিনোদনের ব্যবস্থার ফলে প্রাণিশূন্য হয়ে পড়েছে। এসব উদ্যানে রাস্তা ও অবকাঠামোর উন্নয়নের নামে বন উজাড় সহজতর হয়েছে। এসব এলাকায় ঘুরে আসা সাধারণ পর্যটকের কাছেও এই ব্যাপারটি পরিষ্কার হওয়ার কথা।

ইকোট্যুরিজমের মাধ্যমে পুঁজিবাদের বৈশ্বিককরণের একটি সম্পর্কও লক্ষণীয়। নব্য-উদারবাদী (Neoliberalism) পুঁজিবাদ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার আশির দশকের একটি কৌশল। এই

মতাদর্শে ইকোট্যুরিজমকে উৎসাহিত করা হয়েছে এজন্য যে, এতে করে প্রাকৃতিক সম্পদেপূর্ণ দরিদ্র দেশগুলোতে ইকোট্যুরিজমের খাতে পূঁজির বিনিয়োগ সম্ভব হবে এবং এর ভোক্তা হবে উন্নত বিশ্বের পর্যটক। ফলে উভয়ই লাভবান হবে। এর ফলে অনুন্নত বিশ্বের আধুনিকায়ন (modernization) সহজ হবে। এতে করে আবার বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ডর সূচনা হবে, যা আধুনিকায়নের একটি আর্থনীতিক সূচক হিসেবে নব্য-উদারবাদীরা মনে করে থাকে। (Duffy, 2002) ইকোট্যুরিজমের বিকাশের স্বার্থে প্যাকেজ-ট্যুর তৈরি, বিপণন ও বাজারজাতকরণ, বিজ্ঞাপন, ইত্যাদি করতে নানান বৈচিত্র্যময় ও আধুনিক আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডর বিকাশ ঘটবে। আবার এসব কাজের জন্য প্রাইভেট খাতের বিকাশ ঘটবে এবং তা স্থানীয় পর্যায় হতে শুরু করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুঁজি বাজারের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে বাধ্য। নব্য-উদারবাদী পুঁজিতান্ত্রিকদের আর্থনীতিক রূপকল্পটা এ-ধারারই। (Daffy, 2002)

জৈবসম্ভবায়ন (Bioprospecting)

প্রকৃতিকে পুঁজিকরণ (Capitalization) এবং পণ্যায়নে অপর অন্যতম নব্য-উদারবাদী কৌশল হলো জৈবসম্ভবায়ন। আশির দশকের শেষ দিকে এই ধারণার বিকাশ হতে শুরু হয়। উন্নত দেশের কতিপয় বেসরকারি সংস্থা, এনজিও, উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিল্পগোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ধারণা উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক Thomas Eisner বনজ-রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার উপযোগী করে প্রাপ্ত আয় উন্নত-অনুন্নত বিশ্বের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিলি-বণ্টন ব্যবস্থার (benefit sharing) কথা প্রথম বলেন। এর ফলে অর্থনীতি ও গবেষণা উভয় দিক থেকে প্রকৃতি সংরক্ষণ করা সহজ হবে বলে তিনি এর নাম দিয়েছিলেন ‘Chemical Prospecting’। এটিই পরবর্তীকালে Bioprospecting নামে অভিহিত হতে থাকে। প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রধান অন্তরায় হলে অর্থ। সুতরাং জৈবসমৃদ্ধ (gene-rich), কিন্তু বিত্তে দরিদ্র (cash-poor) দক্ষিণের অনুন্নত দেশগুলোর উচিত তাদের সমৃদ্ধ জৈব ও জিন সম্পদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়োজিত করা। আর এজন্য এসব দেশের সমৃদ্ধ জৈব ও জিন সম্পদ মালিকানা স্বত্ব সৃষ্টির তাগিদ দেয়া হয়। কারণ নির্দিষ্ট জৈব ও জিন সম্পদের মালিক তখন নিজ-নিজ স্বার্থ ও গরজেই এসব সম্পদ সংরক্ষণ করবে। (Hayden, 2003) সুতরাং ইকোট্যুরিজমের মতো এখনোও প্রকৃতিকে পুঁজি বানানো এবং তা ব্যবহার করে রাসায়নিক ও ঔষধজাত উৎপাদিত পণ্য উৎপাদন এবং তা থেকে অর্জিত আয় বিলি-বণ্টনের কথা বলা হয়েছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই ব্যবস্থায় অনুন্নত বিশ্বের প্রকৃতি উন্নত দেশের পুঁজি বিনিয়োগ ক্ষেত্রে পরিণত হবে। অনুন্নত বিশ্বও জৈব ও জিনজাত পণ্যের লভ্যাংশ থেকে প্রাপ্ত আয় প্রকৃতি সংরক্ষণে ব্যবহার করতে পারবে এবং তা করবে ভবিষ্যত লাভের আশায়ই। এতে দরিদ্র দেশের প্রকৃতি সংরক্ষণ সহজ হবে। সতরাং এই পদ্ধতিতে প্রকৃতি একদিকে যেমনি পণ্যে পরিণত হতে হবে, অন্যদিকে ধনীদের জন্য পুঁজি বিনিয়োগের একটি ক্ষেত্র, এমনকি তৃতীয় বিশ্বের জন্য প্রকৃতি নিজেও একটি আয়ের উৎস বা পুঁজিতে পরিণত হতে বাধ্য। সকলের জন্য এই লাভজনক পুঁজি তখন নিজ-নিজ স্বার্থেই সম্মিলিত উদ্যোগে সংরক্ষিত হবে।

এভাবে জৈবসম্ভবায়ন-এর মাধ্যমে লভ্যাংশ বিলি-বণ্টনের প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৯১ সালে দক্ষিণ আমেরিকার দরিদ্র দেশ কোস্টারিকা এবং উত্তর আমেরিকার উন্নত দেশের ঔষধ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান Merck এর সাথে। এর ফলে কোস্টারিকার জীববৈচিত্র্য কার্যত ঔষধ

প্রস্তুতের জন্য এই কোম্পানির কাছে বিক্রি হয়ে যায়। একইভাবে জৈববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতিসংঘের একটি সনদ জৈববৈচিত্র্য বাজারে তোলার আন্তর্জাতিক নীতিমালাও গৃহীত হয়, যাতে ১৫০টি দেশ স্বাক্ষর করেছিল। এর মূল নীতিমালায় জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, এর টেকসই ব্যবহার এবং এর মাধ্যমে আয়ের সুষম বণ্টনের কথা বলা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো CBD (Convention on Biological Diversity) তে যুক্তরাষ্ট্র স্বাক্ষর করেনি। কারণ আয় বিলি-বণ্টনে (benefit sharing) তারা নারাজ। তবে এই দেশের তিনটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে National Institutes of Health, National Science Foundation এবং USAID যৌথভাবে বিশ্বব্যাপী বিলি-বণ্টন চুক্তি করে বেড়াচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রথম সমবায় ভিত্তিক জৈববৈচিত্র্য (International Co-operative Biodiversity Groups (ICBG) প্রকল্প। এদের কাজ হলো নতুন ঔষধ আবিষ্কার, সংরক্ষণ ও আর্থনীতিক উন্নয়ন। (Glowka etal., 1994) এখানে অর্থনীতি ও জৈববৈচিত্র্য সংরক্ষণ একাকার হয়ে গেছে।

সংরক্ষিত প্রাকৃতিক এলাকা ও মানব-পরিবেশ সম্পর্কে ভূখণ্ডীকরণ

সংরক্ষিত প্রাকৃতিক এলাকার একটি দৃশ্যমান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হলো এর সুনির্দিষ্ট স্থানিক সীমারেখা (spatial limit), যার ফলে এই এলাকাটি অন্যান্য এলাকা থেকে পৃথক, বিশিষ্ট ও স্থির। আবার সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চলের অভ্যন্তরেও বিভিন্নভাবে বিভাজন করে আলাদা ভূখণ্ড তৈরি করা হয়। এভাবে প্রাকৃতিক অঞ্চলের মধ্যেও বিভিন্ন মর্যাদার ও বৈশিষ্ট্যের খণ্ড-বিখণ্ডীতি ভূখণ্ড (zone) পাওয়া যাবে। বস্তুত পৃথিবীর প্রায় সকল সংরক্ষিত অঞ্চলের এটি একটি সংরক্ষণ কৌশল। সম্ভবত ভূখণ্ডীকরণ প্রাকৃতিক অঞ্চল পরিকল্পনার একটি অপরিহার্য বিষয়। এখন প্রশ্ন হলো কেন এই ভূখণ্ডীকরণ দরকার। মানুষের আর্থ-সামাজিক বা অন্য যেকোন কর্মকাণ্ডেই স্থানিক পরিচয় (spatial identity) আছে, অর্থাৎ স্থান-নির্ভর। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী বা জীবজগতেরও স্থান নির্ভরতা আছে। কিন্তু এই স্থানিকতা সুনির্দিষ্টভাবে সীমায়িত করা যাবে না, এটি স্থিরও না, বরং গতিশীল। অথচ মানবীয় সমাজ জীবনের ভূখণ্ডীকরণ একটি লক্ষণীয় বাস্তবতা। এই বাস্তবতা তৈরি উদ্দেশ্যপূর্ণ। কারণ ভূখণ্ডীকরণের মাধ্যমে কোনো এলাকায় মানুষ ও সম্পদে উভয় নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করা যায়। কোন উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা কার্যকর করতে হলে নির্দিষ্ট ভূভাগকে সুনির্দিষ্টভাবে সীমায়িত করা দরকার এবং এই উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা স্থায়ী করতে হলে ভূ-ভাগের সীমানাও স্থির হওয়া দরকার। সুতরাং মানুষের আর্থ-সমাজ জীবনে ভূখণ্ডীকরণ একটি স্থানিক কৌশল (Spatial Strategy) মাত্র, যার উদ্দেশ্য হলো সমাজ জীবনের কোন কিছু কার্যকর করা এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা, আবার এরূপ ভূখণ্ডের সীমানা তৈরির মাধ্যমে সীমানাভুক্ত ভূখণ্ডের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন ইত্যাদি সহজতর হয়। (Saele, 1986) পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এ-ধরনের ভূখণ্ডীকরণ আরো জরুরি। কারণ এখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মালিকানায় পুঁজি তৈরি, বিনিয়োগ, উৎপাদন প্রভৃতির প্রয়োজনেই সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড দরকার, যেখানে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। সুতরাং প্রকৃতিকে পুঁজিতে পরিণত করা (Capitalization) এবং তা থেকে পণ্য উৎপাদন (যেমন, ইকোট্যুরিজম) করতে হলে প্রথমে প্রকৃতিকে ভূখণ্ডীকরণের মাধ্যমে পৃথক ও সীমায়িত করা দরকার। এতে করে প্রকৃতির উপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বত্ব বা মালিকানা সৃষ্টি হবে এবং প্রকৃতিকে পুঁজি করে পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। স্বত্ব ও মলিকানা, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের সাথে সংরক্ষণও জরুরি। কারণ সংরক্ষিত না হলে পুঁজি ও পণ্যায়নের ব্যহত হবে। সম্ভবত এই কারণে ভূখণ্ডীকরণের মাধ্যমেই

প্রকৃতিকে পুঁজিকরণ সম্ভব হয়েছে। সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল গঠনে ভূখণ্ডীকরণ তাই গুরুত্বপূর্ণ। এসব সীমায়িত ও সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক ভূখণ্ডের উপর স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কর্তৃপক্ষে যেমন, দাতাগোষ্ঠী, সংরক্ষণ সংগঠন ও বিশেষজ্ঞ, সংরক্ষণ বাস্তবায়নকারী সংগঠন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। (Bassett, 2001) সুতরাং প্রকৃতিকে পণ্য বা পুঁজিতে পরিণত করার একটি কৌশলও হলো ভূখণ্ডীকরণ।

আবার, এই সীমায়িত খণ্ডীকৃত পরিসরে বিভিন্ন ধরনের বিভক্তি প্রয়োজন, যাতে করে বিভিন্ন অংশের জন্য বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চালানো যায়। সামাজিক ভাগকরণ, শ্রেণিকরণ, অসমতাকরণ ইত্যাদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শর্ত (condition of capital) এবং এর স্থানিক কৌশল হলো পরিসরের খণ্ড-বিখণ্ডীকরণ, যার মাধ্যমে ঐ পরিসরের প্রকৃতি দখল, স্বত্ব, ব্যবহার ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার এই হলো ভৌগোলিক শর্ত (geographical or spatial condition of capital)।

বাংলাদেশের উদাহরণ দেখলে দেখা যাবে, এখানে ঔপনিবেশিক আমল থেকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ঘোষণা করে প্রকৃতি ও পরিসরকে খণ্ড-বিখণ্ডীকরণ ধারা তৈরি হয়েছে। এই দেশের বিভিন্ন অংশে আইন করে শ্রেণিবদ্ধ সংরক্ষিত বনাঞ্চল (Classified Forest), জাতীয় উদ্যান (National Park), বোটানিকাল গার্ডেন, ইকোপার্ক, সাফারি পার্ক, গেইম রিজার্ভ, ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চল রয়েছে। এই সীমায়িত অঞ্চলগুলো দেশের অন্যান্য ভূখণ্ড থেকে পৃথক ও সংরক্ষিত করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। ফলে এসব স্থানের আদিবাসী যারা প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের উপর নির্ভর করে তাদের জীবন ও জীবিকা গড়ে তুলেছে, তাদের এসব প্রাকৃতিক আবাস ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন ও উচ্ছেদ করা হয়। এর ফলে এরা যেমনি বনের উপর তাদের অধিকার হারিয়েছে, তেমনি অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংরক্ষণবাদী দলগুলোর, যা স্থানীয় থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। বিশেষ কোনো এলাকা আলাদাভাবে সংরক্ষণের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই যুক্তিতে সংরক্ষিত প্রকৃতিকে পর্যটনের সুযোগ করে দেয়া হলো। এভাবে গড়ে উঠেছে ইকোপার্ক, বিনোদনের জন্য সাফারি পার্ক, গেইম রিজার্ভ ইত্যাদি। অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগ এবং বিনোদন উৎপাদন একটি ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এসব এলাকা। অথচ যারা এই সব এলাকায় ঐতিহ্যগতভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে, প্রাকৃতিকভাবে জীবন-জীবিকা গড়ে তুলেছিল, যারা প্রকৃতির সাথে সহাবস্থানে অভ্যস্ত সহজ-সরল ও অ-বাণিজ্যিক জীবন ধারা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল, সেসব আদিবাসীদের উচ্ছেদ কর হলো সংরক্ষণের যুক্তিতে। এই ভূখণ্ডীকরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রকৃতিকে পণ্য ও পুঁজিতে পরিণত করা হয়েছে। স্বভাবত উচ্ছেদ হওয়া জনগোষ্ঠী এর প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করবে। তাই পুঁজির সংরক্ষণের তাগিদেই সুনির্দিষ্টভাবে সীমানা প্রয়োজন। মধুপুর ইকোপার্কে এই কারণে বিশাল অর্থ ব্যয়ে দেয়াল ঘেরা। আবার এসব সংরক্ষিত অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে আলাদাভাবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যেমন সীমিত প্রবেশাধিকার (protected), প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (reserve), কেন্দ্রীয় অঞ্চল (core), বাফার জোন, জিন পুল, প্রজনন কেন্দ্র ইত্যাদি। এসব একটি খণ্ডের উদ্দেশ্য ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও আলাদা। অর্থাৎ পুঁজি ও পণ্য উৎপাদনের শর্তের পরিপূরক।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। একদল মানুষকে বঞ্চিত করে পরিসর ও প্রকৃতিকে এভাবে খণ্ডীকরণ করে সংরক্ষণ করার তাত্ত্বিক ভিত্তি বা যুক্তি কী হতে পারে? লোকজন

এসব উদ্যোগ মেনেও-বা নিচ্ছে কেন? এর উত্তর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জ্ঞানতত্ত্বের (Epistomology) গঠন-ইতিহাস ও পরিবেশবাদী ডিসকোর্স ও ক্ষমতার বিন্যাস বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে। প্রকৃতি ধারণার উদ্ভব আর পুঁজিবাদী উন্নয়ন ব্যবস্থার সৃষ্টি সমান্তরাল। উভয়েরেই উন্মেষ কাল ১৫০০ থেকে ১৮০০ সনে ইউরোপে প্রাক-শিল্পবিপ্লব ও বিপ্লব-উত্তর সামজ গঠনের কাল। এই সময় ইউরোপে নগরায়ণ ও আধুনকায়ন হয়েছিল। একারণে আধুনিক প্রত্যয়ের সাথে প্রকৃতি, পুঁজিবাদ, শিল্পবাদ, নগরায়ণ ইত্যাদি সহ-সম্পর্কিত এবং কোন সমাজ কতটা আধুনিক তা পরিমাপ করা হয়, সেখানে কতটা শিল্পায়ন, পুঁজির পরিমাণ ও বিনিয়োগ মাত্রা দেখে। আধুনিক সামজে প্রকৃতিও একটি আলাদা স্বত্ববিশেষ। মানব সমাজ থেকে পৃথক, সংরক্ষিত ও পুঁজির একটি উপকরণ মাত্র। আধুনিক সামজে প্রকৃতির এই ধারণা গতানুগতিক ধারণা থেকে ভিন্ন। ঐতিহ্যবাহী সমাজে মানুষকে প্রকৃতির একটা অংশ মনে করে এবং সেখানে প্রকৃতির সাথে খাপ-খেয়ে সহাবস্থানের সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্প ও প্রাযুক্তিক বিপ্লব শুরু হলে সমাজ ব্যবস্থা এবং মানসিকতা পরিবর্তন শুরু হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকরী মানুষ নগরীয় জীবন গড়ে তোলে; প্রকৃতির সাথে সহাবস্থানের পরিবর্তে প্রকৃতি পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হয়, প্রযুক্তিকেন্দ্রিকতার (Technocentrism) ধারা শুরু হয়। একই সময় পুরাতন ধারার স্বয়ংভোগী (Subsistance) ও গোষ্ঠীগত অর্থনীতি (Collective, Communal or Kibbutz) ভেঙে ক্রমে বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রীক আর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে শুরু হয়। (Williaws, 1973, 1972) পুঁজিবাদের উন্মেষকালের এই সময়ই প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতিকে স্বত্বারোপ ও পণ্য ও পুঁজিতে পরিণত করার প্রয়াসও শুরু হয়। তবে দুটো ভিন্ন-ভিন্ন ও আপত স্ব-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসময় প্রকৃতির ধারণা বিকাশ লাভ করে।

ইউরোপীয় বিপ্লব ও রেঁনেসার অনুসঙ্গ বৌদ্ধিক বিপ্লব হিসেবে পুরনো ধ্যান-ধারণা প্রত্যাখান করে যুক্তিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী নতুন একটি জ্ঞান অনুসন্ধানী ধারা শুরু হয়। এটি আলোকায়ন (Enlightment) হিসেবে পরিচিত। আধুনিক বিজ্ঞানবাদ ও প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) এই সময়ই বিকাশ লাভ করে, যা ছিল গ্রিক-রোমান যুগের ঐতিহ্যের পুনর্জন্ম এবং ইউরোপীয় মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছনতার অবসানে আলোকায়ন পর্ব। এই পর্বে প্রকৃতিকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (Objective) বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া (Scientific Method) অনুসন্ধানীয় একটি বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতি নিজস্ব নিয়মে পরিচালিত বলে মনে করা হয়, যা মানবীয় নিয়ম থেকে পৃথক, ভিন্ন, সুশৃঙ্খল, এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় প্রকৃতি জানা যাবে এবং সত্য উদ্‌ঘাটন করা যাবে। এর ফলে প্রকৃতি মানুষ ও সমাজ থেকে শুধুই বিচ্ছিন্ন হলো না, প্রাকৃতিক সত্য আবিষ্কারের দায়িত্ব পেলো বিজ্ঞানীরা এবং প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের কথা বৈধতা (Legitimized) পেল। প্রকৃতি সম্পর্কে কথা বলা বৈধতা পেলো কেবল পানিবিজ্ঞানী, বনবিজ্ঞানী, জীববিজ্ঞানী, পরিবেশবিজ্ঞানী, বাস্তুতন্ত্রবিদ, জিনতত্ত্ববিদসহ অনান্য প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা। এদের আবিষ্কার ও কথাই সার্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠল বা সবাই মেনে নিতে বাধ্য হলো। এভাবে প্রকৃতি মানব-বিচ্ছিন্ন একটি আলাদা সত্তা হিসেবে গণ্য হতে শুরু হয় এবং এই বিচ্ছিন্নতা পুঁজিবাদের একটি শর্ত। পুঁজিবাদের এভাবে দেহ থেকে মন, বিষয় (Object) থেকে ব্যক্তিকে (Subject), প্রকৃতি থেকে সংস্কৃতি আলাদা করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গুণ (individuality) আরোপ করে সবকিছুকে স্বতন্ত্রভাবে উৎপাদনক্ষম ও পুনরুৎপাদনশীল হিসেব দেখানোর প্রয়াস লক্ষণীয়। পুঁজিবাদী সম্পর্ক (capitalist relations) সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ-ধরনের বিচ্ছিন্নকরণ এবং স্বাতন্ত্র্যায়ন (Individualism) বা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

আরোপ অপরিহার্য। (O'Connon 1998) এভাবে আলোকায়নপন্ত্রিরা প্রকৃতিকে আলাদাকরে জীব- বৈচিত্র্য, বাস্তসংস্থান ইত্যাদি প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে এবং তা' সংরক্ষণের জন্য পার্ক, সংরক্ষিত এলাকা প্রভৃতি ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছে।

প্রকৃতিকে এরূপ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দেখার একটি সমস্যা হলো ব্যক্তি বা বিজ্ঞানী কেউ নিরপেক্ষ নয়। ব্যক্তিকে তার বিষয় থেকে পৃথক করাও সহজ নয়। কারণ ব্যক্তির কাছে বিষয়ের নিজস্ব ধারণা তার অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নেয়। সুতরাং বিজ্ঞানী চূড়ান্ত সত্য বা সর্বকালে ও সবার জন্য প্রযোজ্য সার্বজনীন সত্য উপস্থাপন করে না বরং বিশেষ পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট স্থান-কালে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তার প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করে মাত্র। বিজ্ঞানজাত জ্ঞানও তাই চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব (Contested Knowledged)। আলোকায়ন পর্বের অপর একদল বিশেষত শিল্প-সাহিত্যিকরা ব্যক্তি-নিরপেক্ষতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন এবং পরিবর্তে ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধি ও প্রতক্ষ্যণ উপর (Subjectivity) জোর দেন। এরা রোমান্টিকস্ (Romantics) হিসেব পরিচিত। এরাও প্রকৃতিকে ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং নান্দনিক দৃষ্টি থেকে প্রকৃতিকে নগর বসতির বর্হিভূত সজীব, দূষণমুক্ত একটি সত্তা হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু এরূপ প্রকৃতি বাস্তবে নেই। কারণ মানুষের উপলব্ধি বার্হিভূত কোনো প্রকৃতি থাকতে পারে না। অর্থাৎ মানুষের প্রকৃতি দ্বিতীয় প্রকৃতি (Second Nature)। যাহোক, এ ধরনের রোমান্টিক সত্তা হিসেবে দেখার পরিণতিতে প্রকৃতি পর্যটনযোগ্য, উপভোগ্য অন্য ধরনের একটি পণ্যে পরিণত হয়েছে। এভাবে পাশ্চাত্যে এই উভয়বিদ দৃষ্টিকোণই প্রকৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের পুঁজি ও পণ্য পরিণত করেছে। উভয় মানুষকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভেবেছে, ধারণায়ন করেছে এবং সংরক্ষণের কথা বলেছে। এরূপ খণ্ডীকরণে প্রকৃতিতে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। মানব সমাজের মতো প্রকৃতিতেও কিছু এলাকা 'এলিট' মর্যাদা লাভ করে। প্রাশ্চাত্যের এই দু'ধারা অর্থাৎ একদিকে বিজ্ঞান এবং অপর দিকে নান্দনিক ভাবনা উভয় এতই শক্তিশালী যে, এর বাইরে প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো মতেই গ্রহণযোগ্যতা পায় না। (Harawey, 1991) ফরাসি দর্শনিক ফুকো (1972) এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন বাচনগত লাড়াই (Discussive practice) এবং ক্ষমতার সম্পর্ক (power relations) বিশ্লেষণ করে। (Foucanlt, 1972) আধুনিক বিজ্ঞান এবং অন্যান্য পরিবেশগত ধারণা পশ্চিমা শক্তিশালী দাতা দেশের। তাই এদের বিজ্ঞান ও ধারণাই জয়ী হয়, প্রাধান্য পায় এবং সত্য হিসেবে গৃহীত হয়। ফলে উন্নয়নশীল দেশে গতানুগতিক ঐতিহ্যবাহী সমাজে যেখানে মানুষ-প্রকৃতির সহাবস্থান ছিল, তা থেকে মানুষ উচ্ছেদ করা হয়। (Zimmerens, 2000, Zimmerens Young, 1998) প্রকৃতিকে আলাদা করে নানান নামে সংরক্ষিত করার প্রয়াস আজ একটি বৈশ্বিক ঘটনা, যা বস্তুত উদারপন্থি ও নব্য-উদারপন্থিদের প্রকৃতিকে পুঁজি ও পণ্যের রূপান্তরকরণের একটি প্রয়াস মাত্র।

উপসংহার

সাম্প্রতিককালে বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক অঞ্চলের ভূদৃশ্য অভূতপূর্ব সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অপরিহার্য অনুসঙ্গ হিসেবে এসব অঞ্চলের বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সাথে সংঘাতময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কারণ এসব অঞ্চল থেকে বহুসংখ্যক আদিবাসী উৎখাত করা হয়েছে এবং তাদের জীবন-জীবিকা শুধু বিনষ্টই করা হয়নি, বরং তাদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংশের জন্য দায়ীও করা হয়েছে। পরিবেশ ধ্বংশের জন্য আর্থ-সামাজিক-রাজনীতিক পুরো ব্যবস্থাকে একত্রকরে বিশ্লেষণ না করে পশ্চিমা বিজ্ঞানবাদ এবং রোমান্টিকস্রা প্রকৃতিকে মানুষ

থেকে আলাদা করে একে সংরক্ষণের তাগিদ দেয়। এটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই একটি পদ্ধতি, যার অন্তর্নিহিত বিষয় হলো– শ্রেণিকরণ, পৃথককরণ, স্বত্ব নির্মাণ, উৎপাদান, পুনরুউৎপাদন ইত্যাদি। আর এজন্য ভূ-পরিসর ও প্রকৃতির ভূখণ্ডীকরণ, সীমায়ন ইত্যাদি এক-একটি কৌশল মাত্র। এভাবে মানব-সমাজের মত প্রকৃতিও শ্রেণিবিন্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সমাজের এলিট অংশের মতো প্রকৃতির খণ্ডিত অংশ সংরক্ষিত অঞ্চলের মর্যাদা লাভ করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তাই সামাজিক অসমতার মতো প্রকৃতি ও পরিবেশের অসমতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। কারণ গোটা পরিবেশকে একই দৃষ্টিতে না দেখে প্রকৃতির কিছু অংশ খণ্ডীকরণ করে তা সংরক্ষিত হয়। এভাবে পারিবেশিক ন্যায় বিচার (Environmental Justice) শুধু ক্ষুণ্ণ হয়; সংরক্ষিত এসব প্রকৃতিও ক্রমে পণ্য ও পুঁজিতে পরিণত হয়; যা শেষবিচারে পুঁজিপতি এলিট শ্রেণির কাজে লাগে। সুতরাং সামাজিক এলিট শ্রেণির ও প্রাকৃতিক সংরক্ষিত অঞ্চল পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আলাদা কিছুই নয়, অভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি এক একটি প্রত্যয়। কিন্তু এসব আর একমাত্র বিজ্ঞান-সত্য; গ্রাহ্য বা পশ্চিমা আধিপত্যমূলক পারিবেশিক ডিসকোর্স (hegemonic environmental discourse) নয়; অনুন্নত ও শক্তিহীন মানুষরা ক্রমে সংগঠিত হচ্ছে এবং গড়ে তুলছে প্রকৃতি ধারণায়নে (Conceptualization of Nature) নতুন চিন্তা, ক্রমেই তা শক্তিশালী হচ্ছে। মানব-পরিবেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে পৃথক হিসেবে নয়, প্রকৃতির সাথে সহাবস্থানমূলক একটি বিকল্প ডিসকোর্স (counter discourse) গড়ে উঠার প্রয়াস লক্ষণীয়।

উল্লেখপঞ্জি

Bassett, T. (2001). "Patrimony and Development Territories in Northern Cote d'Ivoire" presented at the *97th Annual Meetings of the Association of American Geographers.* New York.

Bridge, G. (2000). The Social Regulation of Resource Access and Environmental Impact: Production, Nature, and Contradiction in the US Copper Industry. *Geoforum*. 237-256.

Bruntland, H. (1987). *Our Common Future.* University of Oxford Press for the World Commission on Environment and Development: Oxford.

Chape, S., S. Blyth, L. Fish, P. Fox and M. Spalding. (2003). "United Nations List of Protected Areas". IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Duffy, R. (2002). *A Trip Too Far: Ecotourism, Politics, and Exploitation.* Earthscan: London. *Ibid*

Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge.* Pantheon Books: New York.

Glowka, L., F. Burhenne-Guilmin, H. Synge, J. McNeely and L. Gundling (1994). *AGuide to the Convention on Biological Diversity.* IUCN: Gland and Cambridge.

GOB, (2006). *Protected Areas of Bangladesh: A visitor's Guide*. Nishorgo Protected area Management Programme, Forest Department, Ministry of Forests, Government. of Bangladesh, Dhaka, 2006.

Groombridge B. (ed). 1992). *Global Biodirversity: Status of the Earth's Living Resources*. Chapman & Hall. London.

Haraway, D. (1991). *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature.* Routledge: New York.

Hayden, C. (2003). *When Nature Goes Public: The Making and Unmaking of Bioprospecting in Mexico.* Princeton University Press: Princeton.

MacArthur R. H. (1972). *Geographical Ecology: Patterns in the Distribution of Species*. Harper and Row, New York.

O’Connor, J. 1998. *Natural Causes: Essays in Ecological Marxism.* The Guilford Press: New York.

Place, S. (1995). .Ecotourism for Sustainable Development: Oxymoron or Plausible Strategy? *GeoJournal*. 35 (2). 161-173.

Sack, R. (1986). *Human Territoriality: Its Theory and History.* Cambridge University Press:

Schroeder, R.A. (1995). Contradictions along the Commodity Road to Environmental Stabilization: Foresting the Gambian Gardens. *Antipode*. 27 (4). 32-342.

UNEP 2006. Global Protected Areas Database. www.unep.org/geo2000. Accessed Nov. 2008.

Williams, R. (1972). "Ideas of Nature" in *Ecology: The Shaping of Inquiry.* J. Benthall, ed. Longman: London.

Williams, R. (1973). *The Country and the City.* Oxford University Press: New York.

Wilson, E.O. (1988). "The Current State of Biological Diversity" in *Biodiversity.* E.O. Wilson, ed. National Academy Press: Washington, D.C.

WTO 2008. *World Tourism Barometre*, fact-sheet newsletter of World Tourism Organization, www.wto.org/facts/eng/barometer.htm. Accessed August 2008.

Zimmerer, K. (2000). The Reworking of Conservation Geographies: Nonequilibrium Landscapes and Nature-Society Hybrids. *Annals of the American Association of Geographers*. 90 (2). 356-369.

Zimmerer, K. and K. Young. (1998). *Nature’s Geography: New Lessons for Conservation in Developing Countries.* University of Wisconsin Press: Madison, Wisconsin.

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতচর্চা ও তার প্রাসঙ্গিকতা

ময়না তালুকদার*

সারসংক্ষেপ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি অবিস্মরণীয় নাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। এই নব-আন্দোলনে যে ক'টি মহৎ বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটেছে তার পুরোভাগে ছিলেন তিনি। মানবকল্যাণের আকাঙ্ক্ষায়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয়-কর্ম-উদ্যোগের মাধ্যমে তিনি সকল প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ব্যয় করেছেন সাহিত্য-সাধনায় আর জনহিতকর ব্রতে। দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তিনি কেবল নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেননি, সমকালীন অনেক কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকের দুঃসময়েও প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন তিনি। তিনি প্রায় পঁয়ষট্টি-টির মতো গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়াও পত্র-পত্রিকা, সাময়িকীতে এখনো ছড়িয়ে আছে তাঁর অগ্রথিত অনেক রচনা। তাঁর অর্ধ-শতাব্দীর সাহিত্য জীবনে তিনি যে সব গ্রন্থ রচনা করেছেন, তার মৌল বিষয়াংশই হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য। সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য অতিশয় ঐশ্বর্যময়, সেটা উপলব্ধি করেই তাঁর রচনাতে হাজার বছরের পুরানো এই ঐতিহ্যবাহী ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি নবরূপে প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃত অভিধান *অমরকোষ* যে তাঁর ভালোভাবেই পঠিত ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচনায় বহু শব্দ ব্যবহার ও পংক্তি প্রয়োগের নৈপুণ্য দেখে। তাঁর গ্রন্থগুলোর উৎস ও বিষয় আলাদা আলাদা হলেও এগুলো রচনা করতে গিয়ে প্রধানত তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর জন্মসূত্রে পাওয়া ঐতিহ্যচেতনা যে কাজ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মোটকথা, তিনি প্রাচ্যাদর্শের সঙ্গে প্রতীচ্যের বিজ্ঞানমুখিতাকে মিলিয়ে এক অভিনব সাহিত্য রচনা করেছেন। বর্তমান আলোচনায় তাঁর জীবনবোধ, শিল্পদৃষ্টি ও মনোলোকের মৌল প্রবণতাসমূহ আলোচনা না করে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে তিনি কীভাবে আধুনিক গদ্য সাহিত্যের দ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণাত্মক বিবেচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণের এক অনির্বাণ দীপশিখা হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। বাংলা সাহিত্যের কালবদল, বিশেষ করে মধ্যযুগের অন্ধ তমসাগর্ভ থেকে আলোকোজ্জ্বল নতুন সাহিত্যে পদার্পণ তাঁরই পদচিহ্ন ধরে ঘটেছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে তিনি যুগস্রষ্টা বা যুগন্ধর। ধীশক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, দয়ার্দ্রচিত্ততা, শিক্ষাচিন্তা, সমাজসচেতনতা প্রভৃতি অগণিত গুণের বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছিল তাঁর জীবনে। মানবকল্যাণ ও আত্মতেজস্বিতা লালন করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, সমাজবাস্তব চিন্তাদর্শের কার্যকারিতা সংঘটনেও অদ্বিতীয় ছিলেন। নারীর জীবনমান এবং সমাজ ও পরিবারে তাদের অবস্থান নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ছিল অত্যন্ত হিতকর। ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তার পরিবর্তে পরদুঃখকাতরতা, সহৃদয়তা, বদান্যতা এবং স্বার্থশূন্যতা প্রভৃতি নানা গুণ তাঁকে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিল। তাঁর সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে তাঁর ছিল মধুর সম্পর্ক। তার জীবনের নানা সংকটময় মুহূর্তে তিনি বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হয়েছেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে গভীর স্নেহ এবং আর্থিক সহযোগিতা করতেন। মধুসূদন দত্তের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর হলেন Knowledge an ancient

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

sage, energy of an Englishman, আর heart of a Bengali mother-এর সমন্বয়ে গঠিত এক মহামানব। বিদ্যাসাগরের হৃদয়বত্তা, পাণ্ডিত্য আর কর্মক্ষমতা আজ ভারতবর্ষসহ বাংলাদেশে উপকথায় পরিণত হয়েছে। এজন্যই আজকের সমাজের প্রেক্ষাপটে তিনি একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই বিস্ময়কে ব্যক্ত করেছেন এভাবে: "মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৪, পৃ. ৮২১-৮২২)

মধ্যযুগে শিল্প-সাহিত্য-দর্শনে ঈশ্বরই প্রাধান্য পেত। তারপরও ঈশ্বর ও শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে নানা অদৃষ্টবাদ, কর্মহীনতা, কুসংস্কার সমাজদেহের প্রতিটি অঙ্গকে আচ্ছন্ন করেছিল। কিন্তু ব্যতিক্রমধর্মী বিদ্যাসাগর ঈশ্বরের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মানবতাবাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। কারণ তিনি চেয়েছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ আধুনিক মানবতাবাদী কাল-সমুদ্রের দিকে এদেশের মানুষের জীবন-প্রবাহকে প্রবাহিত করে দিতে। এজন্য তাঁকে জীবনভর একাকিত্বের যন্ত্রণায় ছটফট করতে হয়েছে। আত্মজৈবনিক এই বেদনার প্রতিভাস তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় তাঁর পত্রাবলিতে। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন চির একা। তাঁর সহযাত্রী কেউ ছিল না। অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে তাঁর একাকিত্ব কর্মে কোনোদিন কোনো কিছু বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি, বরং তাঁর জীবন সাধনায় চিরদিনই এই বৈশিষ্ট্যটি ধ্রুবতারার মতো তাঁর সকল কর্মপ্রেরণার দিক নির্দেশ করেছে। বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই স্বাতন্ত্র্য ও মহিমা উপলব্ধি করে বিনয় ঘোষ বলেছেন:

> আমাদের এই মানুষের সমাজে দেবতার চেয়ে অনেক বেশী দুর্লভ মানুষ। তপস্যা করে জীবনে দেবতার দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু সহজে এমন একজন মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, যিনি মানুষের মতন মানুষ। মানুষের পক্ষে এ সমাজে দেবতায় রূপান্তরিত হওয়া যত সহজ, মানুষ হওয়া তত সহজ নয়। আজও আমাদের সমাজে, বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বিপ্রহরকালে, অতিমানুষ ও মানবদেবতাদের মধ্যে দেবত্বের বিকাশ যত স্বল্পায়াসে হয়, সামাজিক মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ আদৌ সেভাবে হয় না। আজ থেকে শতাধিক বছর আগে, আমাদেরই এই সমাজে তাই যখন দেখতে পাই বিদ্যাসাগরের মতন একজন মানুষ পর্বতের মতন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন, কোন অতিমানবিক অলৌকিক শক্তির জোরে নয়, সম্পূর্ণ নিজের মানবিক শক্তির জোরে, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। (বিনয় ঘোষ, ১৯৫৭, পৃ. ১)

বিদ্যাসাগর যথার্থ মানুষ ছিলেন বলেই মনুষ্যত্বের সাধনা তাঁর জীবনে একমাত্র ব্রত হয়ে উঠেছিল। এই মনুষ্যমহিমা বিদ্যাসাগরকে সমকালীন জীবনধারায় যেমন বৈশিষ্ট্য দান করেছিল, চিরকালীন মানব সভ্যতা আবার তাঁর জীবনধারাকে বহমান কাল-গঙ্গার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিল। তাই জীবন-মৃত্যুর সীমানা নির্ধারণে উনিশ শতকের মানুষ হলেও বিদ্যাসাগর ছিলেন চিরকালের আধুনিক। বর্তমান যুগচেতনার আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, দুশো বছর আগে তিনি যে অসীম সমধর্মী মন-মানসিকতায় সহজে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তার থেকে আজও আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিনি কেবল ভবিষ্যতের যাত্রাপথের চিরন্তন পথিকই নন, অভ্রান্তদৃষ্টির পথ প্রদর্শকও।

অবশ্য তাঁর বিশাল, বিচিত্র কর্মবহুল জীবনকথা ও মানবতাবোধ বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। এখানে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে কতটা অন্বিষ্ট ছিলেন এ আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর

সংস্কৃতচর্চার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পাবো। তাঁর মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থগুলোতে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা-ও তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে বর্তমান প্রবন্ধে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্ম ও সাহিত্যজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; এর একটি থেকে অন্যটিকে স্বতন্ত্রভাবে শনাক্ত করা প্রায় দুঃসাধ্য। তাঁর সকল কর্মের পশ্চাতেই সর্বদা সক্রিয় ছিল সাহিত্য-সাধনা। তাই তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হওয়ার পর বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব বোধ করে পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। *মহাভারত-উপক্রমণিকা*, *বেতালপঞ্চবিংশতি*, *শকুন্তলা*, *সীতার বনবাস*, *ভ্রান্তিবিলাস*, *কথামালা*, ইত্যাদি তাঁর প্রথম দিকের রচনাসমূহ ছিল অনুবাদ কর্ম। অনুবাদ কর্ম হলেও তিনি আদ্যোপান্ত মূলগ্রন্থগুলোকে অনুবাদ করেননি। তাঁর এসব গ্রন্থে নিজস্ব একটা স্বকীয়তা ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচিত প্রায় বত্রিশটি গ্রন্থের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদ এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যবিষয়ক। তাঁর মৌলিক গ্রন্থ হলো *বর্ণপরিচয়*, *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, *রামের রাজ্যাভিষেক*, *নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস*, *শব্দমঞ্জরী*, *প্রভাবতী সম্ভাষণ*, আত্মজীবনী প্রভৃতি রচনা। এছাড়াও সংকলিত, বেনামী রচনা, প্রবন্ধ ও সম্পাদিত গ্রন্থ–সব মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থসংখ্যা পয়ষট্টি-টির মতো হবে। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব শিশু-কিশোরদের পাঠোপযোগী পাঠ্যগ্রন্থ রচনা এবং বাংলা গদ্যের প্রবর্তনা। তাঁর হাতেই বাংলা গদ্য এক নতুন রূপ লাভ করে।

বলা যেতে পারে, *বেদ-উপনিষদ*, *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও বিভিন্ন পুরাণের কাহিনিতে কাব্য-নাটকের বীজ উপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই ভাবধারার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে আজকের বাংলা সাহিত্যে। আনুমানিক দশম শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত মৌলিক কাব্য-নাটক রচনা অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে সামাজিক বিবর্তনের কারণে বাংলা ভাষায় রচিত পাঁচালি, কথকতা, যাত্রা প্রভৃতির কাছে সংস্কৃত কাব্য-নাটক কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেটা ছিল সাময়িক। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই সংস্কৃত কাব্য-নাটক বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে আবারো আধুনিক কালের সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছিল। ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে কবি জগদীশ সংস্কৃত প্রহসন *হাস্যার্ণব*-এর বাংলা অনুবাদ করেন। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীকৃষ্ণমিশ্র রচিত রূপক শ্রেণির সংস্কৃত নাটক *প্রবোধচন্দ্রোদয়* এর বাংলা অনুবাদ করেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের *কৌতুক-স্বস্তি*, *রত্নাবলী*, *মহানাটক*, *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, *সপত্নী*, *মালতী-মাধব*, *ধূর্তনাটক*, *ধূর্তসমাগম*-সহ আরো কিছু নাটকের বাংলা অনুবাদের কথা জানা যায়। এ প্রসঙ্গে ড. নীলিমা ইব্রাহিম-এর অভিমত : "আমরা বিক্ষিপ্তভাবে নাটক রচনার প্রয়াস মুখ্যত সংস্কৃত নাটক ও প্রহসনের অনুবাদের মাধ্যমেই দেখতে পাই।" (নীলিমা ইব্রাহিম, ১৩৭৯, পৃ. ১২) বলা যায় ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই নতুনের আবির্ভাব হয়। আর ধারাবাহিকতা মানে নতুনের উপর পুরোনোর প্রভাব। সেই হিসেবে প্রাচীন কবি-নাট্যকার ও কাব্য-নাটকের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের পথকে আলোকিত করেছে — এটাই স্বাভাবিক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত হাতে গোনা কিছু ইংরেজি নাটকের অনুবাদ ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের কাহিনিই বাংলা কাব্য নাটকে স্থান করে নিয়েছিল। মোটকথা, বাংলা কাব্য-নাটকগুলোর বিষয়বস্তু, ভাব ও ভাষাগত কাঠামো সবই ছিল সংস্কৃতানুসারী। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য:

....একটি কথা এখানে বিস্মৃত হইবার উপায় নাই যে বাংলা নাটকের প্রথম উৎপত্তির যুগে সংস্কৃত নাটকের বহু বাংলা অনুবাদও রচিত হয়। ... বিশেষত এই সকল অনুবাদ যাঁহারা রচনা করিতেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ ও ইংরেজি নাট্য সাহিত্যের প্রকৃতির সঙ্গে অপরিচিত ছিলেন। ... এই যুগে বাংলা ভাষার ভিতর দিয়া এই দেশে সংস্কৃত নাটকের পুনরভ্যুদয় দেখা দিয়াছিল মাত্র। (আশুতোষ ভট্টাচার্য, ২০০২, পৃ. ১২)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য রচনার শুধু পথিকৃৎ নন, অবিসংবাদিতরূপে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। তিনিই সর্বপ্রথম গদ্যভাষারও যে একটা বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি থাকে, কবিতার মতো সুর-তাল-যতিচিহ্ন থাকে, স্টাইল থাকে-সেগুলোই তাঁর গ্রন্থরচনাতে ফুটিয়ে তুললেন। অনুবাদ কর্মের দ্বারাই সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। বিদ্যাসাগরকে কেউ কেউ অনূদিত গ্রন্থের রচনাকার বলে থাকেন। কিন্তু তারা হয়ত জানেন না লেখকের কৃতিত্বের গুণে অনেক সময় অনূদিত গ্রন্থও মৌলিক গ্রন্থের মতোই চিত্তাকর্ষী হয়ে ওঠে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বিদ্যাসাগর সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে কালিদাস থেকে প্রচুর প্রেরণা লাভ করেছেন। কালিদাস এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে কী পরিমাণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করলেই তা বোঝা যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর রচিত *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* গ্রন্থে বলেছেন :

সংস্কৃতভাষানুশীলনের নানা ফল। ইয়ুরোপে শব্দবিদ্যার যে ইয়তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃতভাষার অনুশীলন তাহার মূল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃতভাষার অনুশীলন দ্বারা অন্য অন্য ভাষার মূলনির্ণয়, স্বরূপপরিজ্ঞান ও মর্ম্মোদ্ভেদে সমর্থ হইয়াছেন; এবং এই পৃথিবী যে নানা মানবজাতির আবাসস্থান, তাহাদিগের কে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, কে কোন দেশের আদিম নিবাসী লোক, কে কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়া কোন্ প্রদেশে বাস করিয়াছে ইত্যাদি নির্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইয়ুরোপীয় শব্দবিদ্যা যাবৎ সংস্কৃতভাষার সহায়তা প্রাপ্ত হয় নাই, ততদিন পর্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; এই নিমিত্তই,ডাক্তার মোক্ষমূলর সংস্কৃতভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪, পৃ. ১২৮)

সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বাংলায় অনুবাদ করে বিদ্যাসাগর বাঙালির মন কেড়ে নিয়েছিলেন। সংস্কৃতসাহিত্য এতো বিশাল ও দুর্বোধ্য যে সকলের পক্ষে তা বোধগম্য ছিল না। তাই তিনি এই বিশাল সাহিত্যকে বিশেষ করে কালিদাসকে বাঙালি পাঠকদের কাছে পরিচিত করার প্রয়াসেই নিজেকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুবাদকর্মে নিযুক্ত করেন। তাঁর মতে কালিদাস শুধু ভারতবর্ষের নয়, বিশ্বেরও শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকটি বিদ্যাসাগরকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে, তিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের মধ্যেই ডুবে ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর জন্মগত ঐতিহ্যচেতনা যে কাজ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাল্যকাল থেকেই বিদ্যাসাগর যে পরিবারে, যে সমাজে বেড়ে উঠেছিলেন, সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য রচনায়ও অভ্যস্ত ছিলেন তবুও কেন সেই ভাষায় সাহিত্য রচনা না করে বাংলা গদ্যরীতিতে অনুবাদ কর্ম করে তার রসাস্বাদন করলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত হলো:

দেশে যখন দেশভাষারই একমাত্র চলন হয়েছে, সংস্কৃত ভাষা ক্লাসিক ভাষার পর্যায়ে উঠে গেছে, তখন অনভ্যাসের জন্য কোনো সংস্কৃতজ্ঞই আর প্রকৃত সংস্কৃত লিখতে পারবেন না। লিখলেও তাতে ঠিক পূর্বতন যুগের ভাষা, সাহিত্য ও রসের স্বাদ গন্ধ থাকবে না — যদিও বৈয়াকরণ বিশুদ্ধি থাকবে পুরোমাত্রায়। তাই তিনি নিজে সংস্কৃত রচনা করতে চাইতেন না। (অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৫, পৃ. ১৯১)

তাঁর এই অভিমত যথার্থ যৌক্তিক। যখন একটি প্রাণচঞ্চল, সচল ও সজীব ভাষা কালক্রমে লোক ব্যবহার থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে, শুধু পঠন-পাঠন ছাড়া সে ভাষার আর কোনো প্রচার থাকে না, তখন পণ্ডিত ব্যক্তিরাও সেই ভাষায় কোনো মৌলিক গ্রন্থ রচনা করতে পারেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বেলায় তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেছে। সংস্কৃত সাহিত্যের বিবিধ শাখায় তিনি যে কত গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছিলেন, তা তাঁর কিছু কিছু সংস্কৃত রচনা দেখেই বোঝা যায়। সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময়ই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লক্ষ করা যায়। তিনিই এদেশে সংস্কৃত শিখার সুগম বর্ত্ম নির্মাণ করেছেন। যদিও তিনি মনে করতেন সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক রচনা দুরূহ কর্ম — আসলে এটি তাঁর বিনয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। যা হোক তাঁর তিনখানি সংস্কৃত পুস্তিকা প্রচারিত হয়েছিল— *সংস্কৃত রচনা* (১৮৮৯), *শ্লোকমঞ্জরী* (১৮৯০) এবং *ভূগোল-খগোলবর্ণনম্* (১৮৯২-মৃত্যুর পর মুদ্রিত)। প্রথম পুস্তিকায় তাঁর বাল্যকালের সংস্কৃত রচনা মুদ্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় পুস্তিকাটি সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ ও অন্যান্য শ্লোক থেকে সংগৃহিত। সে যুগে সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। মুখে মুখে প্রচারিত এই উদ্ভট শ্লোকগুলিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে বিদ্যাসাগর *শ্লোকমঞ্জরী* নামে এই গ্রন্থটি মুদ্রিত করেন। তৃতীয় গ্রন্থটি বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রাবস্থায় এক সিভিলিয়ান–এর প্রেরণায় পৃথিবীর ভূগোল ও গ্রহ-নক্ষত্রের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। তিনি পুরাণ, সূর্য-সিদ্ধান্ত ও ইউরোপীয় ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে ৪০৮টি শ্লোক নিয়ে *ভূগোল-খগোলবর্ণনম্* রচনা করে সকলের অতি প্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। আর অবশিষ্ট শ্লোকে তিনি ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকা-আমেরিকার ভৌগোলিক পরিচয় প্রদান করেন। *ভূগোল-খগোলবর্ণনম্* গ্রন্থ থেকে পাশ্চাত্যের নদ-নদী, জনপদের বর্ণনা পেয়ে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা যারপরনাই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাকবি কালিদাস দ্বারা এতটাই প্রভাবিত ছিলেন যে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের দিকে লক্ষ করলে তা বোঝা যাবে। তিনি কালিদাসের *রঘুবংশম্*, *কুমারসম্ভবম্* ও *মেঘদূতম্* –এই তিনটি কাব্য সম্পাদনা করেন এবং *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের কাহিনির অনুবাদ *শকুন্তলা* নামে প্রকাশ করেন। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের প্রশংসা করতে গিয়ে *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* গ্রন্থে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন:

> সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, শকুন্তলা সে সকল অপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। অপূর্ব নাটকের আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত সর্বাংশই সর্বাঙ্গসুন্দর। যদি শতবার পাঠ কর, শত বারই অপূর্ব বোধ হইবে। ... উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তি ঐ সকল স্থল পাঠ করিলে, অবশ্যই তাঁহার অন্তঃকরণে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবেক যে মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না। বস্তুতঃ কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ অপূর্ব পদার্থ। (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪:১২০)

ঔপনিবেশিক শাসনামলে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ভারতের সভ্যতা-কৃষ্টি-সাহিত্য পঠনপাঠনের যে ধারাটি শুরু হয়েছিল তার প্রথম দৃষ্টান্ত হচ্ছে *শকুন্তলার* অনুবাদ। স্যার উইলিয়াম জোন্স (১৬৭৫-১৭৪৯) ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের মূল সংস্কৃত থেকে *শকুন্তলার* ইংরেজি অনুবাদ করেন। অনূদিত গ্রন্থটি পড়ে ইউরোপে সাড়া পড়ে যায় এবং একে একে জার্মান, ফরাসি, ডেনিস, ইতালি ও অন্যান্য ভাষায় রূপান্তরিত হতে থাকে। জার্মান কবি গ্যাটে (১৭৪৯-১৮৩২) এই অনূদিত রচনাটি পড়ে এতই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তাঁর মতে এটি যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক।

বিদ্যাসাগর *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের আদ্যোপান্ত অনুবাদ করেন। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছেন। সংস্কৃত নাটকের কাহিনি বাংলা গদ্যে রূপান্তরিত করলে মূল গ্রন্থের অনেকখানি সৌন্দর্য যে নষ্ট হয় সে বিষয়ে বিদ্যাসাগর সচেতন ছিলেন। তাই তিনি অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের কাহিনির বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। এ যুগের পাঠকের কথা চিন্তা করে তিনি মূল নাটকের নাট্যোচিত সংলাপ, ভনিতা এবং অপ্রয়োজনীয় অলৌকিকতা বাদ দিয়েছেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদিরসাত্মক দৃশ্যকে সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে বর্ণনা করেছেন। এতেই সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর রচনামাধুর্য প্রশংসিত হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে বিহারীলাল সরকারের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য — "এ অনুবাদের তুলনা নাই। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সংস্কৃত যেমন মধুর, এই শকুন্তলার বাঙালা তেমনই মধুর। এককথায় বলি, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা পড়িয়া যাহা বুঝি নাই, ইহাতে তাহা সুচারুভাবে বুঝিয়াছি।" (বিহারীলাল সরকার, ১৯২২, পৃ. ২৭৫)

মহাকবি কালিদাস বিরচিত *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* সাত অঙ্কে বিভক্ত। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই নাটকের আখ্যান ভাগকে গদ্যে বিবৃত করে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। তবে মূল নাটককে বিদ্যাসাগর হুবহু নাটকীয় কাহিনির আকারে উপস্থাপন করেননি। নাটকে যে কাহিনি শোভা পায়, অনেক সময় গদ্য কাহিনিতে সেটি অতিরঞ্জিত বলে মনে হতে পারে বিধায় মূল নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার ও নটীর যে সংলাপ আছে বিদ্যাসাগর তা বাদ দিয়ে একেবারে মূল গল্পের মধ্যে চলে এসেছেন এবং নাটকীয়ভাবে মৃগানুসন্ধানী বাণোদ্যত রাজার বর্ণনা দিয়ে কাহিনির সূত্রপাত করেছেন। কিন্তু হরিণের প্রাণভয়ে পলায়নের দৃশ্য কালিদাস দীর্ঘ করে উপমা দ্বারা বর্ণনা করেছেন:

> গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে বদ্ধ-দৃষ্টিঃ
> পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতন-ভয়াদ্ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্।
> দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রম-বিবৃত-মুখ-ভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
> পশ্যোদগ্র-প্লুতত্বাদ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি ॥
> (রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ১৩৩৯, পৃ. ১৩)

> অর্থাৎ, ধনুকে ছিলা পরিয়ে বাণক্ষেপ করার জন্য আপনি প্রস্তুত হয়ে ছুটছেন, আর ঐ পুরোভাগে প্রাণভয়ে মৃগটা ছুটছে আর ঘাড় ঘুরিয়ে একদৃষ্টে রথের দিকে তাকাচ্ছে। আজ আপনার এবং ঐ মৃগের দিকে চেয়ে আমার সেই দক্ষযজ্ঞের কথা মনে পড়ছে। আমি যেন দেখছি, প্রাণভয়ে ভীত হয়ে মৃগরূপ ধারণ করে প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ ঐ দৌড়াচ্ছে আর সতী বিনাশ-ক্রুদ্ধ রুদ্রদেব প্রকৃতই রুদ্রমূর্তিতে পিনাক উত্তোলন করে তার পিছন পিছন ছুটছে।

কিন্তু বিদ্যাসাগর উপমাসংবলিত দীর্ঘবাক্য বাদ দিয়ে 'প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে' এই বিশেষণটি দিয়ে মূল বর্ণনাকে সংহত করে নিয়েছেন: "একদিন, মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, রাজা শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। হরিণশিশু, তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে, দ্রুতবেগে, পলাইতে আরম্ভ করিল।" (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪, পৃ. ১৩১)

নাটককে কাহিনির আকারে রূপায়িত করতে গিয়ে মূল রস ও সংলাপ বজায় রেখে বিদ্যাসাগর *শকুন্তলা* অনুবাদ করেছেন। তিনি সর্বত্রই রুচিকর ধ্বনিময়তা বজায় রেখে সংস্কৃতের 'সৌম্য ও সরল' শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন। প্রয়োজনে আলংকারিক শব্দপ্রয়োগেও কুণ্ঠিত হননি। নাটকের বিষয়কে স্বচ্ছ, স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন করতে এবং দর্শকদের কাছে বোধগম্য করতে সংলাপের ভাষায়

গুরুত্ব অপরিসীম। সংস্কৃত নাটকেও সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার লক্ষণীয়। সংস্কৃত নাট্যতাত্ত্বিকেরা নাটকে ভাষা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট সূত্রও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই সূত্র ধরে সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে চরিত্র অনুযায়ী ভাষা। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতামত অনুযায়ী নাটকের ভাষা হবে — "নাটকং মিশ্রং কর্তব্যম্। উত্তমাধমমধ্যমপাত্রাণাং ভাষাভিমিশ্রং কর্তব্যম্" অর্থাৎ, নাটকের পাত্র-পাত্রীদের ব্যবহৃত ভাষা হবে মিশ্র; উত্তম, মধ্যম ও অধম প্রভৃতি সামাজিক বর্ণ বা শ্রেণি অনুসারে পাত্র-পাত্রীর ভাষা নির্দিষ্ট হবে।" (সাগরনন্দী, ১৩৮৫, পৃ. ১৪) সাধারণত সংস্কৃত নাটকে দেবতা, ব্রাহ্মণ রাজা প্রভৃতি উচ্চশ্রেণির মুখের ভাষা হবে সংস্কৃত আর রাণিসহ সকল নারীচরিত্রের মুখের ভাষা হবে প্রাকৃত। আর নিম্নবর্ণীয় শ্রেণির মুখের ভাষাও হবে প্রাকৃত।

বিদ্যাসাগর কিন্তু ভাষার সংলাপের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সংস্কৃত আলংকারিকদের নির্দেশই মেনে চলেছেন। তিনি চরিত্রানুগ ভাষা ও সংলাপ ব্যবহার করেছেন। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকে শকুন্তলা, প্রিয়ংবদা, অনসূয়া প্রভৃতি রানীচরিত্র, বিদূষক, রক্ষীদ্বয়, শ্যালক এবং ধীবরের প্রাকৃত সংলাপগুলো বিদ্যাসাগর যথাসম্ভব চলিত ও হালকা শব্দ অর্থাৎ, মৌখিক ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, তিনি *শকুন্তলা* গ্রন্থে সংস্কৃত সংলাপগুলোতে মুন্সিয়ানা গদ্য প্রয়োগ করেছেন আর প্রাকৃত সংলাপগুলোতে যথাসম্ভব মৌখিক ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। ভাষা ও সংলাপের ক্ষেত্রেও সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে। যেমন *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে রক্ষী, নগরপাল ও ধীবরের সংলাপ মাগধী প্রাকৃতে রচিত :

> রক্ষিণৌ– (তাড়য়িত্বা) অলে কুম্ভিলআ, কহে হি কহিং তু ত্র এশে মণিদগ্ধণুক্কিণ্ন-নামহেএ লাঅকীত্র অঙ্গুলী ত্র শমাশাদিত্র অর্থাৎ, (আঘাত করে) ওরে বেটা চোর, বল খুলে শীগগির, কোথায় তুই রাজার নামাঙ্কিত এই রত্নাঙ্গুরী পেয়েছিস্।
>
> পুরুষঃ– (ভীতিনাটিতকেন) পশীদন্তু ভাবমিশ্শে। হগে ণ ঈদিশকম্মকালী অর্থাৎ, (সভয়ে) হুজুরগণ, মারবেন না। আমি পরদ্রব্য অপহরণ করি না। (রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ১৩৩৯, পৃ. ১৪১)

বিদ্যাসাগর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*-এর মতো নগরপাল, ধীবর ও দুই রক্ষীর যে সংলাপ প্রয়োগ করেছেন, সেই সংলাপের ভাষা সাধু হলেও ভঙ্গিতে চলিত। যেমন: "নগরপাল আসিয়া ধীবরকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল এবং জিজ্ঞাসিল, অরে বেটা চোর! তুই এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি, বল? ধীবর কহিল, মহাশয় ! আমি চোর নহি।" (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪, পৃ. ১৬৪)

সুতরাং বলা যায়, মহাকবি কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*-এর বেশিরভাগ সংলাপই তিনি হুবহু অনুবাদ করেছেন। তবে মাঝে মাঝে স্বগতোক্তি, অলৌকিকতা, কবিত্বময় উপমা অলংকার বাদ দিয়েছেন। আবার অনেক সময় পাঠককে আবেগে আপ্লুত করতে একটি দুইটি নতুন বাক্যও জুড়ে দিয়েছেন। আসলে *শকুন্তলা* অনুবাদের দ্বারা বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বাঙালি পাঠককে কালিদাসের *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* নাটকের রস উপভোগে সাহায্য করেছিলেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব প্রণীত *মহাভারত* অষ্টাদশ পর্বে রচিত। বিদ্যাসাগর *মহাভারতের* আদিপর্বের বাষট্টিটি অধ্যায় বাংলা গদ্যে অনুবাদ করে ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* প্রকাশ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ *মহাভারত* সরল গদ্যে অনুবাদ করার কিন্তু নানা পারিপার্শ্বিকতার কারণে তা হয়ে ওঠেনি। ভারতের নানা অঞ্চলে যে সংস্কৃত *মহাভারত*

প্রচলিত ছিল, তার এক পুথির সঙ্গে অন্য পুথির শব্দের গরমিল ছিল। অধ্যায় সংখ্যারও কম-বেশি ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে সংস্কৃত *মহাভারত* থেকে অনুবাদ করেছিলেন, তার আদিপর্বে বাষট্টি অধ্যায় ছিল। বিদ্যাসাগর *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়* প্রকাশের সময় এর নাম দিয়েছিলেন *মহাভারত-আদিপর্ব*। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় এর নাম দিলেন *মহাভারত উপক্রমণিকা*। উপক্রমণিকা নাম প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপন অংশে তিনি বলেছেন:

> মহাভারতে নির্দেশ আছে, কেহ প্রথম অবধি, কেহ আস্তীক পর্ব অবধি, কেহ উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি, ভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা শেষ কল্প অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মতে উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি ভারতের প্রকৃত আরম্ভ, সুতরাং তত্তন্মতে তৎপূর্ববর্ত্তী অধ্যায় সকল তদীয় উপক্রমণিকাস্বরূপ। এই পুস্তক ঐ অংশের অনুবাদ মাত্র; এই নিমিত্ত শেষ কল্প অবলম্বন করিয়া অনুবাদিত অংশ উপক্রমণিকাভাগ উল্লিখিত হইল। (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪, পৃ. ১৭৬)

সুতরাং তিনি সংস্কৃত সাহিত্যকে আত্মস্থ করেছিলেন বলেই *মহাভারতের* ক্লাসিক গাম্ভীর্য বজায় রেখে অনুবাদ করতে পেরেছিলেন। ভাষাকে সংহত রূপ দেবার জন্য এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর অনেক সময় সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদও ব্যবহার করেছেন। পৌরাণিক মহাকাব্যগুলো অর্থাৎ, *রামায়ণ* ও *মহাভারতের* প্রতি তিনি এতটা সন্নিবিষ্ট ছিলেন, তাঁর রচনাবলি দেখেই তা উপলব্ধি করা যায়।

বিদ্যাসাগর অষ্টম পরিচ্ছেদে *সীতার বনবাস* (১৮৬০) নামে শ্রেষ্ঠ বাংলা ক্লাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। ভবভূতি প্রণীত *উত্তরচরিত* নাটক এবং বাল্মীকি *রামায়ণের* উত্তরকাণ্ডের ঘটনাবলম্বনে *সীতার বনবাস* গ্রন্থটি তিনি রচনা করেন। এই গ্রন্থের উৎস সম্পর্কে তিনি বিজ্ঞাপনে লিখেছেন: "এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তক বিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনপূর্বক সঙ্কলিত হইয়াছে।" (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪, পৃ. ২৯০)

বিদ্যাসাগর *উত্তরচরিত*-এর প্রথম অঙ্কের ঘটনা দুই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিধৃত করেছেন। প্রথম পরিচ্ছেদে শুধু আলেখ্যদর্শন বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রামচন্দ্রের সুশাসন, সীতার গর্ভ, সীতার তপোবন দর্শনের ইচ্ছা, দুর্মুখ কর্তৃক সীতার অপবাদ নিবেদন, সীতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস সত্ত্বেও প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রম পরিত্যাগ করে আসার জন্য লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের আদেশ প্রদান, রামের বিলাপ–এই ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন। দুর্মুখের কাছ থেকে নিদারুণ সংবাদ শোনার পর রামের বিলাপকে ভবভূতি যেমনভাবে বর্ণনা করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে বিদ্যাসাগরও রামের আর্তি তুলে ধরেছেন :

> হা দেবি দেবযজনসম্ভবে! হা স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রিত বসুন্ধরে! হা নিমিজনক নন্দিনি! হা পাবকবশিষ্ঠারুন্ধতী প্রশস্তশীলশলিনি! হা রামময় জীবিতে! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা তাতপ্রিয়ে! হা প্রিয়স্তোকবাদিনি! কথমেব বিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ। (ভবভূতি, ২০১১: ৯৩-৯৪)
>
> অর্থাৎ, হায় দেবি, পবিত্র যজ্ঞভূমিতে তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে, তোমার জন্মের অনুগ্রহে পৃথিবী পবিত্র হয়েছিল, তুমি নিমি বংশের জনকনন্দিনী, পাবক বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী তোমার চরিত্রের প্রশংসা করেছেন, তোমার জীবন রামময়, মহারণ্যে তুমি আমার প্রিয় সঙ্গিনী ছিলে, তুমি আমার পিতার প্রিয় ছিলে, তুমি কত অল্পভাষী ছিলে। তুমি এই রকম অথচ তোমার কী করে এই দশা হলো?

রামের করুণ স্বরের বিলাপ বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন এভাবে— "হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি ! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্যবাস সহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর। ... তুমি চন্দন তরুবোধে দুর্বিপাকে বিষবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে।" (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪, পৃ. ৩০১)

সীতার বনবাস-এর একটি বিশিষ্ট অংশ হচ্ছে আলেখ্য দর্শন। আলেখ্য দর্শন বিষয়টি *রামায়ণে* নেই, এটি ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। এর পশ্চাৎপটে রয়েছে বনবাসকালে রাম-সীতার সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতার কথা। রাবণ সীতাকে অপহরণ করার পর রামের মানসিক উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণার মাধ্যমে সীতার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। বনবাসের সময় রাম ও সীতা ছিলেন অভিন্ন এবং অত্যন্ত সুখি। সীতা অপহৃত হবার পর তাঁর উদ্ধার সময় পর্যন্ত উভয়েই যে ভীষণ বিরহযন্ত্রণা ও মানসিক কষ্ট ভোগ করেছিলেন, সেই স্মৃতি উভয়ের মনে জাগরূক হয়ে রয়েছে। সেই যন্ত্রণার কথা আলেখ্য দর্শনের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতে নিরপরাধ সীতাকে বনবাস দেবার পর রাম-সীতার মনে আবার বিরহের অনল জ্বলে উঠবে।

এরপর বিদ্যাসাগর তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে অষ্টম পরিচ্ছেদ অর্থাৎ, শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বাল্মীকি *রামায়ণের* উত্তরকাণ্ড অবলম্বন করে রচনা করেছেন। ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাম প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য তপোবনদর্শনের নাম করে সীতাকে বনবাস প্রেরণের প্রস্তুতি এবং লক্ষ্মণের প্রতি এই নির্মম কাজের আদেশ প্রদান — এই হচ্ছে তৃতীয় পরিচ্ছেদের কাহিনি। চতুর্থ পরিচ্ছেদে সীতাকে বিসর্জন দিতে গিয়ে লক্ষ্মণের প্রচণ্ড ক্ষোভ, গভীর দুঃখ ও অপরাধবোধ। পরিত্যক্তা শোকবিহ্বলা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া সীতাকে বাল্মীকির আশ্রয় দান। পঞ্চম পরিচ্ছেদে রামের অন্তর্দাহ, বিরহযন্ত্রণা ভোগ এবং সীতাকে বিসর্জন দিয়ে লক্ষ্মণ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে তাঁর প্রবল শোকোচ্ছ্বাস এবং রামকে লক্ষ্মণের সান্ত্বনা দান। এদিকে বাল্মীকির আশ্রমে যমজ পুত্র প্রসবের পর সীতার যুগপৎ হর্ষ ও শোক প্রকাশ। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অভিলাষী হলে স্ত্রী ব্যতিরেকে এই যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না বলে বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে পুনরায় বিবাহ করতে বলেন। কিন্তু রামচন্দ্র এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করলে বশিষ্ঠ মুনি সীতার স্বর্ণমূর্তিকে পাশে রেখে যজ্ঞ সম্পাদন করার বিধান দেন। *রামায়ণের* উত্তরকাণ্ডের ১০৪ সর্গে উল্লেখ আছে :

> কর্ম্মান্তিকান্ বদ্ধকিনঃ কোষাধ্যক্ষাংশ্চ নৈগমান্।
> মম মাতৃংস্তথা সর্ব্বাঃ কুমারান্তঃপুরাণি চ ॥
> কাঞ্চনীং মম পত্নীঞ্চ ক্ষায়াং জ্ঞাংশ্চ কর্ম্মণি।
> অগ্রতো ভব গচ্ছত্বগ্রে মহাযশাঃ ॥
>
> (বাল্মীকি,২০১৫, পৃ. ১৪৪২)

অর্থাৎ, মহাযশস্বী ভরত-বালক, বৃদ্ধ, অনুচর, কোষাধ্যক্ষ, মাতৃগণ, কুমারগণ, অন্তঃপুর-বাসিজনগণ, বণিকজন, বর্দ্ধকী এবং যজ্ঞকর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য আমার পত্নীর স্বর্ণময়ী প্রতিমা নিয়ে সাবধানে আগে গমন করুন।

এই যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়ে মহর্ষি বাল্মীকি লব-কুশকে সঙ্গে নিয়ে রামচন্দ্রের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখা যায় বাল্মীকির নির্দেশে লব-কুশ যজ্ঞস্থলে ও পথে-ঘাটে রামায়ণ গান করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাম তাদের গান শুনে এবং সীতার সাথে সাদৃশ্য দেখে বাৎসল্য স্নেহে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাদের দেখে রামচন্দ্রের হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় ভাবের উদ্রেক

হলো — "তদীয় কলেবরে নিজের ও জানকীর অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষ্মণ প্রত্যক্ষ করিয়া রাম একান্ত বিকলচিত্ত হইলেন।" (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪, পৃ. ৩৩০) সীতাকে নির্বাসন দেবার পর তাঁর কোনো সংবাদই রামচন্দ্র রাখেননি। তাই সীতা বেঁচে আছেন কি না, লব-কুশ তাঁর সন্তান কিনা রামচন্দ্র কিছুই বুঝতে পারলেন না। এভাবে আশা-নিরাশার দোলায় আন্দোলিত রাম মনে মনে স্থির করলেন সীতা নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন। নিজ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পুনরায় রাম সীতাকে গ্রহণ করবেন বলে সংকল্প করলেন। অষ্টম পরিচ্ছেদে দেখা যায় অযোধ্যাবাসী দীর্ঘদিন পর সীতা ও তার দুই পুত্রের পরিচয় পেলেন। কৌশল্যার নির্দেশে বাল্মীকির আশ্রম থেকে ক্ষীণ স্বাস্থ্য জীবন্মৃত সীতাকে সভামধ্যে আনা হলো। সীতার শুদ্ধতা সম্বন্ধে অনেকে আনন্দে জয়ধ্বনি করলেও কেউ কেউ পূর্বের মতোই সন্দেহ প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র প্রজাদের মনস্তুষ্টির জন্য সীতাকে পুনরায় সমস্ত লোকের সম্মুখে সতীত্ব প্রমাণের আদেশ দিলেন। লজ্জা ও অপমানে নিরপরাধ সীতা প্রাণত্যাগ করলেন। কিন্তু *রামায়ণে* সীতাকে পুনরায় অগ্নি পরীক্ষা দেওয়ার কথা বললে সীতা ঘোষণা করলেন:

> আমি রাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও কখন মনেও স্থান দিই নাই, এই সত্যবলে ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে বিবর দান করুন। আমি কায়মনোবাক্যে সতত কেবল রামেরই অর্চনা করিয়াছি; সেই সত্যবলেই ভগবতী বসুন্ধরা আমাকে তাঁহার গর্ভে স্থান দান করুন। (বাল্মীকি, ২০১৫, পৃ. ১৪৫০)

এই শপথ বাক্য উচ্চারণ করার সাথে সাথে ভূগর্ভ হতে সিংহাসন উত্থিত হলো এবং দেবী বসুন্ধরা বাহু প্রসারণে সীতাকে কোলে তুলে নিলেন। ঐ সময় স্বর্গ হতে অজস্রধারায় পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল এবং দেবগণ উচ্চস্বরে সাধুবাদ জানাতে লাগলেন। সীতা পাতালে প্রবেশ করলেন। এ দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করে সমস্ত জগৎ যেন কিছুক্ষণের জন্য মোহিত হয়ে রইল। মোটকথা, *সীতার বনবাস*-এর প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ *উত্তরচরিতের* প্রায় অবিকল অনুবাদ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকে বিদ্যাসাগর বাল্মীকিকে অনুসরণ করে প্রায়স্থলেই অবিকল অনুবাদ করেছেন আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে *রামায়ণের* অবাস্তব ও অতি-নাটকীয় ঘটনা বর্জন করেছেন। *রামায়ণের* রামচন্দ্র মহাবীর্যবান, তিনি শুধু প্রজার মনোরঞ্জনের কথাই চিন্তা করেছেন। সীতার জন্য ব্যাকুল হলেও নয়নে যখন অশ্রুবিন্দু দেখা দিত তখন তিনি নিজেকে সংযত করেছেন। কিন্তু ভবভূতির রামচন্দ্র আর বিদ্যাসাগরের রামচন্দ্র বেশি আবেগপ্রবণ ও কোমলচিত্ত। আবেগের কারণ ঘটলেই তিনি কেঁদে ফেলেন। অবশ্য বিদ্যাসাগর করুণ রস উদ্রেকের জন্যই *সীতার বনবাস* রচনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন করুণার সাগর। রামচন্দ্রের সীতা বির্সজনের দুঃখ তিনি ছাড়া আর কে এমনভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। তাই রামের বেদনা ও বিলাপ এবং বিরহিণী সীতার দুঃখে সে যুগের পাঠক-পাঠিকা সমাজে এই করুণরসের উচ্ছ্বাস চিত্তাকর্ষী হয়েছিল। সুতরাং *রামায়ণের* উত্তরকাণ্ডের সর্গগুলোতে যে সমস্ত কথাকাহিনি আছে, সেগুলোকে পরিত্যাগ করে বিদ্যাসাগর ভবভূতি প্রণীত *উত্তরচরিত* এবং উত্তরকাণ্ডের ঘটনাকে অবলম্বন করেই *সীতার বনবাস* গ্রন্থ রচনা করেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন সত্যিকারের বাঙালি, বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে মনে প্রাণে ধারণ করতেন, লালন করতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, পৌরাণিক প্রসঙ্গের প্রতি বাঙালিদের মানসিক প্রবণতা আছে এবং তারা সহজে পুরাণের বিষয় ও ভাবগত আবেদনে সাড়া দেন। তাই তিনি প্রাচীন কাব্য *রামায়ণ-মহাভারত*-পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে অনুবাদ করেছেন। তিনি যে আকণ্ঠ সংস্কৃত সাহিত্যের রস পান করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষা সুগম করার জন্য এবং বাঙালি শিক্ষার্থীদেরকে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখানোর জন্য *সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা* (১৮৫১) রচনা ও সংকলন করেন। সংস্কৃত কলেজের বিদ্যার্থীদের সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে গেলে প্রথমে *মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ*, ধাতুপাঠ, *অমরকোষ* ও *ভট্টিকাব্যের* কিছু অংশ পড়তে হতো। *মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ* অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও দুরূহ তাই ছাত্রদের আয়ত্ত করা খুবই কষ্টকর ছিল। তাই তারা না বুঝেই মুখস্থ করতেন। তাছাড়া *মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ*, ধাতুপাঠ, *অমরকোষ* ও *ভট্টিকাব্যের* কিছু অংশ পাঠ করে ব্যাকরণশাস্ত্রে পারদর্শী ও সংস্কৃত ভাষায় কাব্য-নাটকাদি গ্রন্থের অধ্যয়নে কিছুতেই অধিকারী হওয়া যায় না। তাই শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষগণ এই গ্রন্থগুলোর পরিবর্তে ভট্টোজিদীক্ষিত প্রণীত *সিদ্ধান্তকৌমুদী* অধ্যয়ন করার আদেশ দিলেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কলেজের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা নিতান্ত শিশু, তাদের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। তাছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণ অত্যন্ত দুরূহ ও নীরস বলে অনেকে অধ্যয়ন করতে সাহসও পান না। তাই বিদ্যাসাগর ছাত্রসমাজের সুবিধার কথা চিন্তা করে জটিল সংস্কৃত ব্যাকরণকে সরল বাংলা ভাষায় রচনা করে সকলকে চমকে দেন। তিনি এমনভাবে *সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা* রচনা করেন যাতে সাধারণ শিক্ষার্থীরাও অতি সহজে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের রস আহরণ করতে পারে। *সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা* প্রকাশিত হওয়ার পর শুধু সংস্কৃত কলেজের বিদ্যার্থীরাই নয় সাধারণ ছাত্রসমাজও সংস্কৃত শিক্ষার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে এই গ্রন্থটিকেই বেছে নিয়েছিল। এই গ্রন্থটিতে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলি সহজ-সরলভাষায় উপস্থাপন করেন। এই গ্রন্থটির বিজ্ঞাপনে তিনি বলেন :

> প্রথমেই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়াই একবারে রঘুবংশ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য পড়িতে আরম্ভ করা কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর বোধ না হওয়াতে 'শিক্ষা সমাজের' সম্মতিক্রমে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ছাত্রেরা প্রথম অতিসরল বাঙ্গালা ভাষায় সংকলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অতি সহজ সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিবেক; তৎপরে সংস্কৃত ভাষায় কিঞ্চিৎ বোধাধিকার জন্মিলে সিদ্ধান্তকৌমুদী ও রঘুবংশাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেক। তদ্ অনুসারে সরল বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ সংকলন ও দুই, তিনখানি সহজ সংস্কৃত পুস্তক প্রস্তুত করা অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে প্রথম পাঠার্থে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা নামে এই পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচারিত হইল। (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪, পৃ. ৪৮৩)

সংস্কৃত গ্রন্থগুলো দেবনাগরী অক্ষরে লিপিবদ্ধ তাই দেবনাগরী অক্ষর জানা শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত আবশ্যক বলে তিনি এই পুস্তকের শেষে অক্ষর পরিচয়ের বিধান লিপিবদ্ধ করেছেন যাতে সহজেই দেবনাগরী অক্ষর সম্পর্কে তারা জ্ঞানলাভ করতে পারে।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা করে বিদ্যাসাগর দুঃসাধ্য কর্মকে সহজ করে দিলেন। আধুনিককালে বাংলাদেশে ব্যাকরণ শিক্ষাকে সহজ করার এই মহৎ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃত ব্যাকরণ ভীতি দূর করার জন্য এই গ্রন্থটি যে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল,তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

বিদ্যাসাগরের প্রথম মৌলিক গ্রন্থ হলো *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৩)। গ্রন্থটির নাম দেখেই এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। তবে *সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* গ্রন্থটি বিদ্যাসাগর প্রদত্ত একটি বক্তৃতার বর্ধিত রূপ:

> বীঠন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব প্রতিষ্ঠা সন্দীপন মূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপি-নৈপুণ্য এবং সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, যে সকল মহাশয়েরা সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। (অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০০৫, পৃ. ১৪২)

বেথুন সোসাইটির কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থে খুব সংক্ষেপে পৌরাণিক অর্থাৎ, ক্লাসিক্যাল যুগের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, তা শ্রোতাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছিল। কারণ সংস্কৃত সাহিত্যের কালপর্যায় ও বিষয় বৈচিত্র্য নিয়ে পাশ্চাত্য সমাজে আলোচনা শুরু হলেও এদেশে বাংলা ভাষায় এ জাতীয় রচনা একেবারে নতুন ছিল। তাছাড়া বেথুন সোসাইটির সদস্যরা অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না। তাই বিদ্যাসাগর বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করানোর জন্যই এই গ্রন্থ রচনা করেন। এজন্য তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে এই ভাষার মাধুর্য ও চমৎকারিতা প্রদর্শন করে শ্রোতাদের চিত্ত আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। গ্রন্থটিতে তিনি সন-তারিখ ঘটিত বিবর্তনের দিকে না গিয়ে আলংকারিকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কৃত সাহিত্যকে বিষয়ভেদে শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। সংস্কৃত আলংকারিকেরা সংস্কৃত সাহিত্যকে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করেন— শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। বিশাল এই সংস্কৃত সাহিত্যকে তাঁরা এই উভয় বিভাগের মধ্যেই সমাবেশিত করেছেন। শ্রব্যকাব্য তিন প্রকার–পদ্য, গদ্য ও গদ্যপদ্যময় অর্থাৎ, চম্পূকাব্য। পদ্যকাব্য আবার তিন প্রকার— মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের এই বৈচিত্র্য প্রমাণের জন্য তিনি *শিশুপালবধ*, *কিরাতার্জুনীয়*, *ভট্টিকাব্য*, *রঘুবংশ*, *কুমারসম্ভব*, *মেঘদূত*, *কাদম্বরী* ও *নলোদয়* প্রভৃতি কাব্য থেকে সরল, ললিত ও মধুর বাক্রীতি উল্লেখ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ভারবি প্রণীত *কিরাতার্জুনীয়* মহাকাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখা যাক:

> দেবাকানি নিকা বাদে
> বাহি কাস্ব স্বকাহিবা।
> কাকারেভভরে কাকা
> নিস্বভব্যব্যভস্বনি ॥
> (গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য, ১৯৮১, পৃ. ২১৮)

উল্লিখিত শ্লোকটি বাম থেকে ডানে আবার ডান থেকে বামে একই ভাবে পাঠ করা যায়। সংস্কৃত রচনার এরূপ অসাধারণ কৌশল ও চাতুর্য দেখলে অবাক হতে হয়।

বিদ্যাসাগর এই গ্রন্থে *বৈদিক সাহিত্য*, *উপনিষদ*, *রামায়ণ*, *মহাভারত* সম্বন্ধে আলোচনা করেননি। তিনি প্রাক্-পৌরাণিক যুগকে আলোচনা থেকে বাদ দিয়ে শুধু পৌরাণিক বা ক্লাসিক যুগের সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। কালিক বিবর্তনের চেয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ শ্রেণিভেদ ধরে আলোচনাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্যকে এইভাবে বিভক্ত করে আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন— মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য, গদ্যকাব্য ও চম্পূকাব্য। আর দৃশ্যকাব্যকে ছয়ভাগে নাট্যকারদের নিয়ে এভাবে বিভক্ত করেন–কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, শূদ্রক, বিশাখদেব ও ভট্টনারায়ণ। উপাখ্যানের মধ্যে *পঞ্চতন্ত্র*, *হিতোপদেশ* ও *কথাসরিৎসাগর*-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা করতে পারতেন কিন্তু তা না করে সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব রত্নভাণ্ডার

সাধারণ জনগণের সামনে তুলে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। এছাড়া এই গ্রন্থে ক্লাসিক্যাল যুগের *পুরাণ, তন্ত্র, মনুসংহিতা, স্মৃতি-সংহিতা* ও *ষড়দর্শন* সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু বলেননি, শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন। এরপর তিনি এই গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ভাষার অনুশীলন যে কতটা প্রয়োজন সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সংস্কৃত ভাষা না জানলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্ধকারেই থেকে যেতেন। ইউরোপীয় শব্দবিদ্যার যে শ্রী ও বৃদ্ধি ঘটেছে তা কখনোই সম্ভব হতো না। অতএব বলা যায়, *বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস,* সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ছাড়া কখনোই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে না। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি এই গ্রন্থে পৌরাণিক অর্থাৎ, ক্লাসিক যুগের প্রধান প্রধান কবি-নাট্যকার ও তাঁদের প্রণীত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করে সংস্কৃত রসাস্বাদনে সহযোগিতা করেছেন। সুতরাং তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এতই মোহাবিষ্ট ছিলেন যে, বারবার তাঁর রচনাতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন অনুষঙ্গ উপস্থিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় লোকসাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থ হলো সোমদেব প্রণীত *কথাসরিৎসাগর*। আনুমানিক একাদশ শতকে সোমদেব ভট্ট এই সংস্কৃত কাব্যটি প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে *বেতালপঞ্চবিংশতি* নামে বেতালবিষয়ক পঁচিশটি উপাখ্যান রয়েছে। বেতাল ও বিক্রমাদিত্যের এই কৌতূহলোদ্দীপক এবং হৃদয়গ্রাহী কাহিনিগুলো ভারতের সর্বত্র প্রচারিত ছিল। গল্পগুলো মূলত জনপ্রিয় মৌখিক ধাঁধাঁ যা গল্পের আকারে মুখে মুখে সৃষ্টি হয়েছিল। প্রত্যেকটি গল্পের অভিনবত্ব, হাস্যরসের উপাদান, বুদ্ধির চাতুর্য প্রভৃতি মিলে প্রাচীন ভারতীয় লোকসাহিত্যে এক অপূর্ব গ্রন্থের রূপ নিয়েছিল। নানা ভাষায় এই গ্রন্থের রূপান্তর হয়েছে। বিদ্যাসাগর *বেতালপঞ্চবিংশতি* সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অনুবাদ না করে *বৈতালপচ্চীসী* শীর্ষক হিন্দুস্থানি গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করেছিলেন। হিন্দুস্থানি গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করলেও বিদ্যাসাগর মূল সংস্কৃত গ্রন্থকে যথাসম্ভব অনুসরণ করেছেন। গ্রন্থটি রচিত হবার পর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজও এটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেন। মোটকথা, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পল্লিগ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হতে শুরু করে সকলেই এই গ্রন্থের গল্পগুলো শুনতে ভালোবাসতেন এবং এর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশছোঁয়া।

উপরিলিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়াও তিনি *ঋজুপাঠ* (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ), *ব্যাকরণ কৌমুদী* (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ), *রামের রাজ্যাভিষেক* রচনা করেন। ইতঃপূর্বে তিনি *সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা* রচনা করে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। এবার তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে মূল্যবান দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে *ঋজুপাঠ*-এর তিনটি খণ্ড সংকলন করেন। প্রত্যেকটি খণ্ডই সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ। প্রত্যেক খণ্ডে তিনি সংস্কৃত কবি-সাহিত্যিক ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। *ঋজুপাঠের* প্রথম ভাগ দেবনাগরী অক্ষরে মুদ্রিত কিন্তু ভূমিকা অংশ বাংলায় রচিত। প্রথমভাগে তিনি *পঞ্চতন্ত্র* এবং *মহাভারতের* কিছু কাহিনি সংকলন করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে *রামায়ণের* অযোধ্যাকাণ্ডের কিছু অংশ সংকলন করেছেন। আর তৃতীয়ভাগে তিনি সংস্কৃত ক্লাসিক সাহিত্যের সংকলন করেছেন।

এরপর তিনি সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের সহজে যাতে ব্যাকরণ-জ্ঞান হয়, সেই উদ্দেশ্যে *পাণিনি, মুগ্ধবোধ, সিদ্ধান্ত- কৌমুদী, সংক্ষিপ্তসার* প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্কৃত ব্যাকরণগ্রন্থ বিশ্লেষণ করে চারখণ্ডে *ব্যাকরণ কৌমুদী* (১৮৫৩-১৮৬২) প্রণয়ন করেন। বহুকাল ধরে বাংলার স্কুল-কলেজের

শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষার একমাত্র গ্রন্থ হিসেবে *ব্যাকরণ কৌমুদী* প্রচলিত রয়েছে। এই গ্রন্থখানি বিদ্যাসাগর প্রণয়ন না করলে ভারতসহ বাংলাদেশে সহজভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রসার একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ত। বর্ণ বিভাগ, সন্ধি-প্রকরণ, সুবন্ত-প্রকরণ, তিঙন্ত প্রকরণ, ণিজন্ত ধাতু, পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ বিধান, কৃৎ-প্রকরণ, স্ত্রী-প্রত্যয়, উণাদি-প্রত্যয়, কারক, সমাস, প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষে অতিরিক্ত সূত্র, উদাহরণ সংযোজন, ধাতু-রূপের তালিকা, লিঙ্গানুশাসন, বর্ণনাক্রমিকভাবে ইংরেজি শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ প্রভৃতি বিষয়ও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই কারণেই *ব্যাকরণ কৌমুদী* সকলের কাছে এতো জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

এরপর তিনি রামচন্দ্রের প্রথম জীবন অর্থাৎ, বনগমনের পূর্ব পর্যন্ত কাহিনি নিয়ে *রামের রাজ্যাভিষেক* (১৮৬৯) রচনা শুরু করেন। বাল্মীকি *রামায়ণের* অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সর্গের সম্পূর্ণ এবং পঞ্চম সর্গের কিছু অংশ নিয়ে তিনি রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু অজ্ঞাত কারণে আর সমাপ্ত করতে পারেননি। কাহিনি শুরু হয়েছে স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে — "আমি দীর্ঘকাল অকণ্টকে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিলাম... সৌভাগ্যক্রমে, চরম বয়সে, সেই সর্বজনপ্রার্থনীয় অনির্বচনীয় সুখের অধিকারী হইয়াছি। পুত্র অনেকের জন্মে, কিন্তু কোনো ব্যক্তিই আমার সমান সৌভাগ্যশালী নহেন।" (বিদ্যাসাগর, ১৯৯৪, পৃ. ৪৩৫) রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার মানসে অমাত্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। নগরবাসী একথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও সীতা–সকলেই এ সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রীত হলেন। ঘরে ঘরে মঙ্গলাচার ও মহোৎসব আরম্ভ হলো। প্রত্যেক ভবনে পতাকা উড্ডীয়মান হতে লাগল। এই ঘটনা পর্যন্ত লিখে বিদ্যাসাগর ক্ষান্ত হলেন। এরপর তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন *রামের অধিবাস* নামে পিতার রচনা অংশটুকু মুদ্রিত করেছিলেন। সুতরাং এই স্বল্প রচনাতেও বিদ্যাসাগর *রামায়ণের* ঘটনা অনুসরণ করে *রামের রাজ্যাভিষেক* প্রণয়ন করেছিলেন। সুতরাং এক্ষেত্রেও তিনি প্রাচ্য ভাবাদর্শ থেকে বের হতে পারেননি।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে উদ্দীপিত হলেও তাঁর মনে দীর্ঘদিনের লালিত প্রাচ্য ভাবাদর্শও এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। এই কারণেই তিনি সাহিত্য রচনায় বারবার *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও ক্লাসিক সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ধর্মীয় তথা পৌরাণিক বিষয়ের প্রতি প্রত্যেকটি মানুষেরই আকর্ষণ থাকে। রাম, কৃষ্ণকথা, পৌরাণিক বিভিন্ন কাহিনি সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় লোকমানসকে নানাভাবে উজ্জীবিত করেছে। এই মানসিকতা পরবর্তীকালের সাহিত্যিকদের সাহিত্যেও বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। তাই তিনি বারবার ফিরে গেছেন প্রাচ্যের রসাস্বাদনে। তিনি যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন, এই গ্রন্থগুলো তাঁরই ফল। দেশি-বিদেশি শাস্ত্র ও সাহিত্য অধিগত করে সকলই অকৃপণভাবে দান করেছেন এই বাংলা সাহিত্যকে আর এদেশের মানুষকে। তবে রচনা-সৌকর্যে, গদ্যরীতিতে অভিনবত্ব দান করে সাহিত্যজগতে তিনি শ্রদ্ধার আসন অলংকৃত করে আছেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতচর্চার মাধ্যমে সংস্কৃত সাধারণ মানুষের জন্য যেমন সুগম হয়েছে, তেমনি এই সংস্কৃতচর্চার ফলে বিদ্যাসাগরের পক্ষে সুললিত সুসংহত বাংলা গদ্য (যা সংস্কৃত সাহিত্যাশ্রিত) রচনা করা সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৫)। *বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

আশুতোষ ভট্টাচার্য (২০০২)। *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস* (প্রথম খণ্ড)। পঞ্চম সংস্করণ, এ মুখার্জী অ্যান্ড কো. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য (১৯৮১)। সংস্কৃত *সাহিত্যসম্ভার (তৃতীয় খণ্ড)*। দ্বিতীয় প্রকাশ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা

নীলিমা ইব্রাহিম (১৩৭৯)। *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা* । প্রথম সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

বাল্মীকি (২০১৫)। পঞ্চানন তর্করত্ন (সম্পাদিত), *রামায়ণম্* । বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলকাতা

বিনয় ঘোষ (১৯৫৭)। *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ* (প্রথম খণ্ড)। প্রথম সংস্করণ,বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,কলিকাতা

বিহারীলাল সরকার (১৯২২)। *বিদ্যাসাগর*। চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা

বিদ্যাসাগর (১৯৯৪)। তীর্থপতি দত্ত (সম্পাদিত), *বিদ্যাসাগর রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড)। রাজ সংস্করণ, তুলি-কলম, কলকাতা

ভবভূতি (২০১১)। গৌরীনাথ শাস্ত্রী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *উত্তররামচরিত*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (ষষ্ঠ খণ্ড)* । নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগরচরিত, চারিত্র পূজা (২০০৪)। *রবীন্দ্ররচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড)। ঐতিহ্য, ঢাকারাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (সম্পাদিত)(১৩৩৯)। *কালিদাসের গ্রন্থাবলী* (তৃতীয় ভাগ)। বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা সাগরনন্দী (১৩৮৫)। সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *নাটকলক্ষণরত্নকোশ*। প্রথম প্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা

রোকেয়ার সাহিত্যকৃতি : বাঙালি নারীর মুক্তধারা

মনিরা বেগম*

সারসংক্ষেপ : উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরু ছিল বাঙালি সমাজের জন্য একটি মূল্যবান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সময়। এ সময় সমাজ সংস্কারের সাথে সাথে মানুষের বিশ্বাস ও মূল্যবোধের যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। এ সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে নারীদের, বিশেষ করে মুসলিম নারীদের বঞ্চিত অবরুদ্ধ-অবস্থার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম কলম হাতে তুলে নেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। এই সমাপ্তিহীন সংগ্রামে তিনি এত নিবিড়ভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফেলেন যে, তাঁর সাহিত্যিক পরিচয় সমাজসেবক পরিচয়ের নিচে চাপা পড়ে যায়। ব্যক্তিগত আগ্রহবশত তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং তাঁর শক্তিশালী লেখনী দ্বারা পুরো সমাজে বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তৎকালীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবরুদ্ধ দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেঙে প্রচণ্ড কর্মোদ্যোগ ও সাহিত্য সৃজনের দ্বারা তিনি নারী সমাজকে মুক্তির চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রোকেয়ার সাহিত্যে নারীবাদ ও নারীমুক্তির স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

এক

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশে নারীশিক্ষার প্রসারে ধর্মীয় বিধিনিষেধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিশেষ করে, ধর্মের স্পর্শকাতর বিভিন্ন অনুষঙ্গকে পুরুষতন্ত্র তার সুবিধামত ব্যবহার করে নারীশিক্ষাকে বিবিধ প্রতিবন্ধকতার শৃঙ্খলে বন্দি করে রাখে। এক্ষেত্রে, হিন্দু সমাজ এই চরম পশ্চাৎপদতা থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতে শুরু করলেও মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার প্রসার একপ্রকার রুদ্ধই ছিল। রাসসুন্দরী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, ভুবনমোহিনী দেবীসহ অনেক বিদুষী ব্যক্তিত্ব নারীশিক্ষার প্রসারে ভূমিকা পালন করেন। এক্ষেত্রে প্রাজ্ঞপুরুষ রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-সহ প্রমুখ মনীষীও আধুনিক শিক্ষায় হিন্দু নারীদের অংশগ্রহণে সহায়তা দান করেন এবং সামাজিক বিধি ও প্রথার বিরুদ্ধে যা নারীদের হীন অবস্থার জন্য দায়ী — সেগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নারীর মর্যাদা সমুন্নত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এ ধরনের প্রগতিশীল চেতনা, যা হিন্দু নারীদের অবস্থা উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখে, তা মুসলমান নারীসমাজে দুর্লক্ষ। সেই সময়ে বাঙালি মুসলমান পুরুষেরাই এত পশ্চাৎপদ ছিলেন যে, সেখানে নারীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এমন দুরবস্থার কালে বাঙালির জীবনে রোকেয়ার আগমন ঘটে। তিনি ছিলেন সমসাময়িকদের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল। পরিবেশগত শত প্রতিকূলতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। অবরুদ্ধ মুসলমান-সমাজের অন্তঃপুরের নারী হয়েও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও শক্তিশালী সাহিত্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন — যা এক অপার বিস্ময়। অনগ্রসর মুসলমান সমাজের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রোকেয়া সংগ্রামী সংগঠকের ভূমিকা একাকী পালন করেছেন। (কাজী, ২০১৬)

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে ৯ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার বহুবিবাহ এবং অবরোধ প্রথার প্রতি

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মাতার আকুণ্ঠ সমর্থনের কারণে শৈশব থেকেই তাঁদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল রোকেয়ার। বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের ও বড় বোন করিমুন্নেসার অপার স্নেহে তিনি পরিবারের অভিভাবকদের অলক্ষ্যে জ্ঞানচর্চা শুরু করেন। মূলত নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও অবরোধ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁর শৈশব ও কৈশোরের অভিজ্ঞতা-প্রসূত। ১৮৯৮ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিহারের সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সাথে রোকেয়ার বিয়ে হয় এবং তিনি রোকেয়ার মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে তাঁকে জ্ঞানচর্চা করতে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। (আবদুল মান্নান, ১৯৮৩)

তিনি ছিলেন শিক্ষিত উদারমনা ও প্রগতিশীল মতবাদের অনুসারী। রোকেয়া শৈশব থেকে উর্দু-ফারসির সাথে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার চর্চা করেন। বিয়ের পর সাখাওয়াত হোসেন তাঁকে ইংরেজি শেখার জন্য উৎসাহিত করেন এবং স্বামীর উৎসাহে জ্ঞানপিপাসু রোকেয়া নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করার সুযোগ পান। ১৯০১ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত সময়ে তাঁর মূল রচনাসমূহ বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ পায়। বড় বোন করিমুন্নেসা খানম সাহেবার প্রসঙ্গটি 'লুকানো রতন' প্রবন্ধে (সওগাত, ১৩৩৪) প্রচার করে তিনি দেখিয়েছেন প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে কীভাবে এক অবরোধবাসিনী সব বাধা কাটিয়ে স্বশিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেন, সন্তানদের মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা, স্বাধীনতার স্বপ্ন এবং কর্মের উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে রোকেয়া বলেন,'আমাকে সাহিত্যচর্চায় তিনিই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। ... তিনি উৎসাহ না দিলে এবং আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হইলে আমি কখনই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না' (রো. র., পৃ.১৮)। বস্তুত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগ্নি, পতি যাঁর কাছে সাহায্য অনুপ্রেরণা যেটুকু পেয়েছেন, সবটুকু রত্নজ্ঞানে শিরোধার্য করে আমাদের আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন তিনি (করুণাসিন্ধু, ২০১৬)। ১৯০৯ সালে স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামী প্রদত্ত দশ হাজার টাকা ও জ্ঞানচর্চা পুঁজি করে রোকেয়া তাঁর জীবনের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৯১১ সালে কলকাতায় তিনি সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। নির্মম পর্দাপ্রথা ও অবক্ষয়ী মূল্যবোধে আবদ্ধ রক্ষণশীল সমাজের মেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসতে তাঁকে প্রচুর গঞ্জনার শিকার হতে হয়েছিল। নারীর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য তিনি পাঠক্রমে বিজ্ঞানমনস্ক বিষয়বস্তু সংযোজন করেছিলেন। এছাড়া ১৯১৬ সালে দুঃস্থ নারীদের সহায়তা ও স্বনির্ভর হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতায় "আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতীন-ই-ইসলাম" (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মূলত সামাজিক অনাচার যা শুধু মুসলমান নয় হিন্দু সমাজেও বঞ্চনার যাঁতাকলে নারীদের কীভাবে আটকে রেখেছিল, তা উন্মোচন করতে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর রোকেয়া মাত্র ৫২ বছর বয়সে লোকান্তরিত হন। রোকেয়ার কর্মজীবন পর্যালোচনা করলে নারীমুক্তির লক্ষ্যে তিনি সচেতনভাবে তিনটি কৌশল প্রয়োগ করেছেন: সাহিত্যকর্ম, নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা। এসবের মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বঞ্চিত নারীকে মাথা উঁচু করে মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। (হুমায়ুন, ১৯৯২)

দুই

সাধারণত নারীবাদ (Feminism) বলতে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারকে বোঝায়। নারীবাদের বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যেমন কট্টরপন্থি (redical) নারীবাদ, সমাজতান্ত্রিক (socialist) নারীবাদ, সাংস্কৃতিক (cultural) নারীবাদ ও উদারপন্থি (liberal) নারীবাদ (Liss et

al, 2000)। নারীবাদের চরম রূপ হলো কট্টরপন্থি নারীবাদ। এখানে পুরুষদেরকে নারীদের আদর্শ হিসেবে দেখা হয় না, বরং পুরুষতন্ত্রকে বিলুপ্ত করার প্রচেষ্টা কাজ করে। কট্টরপন্থি নারীবাদে পিতৃতন্ত্রভিত্তিক পারিবারিক কাঠামো এবং নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যাখ্যান করা হয় (Firestone, 1970; Wills, 1984)। সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ মূলত পুরুষতন্ত্র ও পুঁজিবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সম্পদের অসম ভারসাম্যের কারণে নারীরা পুঁজিবাদে পুরুষ শাসকদের অধীন, তাই এ নারীবাদে অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে পুরুষবাদী পুঁজিবাদের অবসান কাম্য (Kenedy, 2008)। সাংস্কৃতিক নারীবাদে মূলত নারীর সহজাত বৈশিষ্ট্যকে পুনর্মূল্যায়ন করে। সাংস্কৃতিক নারীবাদে দেখানো হয় যে, পুরুষসুলভ (masculine) আচরণের পরিবর্তে নারীসুলভ (faminine) আচরণকে উৎসাহিত করলে মানব সমাজ ও সংস্কৃতি লাভবান হবে । এ নারীবাদে নারী-পুরুষের সহজাত পার্থক্যকে ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা হয় (Echols, 1983)। নারীবাদের একটি স্বতন্ত্র রূপ হলো উদারপন্থি (liberal) নারীবাদ। উদারপন্থি নারীবাদীরা প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করে যে, প্রকৃতিগতভাবেই নারীরা পুরুষের তুলনায় শারীরিক সক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে দুর্বল (Tong, 1992)। মূলত আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে স্বতন্ত্র নাগরিক ও ভোটাধিকার প্রাপ্তি উদারপন্থি নারীবাদের মূল লক্ষ্য ছিল। এ সম্পর্কে ম্যারি উলস্টোনক্রাফট (Wollstonecraft, 1792) তাঁর 'A Vindication of the Rights of Woman' গ্রন্থে বলিষ্ঠভাবে দার্শনিক রুশোর এই মতকে খণ্ডন করেন যে, নারীরা তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে না। তিনি যুক্তি সহকারে এই মত ব্যক্ত করেন যে, উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করলে নারীরাও পুরুষের ন্যায় যেকোনো কাজ করতে সক্ষম। উদারপন্থি নারীবাদে নারীকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তাকে নিজ পছন্দ মতো রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাপনের স্বীকৃতি দেয়। (Okin, 1989)

রোকেয়ার লেখার সর্বত্রই যুক্তি, সার্বজনীনতা সেকুলারিজম সর্বোপরি নারীবাদ এই মননশীলতার পরিচয় বহন করে। তাঁর নারীবাদী ব্যাখ্যায়ন (formulation) সুচিন্তিত এবং ধাপে ধাপে যুক্তিসহ উপস্থাপিত। নারী আন্দোলনের যে মূলধারা উদারপন্থি নারীবাদ সেই ধারণার সঙ্গে রোকেয়ার মিল এখানে যে, তিনি পুরুষের সমকক্ষতাকে নারীর উন্নতির সমার্থক হিসেবে দেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নারীদের অবনতির কারণ তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা নয়, বরং সুযোগের অভাব এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থা। উদারপন্থি নারীবাদের পরিচয় পাওয়া যায় রোকেয়ার 'স্ত্রীজাতির অবনতি', 'অর্ধাঙ্গী', 'অবরোধবাসিনী' প্রভৃতি রচনায়। প্রথমদিকের লেখা 'স্ত্রীজাতির অবনতি'-তে রোকেয়া নারীর অধঃস্তন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এর কারণ নির্ণয়ের সচেষ্ট হন। সেদিক থেকে 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধটিকে এদেশীয় নারীদের অবস্থা ও অধিকার বিষয়ে রোকেয়ার প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। প্রবন্ধটির প্রারম্ভেই রোকেয়া পাঠিকাদের কয়েকটি মর্মস্পর্শী প্রশ্ন করেন এবং তিনি নিজেই প্রশ্নগুলোর নীরস ও সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করেন:

> পাঠিকাগণ! আপনারা কি কোনদিন আপনাদের দুর্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতে আমরা কি? দাসী! পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? না। আমরা দাসী কেন? কারণ আছে। (রো. র., পৃ. ১১)

রোকেয়ার বুদ্ধিমত্তা, মননশীলতা ও প্রগতিশীল উদার চিন্তার প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি বৈষম্যকে প্রকৃতি, সহজাত স্বভাব বা শারীরিক সক্ষমতায় প্রোথিত না করে, তা ইতিহাসে প্রোথিত করেন।

এটি নারীবাদী চিন্তকের প্রথম ভিতস্তম্ভ। তিনি গৃহ, মুক্তিফল, ভ্রাতাভগ্নি, নারীসৃষ্টি প্রমুখ রচনায় নারীর অধস্তন অবস্থার উপসর্গ বর্ণনা করেন। তিনি এসব উপসর্গ নির্ণয় করে তা থেকে উত্তরণের সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশ করেন। উদারপন্থিদের মতো তিনি শিক্ষাকে নারী প্রগতির প্রধান চাবিকাঠি হিসেবে দেখেছেন। রোকেয়া কেবল শিক্ষাতেই নেমে থাকেননি, তিনি বুঝেছিলেন পুরুষের ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা নারীর অধস্তনতার একটি অন্যতম কারণ। এ প্রসঙ্গে রোকেয়া বলেন,

> আমাদের শয়নকক্ষে যেমন সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, মনোকক্ষেও জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতে পায় না। ...পুরুষ যত ইচ্ছা অধ্যয়ন করিতে পারেন — কিন্তু আমাদের নিমিত্ত জ্ঞানরূপ সুধাভাণ্ডারের দ্বার কখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হবে কি? (রো. র., পৃ.১৮)

রোকেয়ার লেখায় মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস দেখা যায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করা ছাড়া পুরুষের ন্যায় সমকক্ষতা অর্জন সম্ভব হবে না। তাই তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় বলেন,

> স্বাধীনতা অর্থে পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা বুঝিতে হইবে। ... পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়ঃ তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমার লেডীকেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীম্যাজিস্ট্রেট, লেডীব্যারিস্টার লেডী জজ — সবই হইব! উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই, কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্য্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না? (রো. র., পৃ.২১)

কন্যা, জায়া, জননী-এর বাইরে নারীর যে স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় রোকেয়ার 'Sultana's Dream' ও 'পদ্মরাগ'– রচনা দুটো থেকে। এর সুবাদে রোকেয়া দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সারির নারীবাদী চিন্তাবিদের স্থান দখল করে আছেন (সোনিয়া, ২০১৬)। রোকেয়ার 'Sultana's Dream' বা 'পদ্মরাগ' রচনা পড়লে প্রথমত মনে হতে পারে এখানে তাঁর পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। মুলত 'Sultana's Dream' নারী-পুরুষের ভূমিকা-বৈপরীত্য (gender role reversal)-এর সূত্রে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার চিত্র রয়েছে। অন্যদিকে 'পদ্মরাগে' দেখানো হয়, বিবাহ ছাড়াও একজন নারী স্বাধীনসত্তা হিসেবে কীভাবে সামাজিক জীবনযাপনে সক্ষম হতে পারে।

রোকেয়ার 'Sultana's Dream'এ নারীস্থান (lady land) হলো এমন একটি নারীবাদী ইউটোপিয়া (utopia)[১] যেখানে মানবতাবাদ ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি একত্র হয়ে নারীদের সাবলম্বীরূপে দেখা যায় । নারীস্থান হলো একটি আদর্শ নারীবাদী স্থান। মূলত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পুরুষের কথিত শ্রেষ্ঠত্বকে খর্ব করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন রোকেয়া। এভাবে 'Sultana's Dream'এ আমরা দেখি, কেবল সমাজ সংসারে নয়, নারীরা সুদক্ষভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্র ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতেও সক্ষম। রোকেয়া তাঁর 'পদ্মরাগ' এ দ্বিতীয় নারীবাদী ইউটোপিয়া রচনা করেন নারী আশ্রম তারিণীভবনের মাধ্যমে। তারিণীভবন হলো সমাজের সকল ধর্মের, বর্ণের, সম্প্রদায়ের নির্যাতিত নারীদের আশ্রয় কেন্দ্র যেখানে নারীরা জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এবং মানুষ হিসেবে স্বাধীন সত্তা হিসেবে সামাজিক জীবন অতিবাহিত করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে বর্ণিতা বাগচি (Bagchi, 2005) যথার্থই বলেন, 'Sultana's Dream'ও 'পদ্মরাগ' রচনায় যে দুটি নারীবাদী জগৎ নির্মাণ করা হয়েছে তাই

ইউটোপিয়াস। প্রায় ১২০ বছর পূর্বে একজন অবরোধবাসিনী নারীর পক্ষে এই ইউটোপিয়া কল্পনা করাও এক বিস্ময়কর বিষয় — একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রোকেয়ার সাহিত্য রচনাতে নারীর মুক্তিচিন্তার যে বিষয়টি প্রকাশ পায়, তা হলো নারীর আত্মোপলব্ধি, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য দরকার যথার্থ শিক্ষা। মূলত এসবই হচ্ছে উদারপন্থি নারীবাদের মূল উদ্দেশ্য। উদারপন্থি নারীবাদী হিসেবে রোকেয়ার সাহিত্য রচনায় লক্ষ ছিল নারীকে উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সচেতন স্বাধীন সত্তা হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস।

তিন

রোকেয়া মূলত সমাজ সংস্কারের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে নারীমুক্তির আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। ১৯০১-১৯৩০ সাল পর্যন্ত ছিল রোকেয়ার সাহিত্য সাধনার ব্যপ্তি। এছাড়া সেসময় শিক্ষিত সমাজে বহু বাঙালি মুসলমান নেতারা উর্দু ভাষায় চর্চা করতেন, সেখানে রোকেয়া উর্দু ও ফারসিকে নিজের মাতৃভাষা গণ্য করার প্রবণতাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন এবং শুধু শিক্ষা বিস্তারের নয়, নারীশিক্ষা বিস্তারেও মাতৃভাষা বাংলাকে প্রাধান্য দেয়া কর্তব্য বলে মনে করেন। চিন্তা-চেতনা ও মননশীলতায় তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি। রোকেয়ার প্রথম গ্রন্থ 'মতিচূর' প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। তবে এ গ্রন্থের প্রবন্ধাবলি ১৯০৩-০৪ সালের মধ্যে *নবপ্রভা*, *মহিলা* ও *নবনূরে* প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, Sultana's Dream প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মূলত তাঁর সাহিত্যকর্মের সংখ্যা বিপুল না হলেও তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর এ সমস্ত লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে বাঙালি মুসলমান সমাজের সংকীর্ণতা এবং অবরোধবাসিনী নারী জীবনের দুঃখ-বেদনার যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ। সাহিত্য সাধনায় রোকেয়ার উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। সূক্ষ্ম নান্দনিক বোধের চেয়ে প্রত্যক্ষ বক্তব্যের মাধ্যমে নারী সমাজের মুক্তিচেতনাই ছিল তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। রোকেয়া রচনাবলি বিষয় বৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। 'সৌরজগৎ', 'মুক্তিফল', 'নিরীহ বাঙালি', 'গৃহ' প্রভৃতি রচনায় স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকুলতা, পরাধীনতার প্রতি ধিক্কার, অপ-রাজনীতির প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

রোকেয়ার 'মতিচূর'-এর প্রথম খণ্ডে সাতটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'স্ত্রী জাতির অবনতি' ১৩১১ ভাদ্রে *নবনূরে* প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'আমাদের অবনতি'শিরোনামে। প্রবন্ধটিতে রোকেয়া নারী জাতির বর্তমান হীনাবস্থা, তাদের অধঃপতনের কারণ এবং নারী সমাজের উন্নতির পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে অন্যান্য প্রবন্ধ বা রচনায় রোকেয়া তাঁর এ মূল বক্তব্যই উপস্থাপিত করেছেন। 'মতিচূরে' মূলত নারীমুক্তিকামী রোকেয়ার চিন্তাধারণা অতি সুন্দর ও বলিষ্ঠ লেখনীতে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সময়ে পুরুষশাসিত মুসলিম সমাজের নারীদের প্রতি নির্মম ব্যবহার ও চরম বৈষম্যমূলক আচরণের তীব্র নিন্দা করতে তিনি দ্বিধা করেননি। নারীদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধেরও সমালোচনা করেন রোকেয়া। তিনি বিশ্বাস করতেন, নারীদের অবনতির কারণ প্রচলিত সমাজব্যবস্থা। অর্থাৎ পুরুষের নিরঙ্কুশ আধিপত্যেই নারী পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অলংকারকে রোকেয়া দাসত্বের চিহ্ন হিসেবে বর্ণনা করেন। রোকেয়া তাঁর অনবদ্য ভাষায় ধিক্কার জানান এভাবে—

> আর এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলংকারগুলি — এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ। এখন ইহা সৌন্দর্য বর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার

> দাসত্বের নিদর্শন (Originally badges of slavery) ছিল। তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ পায় লৌহনির্মিত বেড়ি পড়ে, আমরা (আদরের জিনিস বলিয়া) স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ি অর্থাৎ "মল" পরি। উহাদের হাতকড়ি লৌহনির্মিত, আমাদের হাতকড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য-নির্মিত চুড়ি। বলাবাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না। কুকুরের গলে যে গলাবদ্ধ (Dog collar) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্মিত হইয়াছে। (রো. র., পৃ. ১৩)

রোকেয়া শুধু নারী জাগরণের কথা একতরফা বলেননি, পুরুষদের সমকক্ষতা লাভের জন্য তিনি প্রকৃত অর্থে যোগ্যতা অর্জনের কথাও বলেন। মূলত যোগ্যতা অর্জন ছাড়া নারী বা পুরুষ কেউই প্রকৃত মানুষ হতে পারে না। তিনি বলেন—

> আমরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে — একই। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা — উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে — সর্বত্র আমরা যাহাতে তাহাদের পাশাপাশি চলতে পারি,আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক।...তাহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী, সহকর্মিনী, সহধর্মিনী ইত্যাদি হইয়া তাহাদের সহায়তা করি। আমরা অকর্ম্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, একথা নিশ্চিত। (রো. র., পৃ.২২)

'সুবেহ সাদেক' প্রবন্ধে রোকেয়া সুবেহ সাদেকের সময় মোয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনির সঙ্গে নারীর জেগে ওঠার একটি চমৎকার মেলবন্ধন দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

> ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন — অগ্রসর হউন! বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! জড়োয়া অলঙ্কার রূপে লাহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ! আর কার্য্যত দেখাও যে, আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ট অংশের অর্দ্ধেক। (রো. র., পৃ. ২৪২)

রোকেয়া নারীকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি এবং সমুন্নত করার জন্য শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি নারী জাগরণের ক্ষেত্রে দুটো বিষয়কে বারবার সামনে এনেছেন — একটি হলো নাগরিক অধিকার যা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত করে এবং অন্যটি হলো অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন, যা নারীকে পরিবার ও সমাজের কাছে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করায়। রোকেয়ার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মানব সমাজের সার্বিক কল্যাণ কেবল পুরুষদের দ্বারা সম্ভব নয়, পুরুষ ও নারীর যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা সম্ভব। রোকেয়া 'অর্ধাঙ্গী'তে নারীদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পক্ষে যুক্তি প্রদানের সাথে সাথে নারীদের প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম শিক্ষণের কথাও বলেন, যাতে নারী আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি একটি স্বাভাবিক নিয়মের উল্লেখ করেন, "তরুলতা যেমন বৃষ্টির সাহায্য-প্রার্থী, মেঘও সেইরূপ তরুর সাহায্য চায়। জল বৃদ্ধির নিমিত্ত নদী বর্ষার সাহায্য পায়, মেঘ আবার নদীর নিকট ঋণী। তবে তরঙ্গিনী কাদম্বিনীর 'স্বামী', না কাদম্বিনী তরঙ্গিনীর 'স্বামী'?" (রো. র., পৃ.৩১)। অর্থাৎ সংসার যাত্রায় নারী-পুরুষের উদ্দেশ্য অভিন্ন নয়। সংসারে পুরুষ ও নারী দুজনেই অর্থ উপার্জন ও রন্ধন থেকে শুরু করে সন্তান পালনসহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে। এজন্যই সমাজ নারীকে নরের 'অর্ধাঙ্গী' রূপে আখ্যায়িত করে, রোকেয়ার মতে, নারী যদি নরের 'অর্ধাঙ্গী' রূপে আখ্যায়িত হয়, তবে নরও নারীর 'অর্ধাঙ্গ' রূপে

আখ্যায়িত হওয়া উচিত (নমিতা, ২০১৭)। মূলত তৎকালীন নারী সমাজের অজ্ঞানতা ও নির্জীবতার বেদনা রোকেয়াকে ভাবিত করে তুলেছিল। লেখনীর মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়েছে নারীর তীব্রদাহ ও নিদারুণ মর্মবেদনা।

চার

বিশ শতকের প্রথম দশকে 'মতিচূর' ১ম খণ্ডের প্রবন্ধগুলো যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখন বাঙালি মুসলিম সুধীসমাজে প্রচণ্ড উত্তেজনা ও ক্রোধ সৃষ্টি হয়েছিল। রোকেয়ার লেখায় নারী সমাজের পক্ষ থেকে যে আকাঙ্ক্ষার কথা শোনা গিয়েছিল, তাতে পুরুষ সমাজে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি শোনা যায়। কেউ বাহবা দিয়েছিলেন, আর অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে লেখালেখি শুরু করেন। ক্রমশ এ উত্তেজনা প্রশামিত হয়ে দেখা দেয় দুই পরস্পর-বিরোধী প্রতিক্রিয়া। ১৩২২ সনের ভাদ্র সংখ্যার *নবনূরে* গ্রন্থ সমালোচনা বিভাগে মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও সৈয়দ এমদাদ আলী লেখেন:

> মতিচূরের প্রবন্ধগুলি যখন প্রথম নবনূরে প্রকাশিত হয়, তখন তাহা পাঠে আমাদের সহিষ্ণুতার বাধ টুটিয়া গিয়াছিল। ... এই উত্তেজনার ভাব কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে পর গ্রন্থখানি পুনরায় পাঠ করি এবং সেই সময় মতিচূর সম্বন্ধে হৃদয়ে এটকু অনুকূল ধারণা জন্মে। ... লেখিকার সকল কথা না হইলেও অনেক কথাই নিরেট সত্য এবং মতিচূর প্রকৃত মতিচূরই বটে। ... লেখিকা তাঁহার বক্তব্য ভালো করিয়াই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ে আলোচনা করেন নাই।
>
> ...সমাজ-সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজ-দেহে ক্ষত হইতে পারে, কিন্তু তদদ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয় না। মতিচূর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন, ইহাতে যে কোনো সুফল ফলিবে আমরা এমত আশা করিতে পারি না। (রো.র.পৃ. ৬১৬)

রোকেয়ার মতে, যেসব কারণে নারীরা যুগ যুগ ধরে পুরুষের দাসত্ব হতে মুক্ত হতে পারেনি, তার মধ্যে অন্যতম হলো ধর্মীয় অনুশাসন। ধর্মের দোহাই দিয়ে পুরুষেরা নারীদের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করেছে। এক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থগুলো সম্পর্কে রোকেয়ার স্পষ্ট লেখনী—

> আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই। তাহার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে যখনই কোন ভগ্নী মস্তক উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচনরূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। আমরা প্রথমতঃ যাহা সহজে মানি নাই, তাহা পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়া শিরোধার্য করিয়াছি (রো. র., পৃ. ১৫২)।

বস্তুত রোকেয়ার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বৈপ্লবিক। তিনি বিশ্বাস করতেন জাগতিক আইন-কানুন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধর্মের আওতামুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয় (সালাউদ্দিন, ২০১৬)। রোকেয়া ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, তবে তিনি ধর্মের নামে নারীকে অবমাননার বিষয়ে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ইসলামে কন্যা শিক্ষার কথা বলা আছে, কিন্তু মুসলমানরা এই আদি সত্য বিস্মৃত হয়ে নারীশিক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। 'গৃহ' প্রবন্ধে রোকেয়া মুসলিম নারীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অধিকারের বিষয়ে আলোচনা করেন এবং আরো দেখিয়েছেন যে, পুরুষ শাসিত সমাজে মুসলিম উত্তরাধিকার আইন ফাঁকি দিয়ে নারীকে কীভাবে তার প্রাপ্য সম্পত্তি

থেকে বঞ্চিত করা হয়। তাঁর লেখায় তিনি মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান আইনে নারীর প্রকৃত অবস্থান তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন প্রতিটি ধর্মের আইনের ব্যাখ্যায় সমাজে নারীদের কীভাবে বঞ্চিত করা হয়।

১৯২৪ সালে রোকেয়া রচিত একমাত্র উপন্যাস 'পদ্মরাগ' প্রকাশিত হয়। এ উপন্যাসে রোকেয়া নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি বা স্বাবলম্বের কথা তুলে ধরেন (মোরশেদ, ২০১৫)। এ উপন্যাসে তিনি মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান আইনে নারীর প্রকৃত অবস্থান বিশ্লেষণ করে তা থেকে উত্তরণের পথ নির্দেশ করার কঠিন সাধনার পরিচয় রেখেছেন। অনেকের মতে, পদ্মরাগের তারিণীভবনের পরিকল্পনা পাশ্চাত্যের দাতব্য চিকিৎসালয়, যা হিন্দুদের আশ্রম হতে ধার করা নয়; বরং এর পেছনে রয়েছে রোকেয়ারই জীবনের স্বপ্ন। এখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেছেন উপার্জনক্ষম নারীই যথার্থ স্বাধীন। মূলত অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া ছাড়া অবরুদ্ধ নারীর মুক্তি সম্ভব নয়। পদ্মরাগ এর নায়িকা সিদ্দিকা বলছে, "আমি আজীবন ... নারী জাতির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিব ... আমি সমাজকে দেখাইতে চাই একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারী জন্মের চরম লক্ষ্য নহে ও সংসার ধর্মই জীবনের সারমর্ম নহে" (রো. র., পৃ. ৬০৪)। মূলত সিদ্দিকার এই বিদ্রোহ সমাজ পরিবর্তনের জন্য, নারী মনে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করার জন্য। পদ্মরাগের ঘটনা তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতালব্ধ, সেখানে অকৃত্রিম নারীর মনোবেদনায় সাবলীল বর্ণনা পাওয়া যায়। মূলত রোকেয়া ছিলেন বিশ্বজনীন, উদার। মানসিকতার দিক থেকে তিনি বঙ্গীয় রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষ কাজী নজরুল ইসলামের তুল্য। ভারতবর্ষ যে, সকল জাতি ও ধর্মের মহামিলকেন্দ্র, সে বিষয়টি পদ্মরাগের কল্পিত আশ্রম তারিণীভবনের মধ্যেও প্রতিবিম্বিত। (Amin, 1989)

'Sultana's dream' রোকেয়া ১৯০৫ সালে মাত্র ২৫ বছর বয়সে রচনা করেন। তিনি ভাগলপুরে থাকাকালীন স্বামীর অনুপস্থিতিতে মাত্র দুই দিনে এ গল্পটি লেখেন। 'Sultana's dream' একটি ক্ষুদ্র ইংরেজি গ্রন্থ, যেটি পড়ে সাখাওয়াৎ হোসেন মন্তব্য করেছিলেন 'a terrible revenge' (ভয়ংকর প্রতিশোধ) (রো. র. পৃ. ২৫২)। গ্রন্থটি এশিয়া মহাদেশে ইংরেজি ভাষায় প্রথম কল্পবিজ্ঞান রচনা। এ রচনায় রোকেয়ার স্বপ্নের আদর্শ নারীর চিত্রটি প্রধানত ফুটে উঠেছে। মূলত ভারত উপমহাদেশে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি যে অন্যায় অবদমন করা হয় তার বিপরীতে রোকেয়া একটি 'নারীস্থান' নামে একটি কল্পিত রাষ্ট্রের চিত্র কল্পনা করেন। পরবতীকালে 'Sultana's dream' রোকেয়া স্বয়ং 'সুলতানার স্বপ্ন' শিরোনামে বাংলায় অনুবাদ করেন। রোকেয়ার মানস কন্যার একটি প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় নারীস্থানের প্রধান চালিকাশক্তি সেখানকার মহারানীর চরিত্র বর্ণনায়। এই মহারানী ছিলেন শিক্ষিত, সংস্কারমুক্ত, দেশপ্রেমিক ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। এ কল্পরাজ্যে নারী রাজ্যের প্রধান, এখানে পুরুষেরা যেসব কাজে দৈহিক শক্তি প্রয়োজন, সেসব কাজ করে আর মেধাসংক্রান্ত সকল কাজ নারীরা করেন। এখানে সৌরশক্তির মাধ্যমে, রান্নাবান্না, ও অন্যান্য নানাবিধ কাজ সম্পাদন করে। ওরা বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহার করে কৃষিকাজে। মেঘ যে জলীয় বাষ্পের সমাহার, তা-ও কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত হয়। ঔষধ প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য নারীস্থানে কোন মহামারীর প্রকোপে মানুষের অকাল মৃত্যু হয় না। উড়োজাহাজে বায়ুপথে সুলতানা ও ভগ্নি সারার ঘুরে বেড়ানোও সম্ভব হয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কারণে। তিনি পরিবেশ বান্ধব নগরায়ণের কথাও বলেছেন, উল্লেখ্য বায়ুপথে উড়োজাহাজে ভ্রমণ ও সৌরশক্তির উদ্ভাবন তখন পর্যন্ত বাস্তবে ঘটেনি। এ গ্রন্থ রচনার ২৫ বছর পর এ সম্পর্কে রোকেয়া বলেন, "যেসময় আমি 'সুলতানার স্বপ্ন' লিখিয়াছিলাম, তখন এরোপ্লেন বা জেপেলিনের

অস্তিত্ব ছিল না; এমনকি সে-সময় ভারতবর্ষে মোটরকারও আসে নাই। বৈদ্যুতিক আলোক এবং পাখাও কল্পনার অতীত ছিল। অন্ততঃ আমি তখন সেসব কিছুই দেখি নাই" (রো. র. পৃ. ২৫৩)। এ লেখা ১৯০৫ সালের, এ ধারণা তখন ভারতবর্ষে তো দূরে থাক, অন্য দেশেও আসেনি বলা যেতে পারে। রোকেয়ার কল্পনাশক্তি যে কতটা বিজ্ঞানমনস্ক ও মৌলিক ছিল, তা এর থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। এ গ্রন্থে নারীদের মেধা, প্রতিভা ও মননশীলতার প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ পায়। নর ও নারীর ভূমিকার রদ-বদলের বিষয়টিই সম্ভবত বেগম রোকেয়ার স্বামীর নিকট এ রচনা একটি ভয়ংকর প্রতিশোধ বলে মনে হয় ধারণা করা যায়।

রোকেয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'অবরোধ-বাসিনী' প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। অবরোধ-বাসিনী গ্রন্থের ভূমিকা অংশে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক আবদুল করিম একে 'ভারতবর্ষীয় অবরোধবাসিনীদের লাঞ্ছনার ইতিহাস' বলে অভিহিত করেন। গ্রন্থের নিবেদন অংশে রোকেয়া লিখেছেন, "কতকগুলি ঐতিহাসিক ও চাক্ষুষ সত্য ঘটনার হাসি-কান্না লইয়া 'অবরোধ-বাসিনী' রচিত হইল" (রো. র., পৃ. ৩৮১)। রোকেয়া এখানে ৪৭টি ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে অবরুদ্ধ নারীদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেন। এ ঘটনাসমূহ ভারতীয় নারীদের অমানবিক অবরোধ প্রথার সঙ্গে সম্পৃক্ত নিপীড়নের কাহিনি। উদাহরণস্বরূপ ১২ সংখ্যক ঘটনাটি উল্লেখ করা হলো:

> পশ্চিম দেশের এক হিন্দু বধূ তাহার শ্বাশুড়ী ও স্বামীর সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। স্নান শেষ করিয়া ফিরিবার সময় তাহার শাশুড়ী ও স্বামীকে ভীড়ের মধ্যে দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে এক ভদ্রলোকের পিছু পিছু চলিল। কতক্ষণ পরে পুলিশের হল্লা। — সেই ভদ্রলোককে ধরিয়া কনষ্টেবল বলে, "তুমি অমুকের বউ ভাগাইয়া লইয়া যাইতেছ।" তিনি অচম্বিতে ফিরিয়া দেখেন, আরে! এ কাহার বউ পিছন হইতে তাঁহার কাছার খুঁটি ধরিয়া আসিতেছে। প্রশ্ন করায় বধূ বলিল, সে সর্ব্বক্ষণ মাথায় ঘোমটা দিয়া থাকে — নিজের স্বামীকে সে কখনও ভাল করিয়া দেখে নাই। স্বামীর পরিধানে হল্‌দে পাড়ের ধুতি ছিল, তাহাই সে দেখিয়াছে। এই ভদ্রলোকের ধুতির পাড় হলদে দেখিয়া সে তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে! (রো. র., পৃ. ৩৯১)

মূলত রোকেয়ার নকশাধর্মী শ্রেষ্ঠ রচনা হলো অবরোধ-বাসিনী। অবরদ্ধ নারীদের করুন চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে রোকেয়া অসাধারণ মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দেন। রোকেয়ার সাহিত্যিক ক্ষমতা ও ব্যঙ্গনৈপূণ্যের চমৎকার প্রকাশ পায় এ গ্রন্থে। সংক্ষিপ্ত অথচ তীর্যক মন্তব্যে তিনি অবরোধ প্রথা বা সামাজিক সংস্কারকে কশাঘাত করেন। এখানে অবরোধজনিত কেবল সম্ভ্রান্ত বা জমিদার পরিবার নয়, বরং সাধারণ পরিবারের কাহিনিও বিবৃত হয়েছে। অমানবিক অবরোধ প্রথার পিষ্ট হয়ে নারী কিরূপে মনুষ্যত্ববোধ থেকেই বিচ্যুত হয়েছে — কাহিনিগূলো বর্ণনার মধ্য দিয়ে রোকেয়া সেই মর্মস্পর্শী দিকগুলোই তুলে ধরেছেন (মোরশেদ, ২০১১)। রোকেয়াার মতে, পর্দার অর্থ হচ্ছে সুরুচি ও শালীনতা। আমাদের দেশে তাঁর সমকালে প্রচলিত পর্দা ও অবরোধ প্রথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> পর্দা অর্থেও আমরা বুঝি গোপন হওয়া, বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি– কেবল অন্তঃপুরের চারি-প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভালোমতে শরীর আবৃত না করাকে 'বেপর্দা' বলি। যাহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্ধ-নগ্ন অবস্থা থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাহারা ভালোমত পোষাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হয়, তাঁহাদের পর্দা বেশি রক্ষা পায়।
>
> বর্তমান যুগে ইউরোপীয় ভগ্নীগণ সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছেন; তাঁহাদের পর্দা নাই কে বলে? তাঁহাদের শয়নকক্ষে এমন কি বসিবার ঘরেও কেহ বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিতে পারেনা। (রো. র. পৃ. ৫৭)

রোকেয়ার উদ্দেশ্য নিছক সমাজচিত্র বা সাহিত্যিক রূপায়ণ নয়, বরং সমাজে নারীদের অবরোধ প্রথার অবসান। রোকেয়া উপলব্ধি করেছিলেন একমাত্র শিক্ষাই নারীকে অবরোধ থেকে মুক্তি দিতে পারে। শিক্ষা সম্পর্কে রোকেয়ার স্পষ্ট চিন্তা প্রকাশ পায় —

> যাহা হউক 'শিক্ষার' অর্থ কোনো সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের "অন্ধ অনুকরণ" নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাগিদকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন বা (observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তা-শক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি — তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল "পাশ করা বিদ্যা" কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না। (রো. র., পৃ.১৯)

মূলত শিক্ষার সাথে রোকেয়া জীবনবোধকে গভীরভাবে সম্পৃক্ত করেন। শিক্ষার মাধ্যমে কেবল লিখতে বা পড়তে পারা নয়, বরং মানবজীবনকে জানা, জীবনের অধিকার ও কর্তব্যবোধকে যুক্ত করে মূল্যায়িত করেছেন। মূলত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের আত্মবিকাশের সুযোগের কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে এবং সমাজে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে।

পাঁচ

লেখক হিসেবে রোকেয়ার প্রধান গুন হলো মৌলিকতা। এ মৌলিকতার সাথে যুক্ত হয়েছে তার অসাধারণ কল্পনাশক্তি ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ। এ বিষয়ে 'নারীসৃষ্টি', 'অর্ধাঙ্গী' ও 'জ্ঞানফল' — রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। রোকেয়ার 'নারীসৃষ্টি' একটি হিন্দু পৌরাণিকের বাংলা অনুবাদ। এখানে নারী ও পুরুষ সৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনাতে দেখান যে বিশ্বস্রষ্টাকে নারী সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। থেকে স্পষ্ট অনুমেয়, রোকেয়া কাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। 'অর্ধাঙ্গী'তে তিনি রাম ও সীতার সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, সীতার প্রতি রামের ভালোবাসা হচ্ছে কোনো বালকের তার পুতুলের প্রতি ভালোবাসা তুল্য। পুতুল হারালে বা চুরি হলে চোরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বালকটি অস্থির হবে। অর্থাৎ যত প্রিয় হোক না কেন পুতুল তো পুতুলই। সীতা রামের নিকট পুতুল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। জ্ঞানফলের বক্তব্য আরো সাহসীপূর্ণ। নিষিদ্ধ ফল খাবার অপরাধে যে নারীকে এতদিন অভিযুক্ত করা হত, রোকেয়া তার ব্যাখ্যা করেন এভাবে যে, নারীরা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে তার অভিজ্ঞতাকে সুসমৃদ্ধ করার নিমিত্তে জ্ঞানফল খাওয়ায় পর জ্ঞানোদয় হয়। পত্নীর উচ্ছিষ্ট জ্ঞানফল খেয়ে আদমেরও জ্ঞানের উদয় হয় এবং ক্রমে আদম হাওয়ার মনে স্বাধীন হওয়ার চেতনা জাগ্রত হয়। 'জ্ঞানফল' রচনার মর্ম সমাজে নারীশিক্ষায় প্রয়োজনীয়তা। এখানে নারীর আহৃত সেই জ্ঞানফল থেকে নারীকে পরবর্তীকালে বঞ্চিত রাখাই হলো সমাজে সকল দুর্দশার কারণ। (মোরশেদ, ২০১৫)

মূলত সময়োপযোগী বিষয় নির্বাচনে এবং তার সাবলীল উপস্থাপনে তিনি গভীর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি, সুগৃহিণী, শিশুপালন, বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রভৃতি উল্লেখ্যযোগ্য। তিনি শিশুর অকাল মৃত্যু, প্রসূতির মৃত্যু, স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতির জন্য বাল্যবিবাহকে

দায়ী করেন। তিনি পারিবারিক সুখ, গৃহকর্মে নৈপুন্য সবোপরি আর্থিক সচ্ছলতার জন্যের সমাজে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করেন। রোকেয়া তাঁর সমকালীন ইতিহাসের বহু উপাদান তাঁর রচনায় উৎকর্ষতার সাথে সংযুক্ত করেছেন। 'চাষার দুক্ষু', 'এন্ডিশিল্প' প্রভৃতি রচনায় তিনি এদেশের কৃষক ও দেশীয় কুটির শিল্পের বিপর্যয়ের মর্মস্পর্শী চিত্র তুলে ধরেন। চাষার দুক্ষু- তে তিনি পল্লিগ্রামের কৃষক সমাজের দুঃখ মোচনের জন্য দেশবন্ধু নেতুবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রংপুরের বিলুপ্তপ্রায় এন্ডি শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য তার রচিত 'এন্ডিশিল্প' প্রবন্ধের উল্লেখ করা চলে, রোকেয়ার সুচিন্তিত মত দেন যে, দেশীয় শিল্পসমূহ বাঁচাতে নারী শিল্পসমূহের পুনরুদ্ধার করতে হবে। তাঁর মতে, আসাম এবং রংপুরবাসী নারীগণ এন্ডি পোকা ঠিকভাবে প্রতিপালন করে দেশের বস্ত্রশিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সাথে সাথে অর্থনৈতিক সাবলম্বিতাও অর্জনে সক্ষম হবে। রোকেয়ার মতে, কৃষকেরা সমাজের মেরুদণ্ড। তিনি অর্থনীতির মূল জায়গাটি ঠিকভাবে চিহ্নিত করেন। তিনি শক্ত ভাষায় বলেন, কৃষি যদি জাতির অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয়, তবে শ্রমজীবী কৃষকদের খাদ্যের সমতা দিতে হবে। সমতা দিতে হবে চাষীর পুরো পরিবারকে। কারণ একজন গৃহিণীকে ধান থেকে চাল বানানো পর্যন্ত প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, যার ফলে চাল উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য সেসময় আধুনিক প্রযুক্তি না থাকায় চাল তৈরির পুরো প্রক্রিয়া গ্রাম্য নারীদের হাড়ভাঙা শ্রমের মাধ্যমে করতে হতো এবং এখনো অনেক গ্রামে নারীরাই ধান থেকে শুরু করে চাল তৈরির সব প্রক্রিয়া নিজেরাই করে থাকে। নারীর এ পরিশ্রমের ন্যায্য অধিকার বা পারিশ্রমিকের বিষয়টি রোকেয়া গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

তাঁর রচনাশৈলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কথোপকথনের ভঙ্গি। যেমন, তিনি ভূমিকা ও উপসংহারে — পাঠিকাগণ, মনে করুন, পরিশেষে বলি প্রভৃতি শব্দাবলির মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে আরো জীবন্ত ও পাঠকদের সচকিত করেছেন। অজস্র প্রবাদ প্রবচন ও ভাষণের প্রয়োগও বেগম রোকেয়ার রচনাবলির একটি বিশেষ গুণ। গভীর অর্থদ্যোতনাসমৃদ্ধ প্রচুর বাক্যাবলির পর্যাপ্ত উদাহরণ তাঁর রচনাবলি থেকে পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক কিছু উদাহরণ দেওয়া যায় (রো. র., ২০০৬),

১. বীরাঙ্গনাই বীর জননী হয়।

২. রমনী রাঁধুনীরূপে জন্মগ্রহণ করে, এবং মরণে বাবুর্চি-জীবন লীলা সাঙ্গ করে।

৩. সুশিক্ষা হচ্ছে স্পর্শমণি, যাকে স্পর্শ সেই সুবর্ণ হয়।

রোকেয়ার সাহিত্য রচনার বাহন সাধুরীতিতে হলেও তা সহজ-সরল ও অবাধ গতিসম্পন্ন বলা যায়। প্রগতিশীল রোকেয়ার কথ্যরীতিতেও কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা পাওয়া যায়। উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্যকর্মের সীমাবদ্ধতা আর সৃষ্টিধর্মী রচনার অবাধ মুক্তির ব্যবধান মেনে নিলে, রোকেয়ার সাহিত্যকর্মকে তার সমকালীন সমাজ ও মানুষের কাহিনি বলে গ্রহণ করা যায় (শামসুল, ২০১৬)। রোকেয়ার সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান যথার্থ মন্তব্য করেন (১৯৬৪, পৃ. ৪১৯)

> বেগম রোকেয়ার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তাঁর ভাষার সারল্যে, ভঙ্গীর তীক্ষ্নতায় এবং সূক্ষ্ম ব্যঙ্গে। মুসলমান লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ — যেমন মীর মশাররফ হোসেন — সমাজ সমালোচনার উপায় স্বরূপ ব্যঙ্গ রচনার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু স্থূলতা ও অতিরঞ্জন থেকে তাঁরা মুক্ত হতে পারেননি এবং কোথাও কোথাও বিদ্বেষের ছাপ লেগেছে। বেগম রোকেয়াই বিদ্রূপের শাণিত কশা নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নামলেন এবং আঘাত করলেন ব্যক্তিকে নয়, সমাজের মনোবৃত্তিকে।

রোকেয়া ছিলেন সাহিত্যিক। সাহিত্যিক ছিলেন বলেই তিনি সমাজসেবক, লেখার ভিতর দিয়ে তিনি সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা করেন। পেছানো সমাজের পশ্চাদপদতা তাকে চারদিক থেকে শুধু পেছনে টেনেছে। তিনি হার না মানার কারণ হলো তিনি শিল্পী। পাখি গান করে নিজের সুখে অভ্যাসে, শিল্পী সৃষ্টি করে ভেতরের অনুপ্রেরণায় এবং অন্যের জীবনে প্রবেশের আগ্রহে; রোকেয়া তাই করেছেন (সিরাজুল, ২০১৬)। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ই. এম. ফরস্টার (Forster, 1969) রোকেয়ার সমসাময়িক ঔপন্যাসিক ভার্জিনিয়া উলফের (১৮৮০-১৯৪১) সাহিত্যকর্ম নিয়ে বলেছিলেন যে, ভার্জিনিয়ার লেখার সর্বত্রই নারীমুক্তির বিষয়টি পাওয়া যায়, আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, রোকেয়ার লেখার প্রতিটি ছত্রে নারীমুক্তির চেতনার পরিচয় ফুটে ওঠেছে। নারী-পুরুষের সমকক্ষতার ভিত্তিতে বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের উদেশ্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক রূপান্তরের লক্ষ্যে উদারপন্থি নারীবাদী রোকেয়া আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর সাহিত্য রচনার মূলে রয়েছে নারী সমাজকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়। রোকেয়ার তৎকালীন সমাজের নারীজাতির অর্ধপতিত অবস্থা যেমন যথার্থভাবে তুলে ধরেছেন, তেমনি এ অবস্থা হতে উত্তরণের পরিষ্কার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

টীকা

১। ইউটোপিয়া (Utopia) বলতে কাল্পনিক কোনো সম্প্রদায়, সমাজ বা স্থানকে বোঝায়। যেখানে কোনো ধরনের দুঃখ বা কষ্ট থাকে না বলে দাবি করা হয়। ১৫১৬ সালে স্যার টমাস মুরের 'Utopia' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে তিনি আমেরিকার উপকূলে একটি কাল্পনিক দ্বীপকে আদর্শ সমাজ বা স্থান নির্দেশ করে 'Utopia' পরিভাষাটি ব্যবহার করেন (Moore, 1516/1967)।

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৮৩)। *বেগম রোকেয়া*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আবদুল কাদির (সম্পাদিত) (২০০৬)। *রোকেয়া-রচনাবলী*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা (প্রবন্ধে রো. র.)

আনিসুজ্জামান (১৯৬৪)। *মুসলিম মানস ও বাঙলা সাহিত্য*। লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা

এ.এফ. সালাউদ্দিন আহমেদ (২০১৬)। বাংলাদেশে নারীমুক্তি আন্দোলন। *রোকেয়া স্মারক বক্তৃতামালা*, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪৬-৬১

করুণাসিন্ধু দাস (২০১৬)। রোকেয়া লোকমাতাঃ জীবনশিল্পের কর্মশালায়। *রোকেয়া স্মারক বক্তৃতামালা*, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৭০-৮১

কাজী মদিনা (২০১৬)। ভেঙেছে দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময় তোমারি হউক জয়। *রোকেয়া স্মারক বক্তৃতামালা*, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩০৫-৩১৫

নাজমা চৌধুরী (২০১৬)। বেগম রোকেয়ার চিন্তা-চেতনা ও বাংলাদেশের নারী আন্দোলন। *রোকেয়া স্মারক বক্তৃতামালা*, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৪-৯৫

নমিতা মণ্ডল (২০১৭)। নারীবাদী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও তাঁর 'অর্ধাঙ্গী'। *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, সপ্তম সংখ্যা, জুন:২০১৭ আষাঢ়: ১৪২৪, অধ্যাপক দিলীপকুমার ভট্টাচার্য গবেষণাকেন্দ্র, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মোরশেদ শফিউল হাসান (২০১১) *বেগম রোকেয়াঃ সময় ও সাহিত্য।* বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মোরশেদ শফিউল হাসান (২০১৫) *রোকেয়া পাঠ ও মূল্যায়ন।* বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, কলকাতা

মুহম্মদ শামসুল আলম (১৯৮৯)। *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্য।* বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুহম্মদ শামসুল আলম (২০১৬)। রোকেয়ার সাহিত্য সাধনা : পটভূমি ও মূল্যায়ন। *রোকেয়া স্মারক বক্তৃতামালা*, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩০-৪৩

শাহানারা হোসেন (২০১৬)। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: তার চিন্তা-চেতনা ধারা। *রোকেয়া স্মারক বক্তৃতামালা*, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ০৯-২৯

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০১৬)। করতালি পাওয়া না পাওয়া। *রোকেয়া স্মারক বক্তৃতামালা*, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫২-৬৭

সোনিয়া নিশাত আমিন (২০১৬)। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: একবিংশ শতকে তার উত্তরাধিকার। *রোকেয়া স্মারক বক্তৃতামালা*, রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৮২-৯৪

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (২০১৬)। বেগম রোকেয়া : নারীশিক্ষা ইতিহাসের প্রেক্ষিতে। *রোকেয়া স্মারক বক্তৃতামালা*. রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৪-৫১

Amin, S. N. (1989). Rokeya Sakhawat Hossain and the Legacy of the Bengal Renaissance. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Dec.34, no 2.pp 185-92

Amin, S. N. (1998). Rokeya’s Padmarag: Utopian Altanative to the Patriarchal Family.*The Dhaka University Studies*, 55(1): 35-44

Bagchi, B. (2005). *Sultana's dream: And Padmarag: two feminist utopias*. New Delhi: Penguin

Echols, A. (1983). "Cultural Feminism: Feminist Capitalism and the Anti-Pornography Movement". *Social Text*, (7): 34-53.

Firestone, S. (1970). *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*. New York: William Morrow and Company.

Forster, E. M. (1969). *Virginia Woolf: The Rede Lecture.* Cambridge University Press: Cambridge

Kennedy, E. L. (2008). Socialist Feminism: What Difference Did it Make to the History of Women's Studies? *Feminist Studies*. 34(3): 497-525

Liss, M., Hoffner, C., & Crawford, M. (2000). What do feminists believe? *Psychology of Women Quarterly*, 24, 279-284

More, T. (1516/1967). *Utopia*. trans. John P. Dolan, in James J. Greene and John P. Dolan, edd., *The Essential Thomas More,* New York: New American Library

Okin, S. M. (1989). *Justice, Gender and the Family*. Basic Books: New York

Tong, R. (1992). Liberal feminism. *Feminist thought: a comprehensive introduction*. London: Routledge

Willis, E. (1984). Radical Feminism and Feminist Radicalism. *Social Text.* The 60's without Apology (9/10): 91-118. doi:10.2307/466537. JSTOR 466537

Wollstonecraft, M. (1998/1792). *A Vindication of the Rights of Woman*. New York: Norton

সোনালি কাবিন : প্রসঙ্গ নারী

সোহানা মাহবুব*

সারসংক্ষেপ : কবি আল মাহমুদ তাঁর *সোনালি কাবিন* কাব্যে বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও লোকজীবন-আহৃত নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছেন এমন এক নারীকাঠামো, যাঁর সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাজার বছরের বাংলার শাশ্বত সৌন্দর্য এবং ঋদ্ধ অতীত। বাংলার মাতৃতান্ত্রিক ঘরানার এক সমৃদ্ধ চিত্র উঠে এসেছে তাঁর সৃষ্ট নারীদের ব্যক্তিত্ব ও চেতনার আদলে। কবি তাঁর নারীদের কালে কালে বিপন্নপ্রাণ বাঙালির ত্রাতারূপে আঁকতে চেয়েছেন। কবির এই নারী দেহিনী, মোহিনী এবং কখনও কখনও প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তবে, তাঁদের প্রবল শক্তিমত্তা, জীবনবাদিতা ও সৌন্দর্যশক্তি সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণতার নেতি থেকে তাদের মুক্তি দিয়েছে। কখনও কখনও এই নারীরা কবির কাব্যে হয়ে উঠেছে দেশমাতৃকার প্রতীক। কোনো কোনো কবিতায় *সোনালি কাবিন* কাব্যের নারী কবির ব্যক্তিজীবনলগ্ন নস্টালজিয়া থেকে উত্থিত। এছাড়াও, প্রবন্ধে আল মাহমুদের নারীভাবনার সঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশ ও জসীমউদ্‌দীনের নারীভাবনার সাযুজ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলোকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। পঞ্চাশের দশকের অন্যান্য কবিদের নারীভাবনার সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই এই কবির নারীকাঠামোর ভিন্নতা ও অভিনবত্ব উপলব্ধি করা যাবে। বেহুলা-সতী-খনার মতো বাঙালির আদি ও অকৃত্রিম অভিজ্ঞতাসংবলিত নারীদের প্রচ্ছায়ায় এভাবেই *সোনালি কাবিন* কাব্যের নারীকাঠামো হয়ে উঠেছে অভিনব এবং অনন্য।

মধ্য পঞ্চাশের শক্তিমান কবি আল মাহমুদ (১৯৩৬-২০১৯) তাঁর *সোনালি কাবিন* কাব্যে প্রবলভাবে লোকজীবনলগ্ন। আবহমান ঐতিহ্যিক বাংলার ইতিহাস, ঋদ্ধ অতীত, নারী-প্রেম-যৌনতা ও দ্রোহ রূপায়ণেও এ কাব্যে সেই লোকজীবনলগ্নতার তীব্র সৌগন্ধ্য উপলব্ধি করা যাবে। তিনি এ কাব্যে নারীকে এঁকেছেন একান্তই মৃত্তিকালগ্ন-শ্যামাঙ্গী এক অনার্য নারীর প্রতিরূপকে। তাঁর এ কাব্যে নগরসভ্যতা-চর্চিত কোনো নারীর রূপকল্প নির্মিত হতে দেখা যায় না। বরং, *সোনালি কাবিন* কাব্যের কবিতাগুলোতে নানা সত্তায় বিরাজিত নারীদের রূপ-সৌন্দর্য-জীবনসংগ্রাম-কর্মক্ষমতা-মমত্ববোধ থেকে প্রবলভাবে অনুভব করা যাবে যে, এঁরা প্রায় সকলেই নদীবিধৌত বাংলার অন্তরঙ্গ জীবন থেকে উঠে এসেছেন।

আল মাহমুদের কাব্যে নারী এক অন্যতম প্রধান বিষয়। এ প্রসঙ্গে কবি আলোকপাত করতে গিয়ে এক প্রবন্ধে (আল-মাহমুদ, ১৯৯৪) লিখেছেন :

> আমার কবিতার প্রধান বিষয় হল নারী। আমি একসময় ভাবতাম একজন কবি পুরুষের কাছে নারীর চেয়ে সুন্দর আর কী আছে?...পৃথিবীতে যত জাতির কবিতায় যত উপমা আছে আমি আমার সাধ্যমতো পরীক্ষা করে দেখেছি সবই নারীর সাথে তুলনা করেই। দয়িতার দেহের উপমা দিতে কবিরা পৃথিবী নামক এই গ্রহটাকে চষে ফেলেছেন। এমন নদী, পর্বত বা প্রান্তর নেই যার সাথে কবিরা তাদের প্রেমিকার স্তন, উরু, অলকদাম বা নিতম্বের তুলনা দেননি। এভাবেই মানুষ তার প্রিয় মানবীর রহস্য ও রূপের সাথে প্রকৃতির রহস্য ও সৌন্দর্যের সম্মিলন ঘটিয়েছেন... (পৃ. ৫)

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কবির এই বক্তব্য থেকে উপলব্ধি করা যাবে, নারীভাবনা তাঁর কবিতার এক প্রধানতম বিচরণক্ষেত্র। এই ক্ষেত্র নির্মাণে তিনি গভীরভাবে লোকজীবনাগত ভাবনাকল্পের ধারক। সমালোচক লিখেছেন, 'জীবনানন্দ দাশকে বাদ দিলে বাংলা কাব্যে নিম্নবঙ্গের দৈশিক চেতনার উপস্থিতি খুব ঝাপসা আর অস্পষ্ট। সেই ঝাপসা আর অস্পষ্ট আভাস উজ্জ্বলতা পেতে শুরু করল যখন একে-একে প্রকাশিত হতে লাগল লোক লোকান্তর, কালের কলস ও সোনালি কাবিন'। (মহীবুল, ২০১৯, পৃ. ৬) কাজেই, আল মাহমুদ প্রকল্পিত নারীকাঠামোতে যে এই দৈশিক চেতনার বীজ সচেতনভাবেই উপ্ত হবে, সেটি সহজেই অনুমেয়। 'আল মাহমুদ যখনই কবিতা লিখতে বসেন, তখনই তাঁর মধ্যে নিঃশব্দে বিকশিত ও মঞ্জুরিত হয় তাঁর নিহিত নারীসত্তা। বিনতি, সমর্পণ পেলবতা, নম্রতা, চারুতা–এসবেই তৈরি হয়েছে তাঁর শাশ্বত মৌচাক: তাঁর গোপনতম, নিঃশব্দতম, মধুরতম নারীসত্তা'র আদল। (আবদুল মান্নান, ১৯৯৪, পৃ. ৭১)

সোনালি কাবিন কাব্যের নারীভাবনা বিশ্লেষণের আগে কবির প্রথম দুই কাব্যগ্রন্থে কল্পিত নারী কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। ১৯৬৩ সনে প্রকাশিত আল মাহমুদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *লোক লোকান্তর* এ প্রকৃতির স্বাধীন রূপ অঙ্কনের পাশাপাশি তিনি দ্বিধাহীনভাবে নারীর দৈহিক রূপ এঁকেছেন। নারীকে তিনি নগ্নতার দেবীরূপে কল্পনা করেছেন ভেনাসের মতো। কেননা, তাঁর মতে নারীদেহেই আছে সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব নির্মাণ শিল্পের প্রকাশ। সেই শিল্পকে অনুভব করতে গিয়ে তিনি নারীর ইন্দ্রিয়ঘন বর্ণনা দিয়েছেন :

ভেবেছি তো অন্ধকারে আমি হবো রাতের পুরুত
আদিম মন্দিরে একা তুমি এসো নগ্নতার দেবী, ...
শুরু হোক স্তোত্রপাঠ গন্ধবতী তোমার সুনামে,
পীতাভ ধোঁয়ার তলে ডুবে যাক মন্দির দেহলি,
শঙ্খমাজা স্তন দু'টি মনে হবে শ্বেতপদ্ম কলি,
লজ্জায় বিবর্ণ মন ঢেকে যাবে ক্রিসেনথিমামে–
অথবা রক্তের নাচে শুরু হবে সিম্ফনির সুর
বৃষ্টির শব্দের মতো মনে হবে তোমার নূপুর।
(সিম্ফনি)

অন্যত্র, "শোকের লোবান" কবিতার ভেতরেও রয়ে গেছে নারীকেন্দ্রিক কবির লিবিডোপরায়ণ মনোভঙ্গি :

তখন কবিতা লেখা হতে পারে একটি কেবল,
যেমন রমণে কম্পিতা কোনো কুমারির নিম্নাভিমূল
(শোকের লোবান)

এইসব কবিতার ভেতর কবি গভীরভাবে নারীকে ভোগাকাঙ্ক্ষার আদলে বন্দি করেছেন। "অরণ্যে ক্লান্তির দিন" কবিতার চাকমা কিশোরীর বিচিত্র কাপড়ে বাঁধা, ঘামে ভেজা উপচানো বুকে কম্পমান বনের রহস্যে এবং "অহোরাত্র" কবিতার জরির শাড়ি পরিহিতার বুকের গঠনে এবং তার অনিবার্য যৌবনের ফুলে, প্রতীকের মতো জেগে থাকা জঘনে প্রবলভাবে তিনি শরীরকে এনেছেন। "নূহের প্রার্থনা" কবিতায় নারীর উক্তিতে এমন এক নারীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত, যে নারী সৃষ্টিকর্তার আক্রোশ থেকে বাঁচিয়ে তুলতে চায় প্রাণধারা। একারণেই সে হয়ে উঠতে চায় পুরুষ কর্তৃক

ফলবতী। তবে, এ কাব্যগ্রন্থে নারী শুধু শরীরী নয়, সে কোথাও কোথাও বিমূর্ত এক আইডিয়ারও প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই স্ববিরোধী স্বভাবপ্রবণতা নিয়েই *লোক লোকান্তর* কাব্যের নারীকাঠামো নির্মিত।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *কালের কলস* প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সনে। সমকালীন সামরিক শাসনের তীব্রতায় এ কাব্যের মূল সুর হয়ে উঠেছে স্বদেশ ও কাল। বৈরি সময়ে আলোর পথ খুঁজেছেন কবি। কিন্তু চেতনার অন্তস্তলে যে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে বার বার, এ কাব্যের কবিতার ভেতর তার গভীর প্রকাশ অনুভূত। তাঁর স্বদেশ এখন 'বিপন্ন শব্দপূর্ণ এক ভূগোল' (কালের কলস)। স্বদেশের এরকম বিপন্নতায় এ কাব্যে নির্মিত নারীদের অধিকাংশই হয়ে উঠেছে মাতৃরূপকল্প। "ফেরার পিপাসা", "কালের কলস", "শরীর থেকে মা'র", "নিদ্রিতা মায়ের নাম"-এর মতো কবিতাগুলোতে স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার কালে বিপদাপন্ন আশ্রয়প্রত্যাশী এক কবি নারীকে দেশমাতৃকারূপে কল্পনা করেছেন:

তাড়িত দুঃখের মত চতুর্দিকে স্মৃতির মিছিল
রক্তাক্ত বন্ধুদের মুখ, উত্তেজিত হাতের টঙ্কারে
তীরের ফলার মত
নিক্ষিপ্ত ভাষার চীৎকার:
বাঙলা, বাঙলা–
কে নিদ্রামগ্ন আমার মায়ের নাম উচ্চারণ করো?
(নিদ্রিতা মায়ের নাম)

বত্রিশ সায়েদাবাদ ঢাকা–এই বিষণ্ন দালানে
তেমন জানালা কই? যাতে বাঁকা নদী দেখা যায়
ধবল পালের বুক যেন মার বক্ষের উপমা,
কোথায় সলিলে ভাসে জোয়ারের তাবৎ নায়রী,
দেয়ালের ফ্রেমে রাখা কে দুঃখিনী জলের জলুস
পাথর ফাটানো ধারা সান্ত্বনার শব্দের মতন
তুমি কি জননী সেই, অভাবের আভায় দলিত
বাঙলার মানচিত্র এ ঘরের পেরেকে রয়েছো?
(ফেরার পিপাসা)

স্বদেশভূমি, তুমি, তোমার নাম
শুনেছিলাম মাংস থেকে মা'র
ফাটিয়ে দিয়ে শহর ঘর গ্রাম
আমরা ক'টি পুত্র কানু পা'র।
(শরীর থেকে মা'র)

উপরিউক্ত কবিতাগুলোতে স্বদেশ এবং নারী একাকার হয়ে গেছে মাতৃভাবনার অনুষঙ্গে। যদিও, নারীর শরীরী সৌন্দর্যের অনুরণন এ কাব্যেও মেলে। সেইসঙ্গে *সোনালি কাবিনে* কাব্যের মতো এ কাব্যের নারী মোটিফে অনার্য বাঙালি-নারীকাঠামো সুস্পষ্ট:

তুমি আমার তিতাস, কালো জলের ধারা
পানকৌড়ি আমি, আমি পানির ফেনা,
ডুব-সাঁতারে নিত্য কালের এই চেহারা
তুমি আমার কালো শালুক, চিরচেনা।

কালো মাটির কালো পুতুল তুমি আমার
সোঁদা মাটির গন্ধ হয়ে লুকোই গায়ে
আমি তোমার নীলাম্বরী শাড়ির দু'পাড়
বক্ষ ঘিরে জড়িয়ে থাকি লুটোই পায়ে।
(বেহায়া সুর)

কিংবা, "কলস ভাসিয়ে" কবিতায় :

কলস ভাসিয়ে তীরে দাঁড়াল যখন
কেমন আলতা রঙে হলো লালে লাল
… … … … … …
ঘট ভরে ঘরে ফেরা পিছে রেখে গাঙ
অবশ ঊরুতে তার ঝরে টস টস
চোয়ানো পানির ফোঁটা। চুড়ি টুং টাং

বাজে আর ছলকায় সজল কলস।
আশেপাশে রাত আসে কাজল, করুণ
পায়ে তার মল বাজে চলার দরুন।
(কলস ভাসিয়ে)

'কালো জলের ধারা', 'কালো শালুক', 'পানকৌড়ি', 'কালো মাটির কালো পুতুল' এই শব্দগুলো অনিবার্যভাবে *সোনালি কাবিন* কাব্যের মতোই অনার্য এক শ্যামাঙ্গী নারীর কথাই মনে করিয়ে দেয়:

নাওয়ের বাদাম ডাকলো তারে; চরের মাটি
আদর করে বিছিয়ে দিলো শীতল পাটি;
… … … …
পাতার ফাঁকে রাত্রি যখন নামলো সেজে
সেই যুবতীর বাংড়ি হাতে উঠলো বেজে!
হঠাৎ নদী ধরলো এসে সাপের ফণা
হাওয়া আঘাত করলো তারে অন্যমনা!
খোঁপার বাঁধন ভাঙলো যখন যত্নে গড়া
ব্যর্থ হলো আমার সকল মন্ত্রপড়া।
(যার স্মরণে)

ধারালো এক শ্যামল অনার্য লোক-নারীর আহবান বার বার কবি-চেতনায় হাতছানি দেয়। সমালোচক মন্তব্য করেন:

> আল মাহমুদের...দয়িতা নন গ্রীক কিংবা ভারতীয় পুরাণের...নায়িকা, বস্তুত আল মাহমুদের উদ্দীষ্টা একান্তভাবেই এই বাঙলার–এবং যিনি বাঙালিও নন, আদি ও অকৃত্রিম অনার্য যুবতী।...আল মাহমুদ তাঁর নায়িকাকে আবিষ্কার করেন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙলাদেশ নয়, বরং বাংলাদেশ ও বাঙলা সাহিত্যের ব্যাপক পঠনই তাঁকে অই রমণী প্রতিমার পিগম্যালিঅন করেছে। সুতরাং অনুষঙ্গক্রমে এলিঅট স্মরণীয়, যে অতীতের ঐতিহ্য আত্মসাৎ করেই বর্তমানের কবি তাঁর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করেন। (শাহিন, ১৯৮৮, পৃ. ৭১)

কবি টি. এস এলিয়ট তাঁর 'ট্র্যাডিশন এন্ড ইন্ডিভিজুয়াল' প্রবন্ধে সময়হীন-শাশ্বত এক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

> This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional. (Eliot, 1932, P.4)

কাজেই, আল মাহমুদ প্রবলভাবে ঐতিহ্যকে লালন করতে গিয়ে আবহমানকালের সঙ্গে সমসময়ের মিথক্রিয়া ঘটিয়েছেন। আর এভাবেই তিনি তাঁর নারীকে করে তুলেছেন চিরকালীন, শাশ্বত। কবির নির্জ্ঞান চেতনায় সুপ্ত অনাদিকালের বাঙালি কৌমনারীর শ্যামল গাত্রবর্ণ কিংবা কৃষ্ণ গাত্রবর্ণের মোটিফ তাই জেগে ওঠে প্রবল পরাক্রমে। *সোনালি কাবিন* কাব্য থেকে আরো কয়েকটি উদাহরণ:

তরমুজের ক্ষেতের পাশে ঘর,
লজ্জাহীনা ফাজিল ছুঁড়ি এক
ভীষণ কালো, হাসতো থর থর!

মহাকালের কালোর চেয়ে কালো
রাত-বরণী রূপসী সেই পরী,
কাঁপিয়ে কাঁখে ঠিল্লা ভরা পানি
দেহের ভাঁজে ভেজা নীলাম্বরী–

উঠতো হেঁটে জলের ধার বেয়ে;
কালো-বাউশী যেনো কলমী বনে
অঙ্গ নেড়ে অস্ত গোলা জলে
দেখেছিলাম একদা কুক্ষণে।

(এক নদী)

অথবা "সোনালি কাবিন" কবিতায় যখন অন্ধকার রাতের কৃষ্ণত্ব বিগলিত হয়ে যায় এই নারীর কৃষ্ণ শরীরের লাবণ্যে:

দরবিগলিত হয়ে ছলকে যায় রাত্রির বরণ
মনে হয় ডাক দিলে সে তিমিরে ঝাঁপ দিতে পারি।

(সোনালি কাবিন ২)

এই তিমির কামনার অন্ধকার রহস্যঘনতায় আচ্ছন্ন। কবি এই তিমিরযাপনে তার কাঙ্ক্ষিত নারীকে আহবান করেছেন মিলনে। রবীন্দ্রনাথের "কৃষ্ণকলি" কবিতার অনুরণন এইসব কবিতায় অনুভূত হলেও ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় দুটো কবিতা দুইরকম উপলব্ধি জাগায়। এ ক্ষেত্রে আল মাহমুদ অনেক

বেশি মাত্রায় শরীরী, প্রবলভাবে মিলনপ্রত্যাশী। তাঁর "বধির টঙ্কার", "ধৈর্য", "শূন্য হাওয়া", "সাহসে আঘাতে স্পর্শে" ইত্যাদি কবিতায় নারীর সঙ্গে মিলনের গভীর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। নারীকে তিনি যৌনমিলনে আহবান জানান। কেননা, তিনি মিলনে বিশ্বাসী, বিরহে নন। '...বিপজ্জনকভাবে তিনিই আধুনিক কবিতায় নারীর মধ্যে প্রথম 'উগোল মাছের তৃপ্তির সুখদ' সন্ধান করেছেন। ...আল মাহমুদের কবিতায় প্রেম বলতে নারীকেই বোঝায়; আর নারী বলতে বোঝায় শরীরজ অনুভূতি। দার্শনিকতার আড়ালে ঢেকে না দিয়ে বলিষ্ঠ ও সৎ কবির মতো তিনি নারীকে উন্মোচন করেছেন'।[৬] তবে, এই যে তাঁর নারী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এমন অকুণ্ঠ উন্মোচন নিয়ে কবিতায় উঠে আসেন, এ প্রসঙ্গে নারীবাদীরা প্রশ্ন তুলতে পারেন, নারীকে তিনি প্রবলভাবে শরীরজ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন বলে নারীর মানবীয়তা অনেকাংশেই আড়ালে পড়ে গেছে। সমালোচকের মতে:

> আধিপত্যশীল-পুরুষতন্ত্র শিল্প-সংস্কৃতিতে নারীকে যুক্ত করে বিনোদনের একেবারে সস্তা বা সহজলভ্য বস্তু হিসাবে যেখানে নারী স্রেফ দেহসর্বস্ব যৌনতার প্রতিমূর্ত্তি, অন্যকিছু নয়। এভাবে পুরুষতন্ত্র নারীর স্বাভাবিক মনুষ্যসত্তাকে আড়াল করতে করতে একেবারে অদৃশ্য করে ফেলতে চায়।...সাধারণভাবে পুরুষ কবিদের কবিতায় নারী-সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ের অবতারণা ঘটলেই সেখানে নারীর যে প্রতিমূর্ত্তি নির্মিত হয়ে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কবিতার সেই নারী-মানুষটি কবিতায় অত্যন্ত প্যাসিভ অবস্থায় হাজির থাকে। নারীর অন্য রূপের কথা না হয় নাইবা তুললাম, সচরাচর কবিরা 'সৌন্দর্যের' সাথে যুক্ত করে, 'যৌনতার' সাথে যুক্ত করে যে নারীদের কবিতায় তুলে ধরেন সেখানে নারী কেবল 'বস্তু' হয়ে পড়ে থাকে। কোনো অ্যাক্টিভ ভূমিকা সেখানেও তার নেই। মনে হয় যৌনতার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানটিতে নারীর কিছুই করণীয় নেই, কেবল যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমেত তার শরীরী সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে দৃশ্যকাব্যে উপস্থিত হওয়া ছাড়া। (সুস্মিতা, ২০০৮,পৃ. ???)

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, আল মাহমুদের কবিতায় নারী স্রেফ যৌনতার প্রতিমূর্তি নন, এবং এখানে নারীকে শুধু পণ্য হিসেবে দেখা হয়নি। নারীর বলিষ্ঠ দেহজ উপস্থিতি আছে, সেকথা সত্য, কিন্তু সেই উপস্থিতি নারীর মানবীয়তা এবং তাঁর চেতনাগত ঔজ্জ্বল্যকে আড়াল করে নয়। নারী সেখানে বেহুলার মতোই মৃত্যুতাড়িনী প্রাণময়ী, কোথাও কোথাও আশ্রয়দাত্রী। আল মাহমুদের কবিতায় নারী 'প্যাসিভ' নন, তাঁরা যথেষ্ট সক্রিয়।

সোনালি কাবিন আল মাহমুদের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ (১৯৭৩)। বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেই কবি এ কাব্যের নারীকে নির্মাণ করেছেন, যারা এ দেশের প্রকৃতির সঙ্গে, মৃত্তিকার সঙ্গে লীন হয়ে আছে। প্রগাঢ় যৌবনমণ্ডিত এক নারীর রূপকল্প এ কাব্যের কবিতাগুলোতে আঁকা হয়েছে। কবি তাঁর গ্রাম ছেড়ে শহুরে জীবনে ঠাঁই নাড়া বাঁধলেও বার বার তিনি হয়ে ওঠেন নস্টালজিক। ফিরে যেতে চান গ্রামের মানুষগুলোর কাছে, ফিরতে চান সেই অকৃত্রিম গ্রামলগ্ন নারীর কাছে। আর তাই সভ্যতা এগোয়, কিন্তু নিজেকে কবির এখনো ক্ষীরের মতো গাঢ় মাটিতে ঘোর লাগা বর্ষণে চারা রুয়ে দিতে থাকা এক উবু হওয়া কৃষক বলে মনে হয়; এবং এই কৃষকের চেতনায় নারী একজলসিক্ত সুখদ উর্বর ভূমি, কবিকৃষকের বীর্যবান ফলার কর্ষণে যার শরীর থেকে ক্রমাগত জন্ম নেবে সুপুষ্ট সন্তানেরা:

ত্রিকোণ আকারে যেন
ফাঁকা হয়ে রয়েছে মৃন্ময়ী।
আর সে জ্যামিতি থেকে
ক্রমাগত উঠে এসে মাছ পাখি পশু আর মানুষের ঝাঁক
আমার চেতনা জুড়ে খুঁটে খায় পরস্পর বিরোধী আহার।
(প্রকৃতি)

শুধু এ কবিতাতেই নয়, "সোনালি কাবিন" কবিতার ৩ সংখ্যক অংশে কবি যেখানে বলেন, "চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ/উগোল মাছের মতো তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়", সেখানেও নারী কবির ভাবনায় এক কর্ষণযোগ্য উর্বর চর। কবিপুরুষ কর্তৃক সেই চর একদিন কর্ষিত হবে–এই আকাঙ্ক্ষা কবিতায় ধ্বনিত:

সুনীল চাদরে এসো দুই তৃষ্ণা নগ্ন হয়ে বসি।
ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দু'টি জলের আওয়াজ–
তুলে নিয়ে যাই চলো অকর্ষিত উপত্যকায়,
(সোনালি কাবিন ৩)

বাংলা কবিতায় নারীকে ভূমি হিসেবে কল্পনা করবার এ ভাবনা নতুন নয়। আল মাহমুদও তাঁর নারীভাবনায় এ বীজ রোপণ করেছেন। যদিও নারী ও ভূমির এই একত্রীকরণ সমালোচকের চেতনায় অন্য এক ভাবনার জন্ম দিয়েছে:

> পুরুষতন্ত্র বহু শতাব্দী ধ'রে নারীকে ভূমি আর ভূমিকে নারীরূপে দেখে আসছে;...নারী ভূমি, নারী উর্বর; তবে ঐ উর্বরতা সৃষ্টিশীল নয়, তাকে সৃষ্টিশীল করে পুরুষের বীর্য। নারী মৃত্তিকা, পুরুষ বীজ; পুরুষ অগ্নি, নারী জল। ...প্রজননে নারীর ভূমিকাকে অস্বীকার ক'রে তাকে পরিণত করেছে একটি অক্রিয় বীজধারণের পাত্রে। পিতৃতন্ত্র পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্যে বীজকেই দিয়েছে গুরুত্ব। (হুমায়ুন, ২০০১, পৃ. ৫৩)

কবি আল মাহমুদের চোখে নারী শুধুই কী এক কর্ষণযোগ্য ভূমি মাত্র? প্রশ্ন থেকে যায়। তবে, কবির পরবর্তী কবিতাগুলোতে নারীর সক্রিয় ভূমিকা, বিভেদ দূরীকরণের মন্ত্রে উজ্জীবিত এক প্রাণশক্তি হিসেবে নারীর উপস্থিতি তাঁকে এই অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছে বলেই মনে হয়।

"সোনালি কাবিন" কবিতায় কবি কৃষিজীবনলগ্ন এক নারীর কথা বলেছেন, বলেছেন খনার কথা। ক্ষেতের অন্তরালে কৃষকজীবনের প্রেম-মিলনের চিত্র, পট্টবস্ত্র পরিহিত এক অনার্য নারীর প্রতি ধ্বনিত রতির দরদ আবহমান বাঙালির কাঙ্ক্ষিত নারীকেই প্রতীকায়িত করে তোলে:

খেতের আড়ালে এসে নগ্ন করো যৌবন জরদ
শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি
তারো বেশি ঢেলে দেবো আন্তরিক রতির দরদ,
সলাজ সাহস নিয়ে ধরে আছি পট্টময় শাড়ি
সুকণ্ঠি কবুল করো, এ অধমই তোমার মরদ।
(সোনালি কাবিন ১০)

এই নারীই কবির স্বদেশ, যার শরীরে শস্যের সুবাস। এই নারীই ধারণ করে আছে ধন-ধান্য। তাকে সুরক্ষা দেবার বলিষ্ঠ স্বর উচ্চকিত হয়ে ওঠে কবি-কণ্ঠে:

যে নারী উন্মুক্ত করে তার ধন-ধান্যের দুয়ার
অন্ধ আতঙ্কের রাতে ধরো ভদ্রে, আমার এ-হাত
তোমার শরীরে যদি থেকে থেকে শস্যের সুবাস,
খোরাকির শত্রু আনে যত হিংস্র লোভের আঘাত
আমরা ফিরাবো সেই খাদ্যলোভী রাহুর তরাস
নদীর চরের প্রতি জলে-খাওয়া ডাঙার কিষাণ
যেমন প্রতিষ্ঠা করে বাজখাই অধিকার তার,
তোমার মস্তকে তেমনি তুলে আছি ন্যায়ের নিশান
দয়া ও দাবীতে দৃঢ় দীপ্তবর্ণ পতাকা আমার;
ফাটানো বিদ্যুতে আজ দেখো চেয়ে কাঁপছে ঈশান
ঝড়ের কসম খেয়ে বলো নারী, বলো তুমি কার?
(সোনালি কাবিন ১২)

কবিতার এই অংশে এই নারী দেশমাতৃকার আদলে পরিণত হয়েছে এই কারণে যে, এখানে কবির ব্যক্তিগত আবেগের পরিবর্তে কবি ব্যবহার করছেন 'আমরা' শব্দ। পুরো কবিতা জুড়ে যে নারীকে ঘিরে কবির আবেগ কম্পিত, এখানে এসে সেই আবেগ সমবায়ী স্বরে প্রকম্পিত। কাজেই এই নারী "সোনালি কাবিন" কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিগুলোতে হয়ে উঠেছে আবহমান বাঙালির চেতনাগহনে মুদ্রিত দেশমাতার প্রচ্ছন্ন রূপের প্রতীক। "সমকালীনতা থেকে বিযুক্ত করার জন্য কবি এই নারীকে স্থাপন করেছেন কালহীনতার প্রেক্ষাপটে–ইতিহাসের বিভিন্ন উন্মন্থন ও উন্মাদনার মধ্যেও যে-নারী চির-পুরুষের ব্যগ্র ফলার ঘায়ে 'উন্মুক্ত করে তার ধন-ধান্যের দুয়ার', যার শরীরে 'শস্যের সুবাস" (রাশেদ, ১৯৮৮, পৃ. ৫৯)– এ সেই নারী।

সোনালি কাবিন কাব্যের নাম কবিতা "সোনালি কাবিন" আল মাহমুদের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই কবিতায় কবি নারী রূপকল্প নির্মাণে গভীরভাবে আমাদের ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেছেন। কবি এখানে নারীকে নানা নামে অভিহিত করেছেন। কবিতার শুরুতেই কবি তাকে 'হরিণী' বলেছেন, যেটি আমাদের প্রকারান্তরে চর্যাপদের "অপণা মাঁংসে হরিণা বৈরি" পঙ্‌ক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। চর্যাপদে নিজের শরীরের আঘ্রাণে হরিণী যেমন বিপদ ডেকে আনে, বাস্তবে নারীও তেমনি নিজের শরীরের কারণেই হরিণের মতো বিপদাপন্ন হয়। শুধু এ পঙ্‌ক্তিতেই নয়, এ কবিতারই অন্য অংশে তিনি যখন বলেন, স্বাধীন মৃগের বর্ণ তোমারও যে শরীরে বিরাজে/ যখন আড়াল থেকে ছুটে আসে পাথরের ফলা – তখনও চর্যাপদকেই অন্বিত হতে দেখি। কাজেই কবি তাঁর নারীকে শরীরী আঘ্রাণে চিত্রিত করতে গিয়ে বাঙালির ঐতিহ্যের কাছেই ফিরেছেন সগৌরবে। শুধু চর্যাপদই নয়, মধ্যযুগের বৈষ্ণবীয় প্রেমের আবহ নির্মাণে তিনি এই নারীর দেহে 'নখবিলেখনের চিহ্ন' এঁকেছেন। সগৌরবে ঘোষণা করেছেন, অবশ্যই সে অনার্য এক নারী, যে কিনা কামকলায় পারদর্শী আর্যের নারীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। অনার্য কৌমসমাজভুক্ত নারীদের যৌনকলায় পারঙ্গমতা এবং যৌনজীবনোচ্ছ্বাস উঠে আসে এ কবিতার নানা ক্ষেত্রে। এক অবিচ্ছিন্ন কালপ্রবাহ এবং প্রগাঢ় ঐতিহ্যপ্রীতির গভীর আবহ তৈরি করেন কবি সজ্ঞানে। কবি যখন তাঁর দয়িতাকে আহ্বান করেন চর্যাপদ-মুকুন্দরাম-আলাওলের তীর্থভূমি অনার্য বাঙালির এই বাংলায়, তখন সেই গৌরব আরও

সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাজেই সময়ের হাত ধরে কবির এই নারী কখনও গুঞ্জার মালা পরে চর্যাপদের অক্ষরে সজ্জিত, কখনও বা বেহুলার মতো প্রাণশক্তিতে মৃত্যুকে পরাজিত করে অপরাহত। উদাহরণ:

> কোথায় রেখেছো বলো মহুয়ার মাটির বোতল
> নিয়ে এসো চন্দ্রালোকে তৃপ্ত হয়ে আচমন করি
> (সোনালি কাবিন ৫)

কবিসৃষ্ট এই শবরী নারীকে মধ্যযুগের আর এক মহিয়সী নারীর সঙ্গে একাকার হয়ে উঠতে দেখি। সেই মহিয়সী নারী হলেন খনা। যে খনার কণ্ঠরোধে তার শ্বশুর ও স্বামী খড়গহস্ত হয়ে তার জিভ কেটে নিয়েছিল, সেই খনার অভিজ্ঞানে কবি স্নাত হতে চাইলেন। পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এ এক দ্রোহ। নারীর ভাষিক অস্তিত্বকে কবি খনার মাধ্যমে প্রবল করে তুলতে চান। খনার অভিজ্ঞানে জারিত হয়েই কবি নিসর্গসম নারীর আত্মা ও শরীরের যাদু উন্মোচনে সচেষ্ট হতে চান। তিনি হতে চান তরুণ লালনের মতো স্বাধীন ভক্তিধর্মের প্রবক্তা, যে ধর্মের প্রেম ও ভক্তিতে নেই কোনো তোষণের প্রকাশ, সেই ধর্মে তিনি এই নারীকে দীক্ষিত করতে চান। কবি মনে করেন, একালের প্রাণহীন, বিবেকহীন, মগজবিকোনো ক্ষয়াটে বুদ্ধিজীবীদের বাঁচিয়ে তুলতে পারে বেহুলার প্রাণস্পর্শী নাচের নিটোল মুদ্রা, যে মুদ্রায় সুপ্ত আছে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন-স্পর্ধা। মনসাকে তিনি একালের বিষের ধারকশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, যার বিষের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে একমাত্র বেহুলার প্রাণশক্তি এবং জীবন-মন্ত্রই পারে মৃত্যুর পিঞ্জর ভাঙতে। বর্তমানে কবি যে ক্রান্তিকাল যাপন করছেন, সেই বৈরি-বিক্ষুব্ধ সময়ে তিনি তাঁর নারীকে বলিষ্ঠ প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলেন খনা-বেহুলার মতো নারীদের শক্তিমত্তায়। সমালোচক মন্তব্য করেন:

> ...প্রাকৃত সমাজ কাঠামোয় নারীর ভূমিকাও সমান মর্যাদার বলে যে দুঃসময়ের তারা মুখোমুখি তা থেকে পরিত্রাণের জন্যে সে তার ওপরও নির্ভর করে, তার প্রেমিকা হয়ে ওঠে বেহুলার মত প্রত্যয়ী। বলা প্রয়োজন, মৃত্যু থেকে জীবন ছিনিয়ে আনার ও প্রবল বৈরিতায় বেঁচে থাকার এই বিশ্বাস ও মনোভঙ্গী প্রাকৃত মানুষের সামষ্টিক প্রত্যয়েরই ফল।... বেহুলার সঙ্গে খনা মিশে যে প্রাকৃত নারীর জন্ম এখানে কবির অন্বিষ্ট তাই। যে নারী দেবদ্রোহী ভাটির কুমারকে ভেলায় ভাসিয়ে প্রাণহারী যমকে অস্বীকার করে তার প্রেমিকও তেমনি জীবনের স্পর্ধার কাছেই শুধু নতজানু। (শান্তনু, ১৯৮৮, পৃ. ৫১)

এভাবেই কবি একে একে বাঙালির নির্জ্ঞানচেতনাউৎসারিত মহিয়সী নারীদের কথা বলতে চেয়েছেন, তাদের আদলে তাঁর কাঙ্ক্ষিত নারীকে আঁকতে চেয়েছেন। সৌন্দর্যসচেতন শবরী বালিকা, লালনপ্রেয়সী প্রেমময়ী বৈষ্ণবী কিংবা প্রকৃতি-অভিজ্ঞানে ঋদ্ধ খনা অথবা কামকলায় পারদর্শী অনাম্নী অনার্য অঙ্গনা, যারা এ কবিতার গভীরতর অংশ, তারা মূলত অনার্য বাংলার সমৃদ্ধ অতীতকেই মূর্ত করে তোলে। এভাবেই কবি প্রাচীন বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের বিনির্মাণ ঘটান। প্রবল অথচ সংযতস্বরে কবি উচ্চারণ করেন বাংলার ঋদ্ধগাথা:

> যে বংশের ধারা বেয়ে শ্যাম শোভা ধরেছো মানিনী,
> একদা তারাই জেনো গড়েছিলো পুণ্ড্রের নগর...
> (সোনালী কাবিন ৯)

অর্থাৎ এই শ্যামল বর্ণের অনার্য নারী তার রক্তে বহন করছে আবহমান বাঙালির ঐতিহ্য-সংস্কৃতি। অন্য কেউ নয়, শুধু এই নারীই হয়ে উঠেছেন কবির দয়িতা। এই নারীর আত্মিক শক্তি ও প্রণয়ের শক্তিতেই কবি বিশ্বাস করেন, সকল শ্রেণি ব্যবধানের উচ্ছেদ ঘটবে, প্রজ্জ্বলিত সকল বিভেদের আগুন নিবে যাবে। কেননা এই নারীর প্রেম সাম্যবাদী মন্ত্রে উচ্চকিত। কালে কালে এমন প্রেমই বিভেদহীন অনার্য বাংলার কৌম জীবনে বিভেদের বীজকে প্রতিহত করার শক্তি ধারণ করেছে। কবির বলিষ্ঠ উচ্চারণ :

এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।
তারপর তুলতে চাও কামের প্রসঙ্গ যদি নারী
খেতের আড়ালে এসে নগ্ন করো যৌবন জরদ
শস্যের সপক্ষে থেকে যতটুকু অনুরাগ পারি
তারো বেশি ঢেলে দেবো আন্তরিক রতির দরদ,
সলাজ সাহস নিয়ে ধরে আছি পট্টময় শাড়ি
সুকণ্ঠি কবুল করো, এ অধমই তোমার মরদ।
(সোনালি কাবিন ১০)

কখনও বা ছিন্ন তালপত্রহস্তে মুকুন্দরামের পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত কবির কামনাসিঞ্জিত এই বন্যবালিকা। এই বন্যবালিকার কপালেই তিনি হিঙুলের টিকা আঁকতে চান। তাকে তাঁর প্রেমে অভিষিক্ত করতে চান। মূলত, আল মাহমুদ নারীর রূপকল্প নির্মাণ করতে গিয়ে অনার্য বাংলার ইতিহাসের পাতাকেই যেন উন্মুক্ত করেছেন। কবিতায় তিনি বাংলার সেই কালের বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন, যে কালে মাতৃতন্ত্র গৌরবের সঙ্গে সমাজে তার দায়িত্ব পালন করেছে। বাখোফেন তাঁর *মাতৃঅধিকার* গ্রন্থে নারী ও তার পারিপার্শ্বকে যেভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, তাতে উন্মোচিত হয়েছে এক সাম্যবাদী সমাজের মুখ। সেই সাম্যবাদী সমাজে সন্তান ও ভূমি দুয়ের ওপরই ছিল নারীর একাধিপত্য। সাম্যতন্ত্রী পরিবারে নারীদের এই আধিপত্য তাদের শ্রম থেকে কিংবা ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। ক্রমে সম্পদ বৃদ্ধি পেলে নারীর ক্ষমতা পুরুষের হাতে কুক্ষিগত হয় । এভাবে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ঘটলে, মাতৃতন্ত্রের পরাজয় ঘটে। সমালোচক মন্তব্য করেন:

> পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে একরাশ সামাজিক রোগ নিয়ে; দেখা দেয় সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার, নারী-অধীনতা ও দাসপ্রথা, সমাজ ভাগ হয়ে যায় নানা শ্রেণি ও বর্ণে, দেখা দেয় শাসক ও সম্পত্তিশীল শ্রেণী, শুরু হয় সম্পত্তির অসম বন্টন... (হুমায়ুন, ২০০১, পৃ. ৫৮)

আল মাহমুদের কবিতাপাঠে উপলব্ধি করা যায়, কবি সেই লুপ্তকালে সগৌরবে বিরাজমান নারীদের ঋদ্ধ মুখশ্রীই তুলে আনতে চান, সাম্যবাদী সমাজের আদিমাতা এবং মাতৃতন্ত্রের বন্দনা গান গাইতে চান, পরবর্তীকালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যাদের গৌরবগাথাকে লুপ্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছে। পুরুষতন্ত্রের আগ্রাসী থাবায় ছিন্ন হয়ে যাওয়া মাতৃতন্ত্রের ইতিহাস পুনরুজ্জীবনে নানা কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবাদ:

> কারা আমাদের পূর্বনারী? কারা আমাদের আদিমাতা? কোথায় খুঁজে পাব তাদের? শোওয়াল্টার জবাব করেন, তাঁরা আছেন। লোকগান/ছড়া/ব্রতকথায় তাঁরা বেঁচে আছেন। মার্কেজের দিদিমা, পুশকিনের ধাইমা, হয়েই তাঁরা মরে যান। টেক্সট তাকে বুকে নেয়নি। সমাজ যখনই পেরেছে, ডাইনি বলে তাকে হত্যা করেছে। এ সেই 'সার্কাসের সং' পুরুষতন্ত্র যে এমিলি ডিকিনসনের

> লেখা *pontymeter* লোককথাভিত্তিক বলে বিদ্রুপ করে। বাঙালি মেয়েদের সহজিয়া ব্রতকথা (রনে রনে সুয়ো হব জনে জনে এয়ো হব–আকালে লক্ষ্মী হব–সময়ে মা হব) মুছে ফেলে তৈরি করে হতাশাবাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদী শ্লোক (বসুমতী মাতা তোমায় করি নমস্কার–পৃথিবীতে জন্ম আমার না হয় যেন আর)। লুপ্ত অতলান্তিকের মতো তলিয়ে গেছেন খনা, গার্গি, সাফোরা। পুরুষতন্ত্র তাঁদের ক্লাসিদার স্বর থামিয়ে দিয়েছে চিরতরে। (অদিতি, ২০১৪, পৃ. ২৬৪)

আল মাহমুদের *সোনালি কাবিন* কাব্যের রূপকল্প নির্মিত হয়েছে আবহমান বাংলার আদিমাতাদের ঋদ্ধ অভিজ্ঞান ও বিকশিত চেতনার আদলে। এ কাব্যে পাঠক সগৌরবে খনা, বেহুলা, শবরী নারীদের সগৌরব উপস্থিতি টের পান। কালে কালে প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী নারীদের কণ্ঠছেদনের পুরুষতান্ত্রিক আক্রোশের মর্মমূলে কবি কুঠারাঘাত করেছেন যেন। একারণেই মধ্যযুগে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া খনার কণ্ঠ আমরা আল মাহমুদের কবিতায় উচ্চকিত হয়ে উঠতে শুনি, খনার অভিজ্ঞানী সত্তার বলিষ্ঠ উপস্থিতি টের পাই। শুধু খনাই নয়, কবি তাঁর কবিতায় ঈভকে এনেছেন। আল মাহমুদের কবিতায় ঈভ শুধু লিবিডোপ্রকাশক সত্তা হিসেবে সীমায়িত থাকেনি, বরং এখানে তাকে পুরুষতান্ত্রিকতার নিষেধ আর তথাকথিত নৈতিকতারবিপক্ষশক্তি-আত্মোপলব্ধি আর স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের প্রতীকী কণ্ঠ হিসেবে ভাববার অবকাশ রেখেছেন কবি। ঈভ কিংবা খনার বলিষ্ঠ কণ্ঠই মূলত তাদের প্রবল ব্যক্তিত্বপ্রকাশক।

ঈভ আল মাহমুদের কবিতায় হয়ে উঠেছে আদিম কামনামদির আহবানের প্রতীক। "শোণিতে সৌরভ" কবিতায় নারী ঈভের আদিমতায় হয়ে উঠেছে কামনার আধার। এখানে রক্তের ভেতর বহন করা লিবিডোর অকৃত্রিম প্রকাশে কবি যুবক এক গোস্বামীর আকণ্ঠ তৃষ্ণাকে আরোপ করেন ঈভের শরীরী সৌন্দর্যের নগ্নতায়:

> তোমার মাংসের উষ্ণ আতাফল
> শোণিতে মেশালো কি মধুর সৌরভ?
> … … … … …
> ঈভের মতো আজ হওনা চঞ্চল
> … … … … …
> তোমার নাভি দেখে হাঁটছি একা আমি
> দেবে কি গুল্মের কৃষ্ণ সানুদেশ?
> … … … … …
> মধ্যযুগী এক যুবক গোস্বামী
> দেহেই পেতে চায় পথের নির্দেশ;
> … … … … …
> কনক জঙ্ঘার বিপুল মাঝখানে
> রচেছো গরীয়সী এ কোন দর্প?
> আকুল বাঁশরীর অবশ টানে টানে
> … … … … …
> আবাস ছেড়ে আমি আদিম উত্থানে
> ধরেছি ফণা নীল আহত সর্প,
> কনক জঙ্ঘার বিপুল মাঝখানে
> মেলেছো গরিয়সী এ কোন্ দর্প।
> (শোণিতে সৌরভ)

কবি চমৎকার বুননে আদি ও অকৃত্রিম ঈভকে মধ্যযুগের বৈষ্ণবীয় এক গোস্বামীর কামনার ঘেরাটোপে বন্দি করেছেন। ঐতিহ্যপ্রীতির এক অকৃত্রিম প্রকাশ এটি। *সোনালি কাবিনের* নাম কবিতায়ও কয়েকবার ঈভের কথা উঠে এসেছে। কবি যখন বলছেন, 'তুমি যদি খাও তবে আমাকেও দিও সেই ফল/জ্ঞানে ও অজ্ঞানে দোঁহে পরস্পর হব চিরচেনা', তখন, কবি হয়ে উঠছেন এডাম কিংবা আদম আর চিত্রিত নারী সেখানে ঈভ কিংবা হাওয়া। কবি সেখানে 'দারুণ আহত বটে আর্ত আজ শিরা-উপশিরা'–অর্থাৎ তীব্র কামে জর্জরিত হয়ে ওঠেন। দ্রুত ঘূর্ণ্যমান রক্তের ধাঁধায় ডুবে যেতে চান তিনি। কবিকথিত এই রক্তের ধাঁধা মূলত আমাদের রহস্যময় লিবিডো। কবি এখানে সেই লিবিডোতেই ডুবতে চেয়েছেন। অন্যদিকে, তিনি নারী-কামনাকে আরো গাঢ় ও প্রবল করে তুলেছেন সাপের প্রতীক ব্যবহারে। "সোনালি কাবিন" কবিতার দ্বিতীয় সংখ্যক অংশে কবি এই নারীকে 'পানোখি' নামে ডেকেছেন। সাপ ও যৌনতা ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছিন্ন প্রতীক। কাজেই কবি যখন তাঁর দয়িতাকে পানোখী নামে সম্বোধন করেন, সেটি প্রেমের চাইতেও কামমুখর হয়ে ওঠে একান্তভাবে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য যথার্থ:

> তৃতীয় পদ্যে অষ্টাদশীর 'বন্ধবেণী' হয়ে উঠবে 'সাপিনী বিশেষ', আর দ্বিতীয় কবিতায় খোদ দয়িতাই হয়ে উঠেছে ফণাতোলা বিষধর 'পানোখী'।...'এ কোন্ কলার ছলে ধরে আছো নীলাম্বর শাড়ি'–ইত্যাদি অজরামর চিত্রকল্পের প্রদর্শনী থাকলেও কবিতাটি কাম-প্রেমের মোহনীয় আবেশ ছড়িয়েছে মূলত 'পানোখী'র ব্যঞ্জনায়। আল মাহমুদের খুব প্রিয় বিষয় এটি। 'জলবেশ্যা' গল্পে নারী আর নাগিনীর যৌথতায় কামকলার যে ক্লাসিক কিচ্ছা সম্ভব হয়ে উঠেছিল, এ 'পানোখী'র গল্প তারই পূর্বজ।...বিচিত্র কলায়, আকাঙ্ক্ষার চরিত্রে এবং উদযাপনের ধরনে এখানেও এক প্রাচীন অনার্য বংশের প্রকল্পিত মূর্তি তৈরি হতে থাকে,... (মোহাম্মদ আজম, ২০১৯, পৃ. ???)

সাপিনী, পানোখী, ঈভ–প্রত্যেকটি বিশেষণে জড়িয়ে আছে গভীর যৌনগন্ধী আবহ। কাজেই নারী এখানে প্রবলভাবে কামনাময়ী প্রাচীন এক অনার্য বংশের প্রকল্পিত মূর্তি। নারী, প্রেম এবং যৌনতা কবির কাছে জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম। কাজেই নারীর তীব্র শরীরী বর্ণনা কিংবা যৌনতাযুক্ত পঙ্ক্তি কবিতায় বাহুল্যবর্ণনায় পরিগণিত নয়। বরং নারীর রূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশে কবির প্রবল আকাঙ্ক্ষিত লোকজীবনজাত অনুষঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যমে একজন নারীর নগ্ন শরীর এখানে হয়ে উঠেছে সহজ-স্বাভাবিক। বলা যেতেই পারে, "সংস্কৃত কবিতায় এবং মধ্যযুগের বাঙলা রোমান্স কাব্যে যা ছিলো অতি-প্রতুল, সেই রমণী দেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা–ফরাসি ভাষায় যাকে বলে ব্লাজ–তাকে চমৎকার এড়িয়ে যেতে পেরেছেন আল মাহমুদ"। (শাহিন, ১৯৮৮, পৃ. ৫৫) হংস গ্রীবার মতো দেহভঙ্গি আরোপ করে কবি এই নারীকে বঙ্কিম শরীরী সৌন্দর্যে শৈল্পিক করে তোলেন। কবি নারীর এই সৌন্দর্যভঙ্গি প্রকৃতির কাছ থেকেই গ্রহণ করেন কখনও কখনও। নারী আর নদীর নিতল তাঁর কাছে সমার্থক (আভূমি আনত হয়ে)। আর তাই কবিতায় কখনও কখনও নদীর বঙ্কিম ভঙ্গি নারীর শরীরী সৌন্দর্যের সঙ্গে লীন হয়ে গেছে:

> এই সেই স্রোতস্বিনী, যার নকশায় আমাদের রমণীরা
> শাড়ি বোনেন। ঐ সেই বাঁক যার অনুকরণে
> আমার বোনেরা বঙ্কিম রেখায় এঁটে দেহ আবৃত করে।
> (স্বপ্নের সানুদেশে)

মূলত, প্রকৃতিজাত অনুষঙ্গেই কবির নারী রূপ পেয়েছে, হয়ে উঠেছে লাবণ্যময়ী।

আল মাহমুদের কোনো কোনো কবিতায় আত্মজীবনের ছায়াপাত ঘটেছে, যেখানে নারীরা উঠে এসেছে তাঁর চেনা পরিমণ্ডল থেকে। "অবগাহনের শব্দ", "তোমার হাতে", "অন্তরভেদী অবলোকন", "প্রত্যাবর্তনের লজ্জা"র মতো কবিতাগুলোতে কবির ব্যক্তিজীবনলগ্ন নারীরা উঠে আসেন প্রবলভাবে। কোথাও কোথাও মায়ের আদলযুক্ততায় কবিতা হয়ে উঠেছে আবেগঘন। "কবিতা এমন" কবিতায় তিনি অনুভব করেছেন, 'কবিতা তো কৈশোরের স্মৃতি। সে তো ভেসে ওঠা ম্লান/ আমার মায়ের মুখ' (কবিতা এমন)। কিংবা:

আর আমি আমার মাকে জড়িয়ে ধরে আমার প্রত্যাবর্তনের লজ্জাকে
ঘষে ঘষে
তুলে ফেলব।
(প্রত্যাবর্তনের লজ্জা)

কবির গ্রামে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগ 'মা' কে কেন্দ্র করেই উন্মোচিত এইসব কবিতায়।

অন্যদিকে, মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার (কবিতা এমন), কখনও ম্লান মুখ বউ, কখনও বা পিঠে ভেঙে পড়া চুলের ঢেউয়ে উপচে ওঠা নারীর প্রতিরূপকে (তোমার হাতে) কবির ফেলে আসা চিরচেনা গ্রামীণ জীবনলগ্ন আটপৌরে নারীদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এইসব আটপৌরে নারীদের কবিতায় নিয়ে আসার পেছনে গভীরভাবে কবির নস্টালজিয়া কাজ করেছে। নগরের কোনো নারী তাঁকে এইসব নারীদের মতো মমতায় ঘিরে রাখতে পারেনি। এইসব নারীরা মূলত কবির পিছুটান, তাঁর গাঁয়ে ফিরবার তৃষ্ণারই প্রতীক।

"সোনালি কাবিন" কবিতায় কবি নারীকে যে স্বাধীনতা দিতে চান, সেটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনবদ্য। সবশেষে কবি যখন লেখেন:

কথার খেলাপ করে আমি যদি জবান নাপাক
কোনদিন করি তবে হয়ো তুমি বিদ্যুতের ফলা,
এ-বক্ষ বিদীর্ণ করে নামে যেন তোমার তালাক
নাদানের রোজগারে না উঠিও আমিষের নলা।
(সোনালি কাবিন ১৪)

তখন একজন নারীকে তার প্রাপ্য স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ দেন কবি। কবি তার প্রেমে একনিষ্ঠ না থাকলে, নারী তাকে তালাক দেবার অধিকার রাখবে–এমনই এক স্বাধীন প্রজ্ঞায় এ কবিতার নারীভাবনা উচ্চকিত।

বলা যেতে পারে, কবি আল মাহমুদ পূর্বসূরীপ্রদর্শিত পথে হেঁটেছেন এবং সে পথে হাঁটতে হাঁটতেই নতুন করে তাঁর ভাবনাবিশ্বকে গড়ে তুলেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় কখনও কখনও আল মাহমুদের কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ এবং জসীমউদ্‌দীনের কবিতার প্রভাব অনুভূত হয়। লোকজীবনজাত ভাবনায় জারিত এই দুই কবির নারীকল্পে যেহেতু প্রকৃতি ও মৃত্তিকার যোগ রয়েছে গভীরভাবে, সেই সূত্রে আল মাহমুদের মাটিগন্ধা নারীদেহের বর্ণনায় এই দুই কবির কবিতার সৌগন্ধ্য মেলে। যদিও বৈসাদৃশ্যও রয়েছে বিস্তর। জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে তুলনায় সমালোচক লিখেছেন, 'দুই কবির নারীভাবনাও সম্পূর্ণ দু'রকম। বোধ হয় বলা যায়–'রূপসী বাংলা' তার রূপ সত্ত্বেও বিষণ্ণভাবে না-বাচক। 'সোনালি কাবিন' জোরালোভাবে হা বাচক'। (সুস্মিতা, ১৯৯৪, পৃ. ৫৬) দু'একটি কবিতা বিশ্লেষণে বিষয়টি অনুধাবন করা যাবে।

আল মাহমুদের নারীরা অনেকাংশেই শরীরী, রক্তমাংসে মানবিক। কবি ইন্দ্রিয়ঘন বর্ণনায় তাদের আরো বেশি সজীব করে তুলেছেন। অন্যদিকে, জীবনানন্দ দাশের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যের "ক্যাম্পে" কবিতা কিংবা *বনলতা সেন* কাব্যের "শ্যামলী" কবিতায় যে নারীর রূপকল্প নির্মিত হয়েছে, তারা যত না রক্তমাংসের মানুষ, তার চাইতেও বেশি মোহময়ী শক্তির প্রতীক। অন্যদিকে, *রূপসী বাংলা* কাব্যে একেবারেই ভিন্ন ঘরানার নারীরা উঠে আসেন। এখানে যে নারীদের দেখা মেলে তাদের গায়ে পরণ-কথার গন্ধ লেগে আছে। তাদের চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান-মাখা চুল এবং কস্তাপাড় শাড়ি লোক বাংলার সৌগন্ধ্যকেই মূর্ত করে তোলে। যদিও এইসব নারী বিষণ্ণতার ঘেরাটোপে বন্দি। কখনও তারা কল্কাপেড়ে শাড়িতে চন্দনের চিতায় আরোহিত (যতদিন বেঁচে আছি), কখনও তারা বিশালাক্ষী-শঙ্খমালা-চন্দ্রমালা-মানিকমালার মতো বিস্মৃতপ্রায় রূপকথার জগতে বিচরিত। কখনও কখনও এই কবির কবিতায় মনসা-সনকা-বেহুলা-লহনা-খুল্লনার মতো আবহমান বাংলার ঐতিহ্যিক মুখও কবিতায় উঁকি দিয়ে গেছে। কিন্তু সেইসব মুখ 'বিষণ্ণ মলিন ক্লান্ত' (হায় পাখি একদিন)। তাদের দেহের গন্ধ আজ ঢেকে আছে বাংলার অবিরল ঘাসে। অর্থাৎ মৃত্যুময়তায় লীন হয়ে আছে এইসব নারী। *সাতটি তারার তিমির* কাব্যের মৃত সরোজিনী, "আকাশলীনা" কবিতার সুরঞ্জনা, আর "শব" কবিতার মৃণালিনী ঘোষাল কবিতায় মৃত্যুর গন্ধ ফেনিয়ে তোলে। এইসব নারীরা কবিতায় পুরোপুরি শরীরী নয়। কখনও তারা শাদা শাঁখা পরিহিত সকরুণ মেয়েলি হাত নিয়ে, কখনও বা নরম শরীর নিয়ে একবার এসে অন্তর্হিত হয়ে যায় অনির্দেশ্যের পথে। যদিও কবি তাকে ফিরে পান বাংলার তীরে–এরকম কথায় নিশ্চিত করে দেন এই নারীদের অধিকাংশই লোকবাংলার প্রাণের সাথে যুক্ত। কবি লেখেন:

> –কোনো এক শঙ্খ বালিকার
> ধূসর রূপের কথা মনে হবে–এই আম জামের ছায়াতে কবে যেন তারে আমি
> দেখিয়াছি–কবে যেন রাখিয়াছে হাতে
> তার হাত–কবে যেন তারপর শ্মশান চিতায় তার হাড়
> ঝ'রে গেছে, কবে যেন; এ জনমে নয় যেন–এই পাড়াগাঁর
> পথে তবু তিন শো বছর আগে হয়তো বা–আমি তার সাথে
> কাটায়েছি;–
>
> (ঘুমায়ে পড়িব আমি)

জীবনানন্দ দাশ প্রবলভাবে ইতিহাসচেতন কবি। তিনি তাঁর কবিতায় বহুকালবিস্মৃত লোকভুবনের বিনির্মাণ করতে গিয়ে এদের মৃত্যুলীন ধূসর সত্তাকে বিষণ্ণতার মোড়কে মূর্ত করে তোলেন। কবি জানেন, মানুষ কেবল তার যাপিত জীবনকেই যাপন করে না। বরং 'সামূহিক নির্জ্ঞানে সে বহন করে সভ্যতার অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি। ব্যক্তি তাই শাশ্বত মানব অভিজ্ঞানের সঙ্গে নিজেকে সমন্বিত করে এবং তার সংযোগ সাধিত হয় নৃতাত্ত্বিক অভিজ্ঞানের সঙ্গে।...মানুষেরই মনোভূমে লেখা থাকে মানুষের ঐতিহ্য-ইতিহাস'। (মাহবুব, ২০১০, পৃ. ১০৬) জীবনানন্দ তাঁর চেতনাজগত কিংবা তাঁর সামূহিক নির্জ্ঞান থেকে তুলে এনেছেন বাংলার অন্তরঙ্গ লোকমুখ। তাই *বনলতা সেন* কাব্যে অতীত পৃথিবীর নানা সভ্যতা থেকে বেবিলনের রাণী, এশিরিয়া-মিশর-বিদিশার মৃত রূপসীদের কিংবা নগ্ন নির্জন হাতের অধিকারী এক নারীকে উত্থিত হতে দেখি তাঁর চেতনাজগত থেকে। এছাড়াও এ কাব্যের সুদর্শনা, সুচেতনা, সুরঞ্জনা, সবিতার মতো নারীরা এসেছে মূলত কবির প্রেম-চেতনার প্রতীক হয়ে। কাব্যের নাম কবিতায় বনলতা সেন এবং

সেইসঙ্গে শেফালিকা বোস, অরুণিমা সান্যালের মতো নারীদের কবি বাস্তব রক্তমাংসের নারী করে তুলবার আকাঙ্ক্ষায় তাদের বোস, সেন কিংবা সান্যাল উপাধি দিয়ে মূর্ত করে তুলেছেন। নির্মিত হয়ে গেছে বাস্তব পৃথিবীতে তাদের অস্তিত্বের গাঢ়ত্ব। কোন কোন কবিতায় *রূপসী বাংলা* কাব্যের অনুরণনে রূপায়িত লোকনারী হিসেবে এসেছে শঙ্খমালার মতো পাড়াগাঁর রূপসীরা। এইসব নারীদের গায়ে ধান ভানার গন্ধ এখন ফিকে হয়ে শুধু লেগে থাকে বিমর্ষ পাখির রঙ। তারপরও, কবি কোথাও স্পষ্ট করেন না যে, এই নারী শ্যামাঙ্গী কিংবা অনার্য। সেইসব রূপসীদের গায়ে লোকজীবনের সৌন্দর্যের চাইতেও মৃত্যুর ঘ্রাণকেই কবি খুব বেশি গাঢ় করে তোলেন। জীবনানন্দ দাশ এভাবেই নারীর রূপকল্পটি নির্মাণ করে দিয়েছেন। আল মাহমুদের কোনো কোনো কবিতায় জীবনানন্দ কল্পিত নারী কাঠামো উঠে আসে। "সমুদ্র নিষাদ" কবিতায় যেমন জীবনানন্দের "শ্যামলী" কবিতার অনুরণন মেলে। যদিও শব্দচয়নে আল মাহমুদ স্বকীয়তার পরিচয় দেন। যেমন, "আঘ্রাণ" কবিতায় কবি যখন বলে ওঠেন, "আজ এই হেমন্তের জলদ বাতাসে/আমার হৃদয় মন মানুষীর গন্ধে ভরে গেছে।"– তখন প্রকারান্তরে জীবনানন্দ দাশের কবিতার সৌরভ ভেসে আসে। কিন্তু সেই একই কবিতায় আল মাহমুদ যখন বলেন, "কে যেন কিশোরী তুমি আমারি কৈশোরে/নেমেছিলে এ নদীতে। লেগে আছে/তোমারি আতর"–তখন সেটি একান্তই আল মাহমুদীয় পঙ্‌ক্তি হয়ে ওঠে। তাঁর "সিম্ফনি" কবিতার 'শঙ্খমাজা স্তন' শব্দসম্ভারে জীবনানন্দ দাশের "শঙ্খমালা" কবিতার 'স্তন তার করুণ শঙ্খের মতো–দুধে আর্দ্র-কবেকার শঙ্খিনীমালার!'– অনুরণন অনুভব করা যাবে। তবে, আল মাহমুদের কবিতায় যা একান্তই ইন্দ্রিয়জ মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক, জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সেটি 'করুণ' এবং 'কবেকার' শব্দদ্বয় ব্যবহারে এক বিষণ্নতার ঘেরাটোপ তৈরি করেছে।

অন্যদিকে, বাংলা কাব্যের অন্যতম কবি জসীমউদ্‌দীনের নারীকাঠামো প্রকৃতির সঙ্গে প্রবলভাবে যুক্ত। তাঁর *রাখালী* কাব্যগ্রন্থের "রাখালী", "সিঁদুরের বেসাতি", "শাক তুলুনি", "কৃষাণ-দুলালী" কবিতায় যেসব নারীর ছবি এঁকেছেন কবি, তারা প্রবলভাবে রূপসী এবং তাদের সেই রূপ প্রকৃতির অনুষঙ্গে আরো বেশি লাবণ্যময়। *হলুদ বরণী* কাব্যের হলুদ বরণী, সীবন রতা, বউ, লুবান কন্যা, একটি মেয়ে, নবপরিণীতা, উমাকলি, শ্যামলী, রেণু, হলুদ মেয়ে কিংবা *রূপবতী* কাব্যগ্রন্থের রূপবতী, রাজার কুমারী, সোনার মেয়ে, বেদেনী, শ্যামলী, শ্যামলীয়া, চাষীর মেয়ে, ঊষাবতী সেন, কল্যাণী, বস্তির মেয়ে, শাহজাদী অথবা সকিনা কাব্যগ্রন্থের সকিনা, *সোজন বাদিয়ার ঘাটে*র দুলালীর মতো নারী চরিত্রগুলো রূপে প্রকৃতিলগ্নঃ

রূপের ভারেই হয়তো বালা পড়ত ভেঙে পথের বাঁকে।
গাঙেরি জল ছল ছল বাহুর বাঁধন সে কি মানে,
কলস ঘিরি উঠ্‌ছে দুলি গেঁয়ো বালার রূপের গানে।
(রাখালী)

চেকন চোকন' বোষ্টমী তার ঝাট্‌রা মাথায় দীঘল কেশ,
খেজুর গাছের বাগড়া যেমন পূব হাওয়াতে দুলছে বেশ।
... ...
সঙ্গে চলে বৈরাগী তার তেল কুচ্ কুচ্ নধর কায়,
গয়লা বাড়ির ময়লা বাছুর রোদ মেখেছে সকল গায়।
(বৈরাগী আর বোষ্টম যায়)

প্রত্যেকটি কবিতায়ই জসীমউদ্‌দীনের নারীরা রূপবতী এবং তারা অধিকাংশই কৃষিজীবনের সঙ্গে যুক্ত। কোথাও কোথাও কর্মিষ্ঠ, গৃহনিপুণা, সৌন্দর্যপিপাসু নারীর আদল নির্মাণ করেছেন তিনি। এসব নারীরা কর্মী, সুলক্ষণা এবং সুন্দরী। এছাড়াও জননী, পল্লি-গৃহবধূ, প্রিয়তমের জন্য প্রতীক্ষারত নারী, জলকে চলা পল্লি-বধূর দলও তাঁর কবিতায় দৃশ্যমান। সেইসূত্রে দারিদ্র্যপীড়িত নারীজীবনের কথাও মূর্ত হয়ে উঠেছে কোনো কোনো কবিতায়:

মলিন ছিন্ন শত-তালী-দেওয়া বসনে বাঁধিয়া তারে
হায় হায় কেবা বন্দী করিল অভাবের কারাগারে!
(চাষীর মেয়ে)

মৈমনসিংহ গীতিকার নারীকাঠামো অনুসরণে কবি কোথাও কোথাও নারীকে 'সোঁতের শেহলা' বলে অভিহিত করেছেন। সেক্ষেত্রে নারীর অস্তিত্বহীন অনিকেত রূপটিই প্রকট হয়ে উঠেছে। তাদের করুণ-বেদনাতুর পরিণতিও *সোনালি কাবিন* কাব্যের নারীদের থেকে বিসদৃশ। আল মাহমুদ তাঁর কাব্যে যেসব নারীর রূপকল্প নির্মাণ করেছেন, কাব্যজুড়ে তাদের সরব-অস্তিত্ব সগৌরবে উচ্চকিত। বলিষ্ঠ শক্তিমত্তায় চিহ্নিত তারা। তবে, *লোক লোকান্তর* কাব্যের কোনো কোনো কবিতায় আঁকা নারী রূপকল্পে কবি জীবনানন্দ দাশ এবং জসীমউদ্‌দীনের ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ করা যাবে। "অরণ্যে ক্লান্তির দিন" এবং "অহোরাত্র" কবিতায় মেলে জসীমউদ্‌দীনের নারীকাঠামোর আদল। উদাহরণস্বরূপ "সোনালি কাবিন" কবিতার শেষাংশ:

শরমে আনত করে হয়েছিলে বনের কপোতী?
যেন বা কাঁপছো আজ ঝড়ে পাওয়া বেতসের মূল?
বাতাসে ভেঙেছে খোঁপা, মুখ তোলো দেখনহাসি
তোমার টিকলি হয়ে হৃদপিণ্ড নড়ে দুরু দুরু।
(সোনালি কাবিন ১৩)

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোতে লাজে নম্র, কম্পিত এক নববধূর আদলে যেন জসীমউদ্‌দীনের নারীকাঠামোকেই মনে পড়ে। বিশেষ করে কম্পিত বেতসের মতো শরমে আনত মুখ ও শরীরে জসীমউদ্‌দীনের নারীরাই মানসকল্পে ভেসে ওঠে। আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১৫) এই দুই কবির নারীভাবনা নিয়ে লিখেছেন:

> জীবনানন্দ দাশের *বনলতা সেন* এর 'বনলতা সেন', 'সবিতা', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কবিতা শেষ পর্যন্ত নারী-উত্তর। বনলতা সেন নারীই বটে, হয়তো শাশ্বত নারী;–কিন্তু সেখানেও কিরকম দূরতর গভীরতর আবছায়া লুটিয়ে থাকে। কিন্তু 'সুচেতনা' কি নারী? 'শ্যামলী' কি নারী? 'সবিতা' কি নারী? আমরা জীবনানন্দের নারী আর বিশ্ববোধের মধ্যে কোনো ফারাক করতে পারি না যেন। অন্যপক্ষে জসীমউদ্‌দীনের নারী–দেহিনী নারী, পার্থিব নারী। 'বেদেনী', 'চাষির মেয়ে' 'বস্তির মেয়ে'–এসব নাম থেকেই প্রকাশিত জসীমউদ্‌দীনের নারী কোন জগতের। 'শাহজাদি' বা 'রাজার কুমারী' যে-সব কবিতার নাম তার নায়িকাও সুদূরিকা নয়–রাজার প্রাসাদেও একটি মহলে সুগন্ধি আলো জ্বলছে, আর রাখাল ছেলের মেঠো বাঁশি বাজছে।...জসীমউদ্‌দীনের লৌকিক সত্তাটিই তাঁর কেন্দ্র। (পৃ. ৪৩৮)

সমালোচকের এই মন্তব্য দিয়েই পাঠক বেশ ভালোভাবে এই দুই কবির নারীভাবনার সঙ্গে আল মাহমুদের নারীকে আলাদা করে পড়তে পারেন। জসীমউদ্‌দীনের পার্থিব নারী আর জীবনানন্দের

আইডিয়ার ধারক বিষন্ন, মৃত্যুময়, কাল থেকে কালান্তরে পরিক্রান্ত নারীদের তুলনায় আল মাহমুদের *সোনালি কাবিন* এর নারী অনেক বেশি সজীব-রক্তমাংসের মানবী।

আল মাহমুদের সমসাময়িক পঞ্চাশ দশকের কবি শামসুর রাহমান এবং সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় নারী যেভাবে উঠে এসেছে, সেটি সংক্ষিপ্তরূপে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। কবি শামসুর রাহমানের কবিতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নাগরিক নারীর শরীরের তীব্র বর্ণনা। নারীর মোমের মতো মদির আগুনে উজ্জ্বল উরু (কোনো পরিচিতাকে), উঁচু বুকের সঙ্গে টসটসে ফলের উপমা (বিনী), ফ্রকের অন্তরালে উন্মীলিত হিরন্ময় মসৃণ ত্বক (যে আমার সহচর) ইত্যাদি কবিতায় নারীকে প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়জ করে তোলা হয়েছে। এছাড়া "তোমাকে দেখে", "পাশাপাশি" কিংবা "এক মহিলার ভাবনা", "দরজার কাছে", কবিতাতেও নারী কামনামদির এক শরীরের ধারক। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে:

সাবানে ঘষছো তুমি বগলের সবুজাভ ভূমি
সরার মতো স্তন, নাভিমূল, উরু
এবং ত্রিকোণ মাংসপিণ্ড, কী মঞ্জুল
(পাশাপাশি)

এইসব কবিতায় নারীকে কেন্দ্র করে কবির অবদমিত যৌনাকাঙ্ক্ষার তীব্র প্রকাশ লক্ষ করা যাবে। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতায় নারীকে কবি প্রবলভাবে শরীরী বর্ণনায় কেন্দ্রীভূত করেছেন।

অন্যদিকে, সৈয়দ শামসুল হকের *পরানের গহিন ভিতর* কাব্যে কবি নারীকে বিরহী আকুলতায় উন্মত্ত করে তুলেছেন। একজন গ্রামীণ নারীর শাশ্বত প্রেমাভিজ্ঞতার আকুলতা প্রকাশিত এ কাব্যে। সেইসঙ্গে আশ্রয়প্রত্যাশী এক প্রণয়ী নারীর আকাঙ্ক্ষার অনুরণনও ঘটেছে, যেখানে নারীর দেহসৌন্দর্য মুখ্য হয়ে ওঠে:

গোক্ষুর লতায়া ওঠে যুবতীর চুলের খোঁপায়।
বুকের ভিতর লাফ দিয়া ওঠে যে চিক্কুর,
আমি তার সাথে দেই শিমুলের ফুলের তুলনা,
(১০ সংখ্যক সনেট, পরানের গহিন ভিতর)

এছাড়া দেহজ সৌন্দর্যের বর্ণনায় কবিতার প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি নারীকে শরীরী প্রেমে বর্ণনা করেছেন। 'দেহকে বাদ দিয়ে নয়, আবার রিরংসা প্রবৃত্তিতে আত্মসমর্পণ নয়, কাব্যকল্যাণ ও সৌন্দর্যসৃষ্টির মাহিমায় তাঁর কবিতা ভাস্বর'। (ইসমাইল, ২০১৮, পৃ. ৭১) উদাহরণ:

জঙ্ঘার নীচে গুটিয়ে সনখ সুন্দর দুটো পা,
বাম হাতে খুলে দিলে খোঁপা—

যেন এক জাহাজডুবির পর নোনাজলে ভাসছি সারারাত,
সুদীর্ঘ চুলের রশি ছুড়ে দিলে তুমি অকস্মাৎ
তারপর দু'চোখে সাগর ডেকে বললে 'অ-বি
রা-ম তোমার জন্ম হয়। তুমি কবি ॥'
(১ সংখ্যক কবিতা, এক আশ্চর্য সঙ্গমের স্মৃতি)

শহীদ কাদরীর নারীরা অধিকাংশই নাগরিক নারী, যেহেতু নগর ছিল কাদরীর প্রাণ। বোদলেয়ারের একটি কবিতাভাবনার অনুরণন ঘটেছে তাঁর "নর্তকী" কবিতার মধ্যে, যেখানে তিনি তাঁর প্রেমিকাকে দেখেছেন স্বর্গের ডাইনির রূপকে। এই নারীর শরীরী সৌন্দর্য ধারালো এবং গতিময়। শুধু এই কবিতাই নয়, "আলোকিত গণিকাবৃন্দ" কবিতাও আমাদের কল্পনাকে ধাক্কা দেয়; নারীকে, বিশেষত প্রান্তিক নারীকে তিনি 'রুগ্ণ গোলাপদল' আর 'অনিদ্র চোখের অপ্সরা' এবং 'কালো ময়লার সৌরভ'রূপে কল্পনা করেছেন। এভাবে নারীকে দেখবার দৃষ্টিকোণ তিনি সম্ভবত বোদলেয়ারের কাছ থেকে পেয়েছেন। প্রায়শই তাঁর ভাবনাজগতে উঠে এসেছে নগরবাসিনী অন্ধকারের নারীরা। উদাহরণঃ

যেন সমুদ্রোচ্ছ্বাস তার বাহুতে, কটিতে
জঙ্ঘার আলোড়নে, নিতম্বের তৃষ্ণার্ত তরঙ্গে
তলোয়ারের মতো কিংবা ধারালো চাঁদের মতো
চোখের আঁধারে ঐ স্বর্গের ডাইনি যেন গতির পুলকে
কী তীব্র জ্যোৎস্না হেনে যায়
কী তীব্র জ্যোৎস্না হেনে যায় ॥

(নর্তকী)

যে রুটিতে ঝরে না ঝর্নার মতো, মেশে না তোমার
স্তনের লবণ আমি তাকে কোথাও দেখি না,...

(টেলিফোনে আরক্ত প্রস্তাব)

শহীদ কাদরীর নারীভাবনা নিয়ে সমালোচক মন্তব্য করেছেনঃ

> নারীর রক্তমাংসের অস্তিত্বকে কবি পরম স্পর্শন-ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করেছেন। কবির কল্পনার নান্দনিক ভূগোলে নারীর দেহ বায়বীয় নয়, অধরা নয়, অস্পষ্ট নয়, তাতে যেন থাকে স্পর্শের, ঘ্রাণের, আস্বাদের রূপকল্প। তাই কি নারী, কি প্রেমিকা, কি স্ত্রী, কি বারবণিতা, কি আলুলায়িত কুন্তলা বিদেশিনী, কি মধ্যরাতের পার্কে ধর্ষিতা কোনো বালিকা–কেউই আর কবির কলমে মাখনের মতো গলে যায় না,...তারা থাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের স্তরীভূত বায়ুমণ্ডলে মাংসের হিল্লোলের কাছে... (ঝর্ণা, ২০১৬, পৃ. ৬১)

মধ্যপঞ্চাশের এইসব শক্তিমান কবিদের কাব্যে নারীর শরীরজ চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। নারীকে তাঁরা অনেকাংশেই পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, যেখানে আল মাহমুদ তাঁর নারীকে বাঙালির মাতৃতান্ত্রিক ঘরানার স্বাধীন বর্ণে উজ্জ্বল করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি *সোনালি কাবিন* কাব্যের নারীকাঠামো নির্মাণে আবহমান বাংলার অনার্য নারীর সৌন্দর্যকে আত্মস্থ করেছেন এবং প্রবল মমতায় তাঁকে কবিতায় গ্রন্থিত করেছেন।

আল মাহমুদের *সোনালি কাবিন* কাব্যটি বাংলা কাব্যজগতের এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। কেননা, প্রকৃতির কোমলতা, মৃত্তিকার ভাজ, নদীর নিতল আর তার বঙ্কিম পার, শস্যের সুবাস, প্রাকৃত জীবনের আদিমতা, কখনও কখনও আত্মজীবনের প্রচ্ছায়া এবং সেই সঙ্গে বাঙালির নির্জ্ঞানচেতনায় বয়ে বেড়ানো আদিমাতাদের পুণ্যস্মৃতি ও তাদের গাঢ়বদ্ধ অভিজ্ঞানের মিথস্ক্রিয়ায় এ কাব্যের নারী কাঠামো নির্মিত। নারীকে তিনি যেভাবে এঁকেছেন এই কাব্যে, তাতে কোথাও কোথাও যৌনগন্ধী, কামকেলী-পরায়ণা এক নারীমূর্তির আদল সুস্পষ্টরূপে অবয়ব পেলেও

অশ্লীলতার পরিবর্তে সেটি জীবনের সহজাতধর্মকেই প্রকাশ করে। সভ্যতার বিভেদ সৃজনে যে পরাক্রমশালী শক্তির নেতিবাচক উত্থান ঘটছে, কবি এই নারীর প্রণয়ে বিশ্বাস রেখেই সেই বিভেদের বেড়াজাল ভাঙতে চেয়েছেন। কালে কালে বেহুলা-সতী-খনার মতো প্রাকৃতমন্ত্রে উজ্জীবিত, প্রবল প্রাণশক্তির আধার হিসেবে নারীকে অবলোকনের এক উদার দৃষ্টিভঙ্গি পাঠক *সোনালি কাবিন* কাব্যেই পেয়ে যান। প্রেম-কাম-নিসর্গের মিথষ্ক্রিয়ায় এভাবেই এ কাব্যে নির্মিত হয়েছে নারীর এক অনবদ্য শিল্পকাঠামো।

উল্লেখপঞ্জি

আল মাহমুদ (১৯৯৪)। "আমি ও আমার কবিতা", *উপমা* (আল মাহমুদ সংখ্যা), মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন সম্পাদিত, চট্টগ্রাম, পৃ. ৫

মহীবুল আজিজ (২০১৯)। "আল মাহমুদের কবিতা: সত্তার ভারমুক্ততার ভাষ্য", *কালি ও কলম*, ষোড়শ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, পৃ. ৬

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৯৪)। "আল মাহমুদের সাম্প্রতিক কবিতা", *উপমা* (আল মাহমুদ সংখ্যা), মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন সম্পাদিত, চট্টগ্রাম, পৃ. ৭১

শাহিন সৈয়দ (১৯৮৮)। "সোনালি কাবিন; আল মাহমুদের কৃতি ও বিশ্বাস", *একবিংশ-৪*, খোন্দকার আশরাফ হোসেন সম্পাদিত, ঢাকা, পৃ. ৫৫

Eliot T. S. (1932). "Tradition and the Individual Talent", *T. S. Eliot Selected Essays 1917–1932,* New York: Harcourt, Brace and Company, p. 4

অনু হোসেন (১৯৯৬)। *বাংলাদেশের কবিতা প্রসঙ্গে*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ২৯-৩০

সুস্মিতা চক্রবর্তী (২০০৮)। "বাংলাদেশের 'আধুনিক' কবিতায় নারী যখন নির্মিত হয় 'পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের' আলোকে", available: https://thotkata.com/2013/06/02/বাংলাদেশের-আধুনিক-কবিত/, গৃহীত: ফেব্রুয়ারী ১৫, ২০১৯

হুমায়ুন আজাদ (২০০১)। *নারী*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, পৃ. ৫৩

রাশেদ মিনহাজ (১৯৮৮)। "দ্রোহ, যৌনতা, সোনালি কাবিনের অলঙ্কার ও বিবিধ", *একবিংশ-৪*, খোন্দকার আশরাফ হোসেন সম্পাদিত, ঢাকা, পৃ. ৫৯

শান্তনু কায়সার (১৯৮৮)। "কালের অক্ষর ও আল মাহমুদের সোনালি কাবিন সনেটগুচ্ছ" *একবিংশ-৪*, খোন্দকার আশরাফ হোসেন সম্পাদিত, ঢাকা, পৃ. ৫১

অদিতি ফাল্গুনী (২০১৪)। "নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব, লুপ্ত অতলান্তিক ও ভবিষ্যত বিনির্মাণ", *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, বেগম আকতার কামাল সম্পাদিত, (ঢাকা: অবসর, ২০১৪), পৃ. ২৬৪

মোহাম্মদ আজম (২০১৯)। "'সোনালি কাবিন' সনেটগুচ্ছ ও আল মাহমুদের কাব্যিক প্রকল্প", available: https://www.porospor.com/গদ্য/সোনালি-কাবিন-সনেটগুচ্ছ/, গৃহীত: মার্চ ১২, ২০১৯

সুমিতা চক্রবর্তী (১৯৯৪)। "আল মাহমুদের কবিতা: পার্থিব সংযোগ", *উপমা* (আল মাহমুদ সংখ্যা), মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন সম্পাদিত, চট্টগ্রাম, পৃ. ৫৬

মাহবুব সাদিক (২০১০)। *জীবনানন্দ: কবিতার নান্দনিকতা*, ঢাকা: নবযুগ, পৃ. ১০৬

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১৫)। "ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শহীদ কাদরী", *আবদুল মান্নান সৈয়দ রচনাবলি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, অনু হোসেন সংকলিত ও সম্পাদিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৪৩৮

ইসমাইল সাদী (২০১৮)। *সৈয়দ শামসুল হকের কবিতায় প্রেম ও নিসর্গ*, ঢাকা: অন্বেষা, পৃ. ৭১

ঝর্না রহমান (২০১৬)। "শহীদ কাদরীর কবিতায় শরীরী চিত্রকল্প", *অভিবাদন শহীদ কাদরী*, শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ৬১

তাওফিকুল হাকিম ও তাঁর নাটক আহলুল কাহফ

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম*

সার-সংক্ষেপ: প্রাচীন কালে দাকিউনুস নামে এক বাদশা ছিলেন। তিনি ছিলেন মূর্তিপুজক এবং খ্রিষ্টধর্মের শত্রু। মারনুশ এবং মিশলিনিয়া নামে তাঁর দুই মন্ত্রী এবং তাঁর বাড়ির চাকর ইয়ামলিখা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। বাদশার অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেতে তারা তরসুস শহরের সন্নিকটে রকিম পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেয়। কিতমির নামে ইয়ামলিখার কুকুরটাও তাদের সাথে যায়। কুকুরটা গুহার দরজায় বসে তাদেরকে পাহারা দেয়। তারা সেখানে তিনশত বছরের অধিক সময় ঘুমিয়ে থাকে। ঘুম থেকে জেগে ওঠে তারা শহরে পরিবর্তন দেখতে পায়। শহরের সকল কিছুই তাদের অপরিচিত মনে হয়। তারা পুনারায় গুহায় ফিরে যায়। এবং সেখানেই তারা চিরনিদ্রায় শায়িত হয়। পবিত্র কুরআনের সুরা কাহফে বর্ণিত ঘটনা অবলম্বনে মিসরের নাট্যকার তাওফিকুল হাকিম *আহলুল কাহফ* (গুহাবাসী) নাটকটা রচনা করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে *আহলুল কাহফ* নাটক সম্পর্কে পর্যালোচনা করার পূর্বে তাওফিকুল হাকিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী, আরবি সাহিত্যে তাঁর অবদান, তাঁর স্বাতন্ত্র্য সূচক বৈশিষ্ট্য বর্ণনাসহ এর সারমর্ম উল্লেখ করা হয়েছে।

তাওফিকুল হাকিমের পরিচিতি

তাওফিকুল হাকিম 'আল-কিসসাহ' ম্যাগাজিনের প্রথম সম্পাদক (নিযার এবং রিয়াদ, ১৯৯৯, পৃ. ৫৮) এবং আধুনিক মিসরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। তিনি একাধারে সাংবাদিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, জীবনীকার, প্রবন্ধকার এবং কবি। নাট্যসাহিত্যে তাঁর অবদান অসাধারণ। মিসর সমাজ ব্যবস্থার নানা ঘটনার চিত্রায়ণে তাঁর নাটক সমৃদ্ধ। সমকালে প্রচলিত নাট্যকারদের নাটক রচনার ধারা থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্ন ধারায় তিনি *আহলুল কাহফ* নাটকটি রচনা করেন। এতে তিনি সুরা কাহফে বর্ণিত বাস্তব ঘটনার সাথে তাঁর কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাই, স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এ নাটকটি কাল্পনিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত।

তাওফিকুল হাকিম মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ৯ অক্টোবর ১৮৯৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন (ইসমাঈল এবং ইবরাহিম, ১৯৯৮, পৃ. ১৪; নিযার এবং রিয়াদ, ১৯৯৯: ৫৮)। তাঁর পিতা ইসমাঈল বেক আল-হাকিম ছিলেন মিসরের ধনাঢ্য কৃষক পরিবারের সন্তান। ইসমাঈল ইতাইল বারুদের সন্নিকটে বুহায়রা জেলার দালান্জাত শহরে বিচার বিভাগে কাজ করতেন। বুহায়রা অঞ্চলের তিনশত একর কৃষিজমি তাঁর মাতার (তাওফিকের দাদির) কাছ থেকে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। তাওফিকের মা ছিলেন তুরস্কের অবসরপ্রাপ্ত একজন সামরিক অফিসারের দুহিতা। তাঁর মা অভিজাত পরিবারের মেয়ে হওয়ার কারণে তাঁর চলন-বলন-মেধা-মনন ছিল তাওফিকের পরিবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি কামনা করতেন তাঁর সন্তান কুলশীল হউক। তিনি তাওফিকের কৃষকপরিবার এবং তাঁর সমবয়সি ছেলে মেয়েদের সাথে তাঁকে মিশতে দিতেন না এই ভয়ে যে, তাঁর মানসিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটতে পারে। তাওফিক সচ্ছল ও অনুকূল পরিবেশে বড় হতে থাকেন।

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাত বছর বয়সে মিসরের দামানহুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর পিতা তাঁকে ভর্তি করে দেন। ১৯১৫ সন পর্যন্ত তিনি সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। চারুশিল্প ও সংগীতের প্রতি তাঁর ঝোঁকপ্রবণতা ছিল প্রবল, আর পড়াশোনা বিশেষ করে সাহিত্য, ছড়া, কবিতা এবং ইতিহাসের বই-ই যেন ছিল তাঁর নিত্য দিনের খেলার সাথি। দামানহুরে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল না থাকায় তাঁর চাচাদের সাথে তাঁর পিতা তাঁকে মিসরের রাজধানী কায়রোতে পাঠিয়ে দেন। শান্তস্বভাবসুলভ পনের বছরের বালক তাওফিক কায়রোতে আবদ্ধ জীবন থেকে নিস্কৃতি পান এবং মুক্ত ও স্বাধীন জীবন লাভ করেন, যা তাঁর ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তিনি চাচাদের তত্ত্বাবধানে কায়রোর মুহাম্মদ আলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। বিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠিদের মতো দৌড়াদৌড়ি, লম্ফঝম্ফ এবং বস্তুগত কোন খেলাধুলা করতে না পারলেও তিনি বুদ্ধিভিত্তিক খেলাধুলা, প্রেমবিষয়ক কবিতা পাঠ, বির্তক এবং কল্পনাজগত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাওফিক যে বাসায় থাকতেন তার পার্শ্ববর্তী বাসা ছিল অবসরপ্রাপ্ত এক ডাক্তারের। তার ছিল ১৭ বছর বয়সের এক ছলাকলাকারিণী সুন্দরী তরুণী, যে তাওফিকের ফুফুর কাছে আসা-যাওয়া করার সুবাদে তাওফিকের সাথে সময় কাটাতো। তাওফিক মেয়েটিকে গান শুনাতেন, আর মেয়েটি তাকে গিটার বাজানো শিখাতো। এক সময় তাওফিক মেয়েটির প্রেমে পড়লেও যখন বুঝতে পারলেন তাঁর প্রতি মেয়েটির আগ্রহ নেই, তখন তার থেকে বিমুখ হয়ে পড়াশোনায় মনোযোগ দেন (ইসমাঈল এবং ইব্‌রাহিম, ১৯৯৮, পৃ. ৬২-৬৫)।

১৯১৯ সনে মিসরে জাতীয় বিপ্লব শুরু হয়। তিনি তাঁর চাচাদের সাথে এ বিপ্লবে জড়িয়ে পড়েন। সরকারের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র করছে এই অজুহাতে সামরিক সরকার তাদেরকে গ্রেফতার করে সামরিক দুর্গে আটক করে রাখে। তাওফিকের পিতা এ সংবাদ পেয়ে দ্রুত কায়রোতে যান এবং অর্থের বিনিময়ে সন্তান ও ভাইদেরকে ছেড়ে দিতে সামরিক সরকারের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু সরকার সে আবেদন নাকচ করে দেয়। অবশেষে তাঁর পরিচিত সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ এবং তদবির করে তাদেরকে দুর্গ থেকে সামরিক হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে তিনি সক্ষম হন। মিসরের জাতীয় বিপ্লব শান্ত হওয়ার পর সামরিক সরকার তাদেরসহ সকল বন্দিকে মুক্ত করে দেয় (ইসমাঈল এবং ইব্‌রাহিম, ১৯৯৮ : ৬৭)।

১৯২০ সনে তিনি আবার পড়াশোনায় মনোযোগ দেন এবং ১৯২১ সনে অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর পিতার আগ্রহের কারণে পরবতীকালে তিনি আইন কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করেন। আইন পড়া অবস্থায় তিনি ১৯২২ সনে *আল-আরিস*, *আল-মারআতুল জাদিদাহ*, *খাতামু সুলায়মান* এবং *আলি বাবা* ইত্যাদি নাটক লেখেন। নাটকগুলো ওকাশা ব্যান্ড আজবেকিয় থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। ১৯২৫ সনে তিনি আইন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করার পর প্রসিদ্ধ কোনো এক আইনবিদের দফতরে কিছুদিন আইন চর্চা করেন। মিসরের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে তাঁর পরিবারের সুসম্পর্ক ছিল। ফলে প্যারিস শিক্ষা মিশনে দায়িত্বরত কোনো এক কর্মকর্তার সহযোগিতায় উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁর পিতা তাঁকে প্যারিসে পাঠাতে সক্ষম হন। পিতার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে তিনি আইন বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করবেন এবং দেশে ফিরে প্রতিষ্ঠিত কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করবেন। তাওফিক আইন পড়া বাদ দিয়ে প্যারিসের লুভর জাদুঘর, সিনেমা হল এবং নাট্যশালা পরিদর্শন করেন। এসময় সংগীতের প্রতি ঝোঁকপ্রবণতা তাঁর বেড়ে যায়। তিনি লুডউইগ ভ্যান বিটোফেন (১৭৭০-১৮২৭), উলফগ্যাং আমাডেউস মোৎসার্ট (১৭৮৭-

১৮১৯), রবার্ট সুমান (১৮১০-১৮৫৬) এবং ফ্রানজ পিটার সুবার্ট (১৭৯৭-১৮২৮) প্রমুখ সংগীত শিল্পীদের সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নাট্যমঞ্চ ও রয়েল অপেরা হাউসে নিয়মিত যাওয়া-আসা করেন। ইউরোপের ছোটগল্প এবং নাট্যসাহিত্য অধ্যয়নের পাশাপাশি তিন বছর তিনি বিশ্বসাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এতে তিনি আবিস্কার করলেন যে, ইউরোপে নাট্যশিল্প পূর্ণরূপেই বর্তমান, যা গ্রিক নাট্যশিল্পের মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তিনি প্রাচীন গ্রিক নাট্যসাহিত্য অধ্যয়নে সময় ব্যয় করেন এবং *আমামা শুব্বাকিত্ তাযাকুর* নাটকটি লেখেন (ইসমাঈল এবং ইব্রাহিম, ১৯৯৮ : ১৪)। গ্রিক সাহিত্যের রূপকাহিনি ও গ্রিক মহাকাব্য পাঠ করে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতালোক প্রসারিত করেন। গ্রিক সাহিত্যের কোনো এক স্থানে তিনি ফুটবল খেলোয়াড় সম্পর্কে একটি মন্তব্য লক্ষ করেন, তা হলো, 'কিছু ফুটবলার বিশ বছরের আগেই কয়েক মিলিয়ন পাউণ্ডের মালিক বনে যান'। এ কারণে তিনি বলতেন, 'কলমের যুগ শেষ, ফুটবলের যুগ শুরু। একেশ্বরবাদ আখেনাতুনের সময়ও একজন ফুটবলার এক বছরে যা উপার্জন করে মিসরের সমস্ত সাহিত্যিক তা উপার্জন করতে পারেন না'।

১৯২৭ সনে তাঁর মাতা-পিতা তাঁকে স্বদেশে ফিরে আসতে বলেন। তাওফিকুল হাকিম ডক্টরেট ডিগ্রি না নিয়েই ১৯২৮ সনে মিসরে ফিরে আসেন এবং ১৯৩০ সনে আলেকজান্দ্রিয়ার মিশ্রআদালতে এটর্নি জেনারেলের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। এসময় তিনি *ইয়াওমিয়্যাতু নায়িব ফিল আরইয়াফ* গ্রন্থ; *আহলুল কাহফ*, *শাহারজাদ* এবং *আহলুল ফান্ন* প্রভৃতি নাটকসহ 'আওদাতুর রুহ', 'উসফুরুন মিনাশ শারক' এবং 'আল-কাসরুল মাসহুর' ইত্যাদি গল্প রচনা করেন। এরপর তিনি কিছুদিন দেওয়ানি আদালতে কাজ করেন। ১৯৩৪ সনে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হন এবং নিরীক্ষণ ও তদন্তবিষয়ে তদারকের দায়িত্ব পালন করেন (ইসমাঈল এবং ইব্রাহিম, ১৯৯৮, পৃ. ১৪; ইউসুফ, ২০০৩, পৃ. ৯৫)। ১৯৩৭ সনে তাঁকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সংগীত ও নাট্যকলা বিভাগের পরিচালক করা হয়। এরপর তিনি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিচালক পদে আসীন হন। ১৯৪৪ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করলেও মিসর সরকার তাঁকে ১৯৫৪ সনে দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যার (বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের) পরিচালক বানান। এই বছরই তিনি মাজলিসুল লুগাতিল আরাবিয়্যার (আরবি ভাষা একাডেমির) সদস্য নির্বাচিত হন (নিযার এবং রিয়াদ, ১৯৯৯ : ৫৮)।

১৯৫৬ সনে সাহিত্য ও শিল্পকলার তত্ত্বাবধানের জন্য সুপ্রিম কাউন্সিলের অতিরিক্ত সদস্য হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। এবং ১৯৫৯ সনে তিনি পেরিসের ইউনেস্কো-এ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬০ সনে মিসরে চলে আসেন এবং 'আহরাম' পত্রিকার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭১ সনে তাঁকে পত্রিকাটির পরিচালনা পর্ষদের সদস্য করা হয়। ১৯৪৬ সনে অর্থাৎ চল্লিশ বছর বয়সে তিনি এক রমণীর পাণি গ্রহণ করেন। তিনি ইসমাঈল এবং যায়নব এই দুই সন্তানের জনক হন। অবশেষে মিসরের এই লেখক, কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার ২৬ জুলাই ১৯৮৭ সনে মিসরের রাজধানী কায়রোতে ইন্তেকাল করেন (ইসমাঈল এবং ইব্রাহিম, ১৯৯৮, পৃ. ৭০; ইউসুফ, ২০০৩, পৃ. ৯৫; সালমান, ২০০৩, পৃ. ৫০২-৫০৩)। মৃত্যুর পরও তাঁর সাহিত্য বিশেষ করে আরবি নাটক বিশ্বসাহিত্যে নিজস্ব স্বকীয়তায় বিরাজমান।

আরবি সাহিত্যে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ :

কাব্য

১. আশআরু তাওফিকিল হাকিম (أشعار توفيق الحيكم): এ গ্রন্থে আরবি ও ফরাসি ভাষার কবিতা সন্নিবেশিত হয়েছে।

২. রিহলাতুর রাবি' ওয়াল খারিফ (رحلة الربيع والخريف) : ১৯৬৪ সনে মিসরের মাকতাবাতুল আদাব প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত।

নাটক

৩. আল-আরিস (العريس) (১৯২৪), আলি বাবা (على بابا) (১৯২৬), আহলুল কাহফ (أهل الكهف) (১৯৩৩), শাহারযাদ (شهرزاد) (১৯৩৪), বারাক্সা আও মুশকিলাতুল হুকম (براكسا أو مشكلة الحكم) (১৯৩৯), পেগমালিয়ুন (بجماليون) (১৯৪২), সুলায়মান আল-হাকিম (سليمان الحكيم) (১৯৪৩), আল-মালিক ঊদাইব (الملك أوديب) (১৯৪৯), মাসরাহুল মুজতামি (مسرح المجتمع) (১৯৫০), আস-সফাকাহ (الصفقة) (১৯৫৬), আশওয়াকুস সালাম (أشواك السلام) (১৯৫৭), রিহলাতুন ইলাল গাদ (رحلة إلى الغد) (১৯৫৭), লুবাতুল মাউত (لعبة الموت) (১৯৫৭), আল-আয়দি আন নায়িমাহ (الأيدي الناعمة) (১৯৫৯), আস-সুলতানুল হায়ির (السلطان الحائر) (১৯৬০), ইয়া তলিআশ শাজারাহ (يا طالع الشجرة) (১৯৬২), আত-তআম লি কুল্লি ফামিন (الطعام لكل فم) (১৯৬৩), শামছুন নাহার (شمس النهار) (১৯৬৫), মাসিরু সরসর (مصير صرصار) (১৯৬৬) ও আল-ওয়ার্‌তাহ (الورطة) (১৯৬৬) ইত্যাদি।

উপন্যাস

৪. আওদাতুর রুহ (عودة الروح) (১৯৩৩), ইয়াওমিয়্যাতু নায়িব ফিল আরইয়াফ (يوميات النائب في الأرياف) (১৯৩৭), উসফুরুন মিনাশ শারক (عصفور من الشرق) (১৯৩৮) ও আর-রিবাতুল মুকাদ্দাস (الرباط المقدس) (১৯৪৪)।

পুস্তিকা

৫. আহদুশ শায়তান (عهد الشيطان) (১৯৩৮), তাহতা শামসিল ফিক্‌র (تحت شمس الفكر) (১৯৩৮), তাহতাল মিসবাহিল আখদার (تحت المصباح الأخضر) (১৯৩৯), রাকিসাতুল মাবাদ (راقصة المعبد) (১৯৩৯), সুলতানুয যলাম (سلطان الظلام) (১৯৪১), মিনাল বুরজিল আজি (من البرج العاجى) (১৯৪১), হিমারি কালা লি (حماري قال لي) (১৯৪৫) ও তাআম্মুলাত ফিস সিয়াসাহ (تأملات في السياسة) (১৯৪৫)।

অন্যান্য গ্রন্থ

৬. যাহরাতুল উমর (زهرة العمر) (১৯৫২), আসাল হামিক (عصا الحكيم) (১৯৫৪), আত-তাআদুলিয়্যাহ (التعادلية) (১৯৫৫), আদাবুল হায়াত (أدب الحياة) (১৯৫৯), কুলতু যাতাল ইয়াওম (قلت ذات اليوم) (১৯৭০), ছাওরাতুশ শাবাব (ثورة الشباب) (১৯৭৭) ও শাজারাতুল হুকমিস সিয়াসিয়্যি ফি মিসর ১৯১৯-১৯৭৯ (شجرة الحكم السياسي في

(مصر 1919-1979م) (১৯৮৫) প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক দশটি প্রবন্ধ রয়েছে (ইসমাঈল এবং ইব্‌রাহিম, ১৯৯৮ : ৭০; নিযার এবং রিয়াদ, ১৯৯৯ : ৫৮)।

তাওফিকুল হাকিমের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য

তাওফিকুল হাকিম আধুনিক কালে আরবি উপন্যাস এবং নাটক লেখার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সর্বপ্রথম আরবি কাল্পনিক নাটক রচনা করেন। আহমদ লুৎফি আস-সায়্যিদ (১৮৭২-১৯৬৩) তাঁকে বলেছিলেন, 'আন্তা শায়খু তরিকাহ' আপনি হলেন (আরবি নাট্যসাহিত্য পথের) প্রধান ব্যক্তি (তাওফিক, ২০৭)। তাঁর লেখনির মাঝে তিনি স্পষ্ট করে প্রতীকী এবং বাস্তবতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এ কারণে তাঁর নাটক অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর নাটকের ভাষা সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল। তাতে জটিলতা এবং অস্পষ্টতা বলতে কিছু নেই। তিনি অল্প কথায় বিস্তর জিনিস সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁর নাটকগুলো কল্পনা এবং গভীর ভাবার্থের গুণে গুণান্বিত। নাট্যসাহিত্যে তাঁর অবদান, উপন্যাস শিল্পে তাঁর সাধনা, আরবি জীবনী সাহিত্যে তাঁর নিদর্শন, প্রবন্ধমালা, চিঠিপত্র, সংলাপ, কবিতাগুচ্ছ, ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা, রাজনীতি ও ইতিহাস বিষয়ক নিবন্ধনমালা ইত্যাদি তাঁর জ্ঞানের বিশালতা এবং বিরল প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তিনি প্রাচ্য জ্ঞানের সাথে পাশ্চাত্যের শিল্প-সাহিত্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। সমকালে নাটক রচনায় যারা কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, আহমদ মুহার্‌রম (১৮৭৭-১৯৪৫), আহমদ শাওকি (১৮৬৮-১৯৩২), জুবরান খলিল জুবরান (১৮৮৩-১৯৩১), খলিল মুতরান (১৮৭২-১৯৪৯), মুহাম্মদ রশিদ হাফিজ, শিবলি মুলাত (১৮৭৫-১৯৬১), তাওফিকুল হাকিম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাওফিকুল হাকিম *আহলুল কাহফ* নাটকের কারণে আধুনিক আরবি নাট্যসাহিত্যে ঈর্ষনীয়স্থান দখল করে আছেন।

আহলুল কাহফ নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্র

আল কুরআনের সুরা কাহফে বর্ণিত গুহাবাসীদের ঘটনা অবলম্বনে *আহলুল কাহফ* নাটক রচিত। এ নাটকে মারনুশ ও মিশলিনিয়া চরিত্র দুটি খ্রিষ্টধর্মের শত্রু জালেম বাদশা দাকিউনুসের মন্ত্রী। এ মন্ত্রীদ্বয় গোপনে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের ব্যাপারে বাদশা একদিন জেনে যান যে, তাঁরা খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী। তাঁর কবল থেকে বাঁচার জন্য তাঁরা রাজদরবার থেকে পালিয়ে যান। ইয়ামলিখা চরিত্রটি বাদশার রাখাল। সে-ও খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। মারনুশ ও মিশলিনিয়া যখন পালিয়ে যান, তখন সে তাঁদের সঙ্গ নেয়। সাথে ছিল তার কিতমির নাক একটি কুকুর। তাঁরা তিন জনই জীবন ও ধর্ম রক্ষার্থে রকিম পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন। সেখানে তাঁরা তিনশত বছর ঘুমিয়ে থাকেন। রাজকুমারী পেরিস্কা চরিত্রটি অকৃত্রিম প্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সে মিশলিনিয়ার প্রেমে পড়ে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। মিশলিনিয়া চলে যাওয়ায় আমৃত্যু সে কুমারী থাকে। ঈমানদার বাাদশা (থিয়োডিয়াস) চরিত্রটি তিনশত বছর পরে এই গুহাবাসীকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখেন। এ নাটকে গালিয়াস চরিত্রটিও উল্লেখযোগ্য। বাদশা থিয়োডিয়াসের গৃহ শিক্ষক তিনি। তিনি বাদশার কন্যা পেরিস্কাকে এই গুহাবাসী সম্পর্কে নানা ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আরেকটি চরিত্র (থিয়োডিয়াস) এর কন্যা পেরিস্কা। তিনশত বছর পূর্বের পেরিস্কার নামে তার নাম রাখা হয়। রূপে গুণে, সুরতে আগের পেরিস্কার মতোই সে। তার পিতা গুহাবাসীকে রাজদরবারে নিয়ে

আসেন। মিশলিনিয়া তরসুস শহর এবং রাজদরবারে পরিবর্তন দেখতে পেলেও পেরিস্কাকে আগের মতই দেখতে পান। তবে পেরিস্কার সাথে তিনি কথোপকথন করে বুঝতে পারেন যে, তাঁরা মূলত তিনশত বছর আগের লোক। তাঁরা পুনরায় গুহায় ফিরে যান। কিন্তু, এই পেরিস্কাও বাদশা দাকিউনুসের কন্যা পেরিস্কার প্রেমিক মিশলিনিয়ার প্রেমে পড়ে। সেও একদিন গোপনে গালিয়াসের সাথে রকিম পর্বতের গুহায় চলে যায় এবং সেখানেই তার জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। আহলুল কাহফ নাটক থেকে আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারি যে, নারী চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে নারীর হৃদয়ধর্ম নাট্যকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

আহলুল কাহফ নাটকের সারমর্ম

আহলুল কাহফ নাটক ১৯৩৩ সনে কায়রোর দারু মাতবাআতি মিসর থকে প্রকাশিত হয়। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৭। তাওফিকুল হাকিম নাটকে গুহাবসীদেরকে নিয়ে কল্পনায় বিচরণ করেছেন, যেন তাদের বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি জার্মানের স্নায়ুবিদ ও মনোবিজ্ঞানী সিগমন্ড সলেমো ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এ নাটকটি তিনি ফ্রয়েডের মন ও অবচেতন তত্ত্বের সূত্র প্রয়োগ করে রচনা করেছেন। গুহাবাসী অবচেতন অবস্থায় তিনশত বছর অতিবাহিত করেছে। ব্যক্তি জীবনে আবেগ অনুভূতির ভারসাম্যহীন ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে একদিক থেকে তিনি ফরাসি সাহিত্যিক আন্দ্রে জিদের (১৮৬৯-১৯৫১) হতাশা-নিরাশা, দুঃখ-বেদনা, ভবিষ্যত কামনা ও প্রেমাসক্তের চিন্তা এবং অন্যদিক থেকে ইতালির নোবেল বিজয়ী লেখক, কবি এবং নাট্যকার লুইজি পিরানডেলুর (১৮৬৭-১৯৩৬) বাস্তববাদের চিন্তা-চেতনার সমন্বয় ঘটিয়েছেন (ইসমাঈল এবং ইব্রাহিম, ১৯৯৮, পৃ. ৮৮)। তিনি Time and Space কে সমন্বয়সাধন করে *আহলুল কাহফ* নাটকের ঘটনার চিত্রায়ণে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, নিঃসন্দেহে তা নান্দনিক। *আহলুল কাহফ* নাটকটি চারটি অঙ্কে রচিত। নিচে *আহলুল কাহফ* নাটকের সারমর্ম উল্লেখ করা হলো:

তরসুস শহর সন্নিকটস্থ রকিম[১] পর্বতের ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় নতজানু হয়ে উপবিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির ছায়ামূর্তি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। গুহাদ্বারে সামনের পা প্রসারিত করে বসে আছে একটি কুকুর। মূর্তিপুজক বাদশা দাকিউনুস খ্রিষ্টধর্মের শত্রু। খ্রিষ্টধর্মের যাকে পায় তাকেই তিনি নির্যাতন এবং হত্যা করেন। তাঁর দুই মন্ত্রী মিশলিনিয়া এবং মারনুশ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। তারা বাদশার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রকিম পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেয়। চারণভূমিতে ছাগলের পাল রেখে তাদেরই অনুসরণ করে গুহায় উপস্থিত হয় দাকিউনুসের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী রাখাল ইয়ামলিখা। সেখানে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তখন তারা একে অপরকে প্রশ্ন করে 'তোমরা কত সময় এখানে অবস্থান করেছো'? প্রতি-উত্তরে অন্যজন বলে, 'আমরা একদিন কিংবা তার চেয়ে কিছু কম সময়'। তারা তাদের পিঠে ব্যথা অনুভব করে। মিশলিনিয়া গুহা থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। মারনুশ তাকে বারণ করে বলে, দাকিউনুসের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে হলে এখানে আরো দুই কিংবা তিন রাত আমাদের অবস্থান করা উচিত।

কিতমির নামের কুকুরটি ছাড়া রাখাল ইয়ামলিখার আর কেউ নেই। মিশলিনিয়া অবিবাহিত। রাজকুমারী পেরিস্কার সাথে প্রেম করে সে। মারনুশ বিবাহিত। তার এক পুত্র সন্তান আছে। লোকালয় থেকে নিরাপদ স্থানে তাদেরকে রেখে এসেছে সে। তারা যে খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী সে কথা

কেউ জানে না। এমনকি বাদশা দাকিউনুসও জানে না। বাদশা জানে না যে, স্বয়ং রাজকুমারী পেরিস্কা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। ঘটনা তখনই জানাজানি হয়, যখন মিশলিনিয়া রাজকুমারীর কাছে রাজার বাড়ির দাসীর মাধ্যমে একটি ছোট সোনার ক্রসসহ প্রেমপত্র পাঠায়। পত্রটি বাদশার হস্তগত হয়। বাদশা পেরিস্কাকে পত্রটি পড়ে শুনায়। তিনি তাকে কারারুদ্ধ করে বলেন, 'অচিরেই তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করা হবে'।

তাদের প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। শহর থেকে খাবার ক্রয় করে আনার জন্য ইয়ামলিখা মারনুশের কাছ থেকে টাকা নেয়। সে গুহা থেকে বের হয়ে প্রত্যক্ষ করে, দিনমণি মধ্যাকাশে। সূর্যালোক গুহায় পৌঁছায় না। সূর্যালোক গুহার অন্য দিক দিয়ে যাওয়া-আসা করে। গুহা থেকে কিছু দূর যাওয়ার পর সে এক অশ্বারোহী শিকারিকে দেখতে পায়। শিকার খরিদ করার জন্য তার কাছে রৌপ্যমুদ্রা পেশ করে সে। লোকটি তাকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। তার ঘোড়া পলায়ন করতে উদ্যত হয়। সে সোয়ারির লাগাম ধরে লোকটিকে থামিয়ে দিয়ে তার মুদ্রাগুলো দেখায়। সে তার কাছ থেকে একটা মুদ্রা নিয়ে বলে, 'এটা তো বাদশা দাকিউনুসের সময়কার মুদ্রা। তোমার কাছে আরো আছে কি'?। তার কাছে যা ছিল সবগুলো সে শিকারিকে দিয়ে দেয়। শিকারি তখন বলে, এগুলো কোথায় পেয়েছ তুমি? এগুলো তো প্রাচীন মুদ্রা। এগুলো গুপ্তধন। ইয়ামলিখা তখন তার কাছ থেকে মুদ্রাগুলো ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত কেটে পড়ে।

ইয়ামলিখার কাছ থেকে ঘটনাটি শুনার পর তারা বুঝতে পারে, এখানে তারা দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান করছে। তাদের গোঁফ, দাড়ি এবং হাতের নখ বড় হয়ে গেছে। তাদের মাথার চুল ধবধবে সাদা। নিজেদের এ অবস্থা দেখে ইয়ামলিখা বলল, সম্ভবত আমরা এখানে একমাস যাবত অবস্থান করছি। মিশলিনিয়া বলল, 'এখানে আমরা তিন দিন যাবত অবস্থান করছি। এখানে আমি আর থাকবো না'। ইত্যবসরে শিকারি মানুষজন নিয়ে গুহায় উপস্থিত হয়। তারা যখন গুহার বাইরে মানুষের শোরগোল শুনতে পায়, তখন ইয়ামলিখা বলে, 'চলো আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের নফসকে সপর্দ করে দেই'। উপস্থিত জনগণ মশাল নিয়ে গুহায় প্রবেশ করে। তাদের সম্মুখে যে ব্যক্তি ছিল, সে দেখতে পায়, তিন জন ব্যক্তি নতজানু হয়ে বসে আছে। তাদের দেখে সে ভয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে, ছায়ামূর্তি! লাশ! তখন তারা গুহা থেকে দ্রুত বেড়িয়ে যায়।

রাজকুমারী পেরিস্কা স্বপ্নের তাবির জানার জন্য সভাকক্ষে তার গৃহ-শিক্ষক গালিয়াসের অপেক্ষায় বসে আছে। গালিয়াস আসার পর সে বলল, আজ রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি, 'আমাকে জীবন্ত দাফন করা হয়েছে'। গালিয়াস বলল, গতকাল শহরে যা ঘটেছে তার সাথে এ স্বপ্নের মিল পাওয়া যায়। রকিম পর্বতের গুহায় দাকিউনুসের যুগের গুপ্তধন প্রকাশিত হয়েছে। এ কথা শুনে রাজকুমারী বলল, আমারই বংশের পূর্বসূরি সম্পর্কে আমার দাদি মহামতী পূণ্যবতী পেরিস্কার পিতা বাদশা দাকিউনুসের কথা বলছ তুমি। তাঁর কন্যা তিনশত বছর পূর্বে মারা গেছে। আমার গলায় যে স্বর্ণের ক্রস দেখছ তা আমার দাদি পেরিস্কার, যার নামে আমার নাম রাখা হয়েছে। এটা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছি।

বাদশা (থিয়োডিয়াস) গালিয়াসকে ডেকে বললেন, গতকালের ঘটনা কি সত্য? গালিয়াস বলল, হ্যাঁ! জাহাপনা, ঘটনা সত্য। এমন সময় শিকারি রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে বাদশার সামনে ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলল, 'গুহায় ভয়ানক আকৃতির তিনজন ব্যক্তি, মাথায় এ্যালোথালো লম্বা চুল, অদ্ভূত পোষাক পরিহিত, সাথে তাদের একটি কুকুর। জনগণ তাদের দেখে ভয়ে গুহা থেকে

বেরিয়ে এসেছে। তারা সেখানে তিনশত বছরেরও অধিক সময় ঘুমিয়ে ছিল'। বাদশা তাদেরকে রাজদরবারে নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। তাদেরকে রাজদরবারে নিয়ে আসা হলে বাদশা তাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, 'তোমরা বিশ্রাম কর, তোমাদের যা যা দরকার তা তোমরা পেয়ে যাবে, সকলেই তোমাদের সেবা করবে'। বাদশার এরূপ আচরণ দেখে ইয়ামলিখা বুঝতে পারলো এটা বাদশা দাকিউনুসের রাজদরবার নয়। তাই সে চারণভূমিতে ছেড়ে আসা বকরির সন্ধানে বের হলো। মারনুশ আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে বলল, আলহামদুলিল্লাহ্! চোখের পলকেই তিনি বাদশা দাকিউনুসকে ধ্বংস করে তদস্থলে ভাল একজন ঈমানদার বাদশা বানিয়েছেন। সে বাদশার অনুমতি নিয়ে তার স্ত্রী-পুত্রের কাছে যেতে চাইলো এবং বলল, রাজা দাকিউনুসের সময়কার মুদ্রা এখন অচল। আপনি আমাকে কিছু টাকা দিলে আমার স্ত্রী-পুত্রের জন্য আমি হাদিয়া নিয়ে যেতে পারি। মিশলিনিয়া বলল, 'আমার চুল, দাড়ি, জামা-কাপড়ের বেহাল দশা, আমি নাপিতের দোকানে গিয়ে চুল ছাঁটিয়ে এবং জামা-কাপড় পরিবর্তন করে আসি'। তাদের কথা বাদশা বুঝতে না পেরে গালিয়াসকে ডেকে বললেন, 'দেখতো তুমি তাদের কথা বুঝতে পার কিনা তারা কি বলতে চায়'।

ইয়ামলিখা বকরির সন্ধান না পেয়ে ফিরে এসে বলল, মারনুশ! মিশলিনিয়া! তোমরা কোথায়? চলো, তাড়াতাড়ি চলো, আমরা গুহায় ফিরে যাই। এটা আমাদের জগৎ নয়। তোমরা কি জানো, আমরা গুহায় কতকাল ঘুমিয়েছিলাম? মারনুশ বললো, এক সপ্তাহ। সে বললো, না। আমরা গুহায় তিনশত বছর ঘুমিয়েছিলাম। এখন আমরা মৃত, আমরা লাশ। বাদশা দাকিউনুস আর নেই। তিনি মারা গেছেন। মারনুশ বলল, তুমি কী পাগল, না মাতাল হয়ে গেছ। সে বলল, আমি পাগল নই, মাতালও হইনি। একটা মুহূর্তও আমরা এই মানুষগুলোর সাথে বসবাস করতে পারব না। মারনুশ বলল, আমরা কী মানুষ না, আমরা কী রোমের অধিবাসী নই। সে বললো, গুহা ছাড়া আমাদের আর কোনো স্থান নেই, আমাদের কোনো আশা নেই, আমরা তিনজন, সাথে আছে কিতমির। আমৃত্যু আমরা সেখানেই অবস্থান করব। বাইরে গিয়ে দেখ, কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তরসুস শহর তুমি চিনতে পারবে না। আমাদের আশপাশের কারো কথা তুমি বুঝবে না। কারণ, তাদের আর আমাদের মাঝে তিনশত বছরের ব্যবধান। মারনুশ বলল, তুমি গুহায় চলে যাও। আমি বাড়ি যাব। আমার স্ত্রী-পুত্র আমার অপেক্ষায় আছে। এমন সময় গোঁফ, দাড়ি ছেঁটে, নতুন পোষাক পরে মিশলিনিয়া উপস্থিত হলো। মারনুশ তাকে দেখে বলল, মিশলিনিয়া! এই পরিবর্তন তোমার কীভাবে হলো? সে বলল, নাপিতের দোকানে গিয়ে এরকম হয়েছি আমি। এরপর ইয়ামলিখা বলল, তোমরা এখানে থাক, উপভোগ কর এ জগতের সৌন্দর্য, স্মরণ কর বাদশা দাকিউনসের যুগের কথা। এ কথা বলে সে বিষণ্ন বদনে গুহার দিকে চলে গেল। দৃষ্টির আড়াল হওয়া পর্যন্ত মারনুশ এবং মিশলিনিয়া তার দিকে তাকিয়ে রইল।

পেরিস্কার সাথে দেখা না করেই মিশলিনিয়া বাদশার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে সে। মিশলিনিয়া গালিয়াসকে বলল, তুমি পেরিস্কাকে গিয়ে বল, আমি তার সাথে আজ রাতের মধ্যে দেখা করতে চাই। গালিয়াস পেরিস্কাকে সংবাদটি শুনালো। কিন্তু সে তার কোন প্রতিউত্তর দিল না। গালিয়াস মিশলিনিয়ার কাছে ফিরে এসে বলল, রাজকুমারী সংবাদ শুনার পর কিছুই বলেনি। সে বলল, তুমি এ বাড়িতে কী কর? গালিয়াস বলল, 'আমি এ বাড়িতে রাজকুমারীর গৃহ শিক্ষক'। মিশলিনিয়া বলল, গতকালের আগে তো তোমাকে এ বাড়িতে দেখিনি? তুমি বল, পেরিস্কা কোথায়? সে বলল, তিনি

এখন বাদশার শয়নকক্ষে বাদশাকে বই পড়ে শুনাচ্ছেন। এ কথা শোনে মিশলিনিয়া বলল, পেরিস্কা ঈমানদার, খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী এবং এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী। কীভাবে সে একজন অপরিচিত ব্যক্তির কাছে বসে আছে? এ বাদশা কি দাকিউনুসের উত্তরসূরি? সে বলল, না। এ বাদশা ঈমানদার, খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী। অপরদিকে দাকিউনুস ছিল মূর্তিপূজক ও খ্রিষ্টধর্মের চিরশত্রু। ইতিহাস যাকে অভিশাপ দেয়। মিশলিনিয়া বলল, পেরিস্কা বাদশার শয়নকক্ষে তাকে বই পড়ে শুনাচ্ছে, বিষয়টা কেমন যেন মনে হচ্ছে। 'সে যদি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, তবে সে ধ্বংস হউক'। গালিয়াস বলল, 'সে তার দাদির মত প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী '। মিশলিনিয়া তাকে ধমক দিয়ে বলল, তুমি চলে যাও, তোমার দরকার আমার নেই। রাত গভীর হলে পায়চারি করতে সে যখন বারান্দায় আসবে, তখন আমি তার সাথে দেখা করব।

এমন সময় মিশলিনিয়া বাহিরে মারনুশের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলো। মারনুশ তার কাছে এসে বলল, 'সারা দিন আমার ঘর-বাড়ি, স্ত্রী-পুত্রের সন্ধানে সমস্ত শহর ঘুরেছি। কোথাও তাদের দেখা পাইনি। অবশেষে জানতে পারলাম তারা মারা গেছে। একটা বিধ্বস্ত কবরের ফলকে আমার ছেলের নাম লেখা দেখেছি। সে ষাট বছর বয়সে রোমের সৈন্য বাহিনীর সহযোগিতা করতে গিয়ে শহিদ হয়েছে'। মিশলিনিয়া বলল, তুমি কি ইয়ামলিখার মত পাগল হয়ে গেছো? মারনুশ বললো, আমি হতাশ, আমার মন ভেঙে গেছে। এখন এই ভয়ার্ত পৃথিবীর কোন বস্তুর সাথে আমি সম্পর্ক রাখতে চাইনা। এ যুগের লোকদের কথা আমরা বুঝি না, তারাও আমাদের কথা বুঝে না। আমরা এদের কাছে অপরিচিত। তারা আমাকে দেখে একে অপরকে ডেকে বলে, 'এসো, দেখে যাও, এ ব্যক্তি তাদেরই একজন'। সুতরাং ইয়ামলিখার কথাই ঠিক, 'এই নতুন পৃথিবী আমাদের জন্য নয়'।

মারনুশ মিশলিনিয়াকে আরও বলল, শোন! এটা তরসুস শহর নয়। এ নতুন শহরের অধিবাসী এবং আমাদের মাঝে তিনশত বছরের ব্যবধান। এটা ভিন্ন একটা জগত, যা অথৈ সমুদ্রের মতো আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। এখানে আমরা জীবন ধারণ করতে পারবো না। আমরা যেন সমুদ্রের মাছ। হঠাৎ করে যার মিঠা পানি লবণাক্ত পানিতে পরিণত হয়ে গেছে। চল, আমরা গুহায় ফিরে যাই। মিশলিনিয়া বলল, রাখ তোমার অপলাপ। তুমি পেরিস্কা সম্পর্কে কী মন্তব্য করবে? সেও কি তিনশত বছর পূর্বের লোক? তুমি কি তাকে গত রাতে দেখনি। সে বলল, হ্যাঁ! কথাতো ঠিক, পেরিস্কাতো আগের মতই আছে। মিশলিনিয়া বলল, সবকিছু ছেড়ে নতুনভাবে বাঁচার চেষ্টা কর। মারনুশ বলল, 'নতুন জীবন দিয়ে আমার কী উপকার হবে? প্রিয়জনহারা একাকী জীবনের কোন মূল্য নেই। এরূপ জীবন না থাকার চেয়ে ভাল। আমি চললাম। মিশলিনিয়া বলল, তুমি যেও না। আমার আশা পূরণে তোমাকে দরকার। আমি তোমার সাহায্য চাই। মারনুশ তার কথায় কর্ণপাত না করে বলল, 'আল-বিদা', বিদায়।

এমন সময় পেরিস্কা সভাকক্ষে এসে -হাতে তার বই- বলল, তুমি এখানে। মিশলিনিয়া বলল, দীর্ঘ সময় তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। পেরিস্কা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, হে পবিত্র ব্যক্তি! গতকাল তোমাকে একদম বয়স্ক লোকের মত মনে হচ্ছিল। গোঁফ-দাড়ি ছাঁটায় এবং নতুন জামা পরিধান করায় আজ তোমাকে যুবক মনে হচ্ছে। সে বলল, তুমি আমাকে যুবক মনে করছ, এ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তবে তুমি কীভাবে একজন খিয়ানকারিণীতে পরিণত হলে? পেরিস্কা বলল, তুমি এরূপ কথা বলছ কেন? তুমি কি আমাকে চিন? মিশলিনিয়া বলল, তুমি কি পেরিস্কা নও? তুমি না আমাকে বিবাহ করার অঙ্গীকার করেছিলে। সে কথা কি তুমি ভুলে গেছো? পেরিস্কা বলল, এমনভাবে কথা বলছ যেন আমার শিশুকালে শোনা গ্রিক ট্রাজেডি গল্পের বীরপুরুষ

তুমি। মিশলিনিয়া বলল, তুমি যে এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হয়ে যাবে আমি তা বুঝতে পারিনি। আমাদের অঙ্গিকার ছিল আমরা পরস্পরকে ভালোবেসে বিবাহ করব। কিন্তু সে অঙ্গিকার তুমি এখন ভঙ্গ করছ। তোমার সেই ভালোবাসা গেল কোথায়? এ ধরাধাম থেকে কী ভালোবাসা ওঠে গেল। তোমার গলায় যে স্বর্ণের ক্রস আছে তা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম। এটা তোমার সে অঙ্গিকারের চিহ্ন। আমি তোমাকে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আমার অন্যায় হয়েছে। আমাকে তুমি ক্ষমা কর। পেরিস্কা বলল, তুমি চলে যাও। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মিশলিনিয়া বলল, আমি কোথায় যাব? তুমিতো কিছুই বলছ না। তুমি বল, গতরাতে যাকে তুমি বই পড়ে শুনিয়েছিলে তিনি কে? পেরিস্কা বলল, তিনি আমার পিতা। ঘুমানোর সময় তাঁকে বই পড়ে শুনাতে হয়। আমার বই পড়া শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। মিশলিনিয়া বলল, তুমি আমাকে ধোকা দিচ্ছ। তুমি বাদশা দাকিউনুসের কন্যা। এনি কি বাদশা দাকিউনুস? কীভাবে তুমি তাকে রাতের বেলা বই পড়ে শুনাও? পেরিস্কা বলল, তিনশত বছর পূর্বে মারা যাওয়া বাদশা দাকিউনুসের কন্যা আমি নই। তুমি যেই পেরিস্কার কথা বলছ, আমি সেই পেরিস্কা নই। বাদশা দাকিউনুসের কন্যা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। আমি তার সম্পর্কে আমার গৃহ শিক্ষক গালিয়াস থেকে শুনেছি। সে তোমার প্রেমে মুগ্ধ ছিল। সে তোমার অপেক্ষা করতে করতে পঞ্চাশ বছর বয়সে পরপাড়ে চলে গেছে। আমার জন্মের পর এক জ্যোতিষ আমার নাম রাখেন পেরিস্কা। দেখতে আমি ঠিক তারই মত। এ কথাগুলো বলে সেখান থেকে চলে গেল সে।

পেরিস্কা শয়নকক্ষে যাওয়ার সময় গালিয়াস তাকে বলল, পেরিস্কা! মহামানব কোথায়? পেরিস্কা বলল, সে চলে গেছে। গালিয়াস! শোন, ‘গত রাতে যাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম চিরদিনের জন্যে আমি তাকে হারিয়ে ফেলেছি। গালিয়াস বলল, যুবক বয়সের লোকেরা দুঃস্বপ্ন দেখে। আপনি যুবক, চিন্তা করবেন না, জাহাপনা! আপনি কি তার মুখোমুখি হয়েছেন? হ্যাঁ! আমি তার মুখোমুখি হয়েছি। সে অনেক কথা বলেছে। ‘আমার দাদি মহিয়সী পেরিস্কা ছিল বড় মনের মানুষ, ফেরিস্তাদের মত মিষ্টভাষী, লজ্জাবতী, বন্ধুবৎসল এবং অপরূপা সুন্দরী। কিন্তু আমি তা নই’। তারা দুজন দুজনকে ভালোবাসত। তারা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে পরস্পরে ছিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমার দাদি পেরিস্কা আমৃত্যু তার অপেক্ষায় ছিল। মিশলিনিয়া তাকে এই স্বর্ণের ক্রস উপহার দিয়েছিল। সে তাকেই ভালোবেসেছিল, পৃথিবীর অন্য কাউকে নয়। গালিয়াস চলে গেলে মিশলিনিয়া পেরিস্কার কক্ষে আবার উপস্থিত হয়। কিন্তু পেরিস্কা তাকে চলে যেতে বলে। মিশলিনিয়া তার সংস্পর্শ থেকে চলে যেতে নারাজ। পেরিস্কা বলল, হে আমার দাদির প্রেমিক! তুমি কি জান, আমার বয়স কত? আমার জীবন থেকে বিশটি বসন্তকাল অতিক্রম করেছে মাত্র। আমি তোমাকে এই স্বর্ণের ক্রস খুলে দিচ্ছি। তুমি চলে যাও। মিশলিনিয়া বলল, তোমার আমার মাঝে ব্যবধান শুধু এক রাতের, সে ব্যবধান কূল কিনারাহীন সাগরের মতো। আমি চলে যাচ্ছি। বিদায়। পেরিস্কাও বলল, বিদায়।

মিশলিনিয়া গুহায় ফিরে এসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে জেগে ওঠে সে বলে, মারনুশ! আমি ফিরে এসেছি। ইয়ামলিখা! খাবার কোথায়? আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। আমাকে খাবার দাও তুমি’। তারা তার ডাকে সাড়া দিল না। সে তখন ঘুমে কাতর মারনুশের হাত ধরল। মারনুশ বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আরোহী আসবে। মিশলিনিয়া বলল, কোন আরোহী এখানে আসবে না। আমরা এখানে অনেক ঘুমিয়েছি। আমাদের উচিৎ এখান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া। বাদশা দাকিউনুসের হত্যাযজ্ঞ শেষ হয়েছে। তুমি যেই আরোহীর কথা বলছ, সে দুর্বল এবং আমিও দুর্বল হয়ে পড়েছি। আমার পা আমার ভর সইতে পারছে না। আমি ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্ন

দেখেছি। 'কিছু অপরিচিত লোক আমাদের গুহায় প্রবেশ করে আমাদেরকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেছে। দেখলাম রাজপ্রাসাদের সবকিছুই পরিবর্তন। যে বাদশাকে আমি দেখেছি তিনি বাদশা দাকিউনুস নয়। তরসুস শহরও আগের তরসুস শহর নয়। পেরিস্কাও যেন আগের পেরিস্কা নয়। কারণ, সে এখন আমাকে চিনতে পারছে না। শুনতে পেলাম পেরিস্কা কুমারী অবস্থায় তিনশত বছর পূর্বে মারা গেছে। আমরা এখানে তিনশত বছর ধরে অবস্থান করছি'।

মারনুশ বলল, ঘটনা সত্য। অনুরূপ স্বপ্ন আমিও দেখেছি। আমার স্ত্রী-পুত্র তিনশত বছর পূর্বে মারা গেছে। বিধ্বস্ত কবরের ফলকে আমি আমার ছেলের নাম লেখা দেখেছি। রোমের সৈন্যবাহিনীর সহযোগিতা করতে গিয়ে সে শহিদ হয়। আমি আবার গুহায় ফিরে এসেছি'। মিশলিনিয়া বলল, ষাট বছর বয়সে তোমার ছেলে মারা গেলেও তুমি এখনও চল্লিশ বছরে উপনীত হওনি। মারনুশ বলল, তাহলে এটা কী আসলে স্বপ্ন না বাস্তব ঘটনা? সে বলল, এটা নিছক স্বপ্ন। তুমি দেখছ না পেরিস্কা এখনো আমার বাগদত্তা হিসেবে আছে। শীঘ্রই সে আমার কাছে এসে উপস্থিত হবে। তোমার স্ত্রী-পুত্র জীবিত আছে। মারনুশ বলল, তাহলে কীভাবে এ গুহায় আমাদের তিনশত বছর কেটে গেল? এটা আমি বুঝতে পারছি না। সে ইয়ামলিখাকে জাগ্রত করে বলল, ইয়ামলিখা! তুমি বলত আমরা কি এ গুহা থেকে বের হয়েছিলাম? সে বলল, না। আমরা তিনজন, সাথে আছে আমাদের কুকুর। আমরা এখানে ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখেছি? আমাদেরকে রাজপ্রাসাদে নেয়া হয়েছে? রাজপ্রাসাদসহ তরসুস শহর পরিবর্তন হয়ে গেছে। ওটা অন্য একটা জগৎ। মারনুশ বলল, আমরা তিন জন কী একই স্বপ্ন দেখলাম? মিশলিনিয়া বলল, হতে পারে, আমরা যেহেতু একই স্থানে, একই জায়গায় অবস্থান করছি। আমরা ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছি। এখন আমাদের ক্ষুধা পেয়েছে। আমরা দুর্বল। ইয়ামলিখা! ওঠ, যাও, বাহির থেকে খাবার কিনে নিয়ে আস। ইয়ামলিখা ওঠার চেষ্টা করে কিন্তু ওঠতে পারে না, পড়ে যায় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এরপর মারনুশও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। বাকি থাকে মিশলিনিয়া এবং কিতমির। তারাও মৃতপথযাত্রী। উল্লেখ্য যে, তারা যে এ গুহা থেকে বের হয়েছিল সে কথা তারা ভুলে গিয়েছিল।

গুহায় গালিয়াসসহ পেরিস্কার অনুপ্রবেশ। এক মাস হয়ে গেল তারা পুনরায় এখানে ফিরে এসেছে। না খেয়ে তারা কাহিল হয়ে পড়েছে। পেরিস্কা বলল, এখানে আসার সময় আমাকে কি কেউ লক্ষ্য করেছে? গালিয়াস বলল, না। তবে গুহাবাসীদের আনুষ্ঠানিকতায় বাদশা আপনাকে সঙ্গে নিবেন। কারণ, আপনি তাদের উদ্দেশ্যে একটা গির্জা বানাতে চেয়েছিলেন। পেরিস্কা বলল, অসুস্থতার কারণে আমি সেটা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। পেরিস্কা মিশলিনিয়ার আওয়াজ শুনতে পেল। সে জীবিত। গালিয়াস! তুমি পানি, মধু এবং খাবার নিয়ে আস। এ কথা শুনে মিশলিনিয়া বলল, কোন লাভ নেই। আমার সময় শেষ। পেরিস্কা বলল, তুমি মরে যেও না। তুমি আমার জন্য বেঁচে থাক। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি যেই পেরিস্কার প্রেমে মত্ত, সেই পেরিস্কা হতে আমার কোনো আপত্তি নেই। সে তার মাথা হাত দিয়ে উঁচু করে ধরে বলল, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে তুমি ওঠে দাঁড়াও। আমি তোমাকে তিনশত বছর পূর্ব থেকে ভালোবাসি। তোমাকে আমি আরো হাজার বছর ভালোবাসবো। মিশলিনিয়া বলল, আমি চললাম, পরপারে মিলন হবে। একথা বলার পর তার প্রাণপাখি চলে গেল। পেরিস্কা কেঁদে কেঁদে বলল, হ্যাঁ! আমাদের পরপাড়ে মিলন হবে। গালিয়াস খাবার নিয়ে আসার পর পেরিস্কা তাকে বলল, 'এই ধরাধামে ভালোবাসাই আমাদের মিলন ঘটালো যদিও তা ক্ষণকালের জন্য হয়'। মৃত মিশলিনিয়াকে সম্বোধন করে বলল সে, তুমি

তোমার ওয়াদা ভঙ্গ করনি। (ভালোবাসার) পবিত্র মোড়ক তুমি উন্মোচন করনি। তোমার ভালোবাসায় কোনো সন্দেহ হানা দেয়নি যে, তোমার ভেতরে জমে থাকা পবিত্র ধোঁয়া উড়ে যাবে। যে তোমাকে ভালোবাসে তার থেকে চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হওয়া কি তোমার উচিত হলো?

গুহায় জনবলসহ বাদশার আগমন ঘটে। গালিয়াস তাঁর আওয়াজ পেয়ে গুহা থেকে বের হয়ে আসল এবং বলল, এখানেই পবিত্র ব্যক্তিবর্গ ঘুমিয়ে আছে। সকলের অগোচরে পেরিস্কা গুহার ভেতরেই কোনো এক গর্তে লুকিয়ে রইল। বাদশা, গালিয়াস, শিকারি, দুইজন পাদ্রি, সৈন্যবাহিনী এবং তার কর্মচারী গুহায় প্রবেশ করল। বাদশা পাদ্রিকে বললেন, এদের মৃতদেহ কি পবিত্র কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখব? পাদ্রি বললেন, না। তারা যে অবস্থায় আছে সেরকমই থাকবে। আমরা শুধু গুহার মুখ আটকিয়ে দিব। শিকারি বাদশার অনুমতি নিয়ে বলল, গুহার মুখ আটক করা ঠিক হবে না। কারণ, তারা জীবিত। তারা মারা যায়নি। তারা আগের মতোই ঘুমিয়ে আছে। শীঘ্রই তারা ঘুম থেকে জেগে উঠবে। তার কথা দ্বিতীয় পাদ্রি সমর্থন করল। প্রথম পাদ্রি এবং গালিয়াস বলল, তারা মারা গেছে। তাদের আত্মা আকাশে উড়ে গেছে। বাদশা বললেন, সত্যিই তারা যদি আবার জেগে ওঠে এবং দেখে গুহার সম্মুখে প্রাচীর তাহলে তাদের পরিণতি কী হবে? গালিয়াস বলল, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, আমরা গুহায় কুঠার এবং কোদাল রেখে দিতে পারি। যখন তারা জেগে ওঠবে, তখন তারা কুঠার এবং কোদাল দিয়ে তা ভেঙে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবে। বাদশা বললেন, তোমার কথাই ঠিক! যাও, গোটা তিনেক কোদাল নিয়ে আস। কোদাল নিয়ে আসার পর গুহার ভেতরে সেগুলো রেখে দিয়ে গুহার সম্মুখে প্রাচীর করে দেয়া হলো।

পবিত্র ব্যক্তিদের সৎকর্ম সম্পাদন শেষে তাদের শেষ বিদায় জানানোর জন্য বাদশা পাদ্রিদ্বয়কে গুহায় যেতে নির্দেশ দিয়ে বললেন, ‘আমরা ঢোল পিটিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে, শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে পবিত্র ব্যক্তিদের গুহার সম্মুখে প্রাচীর তুলে চলে যাব। গালিয়াস! তুমি রাজকুমারীকে বল, সে যেহেতু অসুস্থ, সেহেতু তাদের বিদায় জানানোর জন্য তার আসার কোনো দরকার নেই’। সৎকর্ম শেষে তারা সকলেই গুহা থেকে বের হওয়ার পর পেরিস্কা আত্মপ্রকাশ করলো। গালিয়াস তার কাছে গিয়ে বলল, জাহাপনা! কোনো অসুবিধে হয়নি তো? পেরিস্কা বলল, কোন সমস্যা হয়নি। তুমি চলে যাও। আমার জন্য দোয়া কর। আমার কারণে আমার পিতা যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তখন এ কথা বলিও যে, ‘রাজকুমারীর কারণে মৃত্যুবরণ করতে আমি প্রস্তুত আছি’।

গালিয়াস বলল, ‘বাকি জীবন আপনার জন্য, আপনার সেবায় উৎসর্গ করলাম। কিন্তু আপনিতো জীবন্ত দাফন হচ্ছেন। জ্যোতিষ বলেছিলেন ‘আপনি সন্ন্যাসীদের অন্যতম। এখন দেখছি সেটাই ঠিক’। আপনি একজন প্রেমিক নারী এবং মানবদরদি মহিলা। এ কথাগুলো বলে গালিয়াস বের হয়ে গেল। পেরিস্কা আমৃত্যু গুহায় মৃতব্যক্তিদের সঙ্গী হয়ে রইলো (তাওফিক, ১০-১৯০)। এটাই হলো *আহলুল কাহফ* নাটকের সারকথা। এখন নাটক রচনার প্রেক্ষাপট এবং অন্যান্য দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক।

রচনার প্রেক্ষাপট

এ নাটক রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাওফিকুল হাকিম বলেন, ‘নিশ্চয় *আহলুল কাহফ* (নাটকটি) আমি আমার হৃদয়পটে লিখেছিলাম সেদিন, যেদিন আমি সুরা কাহফ শুনেছিলাম। শুক্রবার দিন

ইমাম সাহেব মসজিদে সুরাটি তেলাওয়াত করছিল—তখন আমি ছিলাম ছোট্ট শিশু—আর আমি কল্পনায় দেখছিলাম গুহা, অন্ধকার এবং তার প্রবেশপথ। আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম গুহাবাসীরা উবু হয়ে বসে আছে। তাদের কুকুর -অন্যসব কুকুরের মতো নয়- তাদের দিকে সজাগদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এসকল দৃশ্য-ছবি আমার হৃদয়ে অদক্ষ হাতে অঙ্কিত করেছিলাম। আজ প্রকৃত শিল্পীর হাতের ছোঁয়া পেয়েছে' (ইসমাঈল এবং ইব্‌রাহিম, ১৯৯৮, পৃ. ১১১-১১২)।

নাটক সম্পর্কে সমালোচকগণের মন্তব্য

আহলুল কাহফ নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পর মিসরীয় কবি-সাহিত্যিকের মাঝে সাড়া পড়ে যায়। পত্র-পত্রিকা-ম্যাগাজিনে এ নাটক এবং নাট্যকার সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। নাটকটি সম্পর্কে 'আল-বালাগ' পত্রিকায় যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তা হলো, 'এটা মরিস মাতের্‌লিঙ্কের (১৮৬২-১৯৪৯) সাহিত্যকর্মের সাথে তুলনীয়'। ত্বহা হুসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩) এই ধরনের নাটককে অভিনন্দন জানান এবং 'আল-ওয়াদি' পত্রিকায় সমালোচনা করে বলেন, 'আরবি সাহিত্যে এটা একটা নতুন ঘটনা। এটা প্রাচ্যের বড় বড় কবি-সাহিত্যিকের শিল্প-সাহিত্যকর্মের সাথে প্রতিযোগিতা করবে (ইসমাঈল এবং ইব্‌রাহিম, ১৯৯৮, পৃ. ১১১)। এটা অধুনা আরবি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। আমি মনে করি না যে, আমাদের আরবি নাট্যসাহিত্যে আমি যা চেয়েছি তার পুরোটাই সত্য ঘটনা এবং সকল দোষ-ত্রুটিমুক্ত। তাওফিকুল হাকিম আমার এ কথার সাথে বিরোধ করবেন না, তা সত্যেও আমি বলবো যে, *আহলুল কাহফ* নাটক একটা বাস্তব কাহিনি অবলম্বনে রচিত। আরবি সাহিত্যে এ ধরনের নাটক এটাই প্রথম। আরবি সাহিত্যে যা ছিল না, তা যুক্ত হয়ে আরবি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে' (হাসান, ১৯৩৩, পৃ. ৩৭)। অনেকে বলেছেন, 'আধুনিক আরবি সাহিত্যে তাওফিক একজন বড়মাপের নাট্যকার' (ইসমাঈল এবং ইব্‌রাহিম, ১৯৯৮, পৃ. ১১১) ।

মুস্তফা আব্দুর রায্‌যাক *আহলুল কাহফ* নাটক সম্পর্কে যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো, লেখক প্রথমে সুরা কাহফের ঘটনাটি পড়ে আত্মস্থ করেছেন। সুদক্ষ শিল্পী যেমন তার তুলির আঁচরে কোন দৃশ্য জীবন্ত করে তোলেন তদ্রূপ লেখক কল্পনার সংমিশ্রণে ঘটনাটিকে নাট্যরূপ দিয়ে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তুলেছেন। এর প্রতিটি চরিত্রের বর্ণনা সহজ-সরল, বোধগম্য এবং মনোমুগ্ধকর। তিনি এর কতিপয় চরিত্রের সংলাপের ভেতর দিয়ে মানব মনের প্রকৃত অবস্থা ও রহস্য তুলে ধরেছেন। তাঁর কাল্পনিক নাটক *আহলুল কাহফ* আরবি নাট্যসাহিত্যবৃক্ষের প্রথম ফুল ও ফল, যার সুরভিত সুবাস এবং সুমিষ্ট গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে (তাওফিক, ১৯৫-১৯৮)।

আরবি আর্ট মিউজিয়ামের পরিচালক এবং পেরিসের কলেজ ডি ফ্রান্সের অধ্যাপক গ্যাস্টন ওয়াইট (১৮৮৭-১৯৭১) *আহলুল কাহফ* নাটকটি ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে ১৯৪০ সনে প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন, ইসলামের একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আল-কুরআন। সুরা কাহফে একটা কুকুরসহ কতিপয় যুবকের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে, যারা সমকালে বাদশা দাকিউনুসের নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে রকিম পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়ে তিনশত বছররেরও অধিক সময় নিদ্রাবস্থায় ছিল। এই ঘটনাটি নাটকে রূপ দিয়ে তাওফিকুল হাকিম তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন (তাওফিক, ১৯৯-২০০)।

নাটকের বৈশিষ্ট্যাবলি

তাওফিকুল হাকিমের *আহলুল কাহফ* নাটকটি যে বৈশিষ্ট্যাবলিতে সমৃদ্ধ, পর্যায়ক্রমে সেসব উপস্থাপিত হচ্ছে:

খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের সুখ-দুঃখ ও বেদনার চিত্র

সুরা কাহফে বর্ণিত গুহাবাসীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে *আহলুল কাহফ* নাটকটি রচিত হলেও, তাওফিকুল হাকিম এ নাটকে সমকালীন জীবনে খ্রিষ্টধর্মের শত্রু, জালেম বাদশা দাকিউনুসের মানুষের প্রতি জুলুম নির্যাতন, বিশেষ করে খ্রিষ্টানদেরকে হত্যা করার বিবরণ তুলে ধরেছেন। তাঁর অমানবিক নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য তাঁরই রাজদরবারের খ্রিস্টধর্মাবলম্বী মন্ত্রীদ্বয় পালিয়ে যান। তাঁদের সাথে পালিয়ে যায় রাজদরবারের খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী রাখালও। যারা পালাতে পারেনি তাদেরকে তিনি হত্যা করেন। মিঠাপানির মাছ লবণাক্ত পানিতে যেমন বাঁচে না, তেমনি ভালো মানুষ খারাপ লোকের সংস্পর্শে টিকে থাকতে পারে না। তারা জীবন রক্ষার্থে নিরাপদ স্থান তথা তরসুস শহরের রকিম পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেয়। একদিন এই বাদশা দাকিউনুসের ক্ষমতা শেষ হয়। তাঁর স্থলে ক্ষমতায় আসেন ন্যায়পরায়ণ বাদশা থিয়োডিয়াস। তিনি মানুষকে ভালোবাসেন; তাদের দয়া করেন। দেশের উন্নয়ন করেন তিনি। দেশে বয় শান্তির সুবাতাস। প্রজাদের দুঃখের পরে আসে সুখ। তিনি গুহাবাসীদের আবিষ্কার করেন; তাদেরকে রাজদরবারে নিয়ে আসেন; তাদের আদর আপ্যায়ন করেন। কিন্তু তারা তিনিশত বছর পরের মানুষের ভাষা বুঝতে পারে না। তাদের কাছে থাকা মুদ্রাগুলোও অচল। রাজ্যে এখন সুখ থাকা সত্যেও তারা এটাকে মনে করে অসুখ। তাদের এ আদর-আপ্যায়ন ভালো লাগে না; ভালো লাগে না এ নতুন রাজদরবারের নয়নাভিরাম দৃশ্য, সুখ আরাম। স্ত্রী সন্তানাদি এবং ভালোবাসার মানুষ হারিয়ে তারা হয়ে পড়ে দিশেহারা। তারা এ নতুন সমাজের সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারে না। তাই তারা আবার গুহায় ফিরে যায়। গুহাকেই তারা তাদের শান্তির নীড় মনে করে। তারা বুঝতে পারে এ পৃথিবীর জীবন মায়া এবং ছায়া ছাড়া আর কিছুই না। মানুষ সুখের পিছনে দৌড়ায়। শান্তিপ্রিয় লোক সদা শান্তি খোঁজে, অরাজকরা অরাজকতা। যে পরিবেশে মানুষ বড় হয়, সে পরিবেশ ব্যতিরেকে অন্য পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না সময় ও স্থানের ব্যবধানে। বাদশা দাকিউনুসের সময়ে জনসাধারণের জীবনাচরণ, বিশেষ করে খ্রিষ্টানদের সুখ-দুঃখ ও বেদনার চিত্র এবং তিনশত বছর পরের ন্যায়পরায়ণ বাদশার শাসনামলে রাষ্ট্র এবং প্রজাদের অভূতপূর্ব কল্যাণ ও সুখশান্তির দৃশ্যের বিবরণে *আহলুল কাহফ* নাটকটি সমৃদ্ধ। এ কথা সত্য যে, Time and Space কে সমন্বয়সাধন করে সমকালীন জীবনের চিত্রাঙ্কন করাই ছিলো তাওফিকুল হাকিমের *আহলুল কাহফ* নাটক রচনার মূল উদ্দেশ্য।

ব্যক্তিগত কাজে পরনির্ভরশীলতা ক্ষতির কারণ

আহলুল কাহফ নাটকে অন্যতম চরিত্র মারনুশ এবং মিশলিনিয়া। তারা খ্রিষ্টধর্মে ঈমান আনে। তাদের এ ঈমান আনয়ন সম্পর্কে সকলে জেনে যায়। এ জেনে যাওয়ার পিছনে কারণ হলো মিশলিনিয়ার একটি পত্র। মিশলিনিয়া তার প্রেমাষ্পদ পেরিস্কার কাছে সোনার ক্রস এবং পত্র প্রেরণ করেছে রাজার বাড়ির দাসীর মাধ্যমে। আমরা এর প্রমাণ পাই মারনুশের উক্তি থেকে। মারনুশ মিশলিনিয়াকে বলেছে, 'পত্রবাহক হিসেবে তুমি এই রমণী ব্যতীত আর কাউকে পাওনি'

(তাওফিক, ২০)? পত্রটি বাদশার হস্তগত হয়। বাদশা পেরিস্কাকে পত্র সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বলেন, তোমরা পেরিস্কাকে গৃহবন্ধি কর এবং তার জন্য সাতটা যন্ত্রণাদায়ক পিঞ্জিরা প্রস্তুত কর। তাকে না জানিয়ে অচিরেই আমি তার বিবাহের ব্যবস্থা করব (তাওফিক, ২২)। এই কথা থেকে উপলব্ধি করা যায়, যেই কাজ অন্যে সম্পাদন করলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তা নিজে করাই উত্তম। বিশেষ করে গোপনীয় কোনো বিষয় থাকলে তা অন্যকে দিয়ে সম্পাদন করানো অনুচিত। নাট্যকার এই রূপের রূপায়ণ সুন্দরভাবেই করেছেন।

বাস্তব জীবন কল্পনা ও স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ

আহলুল কাহফ নাটক জীবন ও সময়কে ঘিরে রচিত। তবে কথা হলো, সে জীবন কি স্বপ্নীল না বাস্তবে মূর্তমান সজাগ? যে সময়কে ঘিরে নাটকটি আবির্তত হয়েছে, সে সময়ের কি সত্যিই বাস্তবতা আছে নাকি মানব মস্তিষ্কপ্রসূত, কাল্পনিক? নাটকটির অন্যতম চরিত্র হলো ইয়ামলিখা। সে জাগ্রত হয়ে দেখল, দাকিউনুসের তরসুস শহর পরিবর্তন হয়ে গেছে। চারণভূমিতে রেখে আসা তার ছাগলগুলো মারা গেছে। এই বাস্তবতার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পেরে সে মৃত্যুবরণ করতে গুহায় ফিরে যায়। আরেক চরিত্র মিশলিনিয়া। সে যখন রাজদরবারে যায় তখন পেরিস্কাকে দেখতে পায়। কিন্তু যেই পেরিস্কার সাথে তার প্রেম ছিল, ইনি সেই পেরিস্কা নন। সে জেনে যায় তার প্রেমিকা তিনশত বছর পূর্বে মারা গেছে। প্রেমিকা হারানোর ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আমৃত্যু গুহায় অবস্থানের জন্য চলে গেল। নাটকের আরেক চরিত্র মারনুশ। সেও তার স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে দিশেহারা। তারও গন্তব্য হলো গুহায় প্রত্যাবর্তন। তারা নিজেদের জীবন ও সময়ের ব্যবধান দেখে নিরাশ হয়ে পড়ে। মানুষ সামাজিক জীব নিঃসন্দেহে। কিন্তু, তারা যে সমাজের সম্মুখিন হয়েছে, সে সমাজে তারা বসবাস করতে নারাজ। এ নতুন সমাজে বসবাস করার চেয়ে মৃত্যুই যেন তাদের কাছে শ্রেয়। তারা গুহায় ফিরে নিদ্রায় কাতর হয়ে পড়ে। তারা গুহা থেকে বের হয়ে যা কিছু বাস্তবে দেখেছিল সেটা ভুলে যায় এবং সেটাকে তারা স্বপ্নে দেখে। চেতন ফিরে পেয়ে তারা এটাকে মূলত স্বপ্নই মনে করে। নাটকটি বিবেক-বুদ্ধিকে যেমন স্বপ্ন ও জাগরণের মাঝে নিক্ষেপ করেছে, তেমনি একে সময়ের বাস্তবতা এবং কল্পনার সাগরে ভাসিয়েছে। লেখককে অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্য দ্বারা আতঙ্ক করে তোলেছে। তাই নাটকটি যে বাস্তব জীবন, কল্পনা ও স্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ এবং এরই মাঝে যে সংগঠিত হয়েছে তা নির্দ্বিধায় বলা যায় (ইসমাঈল এবং ইব্রাহিম, ১৯৯৮, পৃ. ৮৮-৮৯)।

মানবজীবনে সময় ও পরিবেশের প্রভাব

তাওফিকুল হাকিম আল-কুরআনের সুরা কাহফের ঘটনার সাথে কোন মতপার্থক্য করেননি। তিনি ঘটনার বিষয়বস্তুর চিত্রাঙ্কন করেছেন মাত্র। তিনি যুবকদেরকে তিনশত বছর কিংবা তার চেয়ে বেশি সময় পূর্বে নিয়ে গিয়ে তাদের চরিত্র তুলে ধরছেন। তারা যে ঈমান নিয়ে রকিম পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়েছে এবং আল্লাহ যে তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, (আল কুরআন, ১৮, পৃ. ১৩) তিনি নাটকে সে কাহিনিরও কোনো ব্যত্যয় ঘটাননি। তিনি নাটকের চরিত্রগুলোর চিত্রাঙ্কন করেছেন এইভাবে যে, নাটকের নায়কগণ যখন জেগে ওঠল, তখন তারা সময়ের ব্যবধান লক্ষ করল। তারা লক্ষ করল সময়ের পার্থক্যের সাথে সাথে পরিবেশের স্বভাব-প্রকৃতির পরিবর্তন হয়ে গেছে। তারা যেই সময় ও পরিবেশে বসবাস করেছিল, সেই সময় ও পরিবেশ আর নেই। তারা

বুঝতে পারল তাদের মাঝে এবং নতুন জীবনের মাঝে বিস্তর ফারাক। এ কারণে তারা বিচলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে গুহায় ফিরে যায়। সময় ও পরিবেশের ভিন্নতা তাদেরকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। অবশেষে গুহাতেই তারা মৃত্যুবরণ করে। তাদের জীবনে সময় ও পরিবেশের যে প্রভাব পড়েছে তাওফিক *আহলুল কাহফ* নাটকে সেটা তুলে ধরেছেন।

সমাজে প্রচলিত প্রথা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন

মানুষ যখন সফরে যায়, তখন তার সন্তান-সন্ততি এবং নিকটস্থ ব্যক্তিরা কামনা করে যে, সফর থেকে সে তাদের জন্য কিছু কিনে নিয়ে আসবে। এ গল্পে আমরা মারনুশের উক্তি থেকে সেটার প্রমাণ পাই। সে বাদশাকে বলেছে, 'বাদশা দাকিউনুসের মুদ্রা আপনার সময়ে অচল। আপনি যদি আমাকে কিছু মুদ্রা দিতেন, তাহলে আমার ছেলের জন্য উপহার কিনে নিয়ে যেতাম' (তাওফিক, ৭০-৭১)। এই উক্তি থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, বাড়ির কর্তা যদি বেশ কিছুদিন সফরে থাকে, তাঁর উচিত বাড়ির সদস্য এবং আপনজনদের জন্য কিছু নিয়ে বাড়ি ফেরা এবং তাদেরকে সেটা দেয়া। *আহলুল কাহফ* নাটকে তাওফিকুল হাকিম সমাজের এই সুন্দর দিকটি চিত্রাঙ্কন করেছেন।

পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের রুচিবোধ তৈরি হয়

মারনুশ এবং মিশলিনিয়া যেহেতু দাকিউনুনের মন্ত্রী ছিলেন, সেহেতু তাঁরা ছিলেন সৌন্দর্য-প্রিয় লোক। যখন তাঁরা উপলব্ধি করতে পারলেন যে, তাঁদের চেহারা মলিন হয়ে গেছে, চুল-দাড়ি লম্বালম্বা এবং পরনের পোশাক ময়লাযুক্ত, তখন গোঁফ-চুল-দাড়ি ছেঁটে, নতুন পোশাক পরে জনসম্মুখে উপস্থিত হন। এটা প্রমাণ করে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তাঁদের স্মৃতিশক্তি লোপ পায়নি। দাকিউনুসের রাজদরবারে যেভাবে তাঁরা পরিপাটি থাকতেন, বাদশা থিয়োডিয়াস-এর দরবারেও সেরকম থাকার জন্য নরসুন্দরের কাছে যান এবং পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে আসেন। এটা তাঁদের রুচিবোধের পরিচয় বহন করে। তাওফিকুল হাকিম তাঁদের এই রুচিবোধ নাটকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

মানবতার সেবা

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব। তার মূল্য অনেক। মানুষের উচিত পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসা, তার কল্যাণ কামনা করা, মানবতার সেবা করা। ঈমানদার বাদশা থিয়োডিয়াস-এর কন্যা পেরিস্কা গুহাবাসীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে, বিশেষ করে মিশলিনিয়ার সেবায়। কারণ, মিশলিনিয়া দাকিউনুসের কন্যা পেরিস্কার প্রেমিক ছিল। তার প্রতি তার ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। তারই জন্য তার পিতার ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে সে (তাওফিক, ৩৬)। গুহায় তার সেবা করতে গিয়ে রাজকুমারী নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করে। সে এখন মিশলিনিয়াকে তার দাদি পেরিস্কার মতো ভালোবাসে। মিশলিনিয়া মারা যাওয়ার পর পেরিস্কা আমৃত্যু তারই পাশে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেয়; তার সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করে। সময়ের ওপর ভালোবাসাই জয়ী হয়। *আহলুল কাহফ* এ তাদের এই ভালোবাসার দিকটি নাট্যকার নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন।

কালচেতনার রূপায়ণ

আরবি সাহিত্যে কাল্পনিক নাটকের প্রথিকৃৎ তাওফিকুল হাকিম হলেও তাঁর অনেক আগেই এ ধরনের নাটক লেখে খ্যাতি অর্জন করেন নরওয়ের আধুনিক নাটকের জনক হেনরিক জোহান ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬)। এরপর এই দিকটিতে মনোনিবেশ করেন আয়ারলেণ্ডের বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০) (মাহমুদ, ২০০৬ : ১০৩, ১১৩)। তাওফিক প্রথমে সময়ের কল্পনা করেছেন। পরে সময়ের ওপর বিজয় লাভ করার চেষ্টা করেছেন। সময়ের সমস্যা সমাধানে প্রতি কালেই মানুষ প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করেছে। কারণ, সময় হলো এমন এক বন্ধন, যা এই জীবনের সাথে মানুষকে বেঁধে রাখে। যদি এই বন্ধন ছিঁড়ে যায়, তবে মানুষটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। *আহলুল কাহফের* মতো তাওফিকের আরেকটি কাল্পনিক নাটক হলো *লাও আরাফাশ শাবাব*। *আহলুল কাহফ* নাটকে যুবক যেমন বৃদ্ধে পরিণত হয়েছে, *লাও আরাফাশ শাবাব* নাটকে জ্ঞানের অলৌকিকত্বে বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবকে পরিণত হয়েছে।

নাটক মঞ্চায়ণের অভিপ্রায়

গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লেস (৪৯৬-৪০৫ খ্রি.পূ.), উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) এবং মলিয়র (১৬২২-১৬৭২) প্রভৃতি মনীষীদের মত তাওফিকুল হাকিম শুধু পড়ার জন্য নাটক রচনা না করে মঞ্চনাটক রচনায় মনোযোগ দেন। তিনি *ঈযিস*, *আল-আয়দিন নায়িমাহ*, *আস-সফাকাহ*, *রিহরাতুন ইলাল গাদ* এবং *আশওয়াকুন ইলাস সালাম* ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য রচনা করেন। *আহলুল কাহফ* ছাড়া তাঁর কোনো নাটকই সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়নি। অথচ তিনি কামনা করতেন তার নাটকগুলো মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সফলভাবে মঞ্চস্থ হউক (মাহমুদ, ২০০৬, পৃ. ১২৮)।

উপকথার সংযোজন

তাওফিকুল হাকিম *আহলুল কাহফ* নাটকে দুইটি উপকথা সংযোজন করেছেন। যথা: **ক.** ইয়ামলিখা তার দাদি এবং মার কাছ থেকে শিশুকালে শুনেছে যে, একজন রাখাল প্রচণ্ড ঢলের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোন এক গুহায় আশ্রয় নেয়। সে আল্লাহ্ এবং ঈসা (আ.)-এর ওপর ঈমান এনেছিল। রাখাল সেই গুহায় একমাস ঘুমিয়ে ছিল। পানির ঢল যখন থেমে যায়, তখন সে নিরাপদে গুহা থেকে বের হয়ে আসে। সে জানেই না যে, গুহায় তার একমাস কেটে গেছে (তাওফিক, ৪২)।

খ. নাটকে তিনি জাপানের বহুল প্রচলিত রূপকথারও উল্লেখ করেছেন। কাহিনিটি হলো, ‘গ্রীষ্মকালে যুবক ইউরিশিমা টেরো নৌকা নিয়ে সুমদ্রে মাছ শিকার করতে যায়। সে সুমদ্রে জাল ফেলে। দুপুর গড়িয়ে গেলেও তার জালে কোন মাছ ধরা পড়ে না। অবশেষে বিকেলবেলা তার জালে একটা কচ্ছপ ধরা পড়ে। সেতো ভীষণ খুশি। কিন্তু ‘সুমদ্ররাজার কাছে কচ্ছপ অতি পবিত্র প্রাণী। একে হত্যা করা পাপ’। একথা তার স্মরণ হওয়ার পর কচ্ছপকে সে সুমদ্রজলে মুক্ত করে দেয়। সে আবার সুমদ্রে জাল ফেলে। ইত্যবসরে তাকে তন্দ্রায় পেয়ে বসে। নৌকাতেই সে ঘুমিয়ে পড়ে। সুমদ্ররাজার এক সুদর্শনা কন্যা ছিল। তার চুল ছিল আজানু লম্বা। রাজকুমারী সুমদ্রজলরাশির ওপর দিয়ে মৃদমন্দ বায়ুর সাথে ভাসতে ভাসতে মাছ শিকারি ঘুমন্ত যুবকের কাছে

উপস্থিত হয়। যুবককে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বলে, 'তুমি ভয় পেয় না, আমার পিতা সুমদ্রের রাজা। তিনি আমাকে তোমার ভালো কাজের কৃতজ্ঞতা জানাতে পাঠিয়েছেন। কারণ, তুমি একটা কচ্ছপের প্রাণ বাঁচিয়েছ। তুমি আমার পিতার রাজপ্রাসাদে চল। রাজপ্রাসাদটা ঐ মৃত্যুঞ্জয়ী দ্বীপে। সেখানে কোনো অতিথি মৃত্যুবরণ করে না। আরেকটা কথা তোমাকে বলি, তুমি যদি আগ্রহ প্রকাশ করো, তাহলে আমি তোমার স্ত্রী হতে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। আমরা দুইজন রাজপ্রাসাদে সুখে দিন কাটাবো। সুমদ্র রাজকন্যার কথা শুনে যুবকতো অবাক। সে তার কথায় রাজি হয়ে গেল। সে তখন নৌকা বাইতে বাইতে মৃত্যুঞ্জয়ী দ্বীপের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলো। রাজাপ্রাসাদটা ছিল নয়নাভিরাম। রাজপ্রাসাদে মেয়েটির সাথে তার মহানন্দে সময় কাটতে থাকে। তিন বছর সুখেই কেটে গেল তার। এরপর তার পরিবারের লোকজনের কথা স্মরণ হলে সে তার স্ত্রীকে বলল, 'আমি একদিনের জন্য আমার দেশে ফিরে যেতে চাই। মা-বাবা-আত্মীয়-সজনদের সাথে দেখা করে তোমার কাছে ফিরে আসব, আমি কোনদিন তোমাকে ছেড়ে যাব না'। এ কথা শুনে রাজকুমারী কাঁদতে লাগলো এবং বলল, 'তুমি চলে যাবে, যাও। কিন্তু আমার ভয় হয়, হয়ত এরপর আমাদের আর কোনোদিন দেখা হবে না। তবে দেখা হবে, যদি তুমি আমার ওয়াদা পালন কর। আমি তোমাকে একটা ছোট্ট কৌটা দিচ্ছি। এটা তোমার কাছে রাখবে। এটাই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। তুমি এই কৌটার মুখ কখনোও খোলবে না। যদি এটার মুখ খোলে ফেল তাহলে চিরদিনের জন্য তুমি আমার সাথে আর দেখা করতে পারবে না'। যুবকটি বলল, 'ঠিক আছে তোমাকে ওয়াদা দিচ্ছি, আমি এটার মুখ খোলব না'। একথা বলে তাকে বিদায় জানিয়ে সে স্বদেশের পথে রওয়ানা হলো। তার পিছনে ফেলে আসা সেই মৃত্যুঞ্জয়ী দ্বীপ তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হলো। সে তার গ্রামে ফিরে এসে দেখলো, গ্রামের সবকিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে তার বাড়ির সন্ধান পেল না। রাস্তায় এমন কাউকে দেখলো না, যাকে সে চিনতে পারে। সকলেই তার দিকে কৌতুহল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধের সাথে তার দেখা। সে তাকে তার বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করল। সে বৃদ্ধ হতভম্ব হয়ে তাকে বলল, 'ইউরিশিমাতো চারশত বছর আগে মাছ শিকার করতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেনি। মানুষ তার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে রেখেছে। তুমি তার জীর্ণশীর্ণ স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে পাবে'। বৃদ্ধের কথা তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হলো। সে মনে মনে বলল, ব্যাপার কী? রাজকুমারীর দেয়া কৌটার কথা তার স্মরণ হলো। সে মনে করলো, এই কৌটার মধ্যে হয়ত এর কোন রহস্য লুকিয়ে আছে, চারশত বছরের কোনো রহস্য। সাথে সাথে তার এটাও স্মরণ হলো, তার স্ত্রী কৌটার মুখ খোলতে নিষেধ করেছে। কিন্তু বৃদ্ধের কথা তাকে তাড়িয়ে বেড়ালো। সে মনে করলো হয়ত কৌটার মধ্যে কোন জাদু আছে। সেটা দেখার জন্য সে অস্থির হয়ে পড়ে। তখন সে তার স্ত্রীর কথা ভুলে যায় এবং কৌটার মুখ খুলে ফেলে। কৌটার মুখ খোলার সাথে সাথে কৌটা থেকে ধোঁয়া বের হয়ে দক্ষিণ দিকে উড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে তার সকল সুখস্মৃতি মুছে যায়। সে আর তার প্রেয়সীর কাছে যেতে পারে না। সে তার নিজের মাঝেও পরিবর্তন দেখতে পায়। সে বৃদ্ধে পরিণত হয়েছে। তার চুল-দাড়ি সাদা হয়ে গেছে। এখন সে দুর্বল। তার কোনো শক্তি নেই। সে এখন অপরিবর্তনীয় নীল সাগরের তীরে মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকে (তাওফিক, ১৭৯-১৮৪)। এই গল্পের বৃদ্ধ যেমন তার মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকে, পেরিস্কাও তেমনি রকিম পর্বতের গুহায় মিশলিনিয়ার মৃত লাশের পাশে যমদূতের অপেক্ষায় বসে থাকে। উপরিউক্ত দুইটি উপকথা গুহাবাসীদের সাথে খানিকটা মিলে যায় বিধায় তাওফিকুল হাকিম *আহলুল কাহফ* নাটকে সংযোজন করেছেন।

পরিশেষে বলব যে, তাওফিকুল হাকিম *আহলুল কাহফ* নাটকের মৌলিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে পুনরুত্থানের চিন্তাধারা অস্বীকার করেছেন। চরিত্রগুলোর স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড থেকে তিনি তাঁর চিন্তাকে মুক্ত করতে পারেননি। তাঁর চিন্তার বিশ্লেষণ ব্যক্তিদের চরিত্র তৈরি করেছে। এরপর তিনি ঘটনাকে নাটকে রূপদান করেছেন। সময়ের ব্যবধান দেখে গুহাবাসী তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে। তথাপি তাওফিকের এ নাটকটি মিসরের নাট্যসাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে, ইতঃপূর্বে আরবরা যার সাথে পরিচিত ছিল না।

টীকা

১. সম্রাট দাকিউনুসের ভয়ে সাতজন ব্যক্তি রকিম পর্বতে আশ্রয় নেয়। এটা ঐতিহাসিক সত্যতার সাথে মিলে না। পর্বতটি জর্দানে অবস্থিত। এর পূর্ব নাম ছিল রজিম। পরবর্তীকালে মানুষ একে রকিম নাম দিয়েছে।

উল্লেখপঞ্জি

আহমদ হাসান আয যায়্যাত (১৯৩৩)। আর-রিসালাহ মাজাল্লাতুন উস্‌বুইয়্যাতুন লিল আদাবি ওয়াল উলুমি ওয়াল ফুনূন, প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, কায়রো।

ইসমাঈল আদাম এবং ইব্‌রাহিম নাজি (১৯৯৮)। *তাওফিকুল হাকিম*। দারুয যাঈম লিত তিবাআতিল হাদিসাহ।

তাওফিকুল হাকিম (সন নেই)। *আহলুল কাহফ*। মাকতাবাতু মিসর।

নিযার আবাজা এবং মুহাম্মদ রিয়াদ আল-মালিহ (১৯৯৯)। *ইতমামুল আলাম*। দারু সাদির লিত তিবাআতি ওয়ান নাশর, বৈরুত।

মাহমুদ আস-সামুরাহ (২০০৬)। *মুহাম্মদ মান্দুর (১৯০৭-১৯৬৫) শায়খুন নাক্কাদ ফিল আদাবিল হাদিস*। আল-মুআস্‌সাসাতুল আরাবিয়্যাহ লিদ দিরাসাতি ওয়ান নাশর।

মুহাম্মদ খায়র রমাদান ইউসুফ (২০০৩)। *তাতিম্মাতুল আলাম লিয-যারকালি*। দারু ইবন হাজাম লিত-তিবাআতি ওয়ান নাশর ওয়াত তাওজি, বৈরুত।

জসীমউদ্‌দীনের *বোবা কাহিনী*তে লোকজীবনের রূপায়ণ

তাশরিক-ই-হাবিব*

সারসংক্ষেপ : 'পল্লীকবি' শিরোনামে নন্দিত জসীমউদ্‌দীনের (১৯০৩-১৯৭৬) আজীবনের সাহিত্যসাধনার মূল অবলম্বন কবিতা। তবে গদ্য রচনাতেও তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি স্মৃতিচারণমূলক রচনা ও ভ্রমণকাহিনি, লোকজীবনভিত্তিক নাটক ও উপন্যাস, প্রবন্ধ ও লোককাহিনী প্রভৃতিতে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের মনোলোকে যে ধারণা গড়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যকর্মের আলোকে, তাতে বাংলার গ্রামীণ জীবনের আবহমান ঐতিহ্য, প্রকৃতিপ্রীতি ও অতীতচারিতা, রোমান্টিক আবেশ ও স্মৃতিকাতরতার জোরালো উপস্থিতি, লোকসংস্কৃতির বর্ণাঢ্য রূপ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। তিনি ফরিদপুরের লোকজীবন ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে *বোবাকাহিনী* (১৯৬৪) উপন্যাস লিখেছেন। কবিতার প্রতি তাঁর আজীবনের আগ্রহের সঙ্গে মেলালে ব্যাপারটিকে কিছুটা নাটকীয় মনে হতে পারে। কিন্তু এ উপন্যাস রচনার পূর্বপ্রস্তুতি তাঁর ছিল। লোকসংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আন্তরিকতা একান্তই স্বভাবজাত। পয়ত্রিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ উপন্যাসটিতে জসীমউদ্‌দীন বাংলার মুসলমান কৃষক লোকসমাজের জীবনগাথা অকৃত্রিমভাবে রচনা করেছেন।

পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবন ও লোকজ সংস্কৃতির প্রতি জসীমউদ্‌দীনের প্রগাঢ় মমত্ববোধের অনন্য দৃষ্টান্ত তাঁর উপন্যাস *বোবা কাহিনী* । গ্রামের খেটে খাওয়া প্রান্তিক মানুষের প্রাত্যহিক চালচিত্র বয়ানে তাঁর লেখনীর সামর্থ্য এ উপন্যাসে[১] নিপুণভাবে প্রকাশিত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহুকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করে চলা মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের হাহাকারকে নিগূঢ় উপলব্ধি দিয়ে তিনি যেভাবে বিবৃত করেন, তা পাঠকের হৃদয়কে বারবার আলোড়িত করে। যে জীবনকে তিনি প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, অনুভব করেছেন এর অন্তরঙ্গ সারসত্য, সেই মর্মবাণীই তাঁর উপন্যাসে[২] ভাষ্যরূপ পেয়েছে গ্রামীণ পরিমণ্ডলের বাসিন্দাদের অবয়বে। আজাহেরের পারিবারিক বৃত্তান্তের সূত্রে তার ছেলে বছিরের বিলাতে গিয়ে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলনের অভিপ্রায় উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় ভাবসত্য হলেও এতে সবিশেষ অভিনিবেশ পেয়েছে গ্রামীণ লোকমানুষের জীবনাচার, বিশ্বাস-সংস্কার, মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুশাসন, ঐতিহ্যবাহী[৩] নানা সাংস্কৃতিক আয়োজনের নিপুণ বৃত্তান্ত। ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার নির্যাস, গ্রামীণ আবহ ও লোকসমাজের বিশিষ্ট রূপটিকে কথাশিল্পীর সংবেদনশীল অবস্থান থেকে অনুধাবন এবং লোকমানুষের প্রতি একাত্মতাবোধ প্রভৃতির সমাহারে এ উপন্যাসটি পূর্ববাংলার লোকজ পটভূমিতে রচিত বাংলাদেশের উপন্যাসসমূহের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার দাবিদার। এ উপন্যাসটি পূর্ব-বাংলার লোকসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের[৪] অন্তর্গত বিবিধ উপাদানে সমৃদ্ধ।

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. লোকবিশ্বাস

গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত এ উপন্যাসে লক্ষণীয়, যার অধিকাংশ ইসলাম ধর্মসম্পৃক্ত। সামাজিক জীবনে প্রচলিত তিনটি লোকবিশ্বাসের দৃষ্টান্ত–

ক. আজাহের মাতবরকে সালাম জানাইয়া কহিল, "আমরা মিনাজদ্দী মাতবরের দ্যাশ অইতে আইছি।" ... মোড়ল খুশী হইয়া বলিল, "আরে কুটুমের দ্যাশ অইতে আইছ! তা বইস বাই! বইস। ... আজ সকাল বেলা থাইকাই কুটুম-পক্ষি ডাকত্যাছে, তখনই মনে করছিলাম, আইজ কুটুম আইব।" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৮৯)

খ. মোড়ল বলিল, "বলি, আজাহের-বাই, তুমি নাকি তোমার ছাওয়ালডারে ইস্কুলি দিব্যার চাও? জান লেখাপড়া শিখলি হগলের মানায় না।" ... "আপনার কতা বুজবার পারলাম না মোড়ল সাব", আজাহের বলে। ... "হোন তবে", মোড়ল উত্তর করিল, "মুরালদার সৈজদ্দী তার পুলাডারে ইস্কুলি দিছিল। দুই মাস না যাইতে ছাওয়ালডা মইরা গেল। সগলের উয়া সয় না।" ... আজাহের বলিল, "আমি আইজ ইন্দু পাড়ায় যাইয়া দেইখ্যা আইছি। কতজনের পুলা-পাইন লেখাপড়া করত্যাছে; কিন্তুক তারা ত মরে না।" "আরে মিঞা! এইডা বুজবার পারলা না? ওরা ওইল ইন্দু। ওগো মদ্দি লেহাপড়ার চইল আছে। হেই জন্যি ওগো কুনু ক্ষেতি হয় না।" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১২৮)

গ. বছির বিস্ময়ে বলে,"এহানে এমুন সোনালতা ঐছে তাতো এতদিন দেহি নাই?" ... ফুলী বলে, "বড়ুরে ছাইড়া হেই লতার গয়না বানায়া পরবার আমার মনে লইল না। তাই লতাডারে মেইলা দিলাম এই বোরই গাছটার উপরে। রোজ উয়ার উপরে পানি ডাইলা ডাইলা ইয়ারে বাঁচায়া তুলছি। দেখছাও না কেমন জাটরায়া উট্‌ছে?" ... ফুলী জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা বছির বাই! হুনছি শববরাতের রাইতে সগল মুর্দারা কবরে ফির‍্যা আসে। আগামী শববরাতের রাইতে বড়ু যদি এহানে আসে তবে হে এই বোরই গাছটার উপর সোনালতাগুলান দেকতি পাবি ন্যা?" ... বছির অন্যমনস্ক হইয়া বলে, "হয়ত দেখতে পাবি।" ... "আর আমি যে তার দেওয়া সোনালতাডা এই বোরই গাছে বাঁচায়া রাখছি তাও সে জানতে পারবি, না বছির বাই?" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৯০)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বাঙালি সমাজে কুটুম বা আত্মীয়তা সংক্রান্ত লোকবিশ্বাসের প্রভাব লক্ষণীয়। সুদখোর মহাজন শরৎ সাহার দ্বারা হৃতসর্বস্ব আজাহের মিনাজদ্দী মাতবরের পরামর্শে নিজ গ্রাম ছেড়ে পরিবার নিয়ে তাম্বুলখানা গ্রামে আসে। সে মিনাজদ্দীর আত্মীয় গরীবুল্লা মাতবরের বাড়িতে হাজির হয় আশ্রয়লাভের জন্য। অতিথি এলে কুটুম পাখি সে খবর পূর্বেই জানতে পারে এবং 'কুটুম' বলে ডাকতে থাকে। যে এ ডাক শোনে, সে ভাবে, হয়ত তার বাড়িতে সেদিন অতিথি আসবে। অনুরূপ ঘটনা গরীবুল্লার ক্ষেত্রে ঘটেছে বলেই সে এরূপ বিশ্বাসের প্রতি আস্থাশীল। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে গ্রামীণ মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে গরীবুল্লা মাতবরের সংলাপে। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন গুজব ও রটনা স্বার্থান্ধ মৌলবিগোষ্ঠীর দ্বারা প্রচারিত হয়, যা লোকসমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বিধর্মীর শিক্ষা গ্রহণ করলে মুসলমানরা অকালে মৃত্যুবরণ করবে, নানা বিপদে আক্রান্ত হবে, এরূপ ধারণার বিস্তার ঘটে ভণ্ড ও শঠ ধর্মব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। একারণেই সৈজদ্দীর ছেলের মৃত্যুর ঘটনাকে গরীবুল্লা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ফল হিসেবে বিবেচনা করেছিল, যদিও আজাহের এ অভিমত মেনে নেয়নি। তাছাড়া হিন্দুর সন্তানেরা স্কুলে গিয়ে শিক্ষিত হলেও তাদের কোনো ক্ষতি হয় না, এ ভাবনায় মাতবরের ধারণার বিপরীতে

আজাহেরের অবস্থান নির্দেশিত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ওহাবী আন্দোলনের প্রভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজে খ্রিষ্টান শাসকগোষ্ঠী প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে রক্ষণশীল মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। এর নেপথ্যে ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনব্যবস্থায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব আরোপের একপর্যায়ে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর দ্বারা তাদের পরাজিত হবার ঘটনা। হিন্দুরা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণ করে চাকরি ও ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধন করলেও সমকালে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ও কূপমণ্ডুকতা প্রবলভাবে বিস্তৃত হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষত সত্তরের দশক থেকে ধীরে ধীরে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণের প্রতি তাদের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এ উদ্ধৃতির অন্তরালে লেখক বাঙালি মুসলমান সমাজের বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন।

গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্ম সম্পর্কিত বিশ্বাসের প্রভাব লক্ষণীয় ফুলীর সংলাপে। শবেবরাত মুসলমানদের জন্য বিশেষ পবিত্র রাত। এ রাতে মানুষের ভাগ্য লিখিত হয়, এরূপ ধারণা লোকসমাজে প্রচলিত। শুধু তাই নয়, যেসব মৃত ব্যক্তির আত্মা চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, তারা এ রাতে নিজ নিজ কবরের কাছে ফিরে আসে, এ ধরনের বিশ্বাসও লোকমানসে সক্রিয়। খেলার সঙ্গী বড়ুকে হারিয়ে ফুলীর একাকিত্ব প্রকাশিত হয়েছে উপর্যুক্ত সংলাপে। সেকারণেই সে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে রোপিত স্বর্ণলতা গাছটির পরিচর্যায় নিজের মমত্ব ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে উক্ত লোকবিশ্বাসের অনুষঙ্গে। বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত যে, মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির আত্মা বা রুহ কবরে অবস্থান করে। কিয়ামত বা রোজহাশরের বিচারের পূর্ব পর্যন্ত সেই আত্মা কবরেই থাকে। ইহলোকে সংঘটিত কাজের পরিণাম হিসেবে ভালো ও খারাপ কাজের জন্য তাদের জন্য সেখানেই পুরস্কার ও শাস্তির বিধান রয়েছে। তবে মুসলমানদের জন্য পুণ্যময় রাত হিসেবে বিবেচিত শবে বরাতের রাতে মৃত ব্যক্তির আত্মার কবরের কাছে ঘোরাফেরার কোনো উল্লেখ বা প্রসঙ্গ শাস্ত্রীয় ইসলামে নেই। উদ্ধৃতিতে বিধৃত প্রসঙ্গটি সম্ভবত লৌকিক ইসলামের প্রভাবজাত, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সনাতন ধর্মের পরজন্মবাদ প্রসঙ্গ।

২. লোকসংস্কার

বোবা কাহিনী উপন্যাসে বাঙালি সমাজে প্রচলিত বিবিধ লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। এসব সংস্কারে লোকমানুষের বিশ্বাস, অভ্যাস, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, ভীতিবোধ, অনিষ্ট ও অমঙ্গল সংক্রান্ত নানা ভাবনার রূপায়ণ ঘটেছে।

২.১ *দিব্যি দেয়া*

ক. কামলারা ধান কাটিতেই ছিল। আজাহের এবার তাহাদের সামনে আসিয়াই দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "দোহাই দিছি কোম্পানী বাহাদুরের, দোহাই মহারাণী মার। মিঞারা তোমরা আগগাওরে, আমার জমির ধান কাইটা নিয়া গ্যাল। ও মাতবরের পো! ও বরান খাঁ! ... আজাহের এবার আরো জোরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "দোহাই দিছি কোম্পানীওয়ালার, দোহাই দিছি ইংরাজ বাহাদুরের, মিঞারা তোমরা দেইখা যাও, আমার জমির ধান কাইটা নিয়া গ্যাল।" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৫০-৫১)

খ. আজাহের সেই আদালতের পিয়নের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। "দোহাই দিচ্ছি কোম্পানী বাহাদুরের দোহাই মা মহারাণীর, আমার হালের গরু দুইডা নিবেন না।" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৭২)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে আজাহেরের সংলাপে সুদখোর মহাজন শরৎ সাহার অপতৎপরতায় নিজের কষ্টার্জিত ফসল হারানোর প্রসঙ্গটি দিব্যি দেয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। দোহাই দেয়া সংক্রান্ত সংস্কারের মূলে রয়েছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতি মানুষের আনুগত্য স্বীকার বা সমীহ করার প্রবণতা, পাশাপাশি অন্যকে ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। স্রষ্টার প্রতি সমীহ প্রকাশার্থে বাঙালি মুসলমান সমাজে, 'আল্লাহর দোহাই', 'আল্লাহর কিরা' এবং হিন্দু সমাজে 'ভগবানের দিব্যি' প্রচলিত। ক্রমশ এ সংস্কার লোকসমাজে পরিবর্তিত রূপে যে প্রকাশিত হয়েছে, উদ্ধৃতিতে তা লক্ষণীয়। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির এদেশের শাসনব্যবস্থা দখল করায় ভূমির প্রকৃত অধিকারী কৃষকরা তাদের অধিকার থেকে বহুকাল ধরেই বঞ্চিত হয়েছে। এ অবস্থা আজাহেরের ক্ষেত্রে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে শরৎ সাহার নিকট হতে কষ্টার্জিত অর্থে জমি কিনে তাতে ফসল ফলিয়েও নিজের গোলায় তুলতে না পারার অপারগতায়। তারই সামনে সেই সুদখোর মহাজন কামলাদের দিয়ে বলপূর্বক ধান কাটিয়ে নিতে গেলে সে মরিয়া হয়ে গ্রামের মাতবর মিনাজদ্দী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি বরান খাঁর শরণাপন্ন হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও এর কর্তাব্যক্তিদের দোহাই দিয়েও আজাহের শরৎ সাহাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। কেননা, ক্ষমতা যার করায়ত্ত, সে বরাবরই দুর্বলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, যা উক্ত উদ্ধৃতিতে প্রতীয়মান। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতি পূর্বের উদ্ধৃতিরই সম্প্রসারণ। বিয়ের জন্য শরৎ সাহার নিকট থেকে পনের টাকা ঋণ নিলেও আজাহের যথাসময়ে তা পরিশোধ করে। কিন্তু শঠ সুদখোর মহাজন শরৎ সাহা বারবার তা অস্বীকার করে। বকেয়া অর্থ সুদসহ চক্রাকার বৃদ্ধিতে কয়েক বছরের ব্যবধানে বিপুল অর্থে পরিণত হয়েছে, যা পরিশোধে আজাহের অসমর্থ — এ অভিযোগে শরৎ সাহা আদালতে মামলা দায়ের করে প্রভাব খাটিয়ে। অবশেষে আদালতের সমন জারি করিয়ে সে আজাহেরের সমুদয় বিষয়াষয় দখল করে। আজাহের আদালতের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরিত পিয়নের নিকট কোম্পানি বাহাদুর ও মহারাণীর দোহাই দিয়ে শত আকুতি জানালেও তা কার্যকর হয়নি। অশিক্ষিত অসহায় দুর্বল আজাহেরের হৃতসর্বস্ব হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না, ধূর্ত প্রতারক শরৎ সাহার চক্রান্তের জেরে।

২.২ *মন্ত্র*

ক. গণ্শা বলে, "দেখ বছির। আমি সন্ন্যাসী হয়া জঙ্গলে যায়া তপস্যা করব। দেবতা যদি আমার তপে তুষ্ট হয়া বর দিতি আসে তবে কইমু, আমারে এমন বর দাও ওই মাষ্টারের লাঠিগাছারে আমি যা হুকুম করুম ও যেন তাই করে। মাষ্টার যহন আমারে লাঠি দিয়া মারতি আইব অমনি লাঠিরে কইমু, লাঠি ফির্যা যায়া মাষ্টারের পিঠি পড়, খানিকটা লাঠির বাড়ি পিঠি পাইলি তহন বুঝবি মাষ্টার, লাঠির মাইরের কেমুন জ্বালা।" ... বছির বলে, "আচ্ছা গণেশ ভাই! এমন মন্তর সেহা যায় না? যহন মাষ্টার মশায় তোমারে মারতি আসপি তহন মন্ড্র পইড়া আমি ফুঁক দিব, অমনি মাষ্টারের আত অবশ হয়া যাবি।" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৪৩)

খ. গণ্শা বছিরের আরও কাছে আসিয়া বলে," দেখ বছির। তুই ত শহরে চললি, দেহিস সেহানে কেউ এমন কোন মন্তর যদি জানে যা পড়লি মাষ্টারের ব্যাতের বাড়ি পিঠে লাগে না, আমারে খবর দিস। আমি যায়া শিখ্যা আসপ।" ... "য়্যা গণশা-বাই! তোমারে মাষ্টার মশায় আইজ আবার মারছে নাকি?" বলিয়া বছির সমবেদনায় গণশার পিঠে হাত রাখে। ... "নারে, সে জন্যি না। মাষ্টার মশার মাইর ত আমার গা-সওয়া হয়া গ্যাছে। উয়ার জন্য আমি ডরাই না। পাঠশালার আর সকল ছাত্রগো মাষ্টার মশায় মারে, ওগো কান্দন আমি সইবার পারি ন্যা। তেমুন একটা মন্তর জানতি পারলি আমি ওগো শিখাইয়া দিতাম, ওগো গায়ে মাষ্টারের ব্যাতের বাড়ি লাগত না। এমন মন্তর জানা লোক পাইলি তুই আমারে খবর দিস?" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৯২)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে গণ্‌শার সংলাপে পাঠশালার শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ মনোভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। কেননা, সেখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পড়া বুঝিয়ে দেয় না, অথচ পড়া শিখে না এলে তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালায়। গণশার সরল মনে দেবতার প্রতি ভক্তি রয়েছে বলেই সে অন্য বর না চেয়ে তার কাছে এ সমস্যার সমাধানের জন্য লাঠির আঘাতে শিক্ষককেই কাবু করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। এ ভাবনা বছিরের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে মন্ত্রের শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করায়। কল্পনাচারিতা তাদের আলাপের অবলম্বন হলেও এর অন্তরালে পাঠশালার শিক্ষকের প্রতি বিরূপতার বহিঃপ্রকাশই তাদের ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতি পূর্বের উদ্ধৃতিরই সম্প্রসারণ। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বছিরের শহরে যাবার সময় তার প্রতি গণ্‌শার সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে মন্ত্রের প্রতি আসক্তি। কেননা, পাঠশালার শিক্ষকের প্রহারে গণ্‌শা অভ্যস্ত হলেও সহপাঠীদের ওপর এ নির্যাতন মেনে নিতে সে অসম্মত। তাই সে এ সমস্যার প্রতিকারের জন্য মন্ত্রের ওপর আস্থাবশত বছিরকে উক্ত অনুরোধ জানায়।

২.৩ *বিবিধ*

ক. চিড়া কুটিয়া মা গামছায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে। মা বলে, "সঙ্গে নিয়া যা। সকালে সন্ধ্যায় নাস্তা করিস। আর এই দুই হ্যান পাঁটি সাঁপটা পিঠা নিবিরে? পথের মদ্দি খাইস।" ... বাপ বলে, "বাজা-পুড়া অযাত্রা, সঙ্গে দিও না।" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৯১)

খ. মজিদ হোটেল-ওয়ালাকে বলিল, "হাফেজসাব! আজই এক ছিপারা কোরান শরীফ পইড়া আপনার মা-বাপের নামে বকশায়া দিবানি। আমাগো একটু মাছের ঝোল দেওনের হুকুম করেন।" ... হোটেল-ওয়ালা বলিল, "অত বকশানের কাম নাই। পয়সা আছে যে মাছের ঝোল দিব?" ... মজিদ বলিল, "আমরা তালেব-এলেম মানুষ। আমাগো দিলি আল্লা আপনাগো বরকত দিব। না দিলি আল্লা বেজার হবেন।" ... হোটেল-ওয়ালা মনে মনে ভাবিল, না যদি দেই তবে হয়ত ইহারা অভিসম্পাত দিবে। শত হইলেও তালেব-এলেম! ইহাদের কথা আল্লা শোনে। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে দুই চামচ মাছের ঝোল তাহাদের পাতে ঢালিয়া দিল। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ২৪২)

গ. নতুন শিশু পুত্রটিকে লইয়া আজাহের আর তার বউ বড়ই মুস্কিলে পড়িল। বাড়িতে বর্ষিয়সী কোন স্ত্রীলোক নাই। কেমন করিয়া শিশুকে দুধ খাওয়াইতে হইবে, কেমন করিয়া তাহাকে স্নান করাইতে হইবে, কি ভাবে তাহাকে কোলে লইতে হইবে, কোন সময় কি ভাবে শিশুকে শোয়াইলে তাহাকে ডাইনীতে পায় না এসব খবর তাহারা কেহই জানে না। আনাড়ী মাতা শিশুকে দুধ খাওয়াইতে যাইয়া তাহার সমস্ত গায় দুধ জড়াইয়া দেয়, স্নান করাইতে শিশুর নাকে মুখে জল লাগে, সর্দ্দি হয়। বেশী দুধ খাওয়াইয়া শিশুর পেটে অসুখ করে। ... দৌড়াইয়া যায় আজাহের রামে-রাজের বাড়ি। তুক-তাবিজের অলঙ্কারে শিশুর সকল অঙ্গ ভরিয়া যায়। পাড়া-প্রতিবেশীরা শিশুর ভালোর জন্য যে যেমন বিধান দেয় দুইজনে অক্ষরে অক্ষরে তাহা পালন করে। এই ভাবে শিশু দিনে দিনে বাড়িতে থাকে। ... এখন তাহারা ঠেকিয়া ঠেকিয়া অনেক শিখিয়াছে। রাত্রে বাহির হইতে আসিয়া 'শিশুর ঘরে' প্রবেশ করিলে শিশুকে প্রেতে পায়। নিমা-সামের কালে শিশুকে বাহিরে আনিলে তাহার বাতাস লাগে। বাতাস লাগিয়া পেটে অসুখ করে। ডাইনী আসিয়া শিশুর সঙ্গে কথা কহিতে চেষ্টা করিলে তাহার 'জ্বর চমকা' লাগে। এ জন্য সাবধানও তাহারা কম হয় নাই। ... ঘরের দরজার পাশে একটা মরা-গরুর মাথার হাড় লটকাইয়া রাখিয়াছে। ডাইনীরা তাহা দেখিয়া পালাইয়া যাইবে। কে কখন শিশুকে দেখিয়া নজর দেয়, বলা যায় না ত? সকলের চোখ ভাল না। তাহাতে শিশু রোগা হইয়া যাইতে পারে। উঠানের এক কোণে বাঁশ পুঁতিয়া তাহার উপরে রান্নাঘরের একটি ভাঙ্গা হাঁড়ী বসাইয়া

> রাখিয়াছে। ছেলের দিকে নজর লাগাইলেই সেই নজর আবার যদি সেই কালো হাঁড়ীর উপর পড়ে তবে আর তাহাতে ছেলের কোন ক্ষতি হইবে না। ছেলের যাহাতে সর্দি না লাগে সেই জন্য তাহার গলায় একছড়া রসুনের মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৬৪)

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে খাদ্য সম্পর্কিত লোকসংস্কারের প্রভাব লক্ষণীয়। সম্ভবত সেকারণেই আজাহের তার স্ত্রীকে নিষেধ করেছিল বছিরের শহরে গমনকালে এসব খাবার না দিতে। খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে লোকমানসে ধর্মের প্রতি সমীহবোধ লক্ষণীয় হোটেলমালিক হাফেজ মিঞার মনোভঙ্গিতে। কেননা, কোরান শরীফ মুখস্থকারী কিশোরদের প্রতি সে আস্থা স্থাপনে অনাগ্রহী। দিনের পর দিন ধারে তারা তার হোটেলে খাওয়ায় সে একপর্যায়ে তাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়। অথচ মজিদের প্রলোভনকে উপেক্ষা করতে গিয়েও সে দ্বিধায় পড়ে। কেননা, স্রষ্টার কালাম শিক্ষার্থীরা তার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে অভিশাপ দিলে তা ফলতে পারে ভেবে সে শঙ্কিত ছিল। অভিশাপ সংক্রান্ত লোকসংস্কার এভাবেই তার সিদ্ধান্তকে বদলে দেয়। 'গ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে নবজাতকের জন্ম সংক্রান্ত বিবিধ লোকসংস্কার মান্য করার দৃষ্টান্ড় রয়েছে। প্রথম সন্ড্রন বছিরের জন্মের পর তাকে প্রতিপালন করতে গিয়ে আজাহের ও তার স্ত্রী অনভিজ্ঞতাবশত বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। ছেলের জন্য সঠিক পরিচর্যাহেতু তারা অন্যদের পরামর্শ মেনে নেয়, যাতে প্রতিফলিত হয়েছে নবজাতক সম্পর্কিত সতর্কতা। কেননা, শিশুর অনিষ্টসাধনের জন্য ভূতপ্রেত-ডাইনির অপতৎপরতা, রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি, প্রতিবেশীদের নজর দেয়া বা খারাপ দৃষ্টি পড়া সংক্রান্ত নানা লোকসংস্কার এ দম্পতিকে বিচলিত করে। এর প্রতিকার হিসেবে তুকতাক, তাবিজে আস্থা স্থাপনে তারা উদ্বুদ্ধ হয়।

৩. লোকাচার

এ উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত লোকাচারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো অতিথিকে আপ্যায়ন ও পরিচর্যা। আজাহের তার পরিবার নিয়ে যখন গরীবুল্লা মাতবরের বাড়িতে আসে, সে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। সে সালাম দিয়ে মিনাজদ্দী মাতবরের পরিচয় জানাতেই গরীবুল্লা তাদের ঘরে বসিয়ে স্ত্রীকে আহ্বান করে খাতির-যত্নের জন্য। আজাহেরের জন্য ওজুর পানি পাঠিয়ে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া হয়। আজাহেরের হাত-মুখ ধোয়ার জন্য বদনায় পানি ও খড়ম দেয় গরীবুল্লার মেয়ে ফুলু। গরীবুল্লা মেয়েকে ডেকে জানায়, 'তোর মাকে ক গিয়া বড় মোরগডা জবাই কইরা দিতি। আইজ বেয়াই-এর দ্যাশের কুটুমরে বাল কইরা খাওয়াইতি অবি' (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৯০)। অচিরেই ফুলী আজাহেরের নাস্তার জন্য নানা খাবার নিয়ে আসে। আজাহের হাত মুখ ধুয়ে সেসব খেতে খেতে গরীবুল্লার সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত হয়। এরপর চলে পান-সুপারি খাবারের আয়োজন। অন্যদিকে আজাহেরের ছেলেমেয়েরা গরীবুল্লার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলায় ব্যস্ত হয়ে যায়। সেই সুযোগে রান্না চাপিয়ে গরীবুল্লার স্ত্রী আজাহেরের স্ত্রীর চুলে তেল দেয় এবং 'তুই' সম্ভাষণে ছোট বোনের মতো আন্তরিকভাবে কাছে টেনে নেয়। যে অশেষ কষ্ট হৃদয়ে নিয়ে আজাহের ও তার স্ত্রী গরীবুল্লার নিকট হাজির হয়েছিল, তা প্রকাশের জন্য তারা উন্মুখ ছিল। কিন্তু গরীবুল্লা ও তার স্ত্রী তাদের দুর্দশা অনুমান করেই সে বিষয়ে সেদিন আলাপে বিরত ছিল। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষে তাদের শোয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। পাঁচ-ছয়দিন অতিক্রান্ত হলে গরীবুল্লা আজাহের ও তার পরিবারের সম্মানে গ্রামের মানুষকে নিমন্ত্রণ জানায় বিশাল ভোজের আয়োজনে। ইতোমধ্যে যখনই আজাহের এ গ্রামে তার আসবার

বৃত্তান্ত জানাতে চেয়েছে, গৃহস্থালী কাজে ব্যস্ত হতে চেয়েছে, প্রতিবারই তাকে থামিয়ে দিয়ে গরীবুল্লা জানিয়েছে, 'কুটুমির দ্যাশের মানুষ। মিঞা! তুমি যদি আমার বাড়িতি কাম করবা, তয় আমার মান থাকপ? কুটুম বাড়িতে আইছ। বাল মত খাও দাও, এহানে ওহানে হাইট্যা বেড়াও, দুইডা খোশ গল্প কর' (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৯৫)। অবশেষে ভোজপর্ব সমাপ্ত হলে আজাহের এ গ্রামে পরিবারসহ তার আসবার বৃত্তান্ত গ্রামবাসীকে জানায়। এভাবেই আজাহের গরীবুল্লার পরিবার ও গ্রামের বাসিন্দাদের আন্তরিকতা, সমাদরের সঙ্গে পরিচিত হয়। মৃত সম্পর্কিত লোকাচারের দৃষ্টান্ত বিবৃত হয়েছে আজাহেরের মেয়ে বড়ুর কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণের ঘটনায়। তাকে কবরস্থ করতে সে যেখানে সঙ্গীদের নিয়ে খেলত, বাড়ির কদম গাছটির নিচের সেই স্থানটি খোঁড়া হয়। তাম্বুলখানার হাট থেকে আতর ও লোবান আনা হয়। কাফনের কাপড়ের অভাবে রহিমদ্দী কারিগরের উপহৃত শাড়ি দিয়ে তাকে ঢেকে দেয়া হয়। গরীবুল্লার স্ত্রী বড়ুর মৃতদেহের গোসল করিয়ে দিলে এরপর তাকে বাঁশের মাচায় শোয়ানো হয়। জানাজা শেষে বড়ুর মৃতদেহ কবর দেয়া হয়। তার কবরে প্রথমে মাটি দেয় তার পিতা আজাহের। এরপর ভাই বছির ও অন্যরা মাটি দিয়ে কবর ভরাট করে। কবরের ওপর সরষের বীজ বুনে দেয়া হয়, যেন রাতের অন্ধকারে শেয়াল এসে কবর থেকে মৃতদেহ খুবলে খেতে না পারে।

৪. লোকসাহিত্য

ধাঁধা, লোককাহিনী ও লোকসংগীতের সমাহারে এ উপন্যাসে ফরিদপুরের লোকসাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের পরিচয় প্রকাশিত —

৪.১ ধাঁধা

গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত কিছু ধাঁধার উল্লেখ এ উপন্যাসে রয়েছে। আজাহের যখন বিয়ে করতে যায়, তখন তার হবু স্ত্রী এ শর্তে বিয়েতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিল যে, তার ধাঁধার জবাব বরপক্ষকে দিতে হবে। কনের হয়ে তার পক্ষের কয়েকজন বরপক্ষকে প্রশ্ন করে, 'বচ্ছরকে দুইটা পাখি আসে। তার একটা সাদা আর একটা কালা। আপনারা কালাডা খাইবেন না ধলাডা খাইবেন। কোনডা আপনাগো জন্যি আনবো?' এর উত্তর দেয় মোড়ল মেনাজদ্দী 'বচ্ছরকে দুইডা পাখি আসে রোজার মাসে, কালা পাখি ঐল রাইত আর ধলা পাখি ঐল দিন। আমি কালা পাখিই খাইলাম। রোজার মাসে ত কালা রাত্তিরেই ভাত খাইতে হয়।' (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১১-১২)। এরপর মেনাজদ্দী কনেপক্ষকে জানায়—

মাইটা হাতুন কাঠের গাই—
বছর বছর দুয়ায়া খাই
(জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১২)

এর জবাব দেয় কনেপক্ষের মোড়ল বরান খাঁ, "মানে খেজুর গাছ। এক বছর পরে খাজুইর গাছ কাটা হয়। মাটির হাঁড়ী গাছের আগায় বাইন্দা রস ধরা হয়"। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১২)। এরপর সে আবার প্রশ্ন করে—

নয় মন গোদা, নয় মন গুদি,
নয় মন তার ছাওয়াল দুটি।

নদী পার অইব। কিন্তুক নৌকায় নয় মনের বেশী মাল ধরে না। কেমন কইরা পার অবি? "
(জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৩)

এর জবাবে বরপক্ষের মোড়ল মেনাজদ্দী বলে,

> পেরতমে দুই ছাওয়াল পার হ'য়া ওপারে যাবি। এক ছাওয়াল ওপারে থাকপি, আর এক ছাওয়াল নাও বায়া এপারে আসপি। তারপর গোদা নৌকা বায়া ওপারে যাবি। গোদার যে ছাওয়াল ওপারে রইছে সে নৌকা বায়া এপারে আসপি। আইসা দুই ভাই আবার ওপারে যাবি। ওপার ত্যা এক ভাই নৌকা লয়া এপারে আসপি। এবার গোদার বউ নৌকা লয়া যাবি। ছাওয়ালডা এপারেই থাকপি। ওপার যে ছাওয়ালডা রইছে সে নৌকা নিয়া আইসা এপার ত্যা তার বাইডারে লয়া যাবি। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৩)

ধাঁধার পর্ব সম্পন্ন হলে বিয়ের অন্যান্য আয়োজন ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলে।

৪.২ রূপকথা

লোককথা, রূপকথা, উপকথা, কেচ্ছাকাহিনিতে বাংলা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। গ্রামীণ লোকসমাজে এসবের প্রচলন ঘটেছে বহুদিন পূর্বে এবং বংশপরম্পরায় মুখে মুখে বাহিত হয়ে এগুলো এখনো টিকে রয়েছে। বিভিন্ন গাথা, আখ্যায়িকা, পল্লীগীতি ও পালাগানে উপজীব্য নানা কাহিনি ও রূপকথার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। কখনো কখনো রূপকথার বিষয় ও ঘটনাকে ভিত্তি করেই পল্লিগায়কদের কল্পনাযোগে স্থানীয় ভাষায় এগুলো রচিত ও গীত হয়। এ উপন্যাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় আমির সাধু ও বেলোয়া সুন্দরীর আখ্যানে। লেখকের বর্ণনায়—

> পল্লী-বাংলার অনেকগুলি রূপকথা সাহা, সাধু-সওদাগরদের কাহিনীতে ভরপুর। আজও পল্লীগ্রামের গানের আসরগুলিতে গায়কেরা কত সাধু-সওদাগরের, শঙ্খ-বণিকের দূরের সফরের কাহিনী বর্ণনা করিয়া শতশত শ্রোতার মনোরঞ্জন করে। কবে কোন নীলা-সুন্দরীর মাথার কেশে-লেখা প্রেম-লিপি পড়িয়া কোন্ সাহা বণিকের ছেলে সুদূর লঙ্কার বাণিজ্যে বসিয়া বিরহের অশ্রুবিন্দু বিসর্জন করিয়াছিল, তাহার ঢেউ আজো গ্রাম্য-রাখালের বাঁশীতে রহিয়া রহিয়া বাজিয়া উঠে। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৩২)

রহিমদ্দী কারিগরের সঙ্গে আলাপকালে আজাহের গীত শুনতে চাইলে সে এ লোকগীত পরিবেশন করে। নদীর ঘাটে স্নান করতে গেলে আমির সাধুর রূপবতী স্ত্রী বেলোয়া সুন্দরীকে দেখে মগ জলদস্যুরা তাকে অপহরণ করে। স্ত্রীকে হারিয়ে বিরহব্যথায় ব্যাকুল আমির সাধু মনের দুঃখে সারিন্দা বাজাতে বাজাতে নানা স্থানে খুঁজেও তাকে পায় না। এ কাহিনীকে ভিত্তি করেই গীতটি রচিত। তেমনিভাবে তার পরিবেশিত ওতলা সুন্দরীর কাহিনিকে ভিত্তি করে রচিত গীতের উদ্দেশ্য নারীর নৈতিক আদর্শ ও সতীত্বের মহিমায় অটল থাকার দৃঢ়তাকে মহিমা দান। এসব কাহিনিতে উপজীব্য হয় সমাজ ও পারিবারিক জীবনে অনুসৃত বিশেষ কোনো নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয়-সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ, যা সহজেই শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে। ওতলা সুন্দরীর গীতের কাহিনি হলো—

> ইরান তুরান মুল্লুকের এক খ্যাতিমান বাদশার অতুলনীয় সুন্দরী কন্যা ওতলা সুন্দরী। একসময় এক সওদাগর পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর তারা মহানন্দে প্রাসাদে বসে পাশা খেলে। বিলাস ব্যসনে সময় অতিবাহিত করায় লোকজন সওদাগরপুত্রের নিন্দা করে। এ খবর তার পিতার কানে গেলে সওদাগরপুত্র একপর্যায়ে স্ত্রীকে রেখে দূরদেশে বাণিজ্য করতে যায়। বিদায়কালে সে তার মা ও বোনকে অনুনয় করে, স্ত্রীকে দেখে রাখার জন্য। সওদাগর পুত্র ছয় মাস ধরে বিভিন্ন নগর-বন্দরে বাণিজ্য করতে করতে একপর্যায়ে সাত সমুদ্রের তীরে হাজির হয়। এখানে এক পাখির কাছে ছয় মাসের পথ অচিরেই অতিক্রম করার কৌশল জেনে নিয়ে

> সে গভীর রাতে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হয়। এ ঘটনা কেউ জানতে পারেনি। স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়লীলায় রাত যাপন করে ভোরেই সওদাগরপুত্র মন্ত্র পড়ে সমুদ্রতীরে চলে যায়। একপর্যায়ে ওতলা সুন্দরী গর্ভবতী হলে তার সতীত্ব ও সন্তানের জনকত্বের প্রশ্নে সকলের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হয়। ওতলা স্বামীর আগমনের কথা জানালেও কেউই তার কথা বিশ্বাস করে না। তখন দেহের মহামূল্য অলংকাররাজি ও দামী পরিচ্ছদ খুলে তাকে ছেঁড়া চটের বসন পরিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। পথে পথে অনাহারে ঘুরতে ঘুরতে ওতলা অবশেষে এক বৃদ্ধ চাষীর গৃহে ঠাঁই পায়। সেখানেই সে এক ছেলের জন্ম দেয়। একপর্যায়ে সেই চাষী মারা গেলে আশ্রয়হারা ওতলা ছেলে কোলে নিয়ে আবার পথে নামে, স্বামীর খোঁজে। কিন্তু কেউই সওদাগরপুত্রের সন্ধান তাকে জানাতে পারে না। বনের এক দুষ্ট লোক ওতলার রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে বশীভূত করতে চায়। ওতলা তার প্রস্তাবে সম্মত না হলে সে তার ছেলেকে কেড়ে নেয় এবং তাকে হত্যার হুমকি দেয়। তবু ওতলা সম্ভ্রম বিসর্জনে সম্মত না হলে একপর্যায়ে সেই পাষাণ ওতলার প্রাণপ্রিয় ছেলেকে হত্যা করে। ছেলের শোকে প্রায় উন্মাদিনী ওতলা অহর্নিশ বিলাপ করলেও তার দুঃখের পালা ফুরায় না। রহিমুদ্দীর পরিবেশিত এ গীতাখ্যান শুনে আসরের শ্রোতাদের চোখের জল উপচে ওঠে ওতলার প্রতি সমবেদনায়। গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত এ কাহিনীর অন্যতম আকর্ষণ হলো, প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনায় পরিপূর্ণ মানবিক বৃত্তান্তের সঙ্গে শ্রোতারা নিজেদের জীবনবাস্তবতাকে একাত্ম করতে পারে। ফলে, ওতলা তাদের কল্পনায় ইরানের রাজকন্যা নয়, বরং পল্লীর সাধারণ গৃহবধূ হয়ে ওঠে।

লেখকের অভিমত—

> কাহিনীর ভিতর দিয়া এই দেশের সব চাইতে যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ সেই একনিষ্ঠ প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়া গেল। সেই প্রেমের মর্যাদা রাখিতে এ দেশের মেয়েরা কত দুঃখের সাগরে স্নান করিয়াছে ... যুগে যুগে এই প্রেম, দুঃখের অনলে পুড়িয়া নিজের স্বর্ণজ্যোতি আরও উজ্জ্বলতর করিয়াছে। অস্ত্র তাহাকে ছেদন করিতে পারে নাই, অগ্নি তাহাকে দাহন করিতে পারে নাই। রহিমদ্দীর মত বাঙলার গ্রামগুলিতে এইরূপ কত গায়ক, কত কবি, কত কথক রহিয়াছে। তাহারা বাঙলার অবহেলিত জনগণের মধ্যে আনন্দ-রসে ভরিয়া এই আদর্শবাদ আর নীতির মহিমা প্রচার করিতেছে। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৬৪)

৪.৩ লোকসংগীত

এ উপন্যাসে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী মুর্শিদী-মারফতি, ভাটিয়ালি ও বাউল সংগীতের পাশাপাশি বিয়ের মেয়েলি গীত, বালক-বালিকাদের খেলায় পরিবেশিত গান ও বিভিন্ন গ্রাম্য লোকগীতি কুশীলবদের বয়ানে পরিবেশিত হয়েছে। বিশেষত রহিমদ্দী কারিগরের বয়নে আমির সাধু ও ওতলা সুন্দরীর লোকগীত নৃত্যযোগে উপস্থাপিত হলেও আরজান ফকির ও তার স্ত্রীর মাধ্যমে সারিন্দাযোগে বিভিন্ন লোকসংগীতের পরিবেশনা লক্ষণীয়। লোকমানুষের চিত্তবিনোদন ও প্রাণের আকুতিকে যথোপযুক্ত শব্দ ও ভাবসমাবেশে, লোকবাদ্যসমূহের সুর ও তালের নিপুণ যোজনায় পরিবেশনের অসামান্যতাগুণে এগুলো যুগ যুগ ধরে বাঙালি লোকমানুষকে আলোড়িত করে। এ উপন্যাসে লোকগীতি, বিয়ের মেয়েলি গীত, বালকবালিকাদের পুতুল খেলায় পরিবেশিত গীত, মারফতি, ভাটিয়ালি ও বাউল গানের সমাহার ঘটেছে। প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন অনুষঙ্গ, হাসি-ছাট্টা, প্রেম-ভালোবাসা, বিরহ-মিলনের অনুষঙ্গ, লোককাহিনির চমকপ্রদ ঘটনাদির সঙ্গে যথোপযুক্ত সুর, তাল ও রসের সমাবেশে গীতময়তা ও মানবিক আবেদনের গুণে এসব গান যুগযুগ ধরে শ্রোতাদের বিমোহিত করে চলে। তাদের চিত্তবিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে

এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। রহিমদ্দী কারিকরের কাছে আজাহের গান শুনতে চাইলে সে পরিবেশন করে আমির সাধু ও তার স্ত্রী বেলোয়া-সুন্দরীর গীত–

প্রথমে বাজিলরে সারিন্দা আমির সাধুর নামরে;
হারে তারিয়া নারে। ...
তারপর বাজিলরে সারিন্দা–দেশের রাজার নামরে;
হারে তারিয়া নারে। ...
তারপর বাজিলরে সারিন্দা– বেলোয়া সুন্দরীরে;
হারে তারিয়া নারে। ...
আজ কোথায় রইল আমার বেলোয়া সুন্দরীরে–
(জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৪-৫)

লেখকের শিল্পিমানসে পরম মমতায়, সযত্ন অনুরাগে লালিত পল্লীজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন এসব লোকসংগীত। এগুলোতে বাঙালি লোকসমাজের নিত্যদিনের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ-মিলনের অকৃত্রিম অনুভবের পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রসঙ্গ বাঙ্ময় রূপ পেয়েছে। চিত্তবিনোদন এবং সৃষ্টিশীলতার অনবদ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে রূপায়িত গানগুলোর ভাবময়তা ও সাংগীতিক অনুরণন পাঠকের অন্তর্লোককে নিবিড়ভাবে আলোড়িত করে।

৫. লোকশিল্প

ফরিদপুর অঞ্চলের লোকশিল্পের খ্যাতি অতুলনীয়। বিশেষত, বয়নশিল্পের জন্য এ অঞ্চল স্বনামধন্য। এ উপন্যাসেও এতদঞ্চলের তাঁতি ও হস্তশিল্পীদের সৃষ্টিশীলতার পরিচয় উল্লেখিত। সূচিশিল্পের মধ্যে নকশিকাঁথা, রুমালের নকশা, পাট দিয়ে বানানো দড়ি, বাঁশের কঞ্চির ঝুড়ি, তাঁতে বিভিন্ন রঙের শাড়ি[৫] বয়নে গ্রামবাসী পারদর্শী। ফুলী আজাহেরকে ভালোবেসে যে নকশিকাঁথা সেলাই করেছিল, তাতে সুঁই-সুতার আঁচড়ে মূর্ত হয়েছে গ্রামীণ তরুণীর হৃদয়ে জাগ্রত শিল্পভাবনা ও কল্পনাশক্তির সমন্বয়—

> "তোমার জন্যি আইজ ছয়মাস ধইরা একখানা কাঁথা সিলাই করত্যাছিলাম। আইজ সারা রাইত জাইগা এডারে শেষ করলাম। দেখ তো বছিরবাই কেমন ঐছে।" ... এই বলিয়া ফুলী তার আঁচলের তলা হইতে কাঁথাখানা মেলন করিয়া ধরিল। দেখিয়া বছির বড়ই মুগ্ধ হইল। কোন শিল্প বিদ্যালয়ের শিক্ষা পাইয়া এই গ্রাম্য-মেয়েটি অঙ্কন পদ্ধতির সীমা-পরিসীমার জ্ঞান লাভ করে নাই। নানা রঙ সামনে লইয়া এ-রঙের সঙ্গে ও-রঙ মিশাইয়া রঙের কোন নতুনত্বও সে দেখাইতে পারে নাই। ছেঁড়া কাপড়ের পাড় হইতে লাল, নীল, হলুদ ও সাদা–মাত্র এই কয়টি রঙের সূতা উঠাইয়া সে এই নক্সাগুলি করিয়াছে। ... কাঁথার মধ্যে অনেক কিছু ফুলী আঁকে নাই। শুধু মাত্র একটি কিশোর-রাখাল বাঁশী বাজাইয়া পথে চলিয়াছে। আর একটি গ্রাম্য-মেয়ে কাঁখে কলসী লইয়া সেই বাঁশী মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে। পুকুরে কয়েকটি পদ্মফুল ভাসিতেছে। তাহাদের দলগুলির রঙে বংশীওয়ালার প্রতি সেই মেয়েটির অনুরাগই প্রকাশ পাইতেছে। ... তারই মনের আকুতি রূপ পাইয়াছে ওই চলন্ড় মাছগুলির মধ্যে, ওই উড়ন্ত পাখিগুলির মধ্যে এই ক্ষুদ্র কাঁথার উপরে ফুলী এতগুলি নক্সা এবড়ো থেবড়ো ভাবে বুনোট করে নাই। যেখানে যে নক্সাটি মানায়– যে রঙটি যে নক্সায় শোভা করে সেই ভাবেই ফুলী কাঁথাখানি তৈরী

> করিয়াছে। আর সবগুলি নক্‌সাই বাঙালীর যুগ যুগান্তরের রস-সৃষ্টির সঙ্গে যোগ-সংযোগ করিয়া হাসিতেছে। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ২৮৩)

রহিমদ্দীর বোনা জামদানি শাড়ির খ্যাতি স্বগ্রাম পেরিয়ে আশেপাশের অঞ্চলসমূহেও ছড়িয়ে পড়ে। সেকারণে বড় বড় ব্যবসায়ীরাও তার কাছে আসত শাড়ি কিনতে। শুধু জামদানি শাড়িই নয়, সে মনখুশী, দিলখুশী, কলমীলতা, কাজল লতা, গোলাপ ফুল, রাসমণ্ডল, বালুচর প্রভৃতি শাড়ি বুনতেও পটু ছিল। সেকারণেই আজাহের তার নববধূকে কোন রঙের শাড়িতে মানাবে, এরূপ কল্পনায় মত্ত হয় রহিমদ্দীর তাঁতে বোনা রঙবেরংয়ের শাড়ি দেখে–

> আজাহের কাপড়গুলির পানে চায়, আর মনে মনে চিন্ড়া করে, কোন্ কাপড়খানা তার বউকে মানাইবে ভাল। তার বউ যদি ফর্সা হয়, একেবারে সরষে ফুলের মতো ফর্সা, তবে ওই নীলের উপর হলুদের ডোরা-কাটা শাড়ীখানা সে তার জন্য কিনিয়া লইবে। কিন্তু বউ যদি তার কালো হয়, তা হোক, ওই যে কালোর ওপর লাল আর আবছা হলুদের ফুল-কাটা পাড়ের শাড়ীখানা, ওইখানা নিশ্চয় তার বউকে মানাইবে ভাল। আচ্ছা, বরান খাঁর মেয়ে আসমানীর মত পাতলা ছিপছিপে যদি তার গায়ের গড়ন হয়, তবে ওই যে পাড়ের উপর কলমীফুল আঁকা শাড়ীখানা, ওইখানা তার বউ-এর জন্য কিনিলে হয় না? (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৬)

গ্রামীণ গৃহবধূদের হাতে বোনা শিকা ও আল্পনার উল্লেখ রয়েছে এ উপন্যাসে। আজাহের তাম্বুলখানা গ্রামে গরীবুল্লা মাতবরের বাড়িতে এলে একপর্যায়ে গ্রামবাসী তাকে সাহায্য করেছিল চালাঘর নির্মাণে। প্রতিবেশী নারীরা আজাহেরের স্ত্রীকে বিভিন্ন উপহার দিয়ে, বসতবাড়ি আল্পনায় সাজিয়ে বিমোহিত করেছিল। আজাহেরের বাড়ি দেখে স্বয়ং গরীবুল্লাও অবাক হয়েছিল—

> ঘরের মধ্যে যাইয়া মোড়ল আরো অবাক হইয়া গেল। ঘরের চালার আটনে একটা ফুলচাঙ পাতা। তাহার সঙ্গে কেলীকদম্ব সিকা, আসমান তারা সিকা, কত রঙ বেরঙের সিকা ঝুলিতেছে। সেই সব সিকায় মাটির বাসন। ছোট ছোট খুটি (হাঁড়ি) বাতাসে দুলিতেছে। ঘরের বেড়ায় কাদা লেপিয়া চুন-হলুদ আর আলো-চালের গুঁড়া দিয়া নতুন নক্‌সা আঁকা হইয়াছে। মোড়ল বুঝিতে পারিল তাহার গৃহিণী সমস্ত গাঁয়ের মেয়েদের লইয়া সারা দিনে এইসব কাণ্ড করিয়াছে। ... মোড়লের বউ তখন বলিতে লাগিল, "এই সিকাডা দিছে বরান খাঁর বউ, এইডা দিছে কলিমদ্দীর ম্যায়া, আর এই সিকাডা দিছে মোকিমির পরিবার।" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১০৪-১০৫)

৬. লোকখাদ্য

এ উপন্যাসে গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন লোকখাদ্যের উল্লেখ রয়েছে—

ক. সামনের পালান হইতে বেতে-শাক তুলিয়া আনিয়া কুলার উপর রাখা হইয়াছে। তারই পাশে একরাশ ঘোমটা মাথায় দিয়া বউটি হলুদ বাঁটিতেছে। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ২০)

খ. খ্যাতের ধান পাকলি তুমি মনের মত কইরা পিঠা বানাইও, কেমন? (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ২০-২১)

গ. শ্বশুর বাড়িতে দুপুর বেলায় শুকনো ডাঁটার ঝোল আর পচা আউস চাউলের ভাত খাইয়া জামাই চলিয়া গিয়াছে। ... আজ পাঁচ বচ্ছর মেয়েটাকে বিয়ে দিয়েছি, একখানা পান-বাতাসা হাতে করে মেয়েটাকে দেখে গেল না। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৩৪-৩৫)

ঘ. ফুলু চীনের রেকাবীতে করিয়া মুড়ি, তীলের নাড়ু, নারকেলের তক্তি–আর একটি বাটিতে করিয়া ঘন আওটা দুধ আজাহেরের সামনে আনিয়া ধরিল। ... নাস্তা খাওয়া শেষ হইলেই মোড়ল নিজের বাঁশের চোঙ্গা হইতে পান বাহির করিল। পাশের দাখানা লইয়া একটা সুপারি অর্ধেক কাটিয়া আজাহেরের হাতে দিল। "মিঞা! পান সুপারি খাও।" তারপর খুব গর্বের সঙ্গে বলিতে লাগিল, "পান আমার নিজির বাড়ির, আর সুপারিও নিজির গাছের। চুনডা ক্যাবুল কিন্ছি।" বলিয়া চুনের পাত্রটি সামনে আগাইয়া দিল। আজাহের পান মুখে দিতে না দিতেই মোড়ল নিজির হাতে হুঁকোটি আনিয়া আজাহেরের হাতে দিল।" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৯০)

ঙ. ভাতের হাঁড়ির দিকে চাহিয়া আজাহের দেখিল যে সবগুলি পান্তা-ভাত বউ তাহাদের পাতে ঢালিয়া দিয়াছে। নিজের জন্য কিছুই রাখে নাই। ... সে নিজের মাটির সানকি হইতে অর্দ্ধেকটা পরিমাণ ভাত তুলিয়া হাঁড়িতে রাখিল। তারপর অবশিষ্ট ভাতগুলিতে সানকি পুরিয়া পানি লইয়া তাহাতে কাঁচা মরিচ, পেয়াজ ও লবণ মাখাইয়া শব্দ করিয়া গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১১১)

চ. মেছো বাজার পার হইলেই রাস্তার দুই ধারে মেঠায়ের দোকান। ... মিষ্টির দোকানে সব চাইতে সস্তা দামে বিক্রি হয় জিলিপি। ... আজাহের মিষ্টির দোকানের কাঁচের আবরণীতে রক্ষিত সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া প্রভৃতি স্তরে স্তরে সাজানো নানারকমের মিষ্টিগুলির উপর চোখ বুলাইয়া লইতেছিল। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১২১)

ছ. আজাহের অনেকগুলি বেতের আগা কাটিয়া লইল। শহরের লোকেরা বেতের আগা খাইতে পছন্দ করে। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১২৫)

জ. বনের মধ্যে ঢুকিয়া সারাদিন বছির এখানে সেখানে ঘুরিল। গাছের পেয়ারা পাড়িয়া খাইল। জঙ্গলের কুল পাড়িয়া স্তূপাকার করিল–তারপর সন্ধ্যাবেলায় চুপিচুপি বাড়ি ফিরিয়া আসিল। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১২৮)

ঝ. বউ রহিমদ্দীর সামনে মুড়ি আর গুড় আনিয়া দিয়া বলে, "চাচাজান খাউক।" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৫২)

ঞ. রহিমদ্দী ঢ্যাপের পোঁটলা আর তেলের শিশি তার বোঁচকার মধ্যে বাঁধিতে বাঁধিতে বলে ... (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৬৪)

ট. চিড়া কুটিয়া মা গামছায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে। মা বলে, "সঙ্গে নিয়া যা। সকাল সন্ধ্যায় নাস্তা করিস। আর এই দুই হ্যান পাঁটি সাঁপটা পিঠা, নিবিরে?" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৯১)

ঠ. ফকিরের স্ত্রী সামান্য খুদ ভাজিয়া লইয়া আসিল। দুইটি শাঁখআলু আগেই আখায় পোড়ানো হইয়াছিল। একটি পরিষ্কার নারিকেলের আচিতে ভাজা খুদ আর মাটির সানকিতে সেই পোড়া শাঁখআলু দুইটি আনিয়া বছিরের সামনে ধরিল। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ২১২-২১৩)

ড. ফকিরের বউ ... কিছু মুড়ি আর গুড় আনিয়া বলিল, "বাজান খাও।" ... সামান্য কিছু আতপ চাউল আর গুড় যদি থাকিত, তবে সে মনের মত করিয়া কত রকমের পিঠা তৈরী করিয়া এই কিশোর- দেবতাটির ভোগ দিত। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ২৩৭)

ঢ. ফকিরনী বছিরের হাতমুখ ধোওয়াইয়া তাহাকে সামান্যকটি ভিজানো ছোলা আনিয়া খাইতে দিল। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ২৩৯)

ণ. মাঝে মাঝে আজাহের ... বাড়ি হইতে গামছায় বাঁধিয়া কোনদিন সামান্য চিড়া বা ঢ্যাপের খই লইয়া আসে। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ২৫০)

ত. ভাত লইয়া ফকিরনী আর এক বাড়ি হইতে একটু শাক আর ডাল লইয়া আঁচল আড়াল করিয়া তার ছোট রান্নাঘরে ঢুকিল। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১২৮)

থ. সে ছেলের নাস্তা করিবার জন্য দশ সের চিড়া কুটিয়া দিবে। মিঞাজান দিবে এক হাঁড়ি খেজুরে-গুড়। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ২৬৮)

হুকায় ও কলকেতে তামাক সেবন ফরিদপুরের বাঙালি লোকসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত, যার সাক্ষ্য রয়েছে এ উপন্যাসে। গ্রামের পুরুষেরা এতে যে রীতিমত অভ্যস্ত, উপন্যাসটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিবৃত দৃশ্যসমূহে এর উল্লেখ ও বর্ণনা রয়েছে। অতিথি, বন্ধু-বান্ধব, চেনা পরিচিত ব্যক্তিবিশেষকে সমাদর জানাতে এ অভ্যাস হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ফরিদপুরের গাছবাইড়ার চক ও তাম্বুলখানা গ্রামদ্বয়ের পুরুষসমাজে প্রচলিত। উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদেই নিজের বিয়ের প্রসঙ্গে আলোড়িত নায়ক আজাহের নববধূর জন্য রহিমদ্দী কারিগরের বয়নকৃত তাঁতের রঙিন শাড়ি কেনা প্রসঙ্গে আলাপকালে তামাকযোগে খায়। লেখকের বর্ণনায় দৃশ্যটি এভাবে বিবৃত—

> রহিমদ্দী কারিকর তার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, "আরে কি মনে কইরা, আজাহের? বইস, বইস। তামুক খাও।" ... ঘরের বেড়ার সঙ্গে লটকান হুঁকোটি লইয়া কলিকার উপরে ফুঁদিয়া প্রথমে আজাহের কলিকার ছাইগুলি উড়াইয়া দেয়। তারপর কলিকার গুলটুকু ভাল জায়গায় ঢালিয়া রাখিয়া কলিকার মধ্যে খানিকটা তামাক ভরিয়া অতি সন্তর্পণে সেই গুলটুকু নিপুণ হস্তে তাহার উপর সাজাইয়া দেয়, যেন এতটুকুও নষ্ট না হইতে পারে। তাহার উপরে সুন্দর করিয়া আগুন ধরাইয়া রহিমদ্দী কারিকরের দিকে হুঁকোটি বাড়াইয়া ধরে। ... কারিকর বলে— "আরে না, না–তুমি আগে টাইনা ধুমা বাইর কর।" ... কারিকর যে তাকে এতটা খাতির করিয়াছে, আগে তাকে তামাক টানিতে বলিয়াছে এ যে কত বড় সম্মান! আজাহেরের সমস্ত অন্তর গলিয়া যায়। সে রহিমদ্দীর দিকে হুঁকোটি আরও বাড়াইয়া বলে, "কারিকরের পো, তা কি অয়? মুরব্বি মানুষ। তুমি আগে টাইনা দাও।" ... খুশী হইয়া কারিকর হুঁকোটি হাতে লইয়া টানিতে আরম্ভ করে, তার তাঁত চলা বন্ধ হয়। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৪)

৭. লোকপরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধন

এ উপন্যাসে বাঙালি গ্রামীণ লোকসমাজে প্রচলিত নারী-পুরুষের পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার বিভিন্ন উল্লেখ লক্ষণীয়—

ক. মেনাজদ্দী মাতব্বরের উৎসাহই এ বিষয়ে সকলের চাইতে বেশী। সে ফরিদপুরের খলিফাপট্টী হইতে তাহার জন্য লাল ফোঁটা দেওয়া একটি পিরান (জামা) কিনিয়া আনিল। নিজের যে চাদরখানা এতদিন তেলে ও ঘামে সিক্ত হইয়া নানা দরবারের সাক্ষ্য হইয়া তাহার কাঁধের উপর ঘুরিয়া বিরাজ করিত, তাহা সে আজ বেশ সুন্দর করিয়া পাকাইয়া পাগড়ীর মত করিয়া আজাহেরের মাথায় পরাইয়া দিল। একজোড়া বার্নিশ জুতাও মোড়ল আজাহেরের জন্য সংগ্রহ করিল। এ সব পরিয়া নতুন "নওশা" সাজিয়া আজাহের বিবাহ করিতে রওয়ানা হইল। ... ... সদ্য কেনা বার্নিশ জুতাজোড়া পায়ে লাগাইয়া চলিতে আজাহেরের পা দুলিয়া যাইতেছিল। তবু সে জুতাজোড়া খুলিল না। এমনি নওশার সাজে, এমনই জুতা-জামা পরিয়া সে তাহার কনের বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইবে। ... আজাহের তার রঙীন গামছাখানি অর্দ্ধেকটা বুকপকেটে পুরিয়া দিল, বাকি অর্দ্ধেক কাঁধের উপর ঝুলিতে লাগিল। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৭-৯)

খ. শাড়ীর ফাঁক দিয়া বউ-এর মেহেদী মাখান সুন্দর পা দুটি দেখা যাইতেছিল। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৮)

গ. হাতের চুড়ীগুলি টুং টুং করিয়া বাজিতেছে। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৯)

ঘ. আজাহের বলে, "সামনের ভাদ্দর মাসে পাট বেইচা তোমার জন্যি পাছা পাইড়া শাড়ী কিন্যা আনব।" (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ২১)

ঙ. (আজাহের) ঘরের বেড়া হইতে একখানা কাঠের ভাঙা চিরুণী আনিয়া মাথার অবাধ্য চুলগুলির সঙ্গে কসরৎ করিতে প্রবৃত্ত হইল। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ২১)

চ. পথে সাহাদের সুন্দর ছেলে মেয়েগুলি খেলা করিতেছে। তাহাদের প্রায় সকলের গলায়ই মোটা মোটা সোনার হার। কাহারো বাহুতে সোনার তাবিজ বাঁধা। কপালে সিঁদুর পরিয়া কাঁখে পিতলের কলসী লইয়া দলে দলে সাহা গৃহিণীরা নদীতে জল আনিতে যাইতেছে। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৩১)

ছ. রাঙা টুকটুকে আলতা মাখান পা দু'টি। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৮৩)

জ. আজাহের সেই গোট-ছড়া মেয়ের কোমর হইতে খুলিতে যাইয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। পীর সাহেবের নিকট হইতে ছেলের ভাল-ভালাইর জন্য আজাহের তাহার হাতে একটি রূপার তাবিজ কিনিয়া দিয়াছিল। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ৮৪)

ঝ. কে বাঁশঝাড়ের আগায় উঠিয়া তাহার নাকের নথ গড়িবার জন্য বাঁশের কচি পাতা পাড়িয়া দিবে। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৩৭)

ঞ. বড়ু উঠিয়া কান্দিয়া বলিল, "ও মিঞা ভাই। আমার নাকের ফুল আরায়া ফেলাইছি।" গ্রাম্য সুনারুর নিকট হইতে তাহার মা রূপার একটি নাক-ফুল তাহার জন্য গড়াইয়া দিয়াছিল। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৪৯)

ট. বছিরের হাতে একখানা লাল গামছা দিয়া রহিমদ্দী বলে, "তোমার দাদী এই গামছাখানা বুনাইছে। বলে, নাতীরে দেহি না কত বচ্ছর। তারে গামছাখানা দিয়া আইস গিয়া। (জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮. পৃ. ১৫০)

রহিমদ্দীর পরিবেশিত 'ওতলা সুন্দরীর লোকগীতি'-তে উল্লেখিত হয়েছে বাঙালি সমাজে প্রচলিত নারীর সাজসজ্জা ও পরিচ্ছদের বিভিন্ন অনুষঙ্গ[১০]—

প্রথমে পরিল শাড়ী নামে গঙ্গাজল,
হাতের উপর থইলে শাড়ী করে টলমল। ...
তারপরে পড়িল শাড়ী তার নাম হীত,
হাজারও দুঃখিতে পরলে তারও আইএ গীত।
(জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৫৮)

এ শাড়ীও রাজকন্যার পছন্দ হইল না। সহচরীরা গুয়াফুল-শাড়ী আনিল, আসমান-তারা শাড়ী আনিল, তারপর রাশমণ্ডল, কেলিকদম্ব, জলেভাসা, মনখুশী দিলখুশী, কলমীলতা, গোলাপফুল, কোন শাড়ীই রাজকন্যার পছন্দ হয় না। তখন সব সখীতে যুক্তি করিয়া রাজকন্যাকে একখানা শাড়ী পরাইল।

তারপরে পরাইল শাড়ী তার নাম হিয়া,
সেই শাড়ী পিন্দিয়া হইছিল চল্লিশ কন্যার বিয়া।
(জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৫৯)

সওদাগরপুত্রের সঙ্গে বিয়েতে ওতলা সুন্দরীর সাজসজ্জার বিবরণ—

আনিল বেশরের ঝাপি খুলিল ঢাকনি,
ডান হস্তে তুলিয়া লইল আবের কাঙ্কনখানি।
চিরলে চিরিয়া কেশবাসে বানল খোঁপা,

খোঁপার উপর তুইল্যা দিল গন্ধরাজ চাঁপা।
সাজিয়া পরিয়া এই দিন কন্যা হৈল ক্ষীণ,
কোমরে পরিল কন্যা সুবর্ণের জিন।
তার দিল তরু দিল কোমরে পাশুলী,
গলায় তুলিয়া দিল সুবর্ণের হাসলী।
(জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৬০)

৮. লোকপ্রযুক্তি

গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত কিছু লোকপ্রযুক্তির উল্লেখ এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বিভিন্ন কাজে গ্রামবাসী ঐতিহ্যবাহী এ ধরনের প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটায়। '২১' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, পাঠশালায় শিক্ষাগ্রহণের জন্য বছির ও নেহাজদ্দীন শিক্ষকের পরামর্শে রান্নার হাঁড়ির তলদেশে লেপ্টে থাকা কালির সঙ্গে লাউপাতা ঘষে লেখার উপযোগী কালি তৈরি করে। কালি দোয়াতে ভরে এর মুখে দড়ি বেঁধে তারা পাঠশালায় হাজির হয়। কলম হিসেবে খাগড়া-বন থেকে লাল রঙের খাগড়া বেছে সেটি দিয়ে তারা লেখার কাজ চালায়। লেখার আধার হিসেবে কলাপাতা কেটে নেয়া হয়। এর ওপর শিক্ষক বিভিন্ন বর্ণ লোহার শলাকা দিয়ে লিখে দিলে তারা এর ওপর হাত ঘুরিয়ে বর্ণমালা শেখায় অভ্যস্ত হয়। অন্যদিকে, গ্রামের গৃহিণীরা নিত্যদিনের রান্নাবান্নার কাজেও যে লোকপ্রযুক্তির শরণাপন্ন হয়, এর দৃষ্টান্ত রয়েছে এ উপন্যাসের '২৫' পরিচ্ছেদে। রহিমদ্দী কারিগর আজাহেরের বাড়িতে বেড়াতে এলে তার স্ত্রী চালের গুড়া দিয়ে পিঠা বানায়। পিঠা বাঙালি লোকসংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্যবাহী খাবার। লেখক অনুপুঙ্খ বর্ণনার মাধ্যমে পিঠা বানানোর প্রক্রিয়ায় সন্নিহিত লোকপ্রযুক্তিকে উপস্থাপন করেছেন। আজাহেরের স্ত্রী ঢেঁকিতে ধান ভেনে চাল কুটে নেয়। এরপর সেগুলো কুলায় বিছিয়ে ধীরে ধীরে হাত দিয়ে দোল দিলে ভাঙা চালের গুড়া কুলার একপাশে জড় হয়, অন্যদিকে পৃথক হয়ে যায় ভাঙা চালগুলো। আজাহেরের স্ত্রী সেগুলোকে আলাদা করে গুড়োগুলো সযত্নে ধামায় নামিয়ে রাখে। এরপর চুলার ওপর গরম পানি ফুটাতে দিয়ে ধামায় রাখা গুঁড়িগুলো থেকে অল্প পরিমাণে নিয়ে দুই হাতের মুঠোয় বড় বড় গোলা বানিয়ে ফুটন্ত পানির মধ্যে ফেলতে হয়। সেগুলো আঁচে কিছুটা সিদ্ধ হলে হাঁড়ির পানির কিছুটা নামিয়ে গামলায় ঢেলে রাখতে হয়। এ পানির সঙ্গে মিশ্রিত চালের ঢেলার সঙ্গে লবণ মিশিয়েও খাওয়া যায়। এরপর আজাহেরের স্ত্রী গুড়িঁর ঢেলাগুলো পানি থেকে নামিয়ে দুই হাতে আটা মাখতে থাকে। এরপর আটার দলাগুলো দুই হাতে চ্যাপ্টা করে ছোট রুটির মত আকারে বেলুনে বেলা হয়। ধীরে ধীরে দলাগুলো রুটিতে পরিণত হলে আজাহেরের স্ত্রী সেগুলো চুলার গনগনে আগুনে সেঁকে নেয়। এভাবেই সম্পূর্ণ লোকজ প্রযুক্তিকে ভিত্তি করে হাতে তৈরি হয় মজাদার মুখরোচক রুটি, যা মুরগির ঝোল মাংস দিয়ে রহিমদ্দী ও পরিবারের সদস্যদের খেতে দেয় আজাহেরের স্ত্রী।

৯. লোকক্রীড়া

এ উপন্যাসে গ্রাম্য বালক-বালিকাদের লোকক্রীড়া হিসেবে বর-কনের বিয়ে করে সংসার পাতানো খেলার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। উপন্যাসের '২৪' পরিচ্ছেদে লক্ষণীয়, মাতবর গরীবুল্লার ছেলে নেহাজউদ্দীন ও মেয়ে ফুলীর সঙ্গে আজাহেরের ছেলে বছির ও মেয়ে বড়ু রবিবার পাঠশালা বন্ধ থাকায় বিয়ে ও সংসার পাতানো বিষয়ক খেলা খেলে। বলাবাহুল্য, গ্রামীণ লোকসমাজে বর-কনের বিয়ের রীতি-নীতি, দাম্পত্য সম্পর্ককে বিভিন্ন সংলাপ ও ছড়ায় যেভাবে উপজীব্য করা হয়েছে,

তাতে স্পষ্ট যে, খেলার ছলে বালক-বালিকারাও এতদ্বিষয়ক শিক্ষা পেয়ে থাকে। অবশেষে বছিরের সঙ্গে ফুলীর ও নেহাজউদ্দীনের সঙ্গে বড়ুর বিয়ে হয়। বিয়ের পর ফুলী বরের বাড়ি যায় ডোলায় চেপে। নববধূ ফুলীর ক্রন্দনের কারণ বর নেহাজদ্দী জানতে চাইলে ফুলী ছড়া কেটে জবাব দেয়—

মিঞা ভাইর বাঙেলায় খেলছি হারে খেলা সোনার গোলা লয়া নারে।
আমার যে পরাণ কান্দে সেই না গোলার লাইগারে।
(জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮. পৃ. ১৪৬)

নেহাজদ্দী জানায়, তার সাত ভাইয়ের সাত ভাবী ফুলীকে হিরার গোলা বানিয়ে দেবে খেলার জন্য। তবু ফুলী কাঁদতে থাকে নতুন বায়না জানিয়ে—

আম গাছের বাকলরে সাধুর কুমার! চন্দন গাছে ওকি লাগেরে।
তোমার মায়ের মিঠা কথারে সাধুর কুমার, নিম্বু যেমুন তিতা নারে!
আমার মায়ের মুখের কথারে সাধুর কুমার! মধু যেমন মিষ্ট নারে!
(জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৪৬)

এরপর নববধূ বড়ুর ঘোমটা খসিয়ে ননদ ফুলী তাকে বেগুন কুটে দিতে বলে রান্নার জন্য। বড়ু জানায়, বেগুনে পোকা রয়েছে। ফুলী ভাইয়ের নিকট নালিশ জানায়, ভাবী বেগুন কুটতে শেখেনি। স্ত্রীর ওপর রেগে নেহাজদ্দী তাকে লঠিপেটা করতে যায়। এরপর ফুলী ভাবী বড়ুকে বলে ঘর গুছিয়ে বিছানা সাজাতে। বড়ু জানায়, ঘরের ভেতর মশা, ভনভন করে। তাই সে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায় নদীর ঘাটে গোসলের দোহাই দিয়ে। সেখানে তার সাত ভাই নৌকা বেয়ে যাওয়ার কালে সে তাদের নিকট ছড়া কেটে অভিযোগ জানায়–

ও পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক টুক করে,
গুণবতী ভাই। আমার মন কেমন করে।
হাড় হল ভাজা ভাজা মাংস হৈল দড়ি,
আয়রে কারিন্দার পানি ডুব দিয়া মরি।
(জসীমউদ্‌দীন, ১৯৬৮, পৃ. ১৪৭)

এরপর ফুলী এ খেলা শেষ করতে চাইলে বড়ু তা উপেক্ষা করে তাকে পরামর্শ দেয় স্বামীর কাছে বিভিন্ন জিনিস উপহার চাইতে। তখন নেহাজদ্দী স্ত্রীর আবদার রক্ষার্থে ঢাকাই সিঁদুর, ঢাকাই শাড়ি, শ্যামলা গামছা প্রভৃতি এনে দেয়। এভাবেই বালক-বালিকাদের এ লোকক্রীড়ার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পরিবারব্যবস্থায় প্রচলিত আচার-রীতিনীতি ও অনুশাসন, সংসারে নারী-পুরুষের পৃথক ভূমিকা সম্পর্কে তারা ধারণা পায়, তেমনিভাবে বাল্যজীবনের এ শিক্ষা তাদের মনোলোকেও প্রভাব ফেলে।

১০. লোকভাষা

এ উপন্যাসে লোকভাষার প্রয়োগে লেখকের সহজাত দক্ষতা ও ভাষিক সচেতনতার পরিচয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কুশীলবদের উচ্চারিত সংলাপ বিনিময়ে তিনি ফরিদপুরের উপভাষার সঙ্গে সাধু গদ্যরীতির দ্বারস্থ হলেও এতে সংযুক্ত হয়েছে গ্রামীণ সমাজে, বিশেষত ফরিদপুর অঞ্চলের প্রচলিত শব্দরাশি, বাগধারা, প্রবাদ, অলংকার প্রভৃতি। কুশীলবদের সংলাপ প্রক্ষেপণে তিনি

সংযুক্ত করেছেন তাদের দেহভঙ্গি এবং বিশেষ ঢঙে সংলাপ উচ্চারণের প্রবণতা। ফলে সেই চরিত্রের আবেগ সংলাপের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়, ফুটিয়ে তোলে পরিস্থিতির সাপেক্ষে তার মনোভঙ্গিকে। পাশাপাশি কোনো বিশেষ দৃশ্য বা চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতাকে পাঠকের নিকট উপস্থাপনে লেখকের বয়ানের ভাষা সাধু গদ্যের অনুসারী হলেও তা আড়ষ্ট এবং গুরুগম্ভীর নয়। কেননা, সংক্ষিপ্ত বাক্যে সহজ শব্দের সমাহারে ভাষার প্রবহমানতার গুণে বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলার সামর্থ্য জসীম উদ্‌দীনের এ লেখনীর প্রাণশক্তি। এক্ষেত্রে লোকজ শব্দভাণ্ডার ও বাগধারা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১০.১ *শব্দভাণ্ডার*

দেশজ শব্দ– আক্কা, বেড়া, তেনা, মাজন, গুল, মাড়, ডাল, ডোবা, গোয়াল, পাটি, কালা, ধলা, পুটুলি, খোসা, আঁটি, ঝাঁট, চুলা, বাছুর, বুলি প্রভৃতি।

ক্রিয়া– জোগাইতে, ভাসিয়া, ঠকাইয়াছে, ঢুকাইয়া, ফুটিয়া, পাকায়, মেলিয়া, লটকান, উড়াইয়া, ঢালিয়া, বাঁকাইয়া, বাজাইয়া, বুনাইছাও, কুলাইয়া, পাঠাইয়া, বেচিয়া, ছাড়াইয়া, পারাইয়া, চড়িয়া, মেলিলে, দুলিতে, ভরাইয়া, ছুলিয়া, ছড়াইয়া, শুখাইয়া, কোচকাইয়া, লটকানো, পুরিয়া, খাটিয়া, বিছাইয়া, দমিল, বাইন্ধা, লুটাইয়া, গড়াইয়া, উথলিয়া, ফাড়িয়া, বেচিয়া, কুলাইয়া, দুলিয়া, ভাসিয়া, মুছিয়া, লেপিয়া প্রভৃতি।

আঞ্চলিকভাবে পরিবর্তিত শব্দরাশি– শ্যাওলা > শেহলা, ভরে > ভইরা, বুনেছ > বুনাইছাও, ছেলে > ছাওয়াল, কলকে > কোলকে, ভাদ্র > ভাদ প্রভৃতি।

১০.২ *বাগধারা*

সবাই যদি আসিত, আজ দেখিয়া যাইত, আজাহের একেবারে কেউকেটা নয়। তাকেও লোকে খাতির করে। (পৃ. ১১)

মার কাছে মাসী-বাড়ির গল্প কইতি আইছাও? (পৃ. ২৮)

মেয়েকে আনার নাম করলে ত চোখ চড়ক গাছ। (পৃ. ৩৫)

আমার হুকুমে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। (পৃ. ৩৬)

শরৎ সাহা যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেল। (পৃ. ৪৮)

কলিকাল হ'লেও ধরাটাকে সরা জ্ঞান করা যায় না। (পৃ. ৪৯)

তোমরা কি চোখের মাথা খেয়েছ, দেখছ না ঘরের চালে ক'খানি টিন রয়েছে (পৃ. ৭৫)

আজই ইহার একটা হেস্ত-নেস্ত হইয়া যাওয়া ভাল। (পৃ. ৯৮)

শুধু মুহির কতায় কি চিড়্যা ভেজে মিঞারা? (পৃ. ১০০)

কমিরদ্দির ভিটায় আইজ ঘু ঘু চরত্যাছে। (পৃ. ১০৩)

বাবারে মারে চীৎকার করিয়া গণ্শা আকাশ-পাতাল ফাটাইতেছিল। (পৃ. ১৩৩)

গণ্শাও চৌদ্দপোয়া অবস্থা হইতে রেহাই পাইল। (পৃ. ১৩৪)

পাঠশালার মাষ্টার মহাশয়ের সেই মান্ধাতার আমলের শিক্ষা-প্রণালীর যাঁতা-কলে পড়িয়া চার-পাঁচ বৎসরেও ছেলে লেখাপড়ায় এতটুকুও অগ্রসর হইতে পারে নাই। (পৃ. ১৩৮-১৩৯)

মেনাজদ্দী মাতবর ভেদবমি হইয়া মারা গিয়াছে। মৃত্যুর পর তার যা কিছু জমি-জমা সাত ভূতে দখল করিয়া লইয়াছে। (পৃ. ২৫৩)

পূর্ববাংলার গ্রামীণ লোকসমাজের প্রতি লেখকের প্রগাঢ় মমত্ববোধ ও নাড়ির টান উপন্যাসটিতে ফুটে উঠেছে। বাংলার লোকসংস্কৃতির আবহমানকালের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে গ্রামীণ বাসিন্দারা কীভাবে অনুসরণ করে এবং এর মধ্য দিয়ে নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে ধারণ করে, তা প্রকাশিত হয় তাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ক্রিয়াকর্মে, পারস্পরিক সম্পর্কের গড়নে, ওঠাবসা ও আদান প্রদানে, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসার উদার মানসিকতায়। পূর্ববাংলার লোকজ সংস্কৃতির বৈচিত্র্যময় সম্ভার উপন্যাসটির কুশীলবদের জীবনবাস্তবতা ও চেতনালোকে তাৎপর্যবাহী আবেদন রেখেছে। কেননা, এসবের সঙ্গে মিশে আছে তাদের বংশপরম্পরাগত ঐতিহ্য, অতীতের প্রতি বিমুগ্ধতা ও বাল্যের স্মৃতিকাতরতা, স্বীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মবোধ। তবে, গ্রামীণ লোকজীবন রূপায়ণে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসবশত বাস্তববিচ্যুত হয়নি। কেননা, গ্রামীণ আবহে প্রতিপালিত লোকমানুষের সাংস্কৃতিক পরিসরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাদের অস্তিত্বসংগ্রামের প্রসঙ্গ, যেখানে বিশেষ ভূমিকা রাখে ক্ষমতাধর মাতবর, সুদখোর মহাজন, স্বার্থসর্বস্ব মৌলবি ও তার অনুসারীরা। এদের দাপটে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের অসাম্প্রদায়িক চেতনা, যা বাঙালি লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, নানাভাবে বিঘ্নিত হয়। গ্রামকেন্দ্রিক যূথবদ্ধতা ও সমষ্টিমানুষের সংহতি, একের প্রতি অন্যের সহানুভূতি ও ঔদার্য তাদেরকে যে আন্তরিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করে, এর মানবিক আবেদনের ভাষ্যদানে লেখকের অনায়াস দক্ষতা পাঠকের নিকট অকপটে বিধৃত হয়। পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবনের অনুপুঙ্খ চালচিত্র বয়ানে জসীম উদ্‌দীনের আন্তরিক প্রচেষ্টার অনন্য শিল্পরূপ *বোবা কাহিনী*।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. জসীমউদ্‌দীন জানিয়েছেন—

বাঙলার নভেল উপন্যাসগুলি শুধু কলিকাতাবাসী কয়েকজন মধ্যবিত্ত লোকের কথায় ভরা। দেশের জনসাধারণ তার ভেতরে নিজেদের খুঁজে পায় না। ... আজ শহরের সাহিত্যিকেরা তাঁদের মধ্যবিত্ত- সমাজ নিয়ে যে সাহিত্য রচনা করছেন, তা শহরের মধ্যবিত্তদের যেমন ভালো লাগে, গ্রামের মানুষের কাছে তেমন ভালো লাগছে না। গ্রামের মানুষ যখন শহরের মানুষের সমান শিক্ষিত হবে, তখনও ভালো লাগবে না। সাহিত্য যেমন বিশ্বের, তেমনি তা ঘরেরও। বিশ্বসাহিত্যই বল, আর সাম্প্রদায়িক সাহিত্যই বল, সব সাহিত্যই তৈরি হয় ঘরের প্রদীপ জ্বালানোর জন্য। যে-সাহিত্য ঘরে প্রদীপ জ্বালালো না, সে-সাহিত্য বিশ্বে আলোকপাত করতে পারে না। দেশের জনসাধারণের জন্যই ত সাহিত্য তৈরি হয়। [*জসীমউদ্‌দীনের প্রবন্ধ সমূহ* (দ্বিতীয় খণ্ড), খুরশীদ আনোয়ার জসীম উদদীন [সম্পা'], পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৩৪-৩৫]

২. এ উপন্যাস সম্পর্কে দুজন সমালোচকের প্রাসঙ্গিক অভিমত—

ক. জসীমউদ্‌দীন আপন কবি-স্বভাবের তাগিদেই 'আজাহেরের কাহিনী' শোনাতে গিয়ে যেভাবে ভাবাবেগের বশীভূত হয়েছেন তাতে ঔপন্যাসিকের বাস্ড়ব দৃষ্টি ও বিশে-ষণী মন অনেকটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ... 'বোবা কাহিনী' তে উপন্যাস সৃষ্টির পোষকতা করে এমন উপাদানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও তা উপযুক্ত শিল্পসুষমা লাভ করতে পারে নি। গদ্যে উপন্যাস লিখতে গিয়েও জসীমউদ্‌দীন গীতি-গাথার ভাবলোকেই যেন বারবার ফিরে গিয়েছেন। ... 'বোবা কাহিনী' পল্লীর জীবনবাস্তবের সাথে আমাদের পরিচয়কে নিবিড়তর করে তুলেছে এবং আমাদের উপন্যাসে নতুন দিগন্ত সৃষ্টির সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। ... (এর) ভাষা সরল ও আবেগময়। উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের মুখে আঞ্চলিক ভাষার সংলাপ জুড়ে দিয়ে, এদের জসীমউদ্‌দীন একটা স্থানিকতা (local colour) দিতে পেরেছেন। তা ছাড়া উপন্যাসে মাঝে মাঝে পল্লীগীতি-গাথার ব্যাপক উদ্ধৃতি ও প্রয়োগ এতে পল্লীর যথার্থ আবহ সৃষ্টিতেও সাহায্য করেছে। (সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, *জসীমউদ্‌দীন : কবিমানস ও কাব্যসাধনা*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩২১-৩২২)

খ. একচল্লিশটি পরিচ্ছেদে নির্মিত জসীমউদ্‌দীনের 'বোবা কাহিনী'তে আধুনিক উপন্যাসের গঠন-কৌশলের ঘাটতি ও শিল্পদৃষ্টির অভাববোধ হলেও চরিত্র, পারিপার্শ্বিকতা, পরিবেশ, জীবন যন্ত্রণা, জীবনানুভূতির তেমন কোনো ঘাটতি নেই। ভাষা ও সংলাপ উপন্যাসোপযোগী। এ-সত্ত্বেও এর বাঁধন মজবুত নয়। ... 'বোবা কাহিনী'র পটভূমির বিস্তৃত ক্যানভাস–পল্লী। জসীমউদদীন পল্লী থেকে জীবনচিত্র নেবেন, এটাই স্বাভাবিক। (তিতাশ চৌধুরী, *জসীমউদদীন : কবিতা, গদ্য ও স্মৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১১৯)

৩. সমালোচকের অভিমত—

বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দনটি ধরতে পেরেছিলেন জসীমউদ্‌দীন ... তিনি এঁকে গেছেন লোকজীবনের শাশ্বত স্মারকচিহ্ন, তাই তাতে ধ্বনিত হয়েছে সাধারণ মানুষের প্রাণের স্পন্দন। ... জসীমউদ্‌দীন হাজার বছরের গ্রামবাংলা ঐতিহ্য, লোকাচার, লোকমানসকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন — তা শুধু ছবির সঙ্গে তুলনা করা চলে। ... লোকজীবনের চলিষ্ণুতার সাথে হৃদয়ের আর্তি আর ভালোবাসা মিলিয়ে ... তিনি ঐতিহ্যের গুরুত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ... সুজলা সুফলা বাংলার রূপ বাঙালির আজন্ম আকর্ষণ। ... বাংলার লোকশিল্প ও সাহিত্যে প্রাচীন ঐতিহ্য এখনো প্রভাব বিস্তার করে আছে। ... জসীমউদ্‌দীন সফল হয়েছেন–বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর গ্রামকেন্দ্রিক নদীমাতৃক বাংলার সজীব প্রকৃতিকে একান্ত আপন করে ধরে রাখতে পেরেছেন বলেই। (বিমল গুহ, *আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকজ উপাদান : জসীমউদ্‌দীন-জীবনানন্দ দাশ-বিষ্ণু দে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৩-১৪)

৪. সমালোচক জানিয়েছেন—

জসীমউদ্‌দীন ১৯৩১ সালে শান্তিনিকেতনে বীরভূমের জেলা প্রশাসক, ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক লোকসংস্কৃতি-প্রেমিক গুরু সদয় দত্তের (১৮৮২-১৯৪১) সাথে পরিচিত হন। তাঁরা ... একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। জসীমউদ্‌দীন এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোগে পল্লীশিল্পের বেশ কিছু মূল্যবান নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছিল। ... তিনি ১৯৩৩ সালে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট' পদে যোগদান করেন। এই পদে তিনি ১৯৩৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। দায়িত্ব ছিল পল্লী গীতি গাথা সংগ্রহ করা। (সাজজাদ আরেফিন, 'জসীমউদ্‌দীনের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি', জসীমউদ্‌*দীন : ঐতিহ্যের অহংকার*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫০)

৫. জসীমউদ্‌দীন এ উপন্যাসে গ্রামবাংলার নারীদের শাড়ি সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা তিনি গ্রহণ করেছেন ময়মনসিংহে লোকগাথা সংগ্রহকালে। 'ওতলা সুন্দরীর পালা'-তে উল্লেখিত বিভিন্ন শাড়ির যে বর্ণনা রয়েছে, তা এ উপন্যাসে অপরিবর্তিতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—

> প্রায় ২৫ বৎসর আগে আমি ময়মনসিংহের গ্রামগুলি হতে কতকগুলি শাড়ির নাম টুকে এনেছিলাম। আজকাল সুতোর অভাবে এই শাড়িগুলি ওদেশের তাঁতিরা এখনও তৈরি করে কি না, জানিনে। ... আমার সংগৃহীত ওতলা সুন্দরীর পালাগান হতে এবার কতকগুলি শাড়ির বর্ণনা উদ্ধৃত করব।

রাজকন্যাকে বিয়ের সময় তাঁর সখিরা পরাচ্ছেন:

> প্রথমে পরিল শাড়ি পিনল বড় ঠাটে
> নীমা নামের কালে যেমন সূর্য বইল পাটে।
> এই শাড়ি পরিয়া কন্যা শাড়ির পানে চায়,
> মনমতো না হইলে দাসীকে পিন্দায়।
> তারপরে পরিল শাড়ি নামে গঙ্গাজল
> হাতের উপর থইলে শাড়ি করে টলমল। ...

কিন্তু সে-শাড়িও রাজকন্যার পছন্দ হল না। তখন সব সখীতে যুক্তি করে একখানা পুরাতন শাড়ি রাজকন্যাকে পরাল ... এই শাড়ি পরে রাজকন্যার কিরূপ শোভা হল, পল্লীকবি তারও বর্ণনা করেছেন—

> খিল খাড়ুয়া বাক মুড়া পায়েতে পাশুলি
> বনমালা চন্দ্রহার গলেতে হাশলি।
> কাজলে মাজিয়া আঁখি অরুণ দুটি কূল,
> আলোকের চিত্র যেন হাতে দশাঙ্গুল।
> অতিশায় বাজাখানি শিকারী বাসিনী,
> হাটল কুঞ্চন রূপ দেখতে ভোলে মুনি।

সাজিয়া পরিয়া এইদিন কন্যা হৈল ক্ষীণ,
কোমরে তুলিয়া দিল সোনার একখান জিন।
জিনখান পরিয়া কন্যা করে তানা নানা,
গলেতে তুলিয়া দিল সুবর্ণের দানা।
দানার মধ্যে গাঁথা আছে সুবর্ণের হাসি
এই দানা পিন্দিয়া কন্যা বাজায় মোহন বাঁশি।
নিত্যই নিত্যই ওঠে চন্দ্র আকাশের গায়,
আজকের চন্দ্র দেখি রাজার কোঠায়।

কবিকঙ্কণের রচিত চণ্ডিমঙ্গল কাব্যে দুর্গার কাচুলির যে বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে উপরের শাড়িখানার অনেকখানি মিল আছে। [*জসীমউদদীনের প্রবন্ধসমূহ (২য় খণ্ড*, খুরশীদ আনোয়ার জসীমউদ্‌দীন [সম্পা.], পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৬-২৮]

গ্রন্থপঞ্জি

খুরশীদ আনোয়ার জসীমউদ্‌দীন [সম্পা.] (২০১৪)। *কবি জসীম উদ্‌দীনের প্রবন্ধসমূহ [দ্বিতীয় খণ্ড]* (২০১৪)। পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা।

জসীমউদ্‌দীন (১৯৬৮)। *বোবা কাহিনী*। পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা।

তিতাশ চৌধুরী (১৯৯৩)। *জসীমউদদীন : কবিতা, গদ্য ও স্মৃতি*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বিমল গুহ (২০০১)। *আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকজ উপাদান: জসীমউদ্‌দীন-জীবনানন্দ দাশ-বিষ্ণু দে*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মিঞা লুৎফার রহমান ও ফজলুল হক সৈকত [সম্পা'] (২০০৩)। *জসীমউদ্‌দীন : ঐতিহ্যের অহংকার*। শোভাপ্রকাশ, ঢাকা।

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১২)। *জসীমউদ্‌দীন : কবিমানস ও কাব্যসাধনা*। নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা।

শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত অবাচনিক ভাষিক উপাদান বিশ্লেষণ

নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম*

সারসংক্ষেপ: মনের ভাব প্রকাশে অর্থপূর্ণ ভাষিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবাচনিক ভাষিক উপাদানের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাত্যহিক জীবনে অনেক সময় অবচেতন মনেও মানুষ অবাচনিক ভাষিক উপাদানের ব্যবহার করে থাকেন। একজন মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপনে অবাচনিক উপাদানের ব্যবহার সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ব্যক্তিগত জীবন, শিক্ষালয়, কর্মক্ষেত্র, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক প্রতিটি ক্ষেত্রে সংজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অবাচনিক ভাষিক উপাদানের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশে শিক্ষার্থীগণ অবাচনিক ভাষিক যোগাযোগগত উপাদানের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার করে থাকেন। আলোচ্য গবেষণা পত্রে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীগণের ব্যবহৃত অবাচনিক ভাষিক উপাদান ব্যবহারের নমুনা সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: অবাচনিক ভাষিক যোগাযোগ, অভাষিক উপাদান, শ্রেণিকক্ষ, অঙ্গভঙ্গি, প্রতিবেশ।

ভূমিকা

ভাষার মূল কাজ হচ্ছে যোগাযোগ স্থাপন। একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে ভাষিক উপাদানের পাশাপাশি আমরা অভাষিক উপাদানের ব্যবহার করে থাকি। ভাষা ব্যবহারে বা প্রয়োগে শব্দোচ্চারণ না করেও শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ সংজ্ঞাপন স্থাপন করা সম্ভব। সংজ্ঞাপনকে আরও বেশি কার্যকর করতে অবাচনিক ভাষিক উপাদানের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সচেতন এবং অবচেতন মনে সংজ্ঞাপনের সময় বাচনিক ভাষিক উপাদানের পাশাপাশি আমরা অবাচনিক ভাষিক উপাদানের ব্যবহার করে থাকি যার ফলে একে অপরের সাথে ভাষিক যোগাযোগ আরও সহজ এবং বোধগম্য হয়ে ওঠে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও গ্রহণের সময় পাঠদানকারী শিক্ষক এবং পাঠগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর মধ্যেও এ অবাচনিক ভাষিক যোগাযোগগত উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যা শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের পরিবেশকে প্রভাবিত করে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, প্রাকৃতিক প্রভৃতি উপাদান দ্বারা শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশে অন্তর্গত প্রতিটি সংজ্ঞাপনকারী প্রভাবিত হন। আলোচ্য গবেষণাপত্রে শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশে ব্যবহৃত অবাচনিক ভাষিক আচরণগত উপাদানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অবাচনিক উপাদানের ব্যবহার অতন্ত্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ভাষিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও পাঠগ্রহণে আবাচনিক ভাষিক আচরণ মূলপাঠ অনুধাবনে এবং ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যকার সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পূর্বে বাংলাদেশের প্রতিবেশে শ্রেণিকক্ষকেন্দ্রিক অবাচনিক ভাষিক আচরণগত উপাদান সংক্রান্ত কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপটে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত অবাচনিক ভাষিক উপাদানের ব্যবহার বিশ্লেষণ করা।

---

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২.২ গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণায়, গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে গুণগত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শ্রেণিতে অধ্যায়নরত ৩০ জন শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশে ব্যবহৃত অবাচনিক ভাষিক যোগাযোগগত উপাদান ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে অবাচনিক ভাষিক উপাদান বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং গবেষণা পত্রের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

৩.১ অবাচনিক ভাষিক উপাদান

একে অপরের সাথে অর্থগত ভাষিক উপস্থাপনা সংজ্ঞাপনের সৃষ্টি করে। বাগযন্ত্রগত উপস্থাপনায় সৃষ্টি হয় বাচনিক ভাষিক উপাদান এবং শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে সৃষ্টি হয় অবাচনিক ভাষিক ধারণা। ভাষিক বা অভাষিক ধারণা অর্থপূর্ণ এবং বোধগম্য হবার পেছনেই সংজ্ঞাপন কার্যকর হওয়ার সাফল্য নির্ভর করে। অনেক সময় বাচনিক ভাষায় উপস্থাপিত ধারণাকে অবাচনিক উপাদান আরও বেশি অর্থপূর্ণ করে প্রকাশ করে (আরিফ, ২০১৫)। কিছু বিষয় শব্দ উচ্চারণ না করেও কেবল অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেই অর্থপূর্ণভাবে উপস্থাপন করা যায়। অবাচনিক আচরণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে অবাচনিক ভাষিক উপাদান (Frank, 2013)। অনেক সময় ব্যক্তি তাঁর মনের ভাব প্রকাশে ভাষার বাচনিক প্রয়োগের সময় অসচেতন ভাবে অবাচনিক ভাষিক উপাদানের ব্যবহার করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিছিলে স্লোগানের ভাষা ব্যবহারের সময় জনতার মুষ্টিবদ্ধ হাত প্রতিবাদকে আরও বেশি অর্থপূর্ণ ও শক্তিশালী করে তোলে। সাধারণত অবাচনিক ভাষিক প্রয়োগগত ব্যবহার উপাদান হিসেবে সংজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে শারীরিক অঙ্গভঙ্গির জন্যে বেশির ভাগ সময় আঙুল ও হাতের ভঙ্গি, মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি ও ভঙ্গি, মাথা নাড়ানো, শারীরিক (কোমড়, গলা) বিভিন্ন ভঙ্গি এবং পায়ের ব্যবহার দেখা যায়। অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গির পরিধির ব্যপ্তি মানব প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অংশের সঞ্চালনের মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে (David, 1992)। অবাচনিক ভাষিক প্রয়োগগত উপাদান মাধ্যম হিসেবে অর্থপূর্ণ সংজ্ঞাপন শরীরের অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করা ছাড়াও সমাজ সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক অবস্থানের প্রভাবের উপর ভিত্তি করেও ঘটে থাকে (Edward, 1959)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ধর্মীয়রীতি প্রভাবিত সম্ভাষণে ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সালামের ভঙ্গি এবং সনাতন ধর্ম অনুযায়ী প্রণামের হস্তভঙ্গি। আবার আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিনির্ভর চৈত্র সংক্রান্তি, মঙ্গল শোভাযাত্রা, নববর্ষ প্রভৃতি উৎসবের সময় বাঙালিদের পোশাক এবং অনুষ্ঠান পালনের আচার এবং অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি।

৩.২ শ্রেণিকক্ষে অবাচনিক ভাষার ব্যবহার

বেশ কয়েক বছর ধরেই গবেষকগণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকারী ও পাঠ গ্রহণকারীর মধ্যে কার্যকর সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ভাষিক উপাদানের পাশাপাশি অভাষিক উপাদানের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে অবাচনিক ভাষিক উপাদান প্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্র যথা- মুখভঙ্গি, ইশারা/ইঙ্গিত, অঙ্গভঙ্গি, ইঙ্গিত, পোশাক/পরিচ্ছেদ (facial expression, posture, body language, gesture, dress/attire) প্রভৃতি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়ক উদ্দিপক হিসেবে কাজ করে। পাঠদানকারী বা শিক্ষকের আচরণের সাথে তাঁর ব্যবহৃত অবাচনিক অর্থপূর্ণ প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণ সহজ হয়। পাঠদান ও গ্রহণে অবাচনিক ভাষিক

প্রয়োগ শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখে (Miles & Huberman, 1994)। বিশ শতকে শ্রেণিকক্ষ কেবল পাঠদান ও গ্রহণের ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই বরং একে একটি ছোট গোষ্ঠী (community) হিসেবে তুলনা করা যায় যেখানে একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের পাশাপাশি তাঁর চিন্তা, ধারণা ও আচরণকেও গুরুত্ব দেয়া হয়। শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্ক শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণ ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে তথ্য আদান-প্রদানে অবাচনিক ভাষিক উপাদানের উপস্থিতি শিক্ষা গ্রহণকে সহজ ও দ্রুততম সময়ে কার্যকর করে তোলে (Louis, 1989)। শ্রেণিকক্ষে বার্তা বাচনিক প্রয়োগের সাথে অবাচনিক ভাষিক উপাদানের প্রয়োগ শিক্ষার্থীর কাছে পাঠকে আরও সহজতর করে তোলার পাশাপাশি তাঁকে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে। জন অস্টিনের বিখ্যাত বাককৃতি তত্ত্ব (speech act) অনুযায়ী বক্তার বক্তব্য শ্রোতার কাছে একধরনের কাজ সংগঠন, যথা- অনুরোধ/আদেশ/নিষেধ প্রভৃতি নির্দেশকের অভিপ্রায় পূরণ। "যেখানে বক্তার না-বলা কথাও শ্রোতা বুঝে নেয় এবং সেই উপলব্ধি অনুযায়ী কী ধরনের প্রতিবায়নকৃত পরিবেশন করবে তার সিদ্ধান্ত নেয়" (রহমান, ২০১৩, পৃ. ৬৭)। শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশে শিক্ষকের পাঠদানের সময়ে অবাচনিক ভাষিক উপাদান শিক্ষার্থীর অবচেতন মনকে পাঠগ্রহণের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। পাঠগ্রহণের সময় অভাষিক উপাদানের প্রয়োগ ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ককে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে তোলে, যা শিক্ষাগ্রহণের পরিবেশে অধিক মাত্রায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে (Canan, 2008)।

৩.৩ গবেষণায় উপাত্ত উপস্থাপন

অবাচনিক ভাষিক উপাদান সম্পর্কে প্রথমে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশে তাঁদের ব্যবহৃত অবাচনিক ভাষিক উপাদনের নমুনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছিল:

ক। শ্রেণিকক্ষে আপনারা শিক্ষকের উপস্থিতিতে কী ধরনের অবাচনিক ভাষিক উপাদান ব্যবহার করেন?

খ। শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীর সাথে কী ধরনের অবাচনিক ভাষিক উপাদান ব্যবহার করেন?

গ। আপনার শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কী ধরনের অবাচনিক ভাষিক উপাদান ব্যবহার করেন?

ঘ। কোন কোন অবাচনিক ভাষিক উপাদান শুধু শ্রেণিকক্ষেই ব্যবহার করে থাকেন?

ঙ। বিশেষ কোনো পাঠদানের ক্ষেত্রে আপনাদের পোশাক পরিধান, অঙ্গসজ্জা বা আনুসাঙ্গিক বিষয় সংক্রান্ত কোনো ধরনের অবাচনিক ক্রিয়া কাজ করে?

চ। প্রতিবেশগত প্রভাবের কারণে কোনো অবাচনিক উপাদান শ্রেণিকক্ষে দেখতে পান?

ছ। আপনার শ্রেণিকক্ষের বিশেষ কোনো অবাচনিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে?

৩.৪ শ্রেণিকক্ষে অবাচনিক ভাষিক আচরণ হিসেবে প্রাপ্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশে তাঁদের ব্যবহৃত অবাচনিক ভাষিক আচরণ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্য ও এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো-

৩.৪.১ শ্রেণিকক্ষে আপনারা শিক্ষকের উপস্থিতিতে কী ধরনের অবাচনিক ভাষিক উপাদান ব্যবহার করেন?

১। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তাঁদের উপস্থিতি জানতে নাম ডাকলে শিক্ষার্থীগণ হাত তুলে জবাব দেয়।

২। শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ বা ক্লাশ নিয়ে বের হওয়ার সময় শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদান করে।

৩। পাঠদানের সময়ে শিক্ষকের প্রশ্নের জবাবে অনেক সময় মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বা না বাচক অর্থের প্রকাশ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষক পাঠদানকালে শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করেন, "পড়া বুঝতে পেরেছেন?", "আবার বলবো?"

৪। পাঠদানরত অবস্থায় শিক্ষককে শিক্ষার্থী কিছু জিজ্ঞেস বা শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ডান হাত তোলে।

৫। শিক্ষক পড়া ধরলে শ্রেণিকক্ষে পিনপতন নীরবতার আবহ তৈরি হয়। অনেক শিক্ষার্থী হাত তুলে থাকেন, যাতে বোঝা যায় যে এসব শিক্ষার্থী বাড়ি থেকে পড়া তৈরি করে এসেছেন। আবার যারা পড়া তৈরি করে আসে নাই তাঁরা শিক্ষকের চোখের দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু বা ঘাড় গুজে বসে থাকে।

৬। অনেক সময় শিক্ষক যখন বোর্ডে লিখেন পেছন থেকে দেখতে না পেলে সামনের সারির সহপাঠীকে হাতের ইশারায় সরে বসতে বা মাথা নিচু করতে বলে।

৩.৪.২ শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীর সাথে কী ধরনের অবাচনিক ভাষিক উপাদান ব্যবহার করেন?

১। শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীর সাথে হাত তুলে পাশ্চাত্য রীতিতে (hello) সম্ভাষণ জানানো।

২। অনেকদিন পর দেখা হলে সহপাঠীর সাথে করমর্দন (handshake) করে।

৩। ক্লাস চলাকালীন লিখবার জন্যে কলম না থাকলে সহপাঠীরকাছে লিখার ভঙ্গি করে কলম চেয়ে থাকে।

৪। দলগত শ্রেণি উপস্থাপনার (group presentation) সময় যাঁদের উপস্থাপনা ভালো হয়েছে তাঁরা একে অপরকে বুড়ো আঙুল তুলে ভালো হচ্ছে (well done) বোঝায়। আবার শিক্ষক যখন বলেন কোনো একটি দলের উপস্থাপনা ভালো হয়েছে তখন তাঁরা দুই আঙুল উঁচিয়ে অর্থাৎ ভি চিহ্ন দেখিয়ে তাঁদের আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। অনেক সময় সহপাঠীগণ একে অপরের পিঠ চাপড়ে দেন বা জরিয়ে ধরে। উলেখ্য যে এক্ষেত্রে পুরুষ শিক্ষার্থী কেবল পুরুষ শিক্ষার্থীর সাথে এবং নারী শিক্ষার্থী কেবল নারী শিক্ষার্থীর সাথে বেশির ভাগ সময় এ জাতীয় অঙ্গভঙ্গির সংজ্ঞাপনে অংশ নেয়।

৫। ক্লাস চলাকালীন শিক্ষক পড়া ধরলে কোনো সহপাঠী যদি অন্যমনস্ক থাকেন তবে পাশের শিক্ষার্থী তাঁকে গায়ে ছুঁয়ে, হাত দিয়ে স্পর্শ করে সতর্ক করেন।

৬। ক্লাশ চলাকালীন পানির পিপাসা পেলে যেই সহপাঠীর সামনে পানির বোতল আছে তাঁকে হাতে ইশারা বা চোখের দৃষ্টি দ্বারা তৃষ্ণার্ত বুঝিয়ে পানি পান করতে চায়।

৭। ক্লাসে কোনো শিক্ষার্থী তাঁর খাতার কাগজ ছিঁড়তে দেখলে বোঝা যায়, তিনি তাঁর পাশে বসা সহপাঠী যে খাতা আনে নাই, তাঁকে লিখবার জন্যে দিবে।

৮। অনেক সময় ক্লাস চলাকালীন দুই বন্ধু চিরকুট বিনিময় করেন। তাতে বোঝা যায় ক্লাসে শিক্ষক কথা বললে ক্রুদ্ধ হবেন এই ভয় তাঁদের ভেতর কাজ করছে।

৩.৪.৩ আপনার শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কী ধরনের অবাচনিক ভাষিক উপাদান ব্যবহার করেন?

১। ক্লাশে প্রবেশ করার সময় শিক্ষার্থীগণ দাঁড়িয়ে সম্মান জানালে হাত তুলে বসতে ইঙ্গিত করেন।

২। শিক্ষককে হাত তুলে সালাম দেয়ার ভঙ্গি করে সম্মান জানালে তিনিও হাত তুলে বা হাসির মাধ্যমে তাঁদের সম্ভাষণ করেন।

২। শিক্ষক মুখে আঙুল দিয়ে শ্রেণিকক্ষে কোলাহোলরত শিক্ষার্থীকে থামার নির্দেশ করেন।

৩। কোলাহোলরত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শিক্ষক ভ্রু কুচকে বিরক্তি প্রকাশ করেন।

৩। শিক্ষক অনেক সময় হাতের আঙুল তুলে ইসারা করে শিক্ষার্থীকে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে নির্দেশ করেন।

৪। শিক্ষার্থী প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলে বা ভুল করলে শিক্ষকের মুখের অভিব্যক্তিতে ইতিবাচক হলে হাসির রেখা এবং নেতিবাচক হলে চোখের চাহনিতে রাগ প্রকাশ পায়।

৫। শিক্ষার্থী দেরিতে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলে ঘড়ির দিকে নির্দেশ করেন, এতে বোঝা যায় যে শিক্ষার্থী দেরি করে শ্রেণিকক্ষে এসেছেন।

৬। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দিতে পারলে বা তাঁর শ্রেণি উপস্থাপনার (class presentation) পারদর্শিতা অনুধাবন করে, শিক্ষক হাততালি দিয়ে তাঁকে উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। অনেক সময় সে শ্রেণি উপস্থাপনায় আশানুরূপ ফল প্রকাশ করতে না পারলেও হাততালি দিয়ে তাঁকে পরবর্তীকালে ভালো ভাবে পড়বার জন্যে উৎসাহ দেয়া হয়।

৭। কোনো ছাত্রের বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে তিনি দরজার দিকে হাত ইশারা করলে শিক্ষক পাঠদানরত অবস্থায় থাকলে মাথা ঝাকিয়ে ইতিবাচক অনুমতি দিয়ে থাকেন।

৮। শ্রেণি-উপস্থাপনার সময় কোনো শিক্ষার্থী থেমে গেলে তাঁকে হেসে উৎসাহ দেন, বা তাঁর নির্ধারিত সময়ের থেকে বেশি সময় নিয়ে নিলে তাঁকে ঘড়ির দিকে ইঙ্গিত করে দেরি হয়ে যাচ্ছে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেন।

৯। ক্লাস চলাকালীন শিক্ষকের জরুরি কোনো ফোনকল আসলে তিনি শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হয়ে কথা বলেন বা ক্লাসে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কথা বলেন।

১০। অনেক সময় শ্রেণিকক্ষে ছাত্ররা বেশি হট্টগোল করলে শিক্ষক রাগ হয়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে যান।

১১। কোনো বিষয় বুঝাবার সময় শিক্ষার্থীর মুখের অভিব্যক্তি দেখে শিক্ষক বুঝে যান যে সে পড়াটি বুঝতে পারেন নাই। তাই তিনি আবার বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করেন।

১২। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কোনো শ্রেণির কাজ দিলে তাঁদের লিখার সময় পাশে এসে দাঁড়ালে ছাত্ররা আরও সচেতন হয়ে কাজ করেন।

১৩। অনেক সময় শ্রেণিকক্ষের পেছন দিকের ছাত্রগণের দৃষ্টি দেখে শিক্ষক বুঝতে পারেন যে তাঁরা বোর্ডের নিচের অংশের লেখা দেখতে পাচ্ছেন না। তাই তাঁদের দেখবার সুবিধার্থে সে অংশ তিনি পুনরায় উপরে লিখে দেন।

১৪। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক যখন কোনো পাঠ বোঝাতে থাকেন অনেক সময়ে শিক্ষকের কথা শুনে শিক্ষার্থীগণ তা লিখতে থাকেন। যারা লিখতে গিয়ে থেমে যান তাঁদের দৃষ্টি এবং অঙ্গভঙ্গি দেখে শিক্ষক বুঝতে পারেন যে তাঁরা কিছু অংশ লিখতে পারেন নাই তাই তিনি সে অংশের পুনরাবৃত্তি করেন।

৩.৪.৫ কোন কোন অবাচনিক ভাষিক উপাদান শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষেই ব্যবহার করে থাকেন?

১। শিক্ষার্থীগণ শ্রেণিকক্ষে বিদ্যুৎ চলে গেলে সাথে থাকা বই বা খাতা দিয়ে বাতাস করে।

২। ক্লাস চলাকালীন মুঠোফোন বন্ধ রাখা হয়।

৩। ক্লাস শেষে শ্রেণিকক্ষের বাতি, ফ্যান প্রজেক্টর বন্ধ করা হয়, যাতে বিদ্যুতের অপচয় না হয়।

৪। শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ বা ক্লাস শেষে বের হলে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানো হয়।

৫। শিক্ষক পাঠদান করার সময় কোনো শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে তিনি দরজার দিকে হাতের ইঙ্গিত করে বাইরে যাবার প্রয়োজনীয়তার ইতিবাচক ইশারা করেন।

৬। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে চলে আসার পর দেরি করে ক্লাসে আসলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরে আসার অনুমতি চাওয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে ক্লাস চলাকালীন পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা হয়।

৭। একটি ছাত্রপূর্ণ শ্রেণিকক্ষের সামনে যদি অনেক শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে, এই ক্লাসের পর দাঁড়িয়ে অবস্থানরত ছাত্রদের ক্লাস এই রুমে অনুষ্ঠিত হবে। আবার শ্রেণিকক্ষ ফাঁকা থাকলেও অনেক সময় অনেক শিক্ষার্থী বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে বোঝা যায় যে, তাঁরা শিক্ষকের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

৮। শিক্ষক আসার আগে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীগণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে শব্দ করে কথা বলে থাকেন। শিক্ষককে আসতে দেখলে তাঁরা নিজ নিজ জায়গায় আসন গ্রহণ করে।

৮। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের কোলাহলের উপর বিরক্ত বা রাগ হলে তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে ক্লাসে পিনপতন নীরবতার আবহ তৈরি হয়।

৯। শ্রেণিকক্ষের বাইরে থেকে জোরে জোরে শব্দ আসলে অনেক সময় দরজা জানাল বন্ধ করে দেয়া হয়। আবার গরমে অনেক সময় বাতাসের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ক্লাসের দরজা জানলা খুলে দেয়া হয়। বাইরে বৃষ্টি পরলেও জানলার পাশে বসা শিক্ষার্থীগণ জানালা বন্ধ করে দেন।

১০। শিক্ষক ক্লাসের সিআরকে কোনো কাগজ দিলে বোঝা যায় যে, পাঠদান সংক্রান্ত তথ্য সবাইকে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে দিয়েছেন।

৩.৪.৫ বিশেষ কোনো পাঠদানের ক্ষেত্রে আপনাদের পোশাক পরিধান, অঙ্গসজ্জা বা আনুসাঙ্গিক বিষয় সংক্রান্ত কোনো ধরনের অবাচনিক ক্রিয়া কাজ করে?

১। সাধারণভাবে শিক্ষার্থীর গায়ে আনুষ্ঠানিক পোশাক (ছেলে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ফর্মাল সার্ট, প্যান্ট, কোট, টাই এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শাড়ি) পরিধানরত অবস্থায় নজরে আসলে বোঝা যায় যে, তাঁরা শ্রেণি-উপস্থাপনা বা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন।

২। আবির বা রঙ মাখা অবস্থায় দেখলে বোঝা যায়, তাঁরা তাঁদের ছাত্র জীবনের শেষ পর্যায়ে (অনারস বা মাস্টার্স শেষ পর্যায়) চলে এসেছেন সে বিষয়টি ঘিরে আনন্দোৎসব করছেন।

৩। অনেক সময় বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল দেশের জন্যে বড় কোন সম্মান বয়ে আনলেও শিক্ষার্থীগণ গায়ে আবির রঙ মেখে নেচে গেয়ে আনন্দ করে থাকেন।

৪। বিভাগে গাউন পরা অবস্থায় দেখলে বোঝা যায় সেসব শিক্ষার্থীদের সমাবর্তনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তাঁরা গাউন এবং টুপি পরিধান করে ছবি তুলছেন।

৫। বিভাগে কিছু মানুষ সূর্যতাপে গায়ের চামড়া পোড়া পোড়া ভাব (sun tan) দেখা গেলে বোঝা যায় যে তাঁরা তাঁদের শিক্ষাভ্রমণে বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন।

৬। কোনো শিক্ষার্থীর পরণে বিভাগের খেলার পোশাক বা জার্সি কিংবা স্কাউটের পোশাক থাকলে বোঝা যায় যে তিনি এসব বিষয়ে অংশ নিয়েছেন।

৭। অনেক সময় শ্রেণি-উপস্থাপনার ক্ষেত্রে (মিডিয়া সংক্রান্ত) তাঁরা তাঁদের উপস্থাপিত চরিত্র অনুযায়ী পোশাক পরিধান করেন।

৮। মেয়েরা হলুদ শাড়ি এবং মাথায় গলায় হাতে ফুলের মালা পরে থাকলে বোঝা যায় তাঁরা পহেলা বসন্ত উৎসব পালন করছেন।

৯। অনেক সময় অনেক শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেশের দলের জার্সি পরে ক্লাসে আসেন এতে বোঝা যায় যে তিনি সেই দলকে সমর্থন করেন। ফুটবল ও ক্রিকেট বিশ্বকাপের সময় এ জাতীয় পোশাক পরিধানের মাত্রা বেড়ে যায়।

১০। অনেক সময় শ্রেণিকক্ষে সুস্বাদু খাবারের গন্ধ পেলে সবাই বুঝে যান যে, তাঁদের কোনো সহপাঠী ছুটি শেষে বাড়ি থেকে ফেরার পথে খাবার সাথে নিয়ে এসেছেন।

১১। অনেক সময় শ্রেণিকক্ষে দেখা যায় কয়েকজন সহপাঠী (সাধারণত পুরুষ) যাঁদের গায়ের কাপড় ঘামে ভেজা এবং তাঁরা শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়ে থাকেন মুখায়বে পানির রেখা। সবাই বুঝতে পারেন যে তাঁরা এতক্ষণ কলাভবনের মল চত্বরে খেলছিলেন তাঁর ঘেমে গিয়ে মুখ ধুয়ে ক্লাস করতে এসেছেন।

১২। শ্রেণিকক্ষে কোনো সহপাঠীর সাথে থাকা খাবারের অবয়ব বা স্বাদেই তাঁরা বুঝতে পারেন যে কলাভবনের কোন স্থান থেকে এই খাবার তিনি এনেছেন।

১৩। পাঠদান চলাকালীন আযানের আওয়াজ শুনে অনেক মুসলিম নারী শিক্ষার্থীকে মাথায় ওড়না দিতে দেখা যায়।

৩.৪.৬ প্রতিবেশগত প্রভাবের কারণে কোনো অবাচনিক উপাদান শ্রেণিকক্ষে দেখতে পান?

১। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের উপস্থিতিতে ক্লাস চলাকালীন সময়ে অন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলে শিক্ষার্থীগণ উঠে দাঁড়ান, হাত কপালের কাছে তুলে সালামের ভঙ্গি করে সম্মান জানান। কিন্তু বিভাগের অন্য যেকোনো কর্মচারী বা দারোয়ান, পিয়নের উপস্থিতে নিজ স্থানে বসে থাকেন।

২। শিক্ষক ছাত্রদের এবং শিক্ষার্থীগণ তাঁদের সহপাঠীদের সাফল্যে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিয়ে থাকেন।

৩। ক্লাস চলাকালীন শিক্ষার্থীর কোনো প্রয়োজনে বাইরে যাবার দরকার হলে পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে যান।

৪। অনেক শিক্ষার্থী তাঁর শিক্ষালয় থেকে বাড়ির অবস্থানের দূরত্বের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ব্যবহার করে থাকেন যার যাতায়াতের নিজস্ব সময়সূচি রয়েছে। তাই অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীরা বার বার ঘড়ি দেখেন এবং ক্লাস শেষ করেই দ্রুততার সাথে বের হয়ে যান। তখন সাধারণত ধারণা করা হয়, তাঁর বাস ছাড়ার সময় হয়ে গেছে।

৫। অনেক সময় শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে ছাতা নিয়ে প্রবেশ করেন। তাঁর ছাতা শুকনো থাকলে বুঝতে পারা যায় যে, বাইরে রোদ এবং ভেজা হলে তিনি বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে ছাতা ব্যবহার করেছেন।

৬। শ্রেণিকক্ষে কোনো শিক্ষার্থী চোখে রোদ চশমা ব্যবহার করলে বুঝতে হবে তাঁর চোখে কোন ধরনের সমস্যা হয়েছে তাই তিনি এটি ব্যবহার করছেন। বা কেউ যদি রোদ চশমা পরে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে তা খুলে রাখেন বোঝা যায় বাইরে তাপমাত্রা বা ধুলোবালি ও রোদের হাত থেকে বাঁচতে তিনি চশমা ব্যবহার করেছেন।

৭। অনেক সময় (সাধারণত বৃহস্পতিবার বা সকারি ছুটি) দেখা যায় কোনো কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে ক্লাস করতে নিয়মিত যে ব্যাগ নিয়ে এসছেন তাঁর থেকে বড় কোনো ব্যাগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। নিয়মিত ব্যবহার্য ব্যাগ না এনে সাথে বড় ব্যাগটি দেখলে বোঝা যায় সাপ্তাহিক ছুটির দিন পাওয়ার কারণে তাঁরা ক্লাস শেষ করেই বাড়ি উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

৮। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক তাঁদের পরিক্ষা নিলে কাগজের প্রয়োজন হলে তাঁরা হাত তোলেন এবং প্রশ্ন না বোঝা গেলে উঠে দাঁড়ালে শিক্ষক বুঝতে পারেন যে শিক্ষার্থী প্রশ্ন বুঝতে পারেন নাই।

৯। বিভাগের সামনে শিক্ষার্থীদের ছবি সংবলিত কোন বোর্ড থাকলে বোঝা যায় যে এখানে তাঁদের শিক্ষা সফর বা পিকনিক ভ্রমণের ছবি টাঙানো হয়েছে। বিভাগের সামনে কালো ব্যানার থাকলে বোঝা যায় যে বিভাগের কেউ মারা গেছেন।

১০। ক্লাসের ভিতর অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষার্থীগণের হাতের ব্রাউন পেপার থেকে খাবার খাচ্ছেন। এতে বোঝা যায় যে সকাল থেকে তাঁদের ক্লাস হয়েছে এবং এখনও তাঁদের ক্লাস আছে। শিক্ষক আসার আগে মাঝের সময়ে তাঁরা তাঁদের ক্ষুধা নিবারণে খাবার খেয়ে নিচ্ছেন।

১১। আবার পাঠদানরত শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বাইরে অনেক ছাত্র এবং কোন শিক্ষককে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারেন তাঁর ক্লাসের সময় শেষ।

৩.৪.৭ আপনার শ্রেণিকক্ষে বিশেষ কোনো অবাচনিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে?

১। শ্রেণিকক্ষের উপর বিভাগের নাম লিখা থাকে। উদাহরণস্বরূপ: ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ।

২। IPA (International Phonetic Alphabet) চার্ট, বাংলা ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত চার্ট, ভাষাবিজ্ঞানীগণের ছবি দেয়ালে টাঙ্গানো থাকে।

৩.৫ গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা

শিক্ষার্থীগণের কাছ থেকে শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশ প্রভাবিত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তাঁদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের অবাচনিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত অবাচনিক ভাষিক যোগাযোগের উপাদান

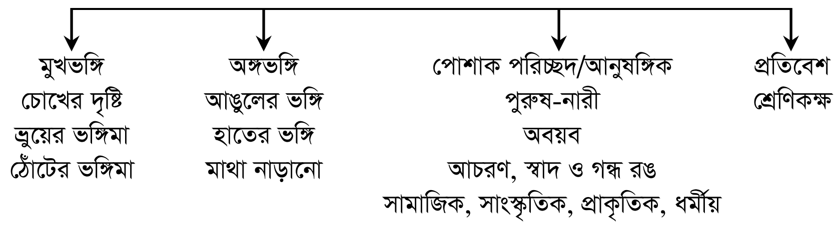

ছক ৩.৫ : শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত অবাচনিক ভাষিক যোগাযোগের উপাদান

৩.৫.১ *মুখভঙ্গি*

মুখভঙ্গিগত অবাচনিক ভাষিক যোগাযোগ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পরিবেশকে অনেকভাবে প্রভাবিত করে। মুখভঙ্গির আলোচনায় চোখ, ভ্রু এবং ঠোঁটের ভঙ্গিমাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে সংজ্ঞাপনের প্রাথমিক এবং অন্যতম প্রধান অভাষিক যোগাযোগ মুখভঙ্গির মাধ্যমে হয়। অনেক সময় অবচেতন মনেই একে অপরের প্রতি আচরণ এবং অনুভূতি এর মাধ্যমে সহজেই ফুটে ওঠে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশে শিক্ষক যেমন শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সময় বা শিক্ষার্থী পাঠগ্রহণের সময় একে অপরের মুখভঙ্গি অর্থাৎ চোখের দৃষ্টি, ভ্রুয়ের ভঙ্গিমা বা ঠোটের অভিব্যক্তি দেখলে বুঝতে পারেন ইতিবাচক না নেতিবাচক অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়।

ক। শিক্ষক পড়া ধরলে যেসব শিক্ষার্থী তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন তাঁরা তাঁদের পড়া তৈরি করে এনেছেন। আবার শিক্ষার্থী ভ্রু কুঁচকে তাকালে বুঝতে পারেন তিনি পড়া বুঝতে পারেন নাই। তখন শিক্ষক আবার সেই পাঠটির পুনরাবৃত্তি করেন। আবার শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক তাঁদের কাজের প্রশংসা করলে শিক্ষার্থীদের মুখে গর্বের হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

খ। ঠিক তেমনি শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশে শিক্ষকের চোখে বড় করে বা ভ্রূ কুচকে থাকলে শিক্ষার্থীগণ বুঝতে পারেন তাঁদের আচরণে শিক্ষক বিরক্ত তখন তাঁরা নিজেদের সংযত করেন। তেমনি শিক্ষক যখন তাঁদের শ্রেণি উপস্থাপনা বা শ্রেণি ও বাড়ির কাজে খুশি হয়ে মৃদু হাসেন তখন তাঁরা পাঠগ্রহণে আরও আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

৩.৫.২ *অঙ্গভঙ্গি*

শ্রেণিকক্ষে অঙ্গভঙ্গির অবাচনিক উপাদানের প্রয়োগ হিসেবে আঙুল, হাত এবং মাথার ভঙ্গির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পাঠদান ও গ্রহণকারীর মধ্যে ব্যবহৃত অঙ্গভঙ্গি সবচেয়ে সরাসরি ও সহজ ভাবে অর্থপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক হস্তভঙ্গির ক্ষেত্রে আঙুলের ও হাতের ব্যবহার করলে শিক্ষক-ছাত্র একে অপরের সাথে যেসব অর্থপূর্ণ অবাচনিক ভাষিক যোগাযোগ সৃষ্টি হয় সেগুলো হলো—

ক। শিক্ষার্থীকে কোনো তথ্য নির্দেশ করতে।

খ। নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষার্থীকে কিছু জিজ্ঞেস করতে।

গ। শিক্ষার্থীকে কোনো বিষয় সম্পর্কে নিষেধ করতে।

ঘ। শ্রেণিকক্ষে কোলাহোলরত শিক্ষার্থীকে থামার নির্দেশ করতে।

ঙ। হাততালি দিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে।

চ। শিক্ষার্থীগণের সালামের প্রতি উত্তরে।

ছ। শিক্ষার্থীগণের দাঁড়িয়ে সম্ভাষণের প্রতি উত্তরস্বরূপ।

অপরদিকে শিক্ষার্থীগণ শ্রেণিকক্ষে হস্তভঙ্গির মাধ্যমে শিক্ষক এবং তাঁর সহপাঠীদের সাথে যেসব অর্থপূর্ণ অবাচনিক যোগাযোগ উপাদান উপস্থাপন করেন তা হলো—

ক। শ্রেণিকক্ষে তাঁর উপস্থিতি জানাতে।

খ। শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

গ। সহপাঠীর অন্যমনস্কতায় তাঁকে সচেতন করতে।

ঘ। হাততালি দিয়ে সহপাঠীকে উৎসাহ দিয়ে থাকেন।

ঙ। হাততালি দিয়ে নিজের অর্জনেরও খুশি বা আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন।

চ। সহপাঠীর সাথে হাত তুলে পাশ্চাত্য রীতিতে সম্ভাষণ জানানো।

ছ। সহপাঠীর সাথে করমর্দন করে কুশল বিনিময়।

জ। সহপাঠীর কাছে প্রয়োজনীয় কিছু চাইতে নির্দেশক হিসেবে।

উল্লেখ্য যে, সাধারণত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীগণ উপস্থাপিত অবাচনিক ভাষিক উপাদান হিসেবে ডান আঙুল ও হাত ব্যবহার করে থাকেন। শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই মাথা নাড়িয়ে (উপর-নিচে, ডান দিক থেকে বা দিকে) কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে ইতিবাচক বা নেতিবাচক ধারণা প্রকাশ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশে শিক্ষার্থীর কোন প্রশ্ন বা আচরণে সম্মতিজ্ঞাপক বা নিষেধমূলক অর্থ প্রকাশে শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে মাথা নাড়েন। শিক্ষার্থীও শিক্ষকের প্রশ্নের ইতিবাচক বা নেতিবাচক ধারণা প্রকাশে মাথা নাড়ান। আবার সামাজিক অনুশাসনের কারণে সরাসরি শারীরিক স্পর্শ (কোলাকলি, করমর্দন, পিঠ চাপড়ে দেয়া) কেবল সমলিঙ্গের সহপাঠীর সাথেই করে থাকেন।

শ্রেণিকক্ষকে অবাচনিক ভাষিক যোগাযোগগত উপাদান অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সংঘটিত হয়, উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে—

ক। দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা।

খ। ক্লাস চলাকালীন জরুরি ফোনকল আসলে শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হয়ে যাওয়া, বা হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কথা বলা।

গ। শিক্ষকের নির্দেশ অমান্য করে, শিক্ষার্থীগণ বেশি হট্টগোল করলে শিক্ষক রাগ হয়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে যাওয়া।

ঘ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ছাত্রের পাশে এসে দাঁড়ালে ছাত্ররা তাঁদের শ্রেণির কাজে আরও সচেতন ও মনযোগী হয়ে যান।

৩.৫.৩ পোশাক পরিচ্ছেদ এবং আনুষঙ্গিক অবাচিক উপাদান

প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি রীতিগত উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীগণকে বৈচিত্র্যময় অবাচনিক অর্থপূর্ণ আচরণ করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

ক। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পোশাক পরিধান (সমাবর্তন, খেলোয়াড়, স্কাউট, শ্রেণি উপস্থাপনা বা ভাইভাতে অংশ গ্রহণকারী) বা অনানুষ্ঠানিক পরিধেয় পোশাক বা আনুষঙ্গের (আবির রঙ মেখে আনন্দোৎসব পালন, বিশ্বকাপ চলাকালীন পছন্দের দলের সাপোর্টার হিসেবে জার্সি পরিধান) উপস্থাপনে শিক্ষার্থীর পরিচয় (শেষবর্ষের শিক্ষার্থী) ও আচরণ (আনন্দোৎসব পালন) সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

খ। বাঙালি জাতিয়তাবোধ ও সংস্কৃতি (বসন্ত উৎসবে হলুদ কাপড় ও ফুলের মালা পরিধান, নববর্ষ উদযাপনের মাসটির সময়ে লাল সাদা কাপড় পরিধান) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিক্ষার্থীগণকে উৎসবকালীন পোশাক পরিধান করতে দেখা যায়।

গ। আবার শিক্ষা সফর বা শিক্ষা ভ্রমণ বা ছুটিতে বাড়ি থেকে থেকে ফেরত আসার পর তাঁর গায়ের রঙ (sun-tan) দেখেই অনুমান করা যায় যে, তিনি ঢাকার বাইরে গিয়েছিলেন।

ঘ। শ্রেণিকক্ষে কোনো শিক্ষার্থী খাবার নিয়ে আসলে গন্ধ বা স্বাদ ও আকৃতি দেখে অন্যান্য সহপাঠীগণ সহজেই বুঝতে পারেন তিনি খাবারটি বিশ্ববিদ্যালয়য়ের কোন স্থান (ডাকসু ক্যান্টিন, মধুর ক্যান্টিন, টিএসসি, মলচত্বর, আইবিএ প্রভৃতি) থেকে কিনে এনেছেন। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে অনেকেই যদি খাবার গ্রহণ করতে থাকেন তাহলে বোঝা যায় যে, তাঁদের সকাল থেকে টানা ক্লাস চলেছে, তাঁরা ক্ষুদার্থ এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের পরবর্তী ক্লাস শুরু হবে।

ঙ। সামাজিক অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লিঙ্গভেদে একজন শিক্ষার্থী কেবল সমলিঙ্গের সহপাঠির সাথে কোলাকুলি বা করমর্দন করেন।

চ। ধর্মীয়রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আযানের শব্দে অনেক নারী শিক্ষার্থী মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন।

ছ। পরিচিত প্রাকৃতিক প্রতিবেশগত কারণে শ্রেণিকক্ষে অবস্থানরত সবাই কোনো শিক্ষার্থী শুকনো ছাতা নিয়ে প্রবেশ করলে বাইরে রোদ এবং ভেজা ছাতা সাথে থাকলে বৃষ্টি হচ্ছে বুঝে নেন। তেমনি কেউ রোদ চশমা পরিহিত অবস্থায় শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলে বাইরে অনেক রোদ বা ধুলোবালি বোঝা যায়। তবে তিনি যদি শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালীন তা পরিধান করে থাকেন তখন বুঝতে হবে যে তাঁর চোখে কোন সমস্যা হয়েছে।

জ। ক্লাস চলাকালীন এক সহপাঠীর সাথ আরেক সহপাঠীর চিরকুট আদান প্রদানে বোঝা যায় তাঁদের সম্পর্কের সখ্যতা রয়েছে। সাধারণত নারী শিক্ষার্থীগণ এ জাতীয় আচরণ করে থাকেন।

ঝ। প্রতিদিন ক্লাস চলাকালীন অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী বার বার ঘড়ি দেখলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে করে তাঁর গন্তব্যে যাবেন, বাস ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। আবার অনেক সময় সাধারণত বৃহস্পতিবার বা সকারি ছুটি আগের দিন কোনো শিক্ষার্থীর সাথে বড় ব্যাগ দেখলে বোঝা যায় যে, তিনি ছুটিতে ক্লাশ শেষ করেই বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

ঞ। শ্রেণিকক্ষের বাইরে থেকে জোরে শব্দ বা মিছিল বা কোলাহল, মাইকিঙের আওয়াজ আসলে বা জোরে বৃষ্টি শুরু হলে পাঠদান ও গ্রহণের সুবিধার্থে দরজা-জানাল বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে গরমে বাতাসের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ক্লাসের দরজা জানলা খুলে দেয়া হয়।

ত। শিক্ষার্থীগণ বই বা খাতা দ্বারা বাতাস দেয়ার ভঙ্গি থেকে সহজেই অনুমান অরা যায় যে শ্রেণিকক্ষে বিদ্যুৎ চলে গেছে।

থ। বিদ্যুতের অপচয় রোধে সচেতন শিক্ষার্থী ক্লাস শেষে শ্রেণিকক্ষের বাতি, ফ্যান প্রজেক্টর বন্ধ করে দেন।

দ। বিভাগের সামনের বোর্ডে শিক্ষার্থীদের ছবি বা পত্রিকা দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, যে তাঁরা নিকটবর্তি অতীতকালে শিক্ষা সফর বা পিকনিক, ভ্রমণে গিয়েছিলেন। আবার বিভাগের সামনে কালো ব্যানার থাকলে কারো মৃত্যুতে শোক প্রকাশক ধারণা বোঝা যায়।

৩.৫.৪ শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশগত অবাচনিক ভাষিক উপস্থাপনা

সংজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কিছু কিছু অবাচনিক ভাষিক যোগাযোগ কেবল শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশেই সংগঠিত এবং সংঘটিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-

ক। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলে শিক্ষার্থীগণ দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্ভাষণ জানান।

খ। শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালীন অন্য কোন শিক্ষক কক্ষে প্রবেশ করলে তাঁরা সম্ভাষণ জানাতে উঠে দাঁড়ান কিন্তু বিভাগে অন্য কোন কর্মচারী এলে তাঁরা নিজ অবস্থানে বসে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা কেন্দ্রিক ধারণা কাজ করে।

গ। শিক্ষকের নির্দেশ তাঁরা পালন করেন অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে সন্তোষ শর্তের[১] ধারণা কাজ করে। কিন্তু একই নির্দেশ তাঁর কোন সহপাঠী করলে তিনি তা করতে বাধ্য নন। আবার শিক্ষক পাঠদান সংক্রান্ত কাগজ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট শ্রেণির দায়িত্ব প্রাপ্ত শ্রেণিব্যত্তিনিধির এর মাধ্যমে দেন যেকোন ছাত্রকে নয়।

ঘ। ক্লাস চলাকালীন শ্রেণিকক্ষে দেরিতে প্রবেশ বা কোন কারণে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে পেছনের দরজা দিয়ে চলাচল করা হয়।

ঙ। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ছাত্র শিক্ষকের উদেশ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ (হাত তোলা, দাঁড়ানো বা চোখের দৃষ্টি) করতে চাইলে তিনি সহজেই বুঝে যান তাঁর কর্তব্য (শিক্ষার্থীকে খাতা সরবরাহ, সে প্রশ্ন বুঝতে পারেনি প্রভৃতি)।

চ। পাঠ চলাকালীন মুঠোফোন বন্ধ রাখা হয়, যাতে অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দে অন্যদের অসুবিধা না হয়।

ছ। ছাত্রপূর্ণ শ্রেণিকক্ষের সামনে শিক্ষার্থীগণ দাঁড়িয়ে থাকলে সহজেই অনুমেয় যে, বর্তমান ক্লাসটি শেষ হলে, নিয়মিত ও নির্ধারিত সময় অনুযায়ী পরবর্তীকালে তাঁদের ক্লাসটি অনুষ্ঠিত হবে। আবার শিক্ষকবিহীন শ্রেণিকক্ষের সামনেও শিক্ষার্থীগণ দাঁড়িয়ে থাকলে বোঝা যায় যে তাঁরা শিক্ষকের জন্যে অপেক্ষারত অবস্থায় আছেন।

জ। শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষের উদ্দেশ্যে আসতে দেখলে শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ স্থানে আসন গ্রহণ করেন।

ঝ। পাঠদানরত শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের বাইরে তাঁর সহকর্মীকে ছাত্রদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে বুঝতে পারেন যে তাঁর পাঠদানের নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে।

ঞ। শ্রেণিকক্ষের উপর বিভাগের নাম লেখা বোর্ডটি দেখে সহজেই বোঝা যায় কোন বিষয়ের পাঠ এখানে দেয়া হয়। থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে এসব চিহ্ন আইকনিক সাইন (iconic sign)[২] হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ- ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ। আবার বিভাগের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলেই যেসব অবাচনিক ভাষিক উপাদানের চিহ্ন IPA (International Phonetic Alphabet) চার্ট, বাংলা ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত চার্ট, ভাষাবিজ্ঞানীগণের ছবি প্রভৃতি) পাওয়া যায় তা ভাষাবিজ্ঞান পাঠ সংক্রান্ত বিষয়কেই ইঙ্গিত করে।

উপসংহার

প্রাত্যহিক জীবনে একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সংগঠনে সচেতন বা অবচেতন ভাবে অবাচনিক ভাষিক উপাদানের ব্যবহার খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। বক্তব্যকে আরও বেশি কার্যকর, অর্থপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য করতে অবাচনিক ভাষিক উপাদানের ব্যবহারের গুরুত্ব অপরিসীম। উপরে উল্লেখিত শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত বেশির ভাগ অবাচনিক আচরণ আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে খুবই সাধারণ এবং পরিচিত বিষয়। অবাচনিক ভাষিক উপাদান প্রয়োগে শ্রেণিকক্ষের প্রতিবেশে পাঠদান ও গ্রহণকারীর মধ্যে মূলপাঠ সহজে অনুধাবন করা, শিক্ষক ছাত্রের সম্পর্কের সুসহাবস্থানের পাশাপাশি তাঁদের একে অপরের সাথে সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সহজ, সার্থক ও অধিক মাত্রায় কার্যকর হয়। এছাড়াও অবাচনিক ভাষিক প্রয়োগে একটি সমাজের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রতিবেশের সম্পর্কেও ধারণা লাভ সম্ভব হয়।

অন্ত্য-টীকা

১। সন্তোষ শর্ত- কোন সংজ্ঞাপন কার্যকর হতে বক্তা এবং শ্রোতার দুই পক্ষেরই বার্তা আদান প্রদানের কিছু নিয়ম বা রীতি থাকে, যা নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তি বিশেষের সামাজিক অবস্থান। বক্তার সামাজিক বা কর্মক্ষেত্রের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে শ্রোতা বক্তার বক্তব্য বা বার্তাটি পালনে বাধ্য হন। আবার সমাজের রীতি ও প্রথা অনুযায়ী বক্তা শ্রোতা তাঁদের সামাজিক অবস্থান থেকে সংজ্ঞাপন ক্রিয়া সংঘটন করে থাকেন। এই ধারণাটিই জন অস্টিনের (১৯৫৫) সন্তোষ শর্ত (felicity condition) হিসেবে পরিচিত।

২। আইকনিক সাইন- চার্লস স্যান্দারস পিঁয়েরস (১৯৩১) এর বিখ্যাত চিহ্ন সংক্রান্ত তিনটি ধারণার অন্যতম একটি হলো আইকনিক সাইন (iconic sign)। কোন ব্যক্তি, বিষয়, বস্তু, পাঠ, অবয়ব এর নাম শুনলে প্রথমে সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একটি ধারণা তৈরি হয়। অর্থাৎ আইকনিক সাইন হলো কোন একজন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কিত বিষয়ের পরিচয় বা নাম।

উল্লেখপঞ্জি

আরিফ, হাকিম (২০১৫)। *বাংলা অবাচনিক যোগাযোগ*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

রহমান, সৈয়দ শাহরিয়ার (২০১৩)। *বাংলা পরোক্ষ কথনকৃতি বিশ্লেষণ*, সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৫০, সংখ্যা ২-৩।

Canan P. Zekia (2008). *The importance of non-verbal communication in classroom management.* World Conference on Educational Sciences 2009, North Cyprus.

Charles Sanders Peirce (1931), *The Collected Papers (8 vols.)* eds. Charles Hartshorne et el, Cambridge, MA: Harvard University press.

Daniel Chandler (2007). *The basics, Semiotics* (2nd ed.), New York: Routledge.

David McNeill (1992). *Hand and mind what gesture reveal about thought*. Chicago: Chicago University Press

Frank Matsumoto & H.s Hwang (2013). *Nonverbal communication science and applications*. Los Angels: Sage publications, Inc.

James Hoopers (Ed.) (1991). *Writings on Semiotics by Charles Sanders Pierce*. *Pierce on Signs*.

The Uiversity of North Carolina press.

John L Austin (1962). *How to do things with words*. University of Harverd.

Miles. B. M. & Huberman, M. A (1994). *Qualitative Data Analysis.* Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Edward Twitchell Hall (1959). *The Silent Language*. Garden city, NY: Doublenday.

Louis Rossman, Louis R (1989). *Tips: Discipline in the Music Classroom*. Reston, VA: MENC Santrock.

নিমা ইউশিজের কাব্যে সমাজ দর্পণের চিত্রকল্প : একটি পর্যালোচনা

মো. মুমিত আল রশিদ*

সারসংক্ষেপ : বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বেশ কিছু জগৎখ্যাত ফারসি কবি বিশ্বসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ মহাকবি ফেরদৌসি (৯৩২/৯৩৬ খ্রি.-১০২০/১০২৫ খ্রি.), ওমর খৈয়্যাম (১০২০/১০২৫ খ্রি.-১১২৩ খ্রি.), জালালুদ্দিন রুমি (১২০৭ খ্রি.-১২৭৩ খ্রি.), শেখ সাদি (১২১৩/১২১৯ খ্রি.-১২৯১ খ্রি.), হাফিজ সিরাজি (১৩২৬ খ্রি.-১৩৮৯/১৩৯০ খ্রি.), ফরিদউদ্দিন আত্তার (১১৪২/১১৪৩ খ্রি.-১২২৯ খ্রি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সম্পূর্ণ ক্ল্যাসিকাল ধারাকে বিকশিত করেছেন। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে ফারসি সাহিত্যে রেনেসাঁ আন্দোলন শুরু হয় এবং এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ফারসি সাহিত্যে আধুনিকীকরণের প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রেনেসাঁ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ক্ল্যাসিকাল ধারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নয় বরং এর পরিবর্তন সাধন করে কবিতার নতুন কাঠামো প্রদান করা। সেই পরিবর্তনের মধ্যে ছিল বিষয়বস্তুর নতুনত্ব, ধরন বা স্টাইলের অভিনবত্ব এবং সর্বোপরি ভাষার সারল্য ও প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতা। এক কথায়, আধুনিক সংজ্ঞাসঞ্জাত পাশ্চাত্যের অনুকরণে সাহিত্য নির্মাণ।

ইরানের মাশরুতিয়াত তথা সংবিধান আন্দোলন, রেনেসাঁ আন্দোলন এবং বিশ্বসংস্কৃতির বির্বতন ধারা বিশ শতকের ইরানকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। মাশরুতিয়াত আন্দোলনের পর ১৯০৫ খ্রি. থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের বিন্দু শল পর্যন্ত ছিল আধুনিক সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ; তাই দিন দিন ভাষার লড়াই এবং সাহিত্য সংগঠনের জন্য মানুষের কাছে বাঞ্ছিত হয়ে পড়ে। কা'ভে (১৯১৬ খ্রি.), বাহা'র (১৯০৯ খ্রি. ও ১৯২০ খ্রি.), দা'নেশকাদেহ (১৯১৬ খ্রি.) এবং আরমাগা'ন (১৯১৯ খ্রি.)-এর ন্যায় বহু সাহিত্য সাময়িকী এ সময়ে আত্মপ্রকাশ করে। এসব সাময়িকীতে প্রাচীন সাহিত্যগুলোর সমালোচনা, ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশ এবং ইউরোপীয় স্টাইলে কাব্য রচনা প্রকাশ করে, যা চলমান সাহিত্য- চিন্তায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এ সময়ে আধুনিক ফারসি সাহিত্যের আকাশে এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারার আবির্ভাব হয়। সময়ের পরিবর্তনে 'আধুনিক কবিতার জনক' হিসেবে সে নক্ষত্রই ইরানের কাব্যজগতে নতুন এক রশ্মি সঞ্চালন করে। তিনি হলেন, আলি ইসফান্দিয়ার নিমা ইউশিজ। আলোচ্য প্রবন্ধে ফারসি ক্ল্যাসিকাল কবিতার আধুনিক রূপান্তরে নিমা ইউশিজের অবদান, সমাজ দর্পণের চিত্রকল্পে তাঁর কাব্যের তাত্ত্বিক প্রয়োগ ও শৈল্পিক শব্দাবলির ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করতে প্রয়াসী হব।

ভূমিকা

নিমা ইউশিজ আধুনিক ফারসি কাব্য-সাহিত্যের অসাধারণ ও সমকালীন এক সাহসী সাহিত্যযোদ্ধা। তাঁকে কাব্য-প্রতিভার বিচারে সমকালীন অন্যান্য কবিদের চেয়ে অধিকতর শক্তিমান কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নিমা ইউশিজ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের শরৎকালে উত্তর ইরানের কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্তী প্রদেশ মাযেন্দারানের ইয়ুশ গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মস্থান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর তেহরানে চলে আসেন এবং সানলুই স্কুলে ভর্তি হন। এখানে থেকে ফরাসি ভাষা আয়ত্ত করেন এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে সম্যকভাবে পরিচিত হন। তাঁর বিভিন্ন লেখা ও প্রবন্ধে ইউরোপিয় কবি-সাহিত্যকদের রচনাবলির যে সমালোচনা করেছেন, তা থেকেই ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে তাঁর পরিচিতির গভীরতা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। (কাহদুয়ি, ১৯৯৬, পৃ. ৬৫)

তাঁর জন্মস্থান ইয়ুশ গ্রাম অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ সবুজ বেলাভূমির এক বিস্তৃত অঞ্চল। সেই সাথে এর প্রসিদ্ধতা, কুয়াশাচ্ছন্ন পর্বতমালা, বিস্তীর্ণ বৃক্ষ ঘেরা এক অপরূপ অরণ্যরাজি নিমাকে কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করে। এখান থেকেই নিমা প্রকৃতি ও চিত্রকল্পের এক অদ্ভুত সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছেন। (Echo of Islam [ed.], 1999, p. 45)

১৯০৬-১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে ইরানি জাতি তাদের কবিতায় এক ধরনের অভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে। এটিকে নিমা ইউশিজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, আর এ কারণেই ফারসি কবিতা নতুন এক রূপ লাভ করে। এর মাধ্যমে নিমা ইউশিজকে ফারসি সাহিত্যের অবিসংবাদী আধুনিক ভিত নির্মাতা তথা 'আধুনিক ফারসি কবিতার জনক' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি কবিতাকে সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক ও কাল্পনিক এবং নান্দনিক অনুভূতি দিয়েছেন, যা সমগ্র ফারসি সাহিত্যেই এক নব কল্পনাপ্রবণ শক্তির সৃষ্টিশৈলী হিসেবে পরিগণিত।

নিমা কী করেছেন?

এর উত্তর কোনো ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দ্বারা তুলনা করা যাবে না; বরং বিংশ শতাব্দীর ফারসি কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর কবিতায় যে কাল্পনিক ও তাত্ত্বিক ধারা সমর্থিত, তা থেকেই আধুনিক ফারসি কবিতায় নতুন চিন্তা-চেতনা ও কাব্য-কল্পনার ব্যাপক প্রয়োগ ঘটে। নিমা তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা দ্বারা ফারসি কবিতার মূল কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করেন এবং সৃষ্টিশীলপূর্ণ কল্পনাশক্তির এক বিস্তীর্ণ কাব্যিক বিচ্ছুরণ ঘটান। প্রচণ্ড বৈষম্যের বিরুদ্ধে, শত্রুভাবাপন্ন রাজনৈতিক প্রজন্মের বিরোধিতা করা এবং সমকালীন মধ্যবিত্তের এক স্মারকস্তম্ভ হিসেবে নিমা নিজেকে এক বিমূর্ত প্রতীক রূপে তৈরি করেছেন। (Esposito [ed.], 1995, p. 320)

প্রকৃতপক্ষে নিমার তাত্ত্বিক ঘোষণা ছিল, "আরযেশ-এ-ইহ্ছাছা'ত দার যিন্দেগিয়ে হোনারমান্দ" (শিল্পীর বা চিত্রকরের জীবন হলো অনুভূতির সূক্ষ্মতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য)।[১] নিমা তাঁর কাব্যনির্মাণে সমসাময়িক রাশিয়ান, ফরাসি ও জার্মান কবিদের কাব্যসাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে টি.ই. হিউমের 'Autumn (হেমন্ত)' কবিতার আদলে লেখা 'মাহ্তাব' (চন্দ্রালোক) কবিতাটির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। নিমা লিখেছেন :

می‌درخشد شبتاب
نیست یک دم شکند، خواب به چشم کسی ولیک
غم این خفته چند
خواب در چشم ترم می‌شکند.
(সিরুছ, ১৩৭৫ সৌরবর্ষ : ৪৪৪)

[ঝলমলে চাঁদের আলো
মিটমিট করে জোনাকির দল
গম্ভীর এক নির্জনতা, হয়তো কারো ঘুমটা কেড়ে নেবে!
তবু এই আমি কদাচিৎ ঘুমে;
সিক্ত নয়ন থেকে নিদ্রা হারিয়ে যায়।]

টি.ই. হিউমের বিখ্যাত Autumn কবিতাটি নিম্নরূপ :

A touch of cold in the autumn night
I walked abroad,
And saw the ruddy moon lean over a hedge,
Like a red-faced farmer.
I did not stop to speak, but nodded;
And round about were the wistful stars
With white faces like town children.

হেমন্তের রাতে শীতের একটু ছোঁয়া
আমি হাঁটছিলাম দূরে,
দেখলাম লালমুখো চাষির মত
বেড়ায় হেলান দিয়ে টুকটুকে লাল চাঁদ।
বললাম না, সৌজন্য জানালাম মাথা নেড়ে;
শহুরে শিশুদের মত সাদামুখ
তৃষ্ণার্ত নক্ষত্র সবদিকে।
(Issacs, 1982, p. 28)

টি.ই. হিউমের সমসাময়িক আরেকজন কবি ছিলেন এডোয়ার্ড স্টোরার। *Mirrors of Ilusion* শিরোনামে তিনি একটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করেন। বইটিতে কোনো তারিখ নেই, কিন্তু ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কপি খানায় ১১ জানুয়ারি ১৯০৯ ছাপা উল্লেখ রয়েছে। এখানে একটি কবিতা রয়েছে *Image* (চিত্রকল্প) শিরোনামে। কবিতাটি নিম্নরূপ :

Forsaken lovers,
Burning to a chaste white moon,
Upon strange pyres of
loneliness and dought.

পরিত্যক্ত প্রেমিককূল,
শুদ্ধশ্বেত চন্দ্রের নিচে
নৈঃসঙ্গ ও শুষ্কতার আশ্চর্য চিতার ওপর
জ্বলে যাচ্ছে।

যতদুর জানা যায়, *Image* প্রথম আধুনিক ইংরেজি কবিতা। দুটি কবিতাই চাঁদ সম্পর্কে, মনে হয় যেন সব যুগের কবিতার ইতিহাসই চাঁদের জন্য নতুন চিত্রকল্প খোঁজার প্রচেষ্টা (Issacs, ১৯৮২, পৃ. ২৯)। নিমার কবিতাও নিঃসন্দেহে এর ব্যতিক্রম নয়। 'মাহ্‌তাব' কবিতাটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নিমা ইউশিজের সময়ে ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাব কাজার বংশের শাসনামলে বিশেষ করে; নাসিরুদ্দীন শাহ (শাসনকাল ১৮৩১-১৮৯৬ খ্রি.) যুগের পুরোটাই দুর্নীতি-অনাচার ও বিজাতীয়দের নিকট দেশ বিক্রির কলংকে কালিমা লিপ্ত। নাসিরুদ্দিন শাহের যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশসমূহের আদলে আধুনিক শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান স্থাপন। আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে গণমানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে ইউরোপীয়দের অনুকরণে পত্রিকা প্রকাশ। ফলে দেশবাসী এক বিভ্রান্তমূলক অবস্থায় নিপতিত হয়। আর এ বিষয়গুলো নিমার সম-সাময়িক বা অগ্রবর্তী কবিদের সাহিত্যকর্মেও তুলে ধরার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পরবর্তী পরিস্থিতি কবি-সাহিত্যকদের অন্তরে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নিমা এদের প্রভাবেও কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

নিমা তাঁর কল্পনাগুলোকে কাব্যিক ছন্দমালায় সুশোভিত করেছেন। নিমা গভীর পর্যবেক্ষণের দ্বারা সমসাময়িক সাহিত্য বিশেষ করে রাশিয়ার বিদ্রোহী কবিতাগুলো সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। ব্রিটিশ কবি লর্ড বায়রনের কবিতা দ্বারাও তিনি বেশ প্রভাবিত ছিলেন– যার উপমা ছিল রোমান্টিসিজম। (Echo of Islam [Ed.], 1999, p. 46)

নিমা সর্বদা নব্যধারার কাব্য রচনায় ব্যতিক্রম জীবনবোধের নতুন কল্পনার অন্বেষণ করেছেন। এ ধারায় তিনি তাঁর কাব্যে সংযোজন করেছেন বাকপটুত্বের এক অবারিত দ্বার। যেখানে কাব্য হয়েছে আরো শ্রুতিমধুর, রুচিসম্পন্ন ও শিল্পসম্মত। নিমা ইউশিজ নিজেই বলেন : "আমি মানুষের অনুভূতিকে ছন্দোবদ্ধ ছকের মধ্যে বেঁধে রাখার পক্ষে নই"। (হামিদিয়ান, ২০০৪, পৃ. ২১৯)

তিনি আরও বলেন-

> আমিও চিরায়ত কবিতার প্রচণ্ড ভক্ত, কিন্তু শুধুমাত্র ছন্দকে অবলম্বন করে কবির কবিত্ব প্রকাশ আধুনিক কালের সঙ্গে মানানসই নয়, তাইতো আমার কবিতা কখনো তিনবার ঢেউ দেয়, আবার কখনো উনিশবার ঢেউ দেয়। কিন্তু এর মধ্যেই ভাব আছে, অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা আছে, জীবনদর্শন আছে, সমাজ অবক্ষয়ের যাবতীয় নিদর্শন আছে। (মারয়াম, ২০০২, পৃ. ১১৮)

চিরায়ত কবিতার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লেখার জন্য নিমা ইউশিজকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার এক অশুভ পাঁয়তারা করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল যে, তিনি পারস্য কবি শেখ সাদী, জালালুদ্দিন রুমি, ওমর খৈয়্যাম, হাফিজ শিরাজি, ফরিদ উদ্দিন আত্তার ও আব্দুর রহমান জামীর ক্ল্যাসিকাল ধারা থেকে বের হয়ে এসে স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটে এবং সাহিত্য সমালোচকগণ নিমার কবিতায়– দেশাত্মবোধ, সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রশংসা, যুগের ধ্বংসলীলা, স্বৈরশাসনের স্থির প্রতিবিম্ব, মানবমনের অন্তর্নিহিত ব্যথা-বেদনা, নিঃস্বের অধিকার এবং সর্বোপরি শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে অবস্থান দেখে মুগ্ধ হন।

নিমার কবিতাগুলো জীবনবোধ ও জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। যখন সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে অসম দুর্নীতি, অনাচার, অবিচার আর অসহনীয় ক্ষমতার দাপটে জীবন চরম দুর্বিষহ ওঠে; ঠিক তখনই নিমার কলম তরবারির ন্যায় ধারালো হয়ে ওঠে। তাঁর কবিতা একটি শক্তিশালী উপস্থাপনা, পরিপূর্ণ রহস্যের বেড়াজাল এবং গোপন এক প্রার্থনার আশ্রয়স্থল হিসেবে সাধারণ মানুষের আস্থা কুড়িয়ে নেয়। যে কারণে তাঁর কবিতা মানুষের বহিরাঙ্গনের গল্প হিসেবে বিবেচিত হয়।

নিমার কবিতাগুলোতে কখনো কখনো দেখা যায় স্বভাবসিদ্ধভাবেই প্রাচীনরীতির ছোঁয়া; আবার কখনোবা নতুনত্বের ছোঁয়া! তবে সকল কবিতাই মানবিক চাহিদার এক পরম আকাঙ্ক্ষা। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিনি যুগের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত এবং সময়কে পরিবর্তনের চেষ্টা তাঁর মধ্যে বহমান ছিল। নিমা নিজে মনে প্রাণে বিশ্বাসী ছিলেন যে, কাব্যে অতীত ইতিহাস বা কাহিনির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ না করে উত্তম হলো এর সারাংশ সংক্ষিপ্ত করা। এ সম্পর্কে নিমা বলেন :

> যদি কবিতার অংশ অতি সংক্ষিপ্ত হয়, তবে উত্তম হল এর মধ্যে বিষয়বস্তু থাকবে এবং তা সৌন্দর্য পরিমণ্ডিত হবে; আর এটিকে উহ্য রাখা হল কবিতার একটি মূল বৈশিষ্ট্য। কাব্যে যদি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া না হয় এবং অতীত কাহিনী স্পষ্ট না থাকে, তবে যতটুকু সারাংশ থাকবে তাতেই কবিতা সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হবে। (মারয়াম, ১৩৮১, সৌরবর্ষ পৃ. ১১৮-১১৯)

চিত্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ

নিমা অর্থের গভীরতা দানের জন্য symbol বা রূপক এর ব্যাপক প্রচলন করেন। কেননা রূপক বা চিত্রকল্প আধুনিক কবিতার এক অবশ্যম্ভাবী উপাদান। নিমা যেহেতু পাশ্চাত্য ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তাই তিনিও কবিতায় চিত্রকল্পের অসাধারণ ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, শুধু আধুনিক কবিকেই নয়, সকল কবিকেই চিত্রকল্প খুঁজে নিতে হয়। মিল্টন তাঁর মন চিত্রকল্পে পূর্ণ করার ইচ্ছায় মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করতেন। শেক্সপিয়র যতবারই বইয়ের দোকানে প্রচার-পুস্তিকা দেখেছেন, সেখান থেকে তুলে নিয়েছেন তাঁর চিত্রকল্প। চসার, স্পেন্সার, মার্লো, ডান, কোলরিজ, কীটস্ ও শেলী সবাই আপনাপন কল্পনা অন্বেষণ করেছেন (Issacs, ১৯৮২, পৃ. ৩৬-৩৭)। ফারসি কবিতাও এর ব্যতিক্রম নয়। ওমর খৈয়্যাম শরাব, সাকী, সুরাহী, পেয়ালার মাঝে এক অসম্ভব চিত্রকল্প এঁকেছেন। রুমি বিরহের বাঁশি দ্বারা মহান প্রভুর মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন, ভালবাসার জয়গান গেয়েছেন। হাফেয শিরাযি প্রেমিকার সৌন্দর্যে আধ্যাত্মিকতার চিত্রকল্প অন্বেষণ করেছেন। শেখ সাদী মানবতার মূল্যবোধকে সমাজের রন্দ্রে-রন্দ্রে খুঁজে ফিরেছেন। কবিতায় চিত্রকলা বা রূপক সম্বন্ধে নিমা নিজেই বলেন :

> কল্পনা বা প্রতীক কবিতাকে গভীরতা দান করে, ব্যাপকতা এনে দেয়, পাঠকের মনে আস্থার সৃষ্টি করে, গাম্ভীর্যতা দান করে এবং পাঠকের নিজের মধ্যে বিশালত্ব ও মহত্ত্বের এক স্থায়ী আসন তৈরী করে- যা সাধারণ পাঠকের চোখে এক জটিল আবরণ তৈরি করে এবং তাকে অস্পষ্ট ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধ করে দেয়। (গোলাম, ১৩৭৮ সৌরবর্ষ, পৃ. ৫১২- ৫২৯)

কল্পনা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে মালার্মে বলেন :

> কোন কিছুর নাম উল্লেখের অর্থই হচ্ছে কবিতার ক্রমোন্মোচনের আনন্দ তিন-চতুর্থাংশ নষ্ট করে ফেলা। অর্থের শুধু ইঙ্গিত থাকবে এবং পাঠক তার কল্পনা দিয়ে এর অন্তর্নিহিত ভাব বুঝে নেবে। মূলত চিত্রকল্পের মাধ্যমেই আধুনিক কবি তাঁর নাগরিকত্বের দায় পরিশোধ করেন।

নিমার কবিতার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও ভাষা সুনির্দিষ্ট। তবে তাঁর অধিকাংশ কবিতার শুরুতেই ভূমিকা লক্ষ করা যায়। কবি শুরুতেই একটি গল্পের পটভূমি ব্যাখ্যা করেন, অতঃপর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তার বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করেন। এমনই একটি কবিতা *কা'রে শাব পা'* (রাতের কর্মসম্পাদনকারী চরণ), যেখানে প্রথমে প্রকৃতির এক অনবদ্য চরিত্র অংকন করেছেন, অতঃপর মূল বক্তব্যে পদার্পণ করেছেন :

ماه می‌تابد، رود است آرام
بر سر شاخه‌ی «اوجا»، «تیرنگ»
دم بیاویخته، در خواب فروخته، ولی در «آبش»
کار شب پا نه هنوز است تمام.
(সিরুছ, ১৩৭৫ সৌরবর্ষ : ৪১২)

[চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয়, শান্ত- স্থির বয়ে চলা নদী
বিভীষিকাময় রাত্রির শীর্ষবিন্দুর শাখা-প্রশাখা
রাত্রির শেষ প্রান্ত, তলিয়ে আছে নিদ্রায়, কিন্তু তার মধ্যেও
রাতের কর্মসম্পাদনকারী পদযুগলের বিচরণ থেমে নেই।]

তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেননি যে শাব পা' দ্বারা বন্য কুকুরের ন্যায় তীব্র ভয়ংকর আওয়াজের সৃষ্টি হয়! মাঝে মাঝে ডালপালা মরমর শব্দে ভেঙ্গে পড়ে! ঢোলের পেটানোর ন্যায় শব্দ হয়! মূলত এর দ্বারা তৎকালীন শাসকবর্গের ক্ষমতার দাম্ভিকতা, যত্রতত্র স্বেচ্ছাচারিতা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের এক প্রতিচিত্র অঙ্কন করেছেন। কবিতাটির কাল্পনিক নামের আড়ালে মূলত স্বৈরশাসকের ট্যাংক বা সাঁজোয়া বহরকে বুঝানো হয়েছে- যা অন্ধকারের বুক চিড়ে রাজপথে বেরিয়ে আসে এবং লোকারণ্যে ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি করে!

কবিতাটিতে নিমা প্রকৃতি ও কল্পনার এক অনবদ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন। যেহেতু কাব্যের প্রধান উপকরণ হচ্ছে শব্দ, তাই শব্দের মধ্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে তাঁর চিন্তা ও কল্পনাশক্তির স্পন্দন সৃষ্টি করেছেন। সেই স্পন্দন তাঁর কবিতায় বিচিত্র আবেগ এনেছে (জাফর, ১৯৯৬, পৃ. ৯৮)। নিমা ইউশিজ তাঁর কবিতার মূল সুর সম্বন্ধে বলেন :

> আমার কবিতার মূল সুর হচ্ছে বেদনা এবং আমি মনে করি বাণী উপস্থাপককে অবশ্যই মূল সূরের অধিকারী হতে হবে। আমি আমার নিজের ও অন্যদের বেদনার জন্যই কবিতা রচনা করি।

নিমার কাব্যিক পদ্ধতি বা ধারা

নিমার কাব্য পদ্ধতি বা নব ধারার মধ্যে ছিল জীবনযাপন, কাব্য, প্রেম, সৌন্দর্য ও প্রকৃতি এবং কাল্পনিক নাম ব্যবহার করে কবিতা রচনা। তাঁর নতুন ধারার কবিতাগুলো তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১. রোমান্টিসিজম (Romanticism)
২. সিম্বলিজম (Symbolism)
৩. পা'রনা' সিজম (Previsouly/Formarely)

১. রোমান্টিসিজম : শিল্প ও সাহিত্যে রোমান্টিকতার অনুসারী ব্যক্তি, কল্পনাবিলাসী ব্যক্তি। এর বিষয়গুলো হচ্ছে স্বাধীন শৈল্পিক চিন্তা-চেতনা, শিল্পগুণের অধিকারী ব্যক্তিত্ব, রাজত্ব, আমিত্ব, শিল্পীর নিজস্ব শৈল্পিক গুণাবলি, আবেগ-অনুভূতিতে উদ্বেলিত হওয়া এবং তা ব্যক্ত করা, পারিপার্শ্বিকতায় দুঃখ-ভারাক্রান্ত হওয়া, সময়ের আগে ছুটে চলা এবং অন্য এক সময়ে পদার্পণ করা, প্রত্যক্ষ অনুভূতির প্রকাশ, শব্দ ও শব্দালংকারের যাদুমন্ত্র ও মনোহরিত্ব। নিমার আফছা'নেহ (রূপকথা)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই উপলব্ধি করা যায় যে, নিমা হচ্ছেন আধুনিক ফারসি সাহিত্যের প্রথম কবি, যিনি একজন পরিপূর্ণ চিন্তাশীল ও শৈল্পিক গুণের অধিকারী; যিনি উপরিউক্ত মূল উপাদানসমূহের কম-বেশি ব্যবহার করেছেন। নিমা নিজেই বলেন : 'আমি হচ্ছি আফছা'নেহ বা রূপকথার কবি, যেখানে বিস্তীর্ণ বেলাভূমির ন্যায় নিজেকে উপস্থাপন করতে পেরেছি' (কামিয়ার, ১৯৯৮, পৃ. ১৬)। নিচে নিমার আফছা'নেহ-এর অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো :

من ندانم با که گویم شرح درد
قصه ی رنگ پریده ، خون سرد؟
هر که با من همره و پیمانه شد
عاقبت شیدا دل و دیوانه شد
قصه ام عشاق را دلخون کند
عاقبت ، خواننده را مجنون کند
آتش عشق است و گیرد در کسی
کاو ز سوز عشق ، می سوزد بسی
قصه ای دارم من از یاران خویش
قصه‌ای از بخت و از دوران خویش.
(সিরুছ, ১৩৭৫, সৌরবর্ষ পৃ. ১৭)

আমি জানি না, কার কাছে গোপন ব্যথাটি বলব:
আমার বিবর্ণ ও হিমশীতল রক্তের গল্প
যারা আমার সঙ্গী হলেন
তারা শেষ পর্যন্ত উন্মাদ ও দেওয়ানা হয়ে গেলেন!
আমার গল্প প্রেমিকদের অন্তরকে রক্তাক্ত করেছে,
পাঠকগণকে শেষ পর্যন্ত পাগল বানিয়েছে।
যদি কারো হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বলে
সে আগুনের দহন হৃদয়কে ছারখার করে দেয়।
আমার বন্ধুদের জন্য একটি গল্প প্রেরণ করছি
গল্পটি আমার ভাগ্য বিড়ম্বনা আর সমকালীন সময়ের সংসারযাপনের গল্প।

২. সিম্বলিজম : ফরাসি সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এর উদ্দেশ্য হলো- কবিতায় অবশ্যই সামগ্রিকভাবে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকবে এবং বিশ্ববাসী এর ফল ভোগ করবে। তবে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে এবং একটি ছন্দের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয়ত : কোনো বস্তুর সশরীরী অস্তিত্ব না থাকলেও এর উপাদান পাওয়া যাবে। সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে নিমার আফছা'নেহ (রূপকথা)-তে এটি প্রতীয়মান। কবিতাটিতে লক্ষ করলে দেখা যায় একাকিত্বের মাঝে ক্ষমার যে মহান সৌন্দর্য বিরাজমান সেটা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি কবিতার সুর ও ছন্দকে নতুন আঙ্গিকে সাঁজিয়েছেন এবং তাঁর এই গভীর বিচ্ছিন্নতাবোধকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সম্পূর্ণ এককভাবে পৌঁছে দিয়েছেন (কামিয়ার, ১৯৯৮, পৃ. ১৬)। কবি নিজেই আফছা'নেহ- এর সংজ্ঞায় বলেন :

تو یک قصه ای؟ آری آری
قصة عاشق بی‌قراری
ناامیدی، پر از اضطرابی
که به اندوه و شب زنده داری
سال‌ها در غم و انزوا زیست.
(সিরুছ, ১৯৯৬, পৃ. ১৫)

তুমি কি একটি গল্প? হ্যাঁ হ্যাঁ
চঞ্চল-অস্থির প্রেমিকের গল্প
আশাহীন মানসিক অস্থিরতায় পরিপূর্ণ
দুঃখ-কষ্টে রাত্রী হয় জীবন্ত
বছরগুলো কাটে চিন্তায় আর
সন্নাসির ন্যায় অনন্ত।

এই আফ্ছানেহটিতে কবি কখনো আশ্‌কে চেশ্‌ম বা চোখের অশ্রুবর্ষণ করেছেন, আবার কখনো এশকে ফা'নি কোনান্দে বা ধ্বংসশীল প্রেমের জন্য হাহাকার করেছেন।

৩. পা'রনা সিজম : এতে সাহিত্যিক মতাদর্শের একটা প্রধান বিষয় হলো- হোনার বারা'য়ে হোনার (শিল্পের জন্য শিল্প), যা নিমা অনুমোদন করেননি, তবে মাঝে মাঝে ঐ সুনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ যেমন- পূর্বোক্ত কবিদের ন্যায় হতাশা, নিরাশা, আশাহীনতা ও নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিমার কবিতায়ও প্রতিফলিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি অবশ্যই খোলামেলা ও প্রকৃতিগতভাবেই চিত্রাবলি স্মরণ করেছেন। আর এ কারণেই কবি আফছা'নেহকে বিষাদগ্রস্ততার প্রতিকৃতি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কবিতাটি পাঠ করলে মনে হবে যেন তিনি একটি সমাধিতে বসে আছেন এবং চোখ দিয়ে রক্তের অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। তার এক হাতে বীণা আর অপর হাতে শরাবের পেয়ালা। এটা জার্মান কবি আলফ্রেদ দোভিনী-এর অনুকরণে লিখিত বলেই গবেষকগণ রায় দিয়েছেন (কামিয়ার, ১৯৯৮, পৃ. ১৬)। সেই সময়ে আফছা'নেহ-এর প্রচণ্ড বিরোধিতা এর স্বীকৃতির মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়।

নিমা ইউশিজের প্রথম কবিতা *কেসসেয়ে রাংগে পারিদে* (বিবর্ণ রঙয়ের গল্প) হল- আত্মার স্পন্দন ও অনুভূতি- যা নিমা ২৭ বছর বয়সে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেছেন। এটা সুস্পষ্টত যে, তিনি কবিসুলভ প্রতিভা দিয়ে সমস্যার জটিল ঘূর্ণাবর্তে থেকেও চেষ্টা করেছেন এর প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে। সাহিত্যিক পর্যালোচনা ও প্রভাবের দিক থেকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, এটি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমির মসনবী বিশেষত 'নেই না'মেহ'-এর নিমায়িক রূপ। যেখানে কবি তাঁর তথা সমগ্র বিশ্বমানবের হৃদয়ের যে অন্তঃসারশূন্যতা সেটিকে কাব্যিক ছন্দমালায় তুলে ধরেছেন, যা থেকে প্রেম-বিরহের এক মর্মস্পর্শী অন্তর্জ্বালা ভেসে আসছে। (কামিয়ার, ১৯৯৮, পৃ. ১৪)

'কেসসেয়ে রাংগে পারিদে' ফারসি সাহিত্যে একটি পরিপূর্ণ ও নবতর কাব্য সংযোজন। এ কল্পকাহিনিটি কবির নিজস্ব ব্যথাবেদনা- যা বাগ্মিতা ও বাকপটুত্বের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ; যেখানে কবি উপচে পড়া কল্পনা ও প্রবাদ-প্রবচন আর উদ্ধৃতির অসামান্য সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এটিকে কেবল নিদারুন মর্মপীড়া বা চরম দুর্দশাগ্রস্ত কাব্য বলা যাবে না; বরঞ্চ একজন কবির অতীত ঘটনার বাস্তব কথোপকথন, অনুভূতির এক সুতীব্র যাতনা, যা সমস্যার জটিল ঘূর্ণাবর্তে ও দুনিয়ার অগ্রহণযোগ্য জীবনপ্রণালীতে পরিপূর্ণ, ক্লান্ত ও ভগ্ন-মনোরথে ভরা; যেখানে উপচে পড়া ভণ্ডামি ও কপটতাগ্রস্ত নগর জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কবি তাঁর কবিসূলভ সুপ্ত চিন্তা-চেতনা ও কল্পনা দ্বারা একান্ত নিজস্বতা থেকে বাঁচার পথ অন্বেষণ করেছেন এবং পরিত্রাণ চেয়েছেন। কবির উপলব্ধি :

هر کجا بودم ، به هر جا می‌شدم
بود آن همراه دیرین در پیم
من نمی دانستم این همراه کیست
قصدش از همراهی در کار چیست ؟
بس که دیدم نیکی و یاری او
مار سازی و مددکاری او
گفتم : ای غافل بباید جست او
هر که باشد دوستار توست او
شادی تو از مدد کاری اوست

بازپرس از حال این دیرینه دوست
گفتمش : ای نازنین یار نکو
همرها ،تو چه کسی ؟ آخر بگو
کیستی؟ چه نام داری؟ گفت: عشق.
(সিরুছ, ১৯৯৬, পৃ. ১৮)

আমি যেখানেই থাকি বা যেখানেই ছিলাম (তোমাকেই খুঁজি)
তোমার সঙ্গেই আমার বন্ধন ছিল
আমি জানতাম না; এই সঙ্গী কে?
আর তার ইচ্ছেটাই বা কী?
তবে আমি তার মাঝে বন্ধুত্বের সৌন্দর্য অবলোকন করেছি,
দেখেছি কল্যাণকামিতা, সাহায্য করার চারিত্রিক উৎকর্ষতা,
(নিজেকে) বললাম : হে অলস মন। তাকে অনুসন্ধান কর,
যা কিছুই হোক পরিশেষে সে তোমারই বন্ধু।
তোমার আনন্দ তার মধ্যে নিহিত
ঐ দীর্ঘদিনের বন্ধুর সন্ধান কর
তাকে বললাম : হে সুহৃদয়া বন্ধু; আমার সঙ্গী
পরিশেষে অন্তত এটা বল,
তুমি কে? কী নামই বা তোমার? বলল : প্রেম।

এভাবেই নিমা তাঁর আফছা'নেহগুলোতে মানবীয় প্রেম ও মনুষ্যত্বের বিরল স্বভাবগুলো কল্পনার অনুভূতি ও অনবদ্য সৃষ্টিশীলতার মিশ্রণে কাব্যিক ছন্দমালায় লিপিবদ্ধ করেছেন।

নিমার কাব্যে সমাজ-দর্পণ

কল্পনার আড়ালে নিমা মূলত তৎকালীন ইরানের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত স্বৈরশাসনের স্থির প্রতিবিম্বগুলো তুলে ধরেছেন। নিমা নিজের কল্পনার ওপরে সর্বপ্রথম যে কবিতা রচনা করেন তা হলো- *এই শ'য়েরে জাভা'ন* (হে তরুন কবি)। যা বিশ শতকের পত্রিকা *মীর যাদেহ্ এশক্বি*-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই কবিতায় দুটো বিষয়ের অবতারণা করা হয়।

ক. নিমার একক উদ্দেশ্য ছিল ভাষার স্বাধীনতা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা।

খ. অপর উদ্দেশ্যটি হলো তাঁর কবিতায় প্রকৃতি ও প্রকৃতির গুণাবলির বর্ণনা। যেখানে তিনি পরিপূর্ণভাবে প্রকৃতির অর্থ ও প্রত্যেকটি বস্তুর নির্দিষ্ট প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন : কোন সৌন্দর্যই কবি এবং কবিতার জন্য সমুন্নত নয়; যা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির বর্ণনা দিতে সক্ষম হবে এবং প্রকৃতির অর্থকে সহজভাবে তুলে ধরবে।

নিমা ইউশিজের চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর কবিতাগুলোর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা *ক্বোক্বনুস* (Phonix) বা রূপকথার কাল্পনিক পাখি। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে নিমা তাঁর বিখ্যাত *ক্বোক্বনুস* কবিতাটি লিখেন। এটির আকৃতি ও বর্ণনায় ছিল নতুনত্বের ছোঁয়া। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, নিমা ফরাসি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত ছিলেন আর ফরাসি কবিতার বৈশিষ্ট্য হলো রোমান্টিসিজম ও সিম্বলিজমের ব্যবহার। *ক্বোক্বনুস* মূলত একটি ইশারা-ইঙ্গিত মূলক সিম্বলিজম ধারার কবিতা। কবিতায় কবি নিজেকে আগুনের লেলিহান শিখায় নিক্ষেপ

করে ছাইভস্মে পরিণত হতে চান; যেন ছাইরূপী কবির চিন্তা-চেতনাগুলোকে অনুসরণ করে প্রতিটি যুবক কবি এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই কবিতা দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়। (ইয়াহিয়া, ২০০৩, পৃ. ৩১৮)

এ কবিতার মাধ্যমে কবি শুধু নিজের দিকেই ইঙ্গিত নয়, অন্যান্য কবিগণকেও সম্বোধন করেছেন। তাঁদের জন্য অপেক্ষারত ললাটের ভাগ্যলিপি সম্বন্ধেও পূর্বাভাস দিয়েছেন। *ক্বোক্বনুস*- এর পটভূমি প্রসিদ্ধ কবি আত্তারের মানতেকুত তায়ের থেকে সংকলন করা হয়েছে। তবে নিমা *ক্বোক্বনুস* দ্বারা নিজেকে তার মধ্যে কল্পনা করেছেন এবং তা ব্যাখ্যা করেছেন। আর *ক্বোক্বনুস* ঐ সকল পাখি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, যেসব পাখি চিন্তায় বিভোর থাকে।

ققُنوس، مرغ خوش‌خوان، آوازه‌ی جهان،
آواره مانده از وزش بادهای سرد،
بر شاخ خیزران،
بنشسته‌است فرد.
بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
(তাকিপুরনাম, ১৯৯৮, পৃ. ১১৮)

ক্বোক্বনুস! কোকিল কণ্ঠী সুরেলা পাখি! বিশ্বজোড়া যার সুরের খ্যাতি
সে বসে আছে ভগ্ন-মনোরথে, কনকনে হিমশীতল বাতাস সহ্য করে!
নড়বড়ে ডালে,
একাকী নিঃসঙ্গ মনে,
চারপাশে ডালে-ডালে অসংখ্য পাখির মাঝে বিষণ্ন হৃদয়ে!

এই কবিতায় নিমা এক অনবদ্য চরিত্র অংকন করেছেন। অন্যান্য পাখিরা নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে, অপেক্ষা করছে এবং সূক্ষ্মভাবে লক্ষ রাখছে যে, এই প্রসিদ্ধ সুরেলা পাখিটি কতটা সুমধুর গান গাইছে! কতটা সুন্দর গীত রচনা করছে! 'বা'দ হা'য়ে সারদ' (শীতল বাতাস) দ্বারা 'দাম'হা'য়ে সর্দ' (নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শীতলতা) বুঝানো হয়েছে। ইঙ্গিত করা হয়েছে রুক্ষ, কর্কশ ও বিষাদগ্রস্ত কেউ হয়ত তার সুমিষ্ট গলার সংগীতের সমালোচনা করছে এবং অন্তর দিয়ে কেউ উপলব্ধি করছে না। ক্বোক্বনুস তথা কবি ঐ অবস্থা থেকে (তৎকালীন সমাজব্যবস্থা) দূরে রয়েছেন। যারা পুরাতন সংগীত (প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা) আঁকড়ে আছে বা পথ হারিয়েছে (বিবেক ঘুমিয়ে রয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গ) অথবা অপরিচিত ব্যক্তি (যারা পূর্বে সমাজসচেতন ছিলেন), তাদের জন্য ক্বোক্বনুসের সুমিষ্ট সংগীত রচিত হয়েছে। ক্বোক্বনুস অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে তাঁর আওয়াজকে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিচ্ছে। যার ফলে সকল আশার পথ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং কেউ আর্তনাদরূপী অচেনা এই সুরটিকে একত্র করতে পারেনি। এই আর্তনাদকে হেমন্তের মেঘমালার মধ্য দিয়ে কবি জীবনবোধের খেয়ালি কল্পনার এক প্রতিচ্ছবি তৈরি করেছেন, যা ফারসি সাহিত্যে পূর্বে কেউ দেখেনি। (তাকিপুরনাম, ১৯৯৮, পৃ. ১১৮)

او ناله هایِ گمشده ترکیب می‌کند،
از رشته‌هایِ پارهٔ صدها صدایِ دور،
در ابرهایِ مثلِ خطّی تیره رویِ کوه،
دیوارِ یک بنایِ خیالی
می‌سازد
(তাকিপুরনাম, ১৯৯৮, পৃ. ১১৮- ১১৯)

ক্কোক্নুস! হারিয়ে যাওয়া বেদনার স্মৃতি রোমন্থন করছে,
সুরগুলো পুরনো সুতোর মত দূরদূরান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে,
দিগন্তের মেঘগুলো দূর পাহাড়ের অদৃশ্য অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে
কল্পনার অলিখিত এক দেয়াল গড়ে উঠছে!

এখানে কল্পনার এক অসাধারণ চিত্র অঙ্কন করেছেন নিমা, রাতের সুর সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে, হলুদাভ সূর্যের প্রভা বিক্ষুদ্ধ সাগরের উর্মিমালায় বিলীন হচ্ছে আর শৃগালের ডাক উপকূল তীরবর্তী এলাকাকে গ্রাস করছে! গ্রামের লোকেরা মিটমিটে আগুন দ্বারা বাড়িকে আলোকিত করছে, ক্ষুদ্র আগুনের হল্কায় চোখগুলো রক্তিম দেখাচ্ছে, দু'চোখের নিচে বিভীষিকাময় বৃহৎরাত্রির এক চিত্র এঁকে দিচ্ছে; দূরের অনবদ্য এক চিত্র অতিক্রান্ত হচ্ছে। ক্কোক্নুস আলোতে দাঁড়িয়েছে এবং অন্ধকারের কোন ভাবলেশ তার মধ্যে নেই। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে শুধু গ্রামের লোকেরা তাদের জীর্ণশীর্ণ গৃহগুলো আলোকিত করছে; তবে আগুনের এই আভা সুপ্ত এবং স্পষ্টত নেই বললেই চলে। গ্রামের লোকদেরকে নিমা মূলত জীবনধারণের বাস্তব প্রতিচ্ছবি হিসেবে পরিগণিত করেছেন। ঠান্ডা হিমশীতল তিমিরাচ্ছন্ন রাতে তাঁর কবিতাই একমাত্র আগুন, যার উষ্ণতা ও আলো রয়েছে, তবে তাদের চোখগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত। কেননা বলা হয়েছে যে, শুধু শৃগালের ডাক ব্যতীত এই রাতে টিকে থাকার মত পর্যাপ্ত শক্তি নেই; যে শৃগালটি ইচ্ছে করলেই রাতের সর্বোচ্চ সীমাকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। কোন ব্যক্তিও ইচ্ছে করলেই এই রাতকে অতিক্রম করতে পারে না। তাই সকল বস্তুই নিশ্চুপ ও মৃত, বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন হল ঐ ছোট্ট রক্তিম আভা– যা সময়ের হাতে নিমজ্জিত (এখানে 'সময়ের হাত' দ্বারা মূলত তৎকালীন স্বৈরশাসকের কার্যকলাপ সমাপ্তির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে) আর তার চরিত্রই হল (সময়ের হাতের) সেখানেও হস্তক্ষেপ করা এবং তার অপকর্ম অব্যাহত রাখা। মূলত স্বৈরশাসনের এক ভয়াল অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ তৎকালীন ইরানি সমাজকে গ্রাস করে রেখেছিল। বর্তমান সময়ের অব্যক্ত হতাশা-ক্রন্দন অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে এই কবিতায় ফুটে উঠেছে। এই কবিতার মধ্য দিয়েই নিমার কাল্পনিক যুগ শুরু হয় এবং নিমা ও তাঁর অনুসারীরাও এই ভঙ্গিমায় কাব্য রচনা শুরু করেন। নিমার এ ধারার উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো হলো- *গোরা'ব* (দাঁড়কাক), *মোরগে গাম* (চিন্তার পাখি), *ভা'ই বার মান* (হায় আফসোস), *খা'বে যেমেস্তা'নি* (শীতঋতুর নিদ্রা), *মোরগে আমিন* (বিশ্বস্ত পাখি), *না'ক্কুস* (ঘন্টার ধ্বনি), *ক্বা'য়েক্ব* (নৌকা), *বারা'য়ে দেলহা'য়ে খুনিন* (রক্তাক্ত হৃদয় সমূহের জন্য), *খা'নে আম আবরিস্ত* (মোর মেঘাচ্ছন্ন গৃহ) ইত্যাদি।

নিমার কল্পনার আরেকটি প্রতিচ্ছবি হচ্ছে *মোরগে গাম* (চিন্তার পাখি) নামক কবিতাটি। এখানে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পাখিটি হলেন– দুশ্চিন্তাগ্রস্থ কবি নিজেই; প্রতি মুহূর্তে কবিকে দুশ্চিন্তায় গ্রাস করছে, এই কবিতায় কবি তাঁর দুশ্চিন্তাকে একত্র করেছেন এবং অপরের দুশ্চিন্তাকেও তুলে ধরেছেন। তিনি শুধু একাকী নিজের আত্মিক কল্পনা ও অনুভূতি নয় বরং অপরের সঙ্গেও সাদৃশ্যপূর্ণ দুঃখ-দুর্দশাগুলো প্রকাশের অভিপ্রায় করেছেন; যা এই কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর এভাবেই কল্পনায় সমাজের দুঃশাসন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন (মারয়াম, ২০০২, পৃ. ১২৩)। কবি বলছেন :

چون دود رفته بر زبر، روی این دیوار غم،
دائماً بنشسته مرغی، پهن کرده بال و پر،
که سرش می جنبد از بس فکر غم دارد به سر.
پنجه هایش سوخته؛

زیر خاکستر فرو،
خنده ها آموخته؛
لیک غم بنیاد او.
(সিরুছ, ১৯৯৬, পৃ. ২২৫)

এই বিষাদময় দেয়ালের ওপর দিয়ে যেন বয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার মেঘমালা,
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় বসে আছে একটি পাখি, মেলে আছে পালক ও ডানা
সে তার মাথা দুলিয়ে বুঝাতে চায় সেখানেও
আছে অন্তহীন বিষণ্নতা।
তার ছানাগুলো পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে;
ঠাঁই হয়েছে জ্বলন্ত ছাইয়ের নিচে,
সে হাসতে জানে;
কিন্তু বিষাদই যেন তার বুনিয়াদ।

ভা'ই বার মান (হায় আফসোস) কবিতাটি নিমার একটি চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী কাব্য। যেখানে সর্বত্র নিমার চিন্তাগুলো হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছে। দেশের সর্বত্র হত্যাকাণ্ডের এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজমান, এটিই চিত্রিত হয়েছে এই কবিতায়। বিজয়ের সঙ্গে শত্রুর ছায়া বিভীষিকাময় রাত্রির ন্যায় গ্রাস করছে। জুলুম আর অত্যাচার পুনরায় দেশকে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে, আর এই শত্রুরা এমন স্বৈরাচারী এবং তাদের বিচার ব্যবস্থা এতটাই দুর্নীতিগ্রস্ত যে, তারা ঢালাওভাবে দমন-পীড়ন, গ্রেফতারি পরোয়ানা, ভিন্ন মতাবলম্বীদের সমূলে মূলোৎপাটন করতে চাইছে, যার মাধ্যমে তারা তাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। আর এজন্য তারা বিভিন্ন অজুহাতে মানসিক ও শারীরিক কষ্ট, যন্ত্রণা ও নিপীড়নের এক স্টিমরোলার চালাচ্ছে। তাদের গৃহে অত্যন্ত সুকৌশলে গোয়েন্দা পাঠিয়ে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। গোয়েন্দারা তাদেরকে জীবিত অবস্থায় ধরে এনে দিনে-দুপুরে রাজপথকে রক্তাক্ত করছে অথবা কখনো কখনো সরকারের অনুগত চরেরা তাদের শারীরিকভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন করছে। কবি এসব দেখে বিষন্নতায় ডুবে যেতেন আর হতাশাগ্রস্ত জীবনের অবসান কামনা করতেন (ইয়াহিয়া, ২০০৩, পৃ. ৩০৮)।

وای برمن! می‌کند آماده بهر سینه‌ي من تیرهائی
که به زهر کینه آلوده ست.
پس به جاده‌های خونین کلّه‌های مردگان را
به غبار قبرهای کهنه اندوده
از پس دیوارمن بر خاک می‌چیند
وز پی آزارِ دل آزردگان
در میان کلّه‌های چیده بنشیند
سر گذشت زجر را خواند.
وای برمن!
(সিরুছ, ১৯৯৬, পৃ. ২৩৪)

হায় আফসোস! আমাকে অন্ধকারে ঢেলে দেওয়ার সকল
আয়োজন-ই সম্পন্ন করেছে তারা!
তাদের হিংসায় যেন বিষমাখা।
এরপর রক্তাক্ত রাজপথে মরদেহের মস্তকগুলোকে পুরোনো
কবরের মাটিতে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।
যে মাটি প্রাচীনত্বের ভারে নুয়ে পড়েছে

এরপর আমার গৃহের দেয়াল মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে,
ব্যথিত হৃদয়গুলোকে অনবরত ব্যথায় ভারাক্রান্ত করা হচ্ছে !
পড়ে থাকা মস্তকগুলোকে জমা করে তার উপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে,
নিষিদ্ধ জগতকে নিজের হাতে তুলে নেয়া হয়েছে,
হায় আফসোস !

নিমা ইউশিজের এই কবিতাটির সঙ্গে টি.এস.এলিয়টের ম্যাকাভিটি : দ্য মিস্ট্রি ক্যাট (রহস্যময় বিড়াল) কবিতাটির এক আত্মিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই কবিতায় টি.এস. এলিয়ট একটি রহস্যময় বিড়ালের রূপকে বলতে চেয়েছেন; কোন দুষ্কর্মের মূল হোতা বরাবরই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। আমরা নিশ্চিত টের পাই অপকর্মটি তার, কিন্তু তাকে ধরতে পারি না।

ম্যাকাভিটি, ম্যাকাভিটি-তার কাছে দুনিয়াতে হেয় আর সব
বিড়ালের ছদ্মবেশে সে এক জঘন্য পশু নষ্টামির দুরন্ত দানব।
তাকে তুমি দেখে থাকবে অলিতে গলিতে কিংবা প্রকাশ্য স্কোয়ারে
দুষ্কর্ম ঘটার পর সেখানে সে আর নেই, সটকে পড়ে খুব চুপিসারে।
আপাত শ্রদ্ধেয় সে-ও (লোকে বলে ফাঁকি দেয় তাসে)
পদচিহ্ন রাখে সে পুলিশের নথিপত্রে, মিলায় বাতাসে।
(*দৈনিক প্রথম আলো*, ২০০৪)

না'কুস (ঘণ্টার আর্তনাদ) কবিতার মাধ্যমে নিমা আশাবাদী হয়েছেন যে, দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধিত হবে। নিমা 'সাহরগা'হ' (প্রভাত) দ্বারা কল্পনার আড়ালে এক ঐতিহাসিক সময় আগমনের আগাম আভাস দিয়েছেন। যদিও প্রকৃতি কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ ছাড়াই তার আলো বিতরণ করে; কিন্তু মানব জীবনের এই ঘোরতর অন্ধকার থেকে সামগ্রিকভাবে স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ ও বিবেকবান মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টাই হতে পারে মুক্তির একমাত্র উপায়। তিনি এই কবিতায় জনগণকে সকল প্রকার অলসতা, সমাজ বিমুখতা, অসচেতনতা, গোঁড়ামির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন এবং নতুন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে বলেছেন। কবির প্রত্যাশা না'কুস মানুষকে যেমন জাগ্রত করবে; তদ্রূপ সচেতনও করে তুলবে। এ কারণেই নিমা ঘণ্টার আর্তনাদকে 'দেলকেশ' (চিত্তাকর্ষক) শব্দটি দ্বারা বিশেষায়িত করেছেন। নিমা ঘণ্টার আর্তনাদ দ্বারা দূরের শূন্য, উন্মুক্ত ও নিশ্চুপ প্রভাতের স্বাধীন মোরগ (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রমনা দেশ) বলে সাদৃশ্য করেছেন। (জাফর, ১৯৯৬, পৃ. ১০০)

না'কুস কবিতাটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- এর মধ্যে ১২টি ছত্র বা বন্ধনী রয়েছে এবং প্রতিটি বন্ধনীতে ঘণ্টার আর্তনাদকে মূল উপজীব্য করা হয়েছে। একেকটি রাতকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রহর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর শেষের ছত্র অর্থাৎ দ্বাদশতম অংশে রাত্রির অবসানের এক বিমূর্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। যেখানে আমরা কবিকে আশাবাদী এক মানুষের আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হিসেবে দেখতে পাই। এ হিসেবে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, না'কুস একটি সার্থক ও কল্পনার সুউচ্চ-আকাঙ্ক্ষা। কবিতাটিতে শাব (রাত) দ্বারা বিপ্লব পূর্ব সামাজিক জুলুম, ফ্যাসাদ, স্বৈরতন্ত্র, অন্যায় শাসনের চিন্তা-চেতনার নিকষ অন্ধকারের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অপরদিকে রুয (দিন)- দ্বারা বিপ্লব পরবর্তী সৌভাগ্যশালী, সমৃদ্ধশালী, সত্যপ্রকাশে স্বাধীন, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতীকি অর্থ তুলে ধরা হয়েছে (সিরুছ, ১৯৯৬ : ৩৩৮)। এ ধারার অন্যান্য কবিতা হলো- *খারুস মি খা'নাদ*,

পা'দশা'হে ফাতহ্, বেশা'রাত ইত্যাদি। কল্পনা ও প্রকৃতির অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ নিমার কবিতাকে প্রাণবন্ত ও মোহময় করেছে। তিনি শুধু নৈরাশ্যবাদ ও হতাশাকেই প্রাধান্য দেননি বরঞ্চ এই দুর্যোগময় পরিস্থিতি উত্তরণেরও আহবান জানিয়েছেন-

اي ستمديده مرد! شو بيدار
رفت نحسيِ قرن ها بر باد
نحسيِ بخت، اين زمان بشکست
به گدايان همه، بشارت باد.
(সিরুছ, ১৯৯৬, পৃ. ১৫৩)

হে নিপীড়িত মানুষ! জেগে ওঠো!
অশুভ ছায়ার কালো মেঘ শতাব্দীর পর শতাব্দী বরবাদ করে দিয়েছে
ভাগ্যের অশুভ ছায়ার পথ মাড়িয়ে সৌভাগ্যের ডানা মেলতে শুরু করেছে,
বঞ্চিত-নিপীড়িতদের প্রতি আমার সুসংবাদ।

নিমার সমগ্র কল্পনায় কাব্যিক ভাবধারা প্রকাশমান ও শৈল্পিক প্রতিচ্ছবির সৃষ্টিশীলতা বহমান। বিষয়বস্তুর সূক্ষ্ম-চুলচেরা বিশ্লেষণ, বিশেষত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিশেষ পরিকল্পনা এবং সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি তাঁকে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে একজন অতুলনীয় ও উপযুক্ত গল্প বর্ণনাকারী হিসেবে স্থান দেয়া হয়েছে।

উপসংহার

ফারসি কাব্যজগতে নতুন পথের অগ্রনায়ক এবং 'আধুনিক ফারসি কবিতার জনক' নামে খ্যাত কবি নিমা ইউশিজ ৬২ বছর বয়সে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তেহরানে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর কবিতায় সমাজ জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত আর বৃহৎ সমস্যাবলিকে অদ্ভুত চাতুর্যে, অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে, কল্পনার বেড়াজালে, চিত্রকল্পের যথোপযুক্ত ব্যবহারে, সূক্ষ্ম অথচ ধারালো চিত্র অঙ্কন করেছেন। জীবনবোধ ও বিবেক তাঁর কবিতার প্রথম ও শেষ দর্শন। জীবন যেখানে অসাড়, মানব-সমাজ সেখানে ঘূণে ধরা জীবন্ত কংকাল। নিমার প্রতিটি কবিতা সেই আর্তনাদকে প্রমাণ করে। সে আর্তনাদ মুক্তি চায়, নিরাশার অতল গহীনের সিঁড়ি অতিক্রম করে আশার আলোকে বুক বাঁধে। হতাশাকে পেছনে ফেলে ইতিবাচক সমাজ বিনির্মাণে অগ্রসর হওয়ার স্বপ্ন দেখায়। এ স্বপ্নের আহবান নিরন্তর, সর্বজনীন ও সর্বকালীন। কারণ নিমা ইউশিজের কবিতার সারমর্ম দেশকাল ও জাতিভেদ করে কালোত্তীর্ণ। তাই এখনও আমরা তাঁর কবিতার মর্মবাণী উপলব্ধি করি সবসময়। কালিক ও স্থানিক দূরত্ব অতিক্রম করতে পারলেই সে কবিতা স্বার্থক হয় এবং কবি হয়ে উঠেন সর্বজনীন। কবি নিমা ইউশিজের কবিতা এখানেই বিশিষ্টতার দাবি রাখে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. ক্বোকৃনুস : একটি কাল্পনিক পাখি, যার গলার আওয়াজ সুমধুর এবং দেখতে মনোহরিণী। অন্যান্য পাখির চেয়ে চারিত্রিক দিক থেকেও ব্যতিক্রম। যেমন- যখন তার বয়স ক্রান্তিলগ্নে উপণীত হতে থাকে তখন সে আগুন জ্বালাবার উপকরণ সংগ্রহ করে তার উপর বসে সুমিষ্ট সুরে গান গায়। গান শুনে অন্যান্য কোকৃনূস তার সাথে ঘুরতে থাকে। ডানা ঝাঁপটাতে থাকে, এক ঠোঁট অন্য ঠোঁটের সঙ্গে ঘষতে থাকে, ঐ ঠোঁট ঘষার দ্বারা আগুনের সৃষ্টি হয় এবং ঐ আগুনে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে অবশেষে মারা যায়। ছাই থেকে ডিম হয় এবং ডিম থেকে বাচ্চা হয় (জাফর ইয়াহাকি, চুন সাবুয়ে তেশনে, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৭)।

২. সৌরবর্ষ : বর্তমান ইরানে প্রচলিত সৌরবর্ষের সঙ্গে ৬২১ যোগ করলে খ্রিষ্টাব্দ পাওয়া যায়। আবার যদি আরবি হিজরি কামারি সন বের করার চেষ্টা করা হয়, তবে খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬২২ বিয়োগ করে ৩৩ দ্বারা গুণন করতে হবে। অতঃপর প্রাপ্ত ফলাফলকে ৩২ দ্বারা ভাগ করলে হিজরি কামারি বা আরবি সন পাওয়া যাবে। আবার খ্রিষ্টাব্দ বের করতে চাইলে আরবি হিজরি কামারি সনের সঙ্গে ৩২ গুণন করতে হবে, অতঃপর ৩৩ দ্বারা ভাগ করে যে ফল পাওয়া যাবে, সেটাকে ৬২২-এর সঙ্গে যোগ করলেই খ্রিষ্টীয় বর্ষ পাওয়া যাবে।

৩. কাজার রাজবংশ : ১৭৮৯ থেকে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইরানে শাসন করে। পাহলাভি বাদশাহ রেযা খান তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইংল্যান্ডের সাহায্যে কাজারিদের উৎখাত করেন। ইরানের ইতিহাসে এই রাজবংশ অনেক আধুনিক বিষয় যুক্ত করলেও এ যুগের সবচাইতে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে ইরানের উত্তরাঞ্চলের জর্জিয়া, আজারবাইজান, আর্মেনিয়ার মত অসংখ্য মূল্যবান দেশসহ ১৭ টি অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে যায়।

উল্লেখপঞ্জি

ইয়াহিয়া আরিয়ানপুর (২০০৩)। *আয নিমা তা' রুযেগারে মা'* (তারিখে আদাবে ফারসি মোআসের)। যাভভার প্রকাশনী, তেহরান।

কামইয়ার আবেদি (১৯৯৮)। *তাআম্মোলাতি দার মানযুমেয়ে আফসা'নেয়ে নিমা, বে মোনাছেবাত হাফতা'দোমিন সা'ল সারা'য়েশে অন : হাফতা'দ সা'ল বা' আফসা'নেহ*। আদাবেস্তা'ন [সম্পা. বাসিদ আহমাদ সাম], তেহরান।

কামইয়ার আবেদি (২০১৭)। *মোকাদ্দেমেয়ে বার শেরে ফারসি দার সেদ্দেয়ে বিসতোম মিলাদি।* মোআছছেছে ফারহাঙ্গি হোনারি জাহানে কেতাব প্রকাশনী, তেহরান।

কায়সার আমিনপুর (২০০৪)। *সোন্নাত ভা নো অভারি দার শে'রে মোআ'সের*। এলমি ভা ফারহাঙ্গি প্রকাশনী, তেহরান।

গোলাম হুসাইন ইউসুফি (১৯৯৯)। *বারগহা'য়ে দার অগুশে বা'দ*, তৃতীয় প্রকাশ। এলমি প্রকাশনী, তেহরান।

তাকিপুরনাম দারিয়ান (১৯৯৮)। *খা'নে আম আবরিস্ত* (শে'রে নিমা আয সোন্নাত তা' তাজাদ্দোদ)। মোরভারিদ প্রকাশনী, তেহরান।

মারয়াম খালিলিজাহান তিগ (২০০২)। *রেওয়ায়েত দার শে'রে নিমা*। দানেশ [সম্পা. ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র], পাকিস্তান।

মোরতাযা কাখি [সম্পা.] (২০০৯)। *রোওশান তার আয খামুশ* (বার গোযিদেয়ে শেরে এমরুযে ইরান)। মোআছছেছে অগাহ প্রকাশনী, তেহরান।

মোহাম্মদ কাযেম কাহদুয়ী (১৯৯৬)। *ইরানের সমকালীন কবি নিমা ইউশিজ*। নিউজ লেটার [সম্পা. সিরাজুল ইসলাম] ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।

মোহাম্মদ জাফর ইয়াহাকি (১৯৯৬)। *চুন সাবুয়ে তেশনে*, দ্বিতীয় সংস্করণ। জামি প্রকাশনী, তেহরান।

সাইদ হামিদিয়ান (২০০২)। *দা'স্তা'নে দেগার দিছি* (রাভান্দে দেগার গুনিহায়ে শেরে নিমা ইউশিজ)। নিলুফার প্রকাশনী, তেহরান।

সিরুছ তাহবাজ (২০১০)। *মাজমুয়ে কামেলে আশ্আরে নিমা ইউশিজ*, চতুর্থ মুদ্রণ। নেগাহ প্রকাশনী, তেহরান।

দৈনিক প্রথম আলো (২০০৪)। *টি.এস.এলিয়টের ম্যাকাভিটি: দ্যা মিস্ট্রি ক্যাট* (রহস্যময় বিড়াল), ২৭ আগস্ট, ঢাকা।

Echo of Islam (1999). *Nima Youshij : Father of Modern Persian Poetry*. August, Tehran, Iran.

J Issacs (1982). *The Back Ground of Modern Poetry* (বাংলা অনুবাদ : হুমায়ন কবির)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

John L Esposito (1995). *The oxofrd Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Voll-3. Oxford University Press.

নিমা ইউশিজের লেখা এসব সমারোচনা ও পর্যালোচনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর গ্রন্থ আয়যেশে ইহসা'সাত ভা পাঞ্জ মাক্বালেয়ে দিগার (অনুভুতির মূল্য ও অন্য পাঁচটি প্রবন্ধ)-এ দেখা যেতে পারে।

স্পেনের উমাইয়া ও ফাতেমি সম্পর্ক : আর্থ-সামাজিক প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান*

সারসংক্ষেপ : রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মুসলমানদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসারণ করলেও তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিরাজিত থাকে। সপ্তম শতাব্দীতে মদিনায় হজরত মুহাম্মদ (সা.) যে ঐক্যের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার খিলাফত নিয়ে মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক সময় মুসলিম বিশ্বে তিন কেন্দ্রে–বাগদাদ, মিশর, স্পেনে তিন খিলাফত বিরাজিত থাকে। স্পেনের উমাইয়া এবং উত্তর আফ্রিকা ও মিশরের ফাতেমিদের পারস্পরিক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেনি। জিব্রাল্টার প্রণালীর দুই তীরে গড়ে ওঠা দুই খিলাফত ভৌগোলিকভাবে পরস্পরের মুখাপেক্ষী ছিল। প্রাচীনকাল থেকে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালু ছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দুই বংশের তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না; তারা সুদীর্ঘকাল থেকে চলমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে বজায় রেখেছিল। ফলে সেসময় এ অঞ্চলের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল।

খুলাফায়ে রাশেদুনের পর খিলাফত যে বিভক্তি প্রক্রিয়ায় পতিত হয় তাতে ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনে আবদুর রহমান আদ-দাখিল কর্তৃক স্বাধীন উমাইয়া আমিরাত প্রতিষ্ঠিত হয়, যা পরবর্তীকালে খিলাফতে রূপ নেয়। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় উবায়দুল্লাহ আল-মাহদির মাধ্যমে শিয়া ফাতেমি খিলাফত যাত্রা শুরু করে। মূলত মহানবীর (সা.) উফাতের পর সমগ্র মুসলিম বিশ্ব খিলাফত ও ইমামত প্রশ্নে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে একটা দল হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর চাচাত ভাই ও জামাতা হজরত আলি (রা.) ও তাঁর পরিবারের পক্ষে খিলাফতের শক্তিশালী দাবি উত্থাপন করে। উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তারা তাদের দাবি প্রতিষ্ঠা করে। সুন্নি খিলাফতের মধ্যে শিয়া ফাতেমি খিলাফতের প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেগবান হয়। অপরদিকে বাগদাদের সুন্নি খিলাফতের দুর্বলতায় যখন স্পেনে স্বাধীন উমাইয়া আমিরাতের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন জিব্রাল্টার প্রণালীর অপর তীরে প্রতিষ্ঠিত শিয়া ফাতেমি খিলাফতের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। গ্রিকদের সময় থেকে উত্তর আফ্রিকার বার্বার ও আন্দালুসিয়রা পরস্পরকে ঘৃণা করতো। জিব্রাল্টার প্রণালীর দুই তীরে গড়ে ওঠা সুন্নি উমাইয়া ও শিয়া ফাতেমি রাজবংশের সময় তা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নতুন মাত্রা লাভ করে। কিন্তু দুই রাজবংশের মধ্যকার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দ্বন্দ্ব যেমন চলমান ছিল তেমনি সুদীর্ঘকালের আর্থ-সামাজিক সম্পর্কও গতিশীল ছিল। প্রকৃতপক্ষে জিব্রাল্টার প্রণালীর দুই তীরে গড়ে ওঠা জনবসতি ভৌগোলিক কারণেই পরস্পরের মুখাপেক্ষী ছিল। মধ্যযুগে এর চেয়ে যোগাযোগে সহজ নিকটবর্তী অঞ্চল তাদের ছিল না। ফলে উভয় পক্ষই প্রয়োজন বিবেচনায় পরস্পরের সান্নিধ্য আশা করলে তাদের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি হয়। বাণিজ্যের পথ ধরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বেগবান হয়। তাছাড়া ইসমাইলি প্রচারণায় ভিত্তিশীল ফাতেমি খিলাফতের প্রতিনিধিরা তাদের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো বিশেষ করে স্পেনে ব্যাপক প্রচারণায় নিয়োজিত ছিল। যদিও তাদের গোপন প্রচারণা স্পেনে ভয়ংকর অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। এই গোপন ইসমাইলি

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচারণার মধ্যেও প্রণালীর দুই তীরের অধিবাসীদের সম্পর্ক বেগবান হয়। ইসমাইলি প্রচারকরা উত্তর আফ্রিকার ফাতেমি সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতির সাথে স্পেনের সম্পর্ক স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জিব্রাল্টার প্রণালী পূর্বে ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরকে সংযোগকারী সমুদ্র প্রণালী। এর একদিকে উত্তর আফ্রিকা অপরদিকে দক্ষিণ স্পেন। প্রণালীটি ৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং এর সর্বনিম্ন প্রস্থ স্পেনের মারোকুই পয়েন্ট ও মরক্কোর কায়ারস পয়েন্টে ১৩ কিলোমিটার। সরু প্রণালীটি দীর্ঘদিন যাবত আফ্রিকা থেকে ইউরোপগামী অভিবাসীরা প্রায়ই ব্যবহার করত।

স্পেন এবং মিশরসহ পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্যিক মাধ্যম হিসেবে ইফ্রিকিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এ সময় মিশর, সুদান, ভারত ও চীনের পণ্য আল-মাগরিবের মাধ্যমে স্পেন ও ইটালিতে যেত। Imamuddin (1963) উল্লেখ করেছেন যে, উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ম্যানুয়েল কলমিরো তাঁর *Historia de la Economia Politica en España* গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, সংক্ষেপে বলতে গেলে আরব স্পেন ইটালি, মরক্কো, উত্তর আফ্রিকা, মিশর, গ্রিস ও সিরিয়ার সাথে একটি প্রত্যক্ষ ও খুব স্বাভাবিক এবং মধ্য আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চল, ইউরোপের বিভিন্ন স্থান, ভারত ও চীনসহ এশিয়ার সাথে পরোক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলে। মুসলিম দেশগুলোতে স্পেনের মুসলমানরা সরাসরি ব্যবসা দ্রব্য নিয়ে যেত কিন্তু এশিয়া ও ইউরোপের অমুসলিম দেশগুলোতে ইহুদিরা ব্যবসা দ্রব্য নিয়ে যেত। ইহুদিরা মাঝে মধ্যে মোজারাবদের (আরব খ্রিষ্টান) সহায়তা পেত। হেনরি পিরেস তাঁর *La Poesie Andalouse* গ্রন্থে বলেন যে, মোজারাব ও ইহুদিরা উত্তর স্পেন ও আন্দালুস এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসমূহ, বাইজান্টিয়াম, বাগদাদ ও কায়রোর মধ্যকার বাণিজ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করত। (Imamuddin, 1963) ইরাকে আব্বাসিদের অবনতি এবং প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে তাদের রাজধানীর পতনের পর দশম শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরকেন্দ্রিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম নতুনভাবে জেগে ওঠে। (Constable, 1994) উপকূলীয় শহরগুলো যেমনঃ ত্রিপোলি, টায়ার, একর, আলেকজান্দ্রিয়া, তিউনিস, মাহদিয়া, পালেরমো, আইবেরীয় উপদ্বীপের মালাগা, আলমেরিয়া, ডানিয়া, ভ্যালেন্সিয়া এবং সেভিল ছিল মুসলিম বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যাতায়াতকারী সমুদ্রযাত্রীদের জন্য মাইলফলক। (Aljadayel, 2019)

স্রোত, জোয়ার-ভাটা, প্রবাহিত বাতাস, উপকূলের গঠন এবং আবহাওয়া পরিস্থিতি দ্বারা ভূমধ্যসাগরীয় নৌযাত্রা প্রভাবিত ছিল। পশ্চিমদিকে পানির স্রোত জিব্রাল্টার প্রণালী থেকে ঘড়ির কাটার বিপরীতে চলত। (Pryor, 1988) উত্তর উপকূলের ভৌগোলিক অবস্থান তাদের সুবিধা দিত। তাদের অনেকগুলো উপসাগর ও নিরাপদ সৈকত ছিল, যেগুলো খারাপ আবহাওয়াতে জাহাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অন্যদিকে দক্ষিণ উপকূল সর্বদা অখ্যাত ছিল এর বিশ্বাসঘাতক চরিত্রের জন্য। (Pryor, 1988) শীতকালে বিপজ্জনক ঝড়ো আবহাওয়া জাহাজ চলাচলে বাধা দিত। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর বন্ধ থাকত। (Pryor, 1988)

ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যে দ্বীপসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এগুলো দখলের মাধ্যমে মুসলমানরা মুসলিম বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যকার ট্রাংক রুটগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করেছিল। ছোট আকারের বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর জন্য দ্বীপসমূহ ছিল বিশেষ সরবরাহ পয়েন্ট ও আশ্রয়। তবে দ্বীপগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও বাণিজ্যপথগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছিল।

নবম শতকে আন্দালুসিয় বহিস্কৃত জলদস্যুরা ক্রিট দ্বীপ দখল করার পর ৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বাইজান্টাইনরা পুনরায় দখল করে। দশম শতকে তিন দশক আরব-বাইজান্টাইন যৌথ ক্ষমতাধীন থাকার পর বাইজান্টাইনরা ৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সাইপ্রাস পুনরায় জয় করে। (Aljadayel, 2019) মুসলিম বাণিজ্যের শ্রম এলাকা হিসেবে পরিচিত সাগরের পশ্চিমদিকের অবস্থা ছিল ভিন্ন। মুসলিম স্পেনের জাহাজগুলো মিশর ও সিরিয়ার দিকে চলাচলে বেলিয়ারিক, সার্দিনিয়া এবং সিসিলি সন্নিহিত ট্রাঙ্ক রুট অনুসরণ করত। যতদিন দ্বীপগুলো মুসলিম নিয়ন্ত্রণে ছিল ততদিন তাদের জাহাজগুলোর নিরাপত্তা ছিল। (Pryor, 1988) পূর্ব থেকে পশ্চিমের নৌযাত্রায়ও এই রুট অনুসরণ করা হতো। যেমন কেপ বন থেকে জিব্রাল্টার প্রণালীর প্রাকৃতিক পথ ছিল সিসিলি, সার্দিনিয়া এবং বেলিয়ারিক দ্বীপ হয়ে। (Pryor, 1988) সিসিলি ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। সমুদ্রের মাঝখানে হওয়ায় এটা জাহাজগুলোর জন্য সমুদ্রের রাস্তা ছোট করেছিল। মূলত উত্তর আফ্রিকার নিকটবর্তী উপকূলের দিকে সন্নিহিত দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরের গমনাগমন পথ ছিল বিপজ্জনক। একই সঙ্গে স্রোত প্রবাহের বিপরীতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে নৌযাত্রা ছিল কষ্টসাধ্য। তাই সিসিলি এবং বেলিয়ারিক দ্বীপ হয়ে যাত্রা ছিল সংক্ষিপ্ততম দূরত্বের ও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। (Aljadayel, 2019)

এছাড়া খ্রিষ্টান জলদস্যুদের জাহাজ ও নৌবহর মুসলিম জাহাজগুলোর গমনাগমন বাধাগ্রস্ত করত। তাদের পূর্ববর্তী মুসলিমরা যেমন ছিল, তেমনি তারাও তাদের জন্য বিপদ তৈরি করেছিল, ফলে মুসলিম জাহাজগুলো দক্ষিণের রুটটি ব্যবহার করত না। (Pryor, 1988) অপরদিকে বাইজান্টাইনরা সিসিলি ও সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করে সমুদ্রের উত্তরদিকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। পূর্ব ও পশ্চিমে যাতায়াতকারী যে জাহাজগুলো তাদের নিয়ন্ত্রিত দ্বীপগুলো হয়ে যেত সেগুলোর উপর তারা করারোপ করেছিল। এ কারণে আইবেরীয় উপদ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যকার রুটগুলো ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করত। যদিও সমুদ্রটি একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল ছিল, ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা তাদের দেশ সংলগ্ন উত্তর পথটি বেছে নিয়েছিল, যেখানে স্পেনের বণিকরা দক্ষিণের ভ্রমণপথের উপর নির্ভর করত। (Constable, 1994)

Dozy (1972) আফ্রিকার এক ব্যবসায়ী এবং আল-মানসুরের পারিবারিক বাজার সরকারের মধ্যকার তর্কের তথ্য তুলে ধরেছেন। এছাড়া আন্দালুসের ঐতিহাসিক ইবন হাইয়ানকে লেখা উমাইয়া কর্মচারী আবু আলি বিন রাব্বি আল-কারির পত্র থেকে জানা যায় যে, তার দেশ বাণিজ্য ও হস্তশিল্প পণ্যের উদ্বৃত্ত দ্রব্য স্পেনে রপ্তানি করে, যা কায়রোয়ানের দ্রব্যের একটি উৎকৃষ্ট বাজার। চতুর্দশ শতকের ধর্মতাত্ত্বিক ও আইনবেত্তা আবুল আব্বাস আহমাদ আল ওয়ানস্রিসি উল্লেখ করেন যে, ফেজের এক ব্যক্তির নিকট আন্দালুসীয় এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণী ছিল। এই ঋণ ও অর্থ বিনিময় স্পেন ও মরক্কো-এ দুই রাষ্ট্রের মধ্যকার ঘনিষ্ট অর্থনৈতিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। জিব্রাল্টার প্রণালীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলের ঘনিষ্ট অর্থনৈতিক সম্পর্ক তাদের পরস্পরের মুখাপেক্ষী করে তুলেছিল এবং এর মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানুষের স্থানান্তর ঘটেছিল স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। (Imamuddin, 1963) নবম শতকের লেখক আবু ফজল আল-দিমাশকীর *কিতাব আল আশারা ইলা মাহাসিন আল তিজারা* -এর বরাতে Constable (1994) বর্ণনা করেন যে, মুসলিম শাসন আমলে সেখানে প্রধানত তিন শ্রেণির বণিক ছিল । প্রথম শ্রেণির বণিক ছিল খাজ্জান, যারা কমদামে দ্রব্য কিনে রাখত, আর দাম বাড়লে বিক্রি করে দিত। দ্বিতীয় শ্রেণির বণিক ছিল রাক্কাদ, যে বণিকরা নিজেদের ব্যবসা অথবা অংশীদারী ব্যবসায়ের জন্য ভ্রমণ করত।

তৃতীয় শ্রেণির বণিক ছিল মুজাহ্হিজ, যারা বড় আকারের আন্তর্জাতিক আমদানি ও রপ্তানি পরিচালনা করত। এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা প্রথম দুই শ্রেণির বণিকদের ব্যবসায়ের কেন্দ্রীয় সংগঠক থাকত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবসায়ীদের তিনটি বিভাগ ছাড়াও আল-আন্দালুসে স্থানীয় বিভিন্ন ধরণের লোকেরা আরও বেশি জড়িত ছিল। এর মধ্যে বিদেশি বাণিজ্যে নিযুক্ত এজেন্ট, দালাল এবং মধ্যবিত্তরা অন্তর্ভুক্ত ছিল। উল্লেখ্য যে, আল-আন্দালুস বা যে কোনো জায়গায় বাণিজ্য আমির বা খলিফার প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং তার আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের ব্যবসায়ীরা ছিল স্বতন্ত্র, আইন বা শুল্ক ছাড়াই তারা যেখানে খুশি সেখানে ভ্রমণ করতে পারত। (Constable, 1994)

ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রশাসন ছিল খুব কঠোর। উমাইয়া আমলে বিভিন্ন ধরণের কর্মচারীরা বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত ছিল। তাদের মূল দায়িত্ব ছিল বন্দরগুলো এবং শিপিং পরিচালনা করা, কর এবং টোল আদায়ের পাশাপাশি মূল্য এবং পণ্য নিয়ন্ত্রণ করা। ফলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সামনে বিদেশি ও আন্তর্জাতিক বণিকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে স্থানীয় এজেন্টদের কর্মচারীরা তাদের আইনগত প্রতিনিধি ছিল। অন্যান্য দালাল এবং মধ্যবিত্তরা ব্যবসায়ীদের সহায়তা করছিলেন দিওয়ানের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে বা নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে পণ্য প্রদান করে। বন্দরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা আগত জাহাজগুলোতে কর আরোপ করত এবং লোকেরা কর না দিলে বন্দরের কাছে আসতে দেওয়া হতো না। কিছু পণ্য বিশেষত কাঠ রপ্তানি করা নিষিদ্ধ ছিল, যা জাহাজ এবং নৌবাহিনী নির্মাণে ব্যবহার করা হতো। (Aljadayel, 2019) ভূমধ্যসাগরের ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অংশীদারিত্ব ছিল। প্রথম শ্রেণি মুসলিম বিশ্বে 'শিরকা অথবা খুলতা' নামে প্রচলিত ছিল। এখানে দুই বা ততোধিক অংশীদার অর্থনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে তাদের উভয়ের পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগ করত। লাভ প্রত্যেকের অংশ হিসেবে বণ্টন করা হতো। এক্ষেত্রে কিরাদ অথবা মুদারাবা পদ্ধতি ছিল সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। অপরদিকে নবম শতাব্দীর পর থেকে ইসলামি আইনে কিরাদ বিদ্যমান ছিল। বিনিয়োগকারী পুঁজি দিতেন আর দ্বিতীয় পক্ষ শ্রম দিতেন। এটি আগে ইহুদিদের মধ্যে ইস্কা নামে এবং বাইজান্টাইনদের মধ্যে 'চেরোকিনোনিয়া' হিসাবে পরিচিত ছিল। ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় পটভূমির অংশীদারদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এটি সহায়তা করেছিল এবং এখানে মূলধন লোকসানের দায়িত্ব অন্য অংশীদারদের গ্রহণ করতে হতো না বলে পদ্ধতিটি বিশেষত পছন্দ করা হয়েছিল। (Constable, 1994) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আগ্রহী উমাইয়া খলিফাদের নিজস্ব বাণিজ্যিক এবং সামুদ্রিক বহর ছিল। এমনকি তারা বণিকদের মতো আচরণ করত; তাদের জাহাজ ভাড়া দেওয়া, বণিকদের যুক্ত করা বা জাহাজ-মালিক হিসেবে সরকারি পণ্য সরবরাহে জড়িত ছিল। (Constable, 1994)

মধ্যযুগে যখন বার্বারদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপনিবেশ ছিল স্পেন তখন উত্তর আফ্রিকায় আন্দালুসের বাণিজ্যিক উপনিবেশ ছিল বন্দর ও উপকূলবর্তী শহরসমূহে। এ সময় ইফ্রিকিয়াতে দুটো প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল- পূর্বে বার্কা ও পশ্চিমে সিজিলমাসা। বার্কা বর্তমান লিবিয়ার একটি উপকূলীয় এলাকা, যেখানে প্রাচীন বসতি গড়ে উঠেছিল। শহরটি উত্তর আফ্রিকায় প্রাচীন গ্রিক উপনিবেশ থেকে পরবর্তীকালে রোমান ও বাইজান্টাইন শহর হিসেবে পরিচয় পায়। মিশর থেকে কায়রোয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলার জন্য এটা ছিল প্রথম বড় বিশ্রাম স্থান। এখানে পূর্ব ও পশ্চিমের যাবতীয় বাণিজ্য পণ্যের সমারোহ হতো। সিজিলমাসা আধুনিক মরক্কোর দক্ষিণে অবস্থিত দূর বাণিজ্যে ব্যবহৃত মধ্যযুগের একটি বিখ্যাত ও উত্তর আফ্রিকার প্রধান মরুভূমি

কেন্দ্রিক এন্ট্রিপট[১] ছিল। মরুদ্যান শহরটি পরবর্তী সময় শুধু সাহারার দক্ষিণ থেকে আগত স্বর্ণের সুরক্ষা দেয়নি, বরং এটা স্বর্ণ উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করত এবং উত্তর থেকে পূর্বদিকে মূল্যবান বাণিজ্য বৃদ্ধি করেছিল; আরব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকরা এটাকে মাগরিবের সবচেয়ে সম্পদশালী শহর হিসেবে বিবেচনা করত। (Lightfoot and Miller, 1996) বহু ইরাকি বণিক সিজিলমাসাতে বসতি স্থাপন করে। সেখানে অন্যান্য দেশের বণিকদের ন্যায় স্পেনের বণিকদের সাথে তাদের যোগাযোগ হয়। এটা সেসময় এমন ব্যস্ত বাণিজ্যিক শহর ছিল যে, মধ্যযুগের বাগদাদ, দামেশক, কর্ডোভা, কায়রোয়ান, কায়রো যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ শহরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে। সিজিলমাসার বাণিজ্য বাজারে প্রত্যহ হাজার হাজার দিনারের চুক্তি হতো। ইবন হাওকাল বাগদাদের অধিবাসী একজন ইরাকি ছিলেন। তিনি বিশ্বভ্রমণের জন্য ৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ ত্যাগ করেন এবং ৯৪৮-৪৯ খ্রিষ্টাব্দে স্পেন ভ্রমণ করেন। একজন ফাতেমি গুপ্তচর হিসেবে তিনি খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমানের সময় কর্ডোভা অবস্থান করেন। *কিতাব সুরাত আল আরদ* তার বিখ্যাত গ্রন্থ। তিনি এখানকার একটি বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ঋণপত্র দেখে বিস্মিত হয়েছেন। যাতে মুহাম্মদ বিন আবি সা'দুন নামক এক মাগরিবি বণিকের নামে বিয়াল্লিশ হাজার দিনারের উল্লেখ ছিল। স্পেনের বিশেষ করে রায়্যহ এলাকার অধিবাসীদের তাহিরাতে অনেক দোকান ছিল। মাকদিসি এটাকে পশ্চিমের বলখ ও ইসলামের দামেশক বলে অভিহিত করেছেন। নবম শতাব্দির শেষদিকে ওমর বিন হাফসুন তাহিরাতে এসে পলায়ন করেন এবং তার একই দেশি রেজিওর একজন দর্জির দোকানে কাজ করা শুরু করেন। আফ্রিকার ছোট বড় সব বন্দরে আন্দালুসের বণিকদের যাতায়াত ছিল খুবই স্বাভাবিক, যা ভৌগোলিক আল-বাকরি ও ইবন হাওকাল উল্লেখ করেছেন। (Imamuddin, 1963) ইবন গালিবের গ্রন্থ *কিতাব ফুরজাত আল-আনফুস*-এর বরাতে Imamuddin (1963) বলেন যে, বর্তমানে আফ্রিকা হয়ত তার সম্পদ ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু আন্দালুসের বণিকরা সেখানে বসতি স্থাপন করে এর ব্যবসার বিস্তার করেছে।

উমাইয়া ও ফাতেমি প্রভাবাধীন এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক বন্দরগুলোর মধ্যে টিনেস (আলজেরিয়া), ওরান (আলজেরিয়া), আল-বাসরাহ (মরক্কো), তাবারকাহ (তিউনেসিয়া), মারসা বাজাইয়া (আলজেরিয়া), আলজেসিরাস (স্পেন), মারসা আল জারাস (তিউনেসিয়া), পেচিনা (স্পেন) ছিল অন্যতম। আফ্রিকার টিনেস বন্দর উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মধ্যকার বাণিজ্যিক পণ্য আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে; যেখানে আন্দালুসের বাণিজ্যিক জাহাজগুলো স্বাভাবিক যাতায়াত করত। আল-বাকরির মতে, ৮৭৪-৭৫ খ্রিষ্টাব্দে টিনেস বন্দর প্রতিষ্ঠিত হলে এখানে যারা প্রাথমিকভাবে বসতি স্থাপন করে তারা অনেকেই আন্দালুসের তুদমির (মুর্সিয়া) এবং আলভিরা থেকে আগত নাবিক ছিল। এ সব আন্দালুসিয় নাবিকদের মধ্যে আল কুরকুনি, আবু আইশা, আল- সাফর এবং সুহাইব-এর পরিবার অন্যতম। টিনেসের নাবিকদের সাথে স্পেনের নিয়মিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। (Imamuddin, 1963) আল-আন্দালুস সংলগ্ন ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল রেখা বন্দরগুলোতে পূর্ণ ছিল। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে আলমেরিয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল, যা জাহাজ নির্মাণ এবং রেশম উৎপাদনসহ বিভিন্ন শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। মালাগাও ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। জিব্রাল্টার প্রণালী হয়ে সেভিলে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত বাতাসের অপেক্ষা করা জাহাজগুলোর জন্য এটি একটি আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। আইবেরিয় উপকূলীয় রেখার পূর্বদিকে ডানিয়া বন্দর ছিল। এটি বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিল তাইফার সময়কালে বেলিয়ারিক এবং ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্বের মধ্যকার প্রশস্ত সামুদ্রিক

চলাফেরা এবং বিনিময়ের কেন্দ্র হিসেবে। তাইফার সময়ে ডানিয়ার উত্তরে ভ্যালেন্সিয়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হয়ে ওঠে। সেভিল ছিল জিব্রাল্টার প্রণালীর পশ্চিমে একটি অনন্য এবং কৌশলগত বন্দর। এ বন্দরের অবস্থান এটিকে অনুমতি দিয়েছে ব্যবসায়িক তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করতে, যদিও এটি একটি রাজনৈতিক মাত্রা দিয়েছিল। এটি উল্লেখ করাও গুরুত্বপূর্ণ যে, কর্ডোভা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল, বিশেষত উমাইয়া শাসনের সময়। এটি পরোক্ষভাবে ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যে জড়িত ছিল। শহর এবং পূর্ব উপকূলের মধ্যে স্থলপথ ছাড়াও গোয়াদালকুইভার নদী সেভিল বন্দরের সাথে সংযুক্ত করার একটি উপায় ছিল। নৌকা বা ছোট জাহাজ দ্বারা শহরে পণ্য পরিবহণ করা হতো। অবশ্য আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীরা এটি পরিচালনা করতো না, এর দায় ছিল স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উপর। (Aljadayel, 2019)

তারা প্রতিপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। স্থায়ী উপনিবেশ ব্যতীতও স্পেনের বিভিন্ন স্থানে বার্বার বণিকরা নিয়মিত যাতায়াত করতো। এ সকল আফ্রিকান বণিকদের মধ্যে জাকারিয়া বিন বকর বিন আহমেদ আল গাসসানি, মুহাম্মদ বিন আল-কাসিম আল-কারাবি এবং ইয়াহিয়া বিন খালাফ আল-সাদাফির নাম অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। (Imamuddin, 1963) ফাতেমি সাম্রাজ্যে নিয়মিত যাতায়াতের ক্ষেত্রে প্রথম যে ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় তিনি হলেন ইবন আল আসাহ। তাঁর ডাকনাম আবু কাফর, তাহিরাতের অধিবাসী। তিনি বিদেশি বাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে আন্দালুসে আসেন এবং তাঁর পিতা ও ভাইয়ের সাথে ৯৩৭-৩৮ সালে কর্ডোভা ভ্রমণ করেন। তিনি পূর্ব দিকে গমন করে মিশরও ভ্রমণ করেন। তিনি সেখানে আবু আল-তায়্যেব আহমদ বিন আল-হুসাইন আল-মুতানাব্বির দিওয়ান অধ্যয়ন করেন। তিনি টিনেস হয়ে পুনরায় আন্দালুসে ফিরে যান এবং ১০০৩ সালে মৃত্যু পর্যন্ত কর্ডোভাতে অবস্থান করেন। এছাড়া ছিলেন মুহাম্মদ বিন কাসিম, ডাকনাম আব্দুল্লাহ। তিনি আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য সম্পর্ক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মিশর গমন করেন। ১০০৯-১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কর্ডোভাতে ফিরে আসেন ও ১০৩৬-৩৭ খ্রিষ্টাব্দে আলমেরিয়াতে মৃত্যু বরণ করেন। সিউটার ইয়াহিয়া বিন খালাফ আল-সাদাফি প্রকৃতপক্ষে আল মাগরিবের বাসরার অধিবাসী ছিলেন। তিনি আবু জাকারিয়া নামে পরিচিত। তিনি পূর্বদিকে গমন করে মক্কাতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আবু সাইদ বিন আল আরাবি (মৃত্যু ৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ) ও অন্যান্যদের ভাষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি আন্দালুসে বাণিজ্য উপলক্ষে গমন করে সীমান্তে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং পরবর্তীকালে সিউটাতে মৃত্যু বরণ করেন। (Imamuddin, 1963) তার মৃত্যুর সঠিক সময় জানা যায়নি।

মধ্যযুগে মিশর ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। জলপথ ও স্থলপথে স্পেন ও আল-মাগরিবের হজযাত্রী ও বণিকদের পূর্বদিকে ও আরবে গমন করতে হলে মিশরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হতো। যদি তারা উত্তর আফ্রিকা উপকূল দিয়ে আলেকজান্দ্রিয়া অথবা কায়রোর পথে ভ্রমণে মরুভূমি পার হতো তখনও মিশরের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হতো। মধ্যযুগে এ পথ কম ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে মরক্কোর হজযাত্রীরা এ পথ ব্যবহার করছে। সমুদ্র যাত্রাপথেও স্পেনীয়রা মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর হয়ে যাতায়াত করত। ফলে মিশর ফাতেমি, স্পেন ও পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্যের মহাকেন্দ্রে পরিণত হয়। আব্বাসি স্বর্ণযুগে পারস্য উপসাগরে স্পেনীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, যা বর্তমানে একটি ব্যস্ত ব্যবসায়িক ও বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। আব্বাসি বাণিজ্যের প্রসার ভারতীয় উপকূল এবং দূরপ্রাচ্যে চীন উপকূল পর্যন্ত পৌঁছেছিল। এরপর যখন দশম শতকে স্পেনে বনু উমাইয়া এবং মিশরে ফাতেমিরা প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল তখন ভারত ও চীনের ব্যবসা দ্রব্য ইরাকের পরিবর্তে মিশরে আসত; বাণিজ্য কেন্দ্র পারস্য উপসাগর থেকে পূর্বে লোহিত সাগর এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরে স্থানান্তরিত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় দ্রব্যসমূহ কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়ার মাধ্যমে স্পেনে আসত। মধ্যযুগে দামেশক ও বাগদাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বেশির ভাগ উট বাহিত ছিল। কিন্তু কর্ডোভার ব্যবসা-বাণিজ্য চলত বাণিজ্যিক জাহাজের মাধ্যমে। ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশসমূহের সাথে স্থলপথে এবং ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ ও উপকূলসমূহে, তিউনেশিয়া, মিশর ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত সমুদ্রপথে। স্পেনের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের দিনে এর বাণিজ্য জাহাজের সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও বেশি। পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে দূরদেশে বিশেষ করে ফাতেমি মিশরে স্থায়ী বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরিত হতো। উল্লেখ্য যে, ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমিদের বিজয়ের অনেক পূর্ব থেকেই স্পেনের উমাইয়াদের সাথে মিশরের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ৯০৫-৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তুলুনি ও ইখশিদি শাসনের সময় বাগদাদের আব্বাসি খিলাফতের প্রতিপক্ষ হওয়ায় স্পেনের উমাইয়াদের সাথে মিশরের মিত্রতা স্থাপিত হয়। ফাতেমিদের আগমনের পর রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলেও অন্যান্য সম্পর্ক চলমান থাকে। (Imamuddin, 1963) তৃতীয় আব্দুর রহমানের একজন ইহুদি কর্মকর্তা চাসদাই (Chasdai) খাজারসের রাজাদের নিকট প্রেরিত একটি পত্রে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দেশে (স্পেনে) বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপ থেকে প্রচুর বণিক এসেছে। বিশেষ করে মিশর এবং তার পরের (পূর্বের) দেশগুলো থেকে। রাজপুত্রদের ব্যবহারের জন্য তারা বিভিন্ন প্রসাধনী, মূল্যবান পাথর এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য এনেছে। এ সময় মূল্যবান ও সাধারণ সকল মিশরীয় উৎপন্ন দ্রব্য মিশর থেকে স্পেনে রপ্তানি হতো। চাসদাইর এ বর্ণনা মামলুক যুগের বিখ্যাত কুর্দি ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক আবু আল ফিদা (১২৭৩-১৩৩১ খ্রিষ্টাব্দ) দ্বারা সমর্থিত। তিনি বলেন, স্পেনীয় জাহাজগুলো ফাতেমি আমলে মিশরে তাদের দ্রব্য বিপণী করত এবং মিশরী পণ্যসমূহের সাথে বিনিময় করত। ইবন হাইয়ান হাজিব আল-মুজাফফরের সময় (১০০২-০৭ খ্রিষ্টাব্দে) স্পেনে মিশর ও ইরাক হতে আগত কতিপয় বণিকের বর্ননা প্রদান করেন। তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মদ বিন আবু ইয়াজিদ খালিদ বিন খালিদ, তাঁর উপনাম ছিল আবুল কাসিম। তিনি সম্ভবত মিশরের অধিবাসী ছিলেন। ১০০৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আন্দালুসে গমন করেন। তিনি একজন শিক্ষিত ও ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি কবিতা লিখতেন আর জীবিকা নির্বাহ করতেন ব্যবসা করে। (Imamuddin, 1963)

স্পেনের সকল বণিক পূর্বদিকে গমন করতেন। এ সময় তাঁরা গমনাগমনের পথ হিসেবে মিশরকে ব্যবহার করতেন। স্পেনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতেন এবং মিশরের বিভিন্ন দ্রব্য বহন করে আনতেন। এছাড়াও তাঁদের অনেকে ব্যবসা উপলক্ষ্যে মিশর গমন করতেন। এক্ষেত্রে আহমদ বিন ফাতহ বিন আব্দুল্লাহর নাম জানা যায়। এই স্পেনীয় বণিক মিশরে গমন করেন। এছাড়া তিনি উত্তর আফ্রিকার কায়রোয়ানে আবু মুহাম্মদ আল-কিনানী এবং অন্যান্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি স্পেনে ফিরে এসে ১০০৯-১০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এছাড়া মাসুদ বিন আলি বিন মারওয়ানের নাম জানা যায়। তিনি স্পেনের পেচিনার কেন্দ্রীয় মসজিদের ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন। তিনি আবু আল-কাসিম নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি হজ্জ ও বাণিজ্য উপলক্ষ্যে প্রাচ্যের দিকে যাত্রা করেন। মিশরে আহমদ বিন শুয়াইব আন-নাসাই, ওয়াকি ও অন্যান্য কতিপয় মনীষীর ভাষণে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় মিশরের পাশাপাশি সিরিয়ার সাথেও স্পেনীয় আরব বণিকদের

উন্নত সম্পর্ক ছিল। যদিও ততদিনে বাণিজ্য কেন্দ্র সিরিয়া থেকে ইরাক ও মিশরে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। স্পেনীয় আরবরা অনেক পূর্ব থেকেই প্রাচ্যে যেতে বাধ্য ছিল বিধায় প্রাচ্যের সংস্পর্শে থেকে নিজেদের শিল্প ও কৃষিকে উন্নত করতে এবং নিজেদের দেশে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য প্রচুর উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল। (Imamuddin, 1963)

উমাইয়া ও ফাতেমি আন্তঃবাণিজ্যে বিভিন্ন প্রকারের পণ্য বিনিময় হতো। এ সময় আন্দালুস থেকে প্রচুর পণ্য রপ্তানি করা হতো। টলেডোর উত্তরে অবস্থিত মাউন্ট সারাত থেকে এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে ফ্যাট ক্যাটেল ও মেষ রপ্তানি করা হতো। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা ছিল খচ্চর কেন্দ্রিক, যা স্পেন থেকে প্রাচ্যে রপ্তানি করা হতো। সেগুলো অনেক সুঠাম ও আকর্ষণীয় ছিল; যার প্রত্যেকটির মূল্য কমপক্ষে পাঁচশত দিনার ছিল। সেভিলের লোকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যে যুক্ত থেকে অনেক বিত্তবান হয়েছিল বিশেষ করে অলিভ ওয়েল-এর ব্যবসায়; যা তারা জাহাজে করে উত্তর আফ্রিকা, আলেকজান্দ্রিয়া এবং প্রাচ্যের দূরবর্তী অন্যান্য এলাকায় রপ্তানি করতো। (Imamuddin, 1963) সেভিলের তেল প্রাচ্যে এবং বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে স্থলপথ এবং সমুদ্রপথে রপ্তানি করা হতো। সেভিল থেকেও পূর্বদিকে ডুমুর রপ্তানি হতো। মালাগার ডুমুর (ফিগ) স্বাদ ও গন্ধের জন্য বিখ্যাত ছিল যা প্রচুর পরিমাণে মিশর, সিরিয়া, ইরাক এবং এমনকি ভারতেও রপ্তানি হতো। এমনকি ইবন বতুতার সময়ও মালাগা ডুমুর রপ্তানি করত। ইবন বতুতার মতে, মালাগার ডুমুর ও বাদাম বিশ্বে অনন্য ছিল, যা তারা পূর্ব ও পশ্চিমে (উত্তর আফ্রিকা) পাঠাতো। মালাগা আন্দালুসিয়ার অন্যতম বড় ও সবচেয়ে সুন্দর শহর ছিল। এখানে স্থলপথ ও সমুদ্রের সুবিধা একত্রিত হয়েছিল এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূলের সরবরাহ ছিল। তিনি দেখেছেন ছোট এক দিরহামের বিনিময়ে আট পাউন্ড আঙ্গুর এখানকার বাজারগুলোতে বিক্রি হতো এবং মুর্সিয়ার রুবি রঙের ডালিমের বিশ্বে তুলনা নেই। ইবন বতুতার এই বর্ণনা অন্যান্য আরব লেখক ও পর্যটকদের দ্বারা প্রমাণিত। (Norris, 1959) বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট শুষ্ক কিশমিশ মালাগাতে তৈরি ও সংরক্ষিত হতো। মুর্সিয়া চিনি দ্বারা সংরক্ষিত ফলের জন্য বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। চিনি দ্বারা সংরক্ষিত এই ফল আলমেরিয়া বন্দরের মাধ্যমে এ সময় জাহাজে করে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় রপ্তানি করা হতো। স্পেনের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ আইভিজা (lviza) থেকে প্রচুর পরিমাণে লবণ আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডে রপ্তানি হতো। এছাড়া স্পেন থেকে রপ্তানি করা উল্লেখযোগ্য খাদ্যপণ্য ছিল উন্নতমানের শুস্ক মধু। (Imamuddin, 1963)

ফাতেমি মিশরে স্পেন থেকে কিরমেস[২] ও জাফরান রপ্তানি হতো। কিরমেস লাল রঙের জন্য এবং জাফরান হলুদ রঙের জন্য ব্যবহৃত হতো। (Meyer, 2000) স্পেনের এলভিরা ও মেরিদা থেকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে লিনেন রপ্তানি হতো। এলভিরার ফাহসের লিনেন মিশরের ন্যায় উন্নত ছিল। ইবন হাওকাল দশম শতকের প্রথমদিকে স্পেন ভ্রমণ করেন। তাঁর মতে, সে সময় স্পেন থেকে লিনেনের গাউন মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় রপ্তানি হতো। (Imamuddin, 1963)

কন্সট্যাবল, যিনি মুসলিম স্পেনের বাণিজ্যের ধরণ নিয়ে গভীর গবেষণা করেছেন, তিনি জেনিজা[৩] রেকর্ড থেকে একটি আকর্ষণীয় বিষয় পেয়েছেন–মিশর থেকে লিনেন তৈরির জন্য শন আন্দালুসে আনা হতো এবং সেই শন থেকে লিলেন কাপড় তৈরি করে পুনরায় তা নিকট প্রাচ্যে রপ্তানি করা হতো। তার এই তথ্য ভৌগোলিকদের রচনা থেকেও প্রমাণিত। যদিও সিল্কের কদর তুলনামূলক বেশি ছিল, লিলেন ও শন প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্য হতো। জেনিজা বণিকরা মাঝে মধ্যে সিল্ক ও

শনের বাণিজ্য পরিচালনা করত; আন্দালুস ও সিসিলি থেকে পূর্বদিকে সিল্ক এবং মিশর থেকে পশ্চিমদিকে শন বাণিজ্য হতো। প্রতিবছর শত শত এমনকি হাজার হাজার বেল মিশরের শন পশ্চিমে রপ্তানি হতো, যার প্রত্যেক বেলের ওজন সাধারণভাবে ছয় শত পাউন্ড হতো। দশম শতাব্দীতে এক সময় আন্দালুসে মিশরের শন লিনেনে পরিবর্তিত হতো এবং তা মিশরে রপ্তানি করা হতো। (Constable, 1994)

মোটামুটি সব আন্দালুসি কাপড় যেগুলো বইয়ের লেখায় টিকে আছে সেগুলো সব সিল্ক (অবশ্য এটা স্বাভাবিক, কারণ এগুলো ছিল আড়ম্বরপূর্ণ), তবে হিশামের পর্দা নামে পরিচিত কাপড়, যেখানে খলিফা দ্বিতীয় হিশামের (৯৭৬-১০০৯ এবং ১০১০-১৩ খ্রিষ্টাব্দ) নাম উৎকীর্ণ, তা সিল্কে তৈরি এবং লিনেনে স্বর্ণ খোদিত ছিল। (Baker, 61) এই চমৎকার আকর্ষণীয় কাপড়ের টুকরাটি মাদ্রিদের রয়েল একাডেমি অব হিস্ট্রিতে সংরক্ষিত আছে। এটা সোরিয়া প্রদেশের গোরমাজের সান এস্টেবান গির্জার বেদিতে প্রাপ্ত একটি বাক্সের মধ্যে পাওয়া যায়। এটা রীতিতে সমসাময়িক স্পেনের হস্তীদন্ত শিল্পের এবং নকশায় মিশরের ফাতেমি টেক্সটাইল শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করে। (Dimand, 1930)

তুলা একটি নতুন পণ্য, যা আইবেরীয় উপদ্বীপে মুসলমানরা চালু করেছিল। মুসলমানদের উন্নত চাষ পদ্ধতি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। দশম শতাব্দীতে পূর্বদিকের প্রদেশসমূহ থেকে উত্তর আফ্রিকা ও আইবেরিয়ার তুলা উৎপাদন সমগ্র ইসলামি বিশ্বে বিস্তৃত হয়েছিল। (Baker, 1995) ইফ্রিকিয়ার জেরবা, তিউনিস ও অন্যান্য অংশ থেকে স্পেন ও ইটালীতে তুলা রপ্তানি হতো। একই সাথে আন্দালুসিয়ার তুলা উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় শহরগুলোতে রপ্তানি করা হতো। (Watson, 1977) অবশ্য Meyer (2000) প্রচুর পরিমাণে তুলা আন্দালুসিয়া থেকে উত্তর আফ্রিকায় রপ্তানি বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, রাজি উল্লেখ করেছেন সেভিল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হতো। যা সমগ্র অঞ্চলে এবং সমুদ্রের ওপারে রপ্তানি হতো। কন্সট্যাবলও বিরোধিতা করে বলেছেন, বেশি পরিমাণে রপ্তানির কোনো রেকর্ড জেনিজা রেকর্ড ও ল্যাটিন চুক্তির কোনো দলিলে তিনি খুজে পাননি। (Constable, 1994)

Constable (1994) এর মতে, আন্দালুসের অর্থনীতি কখনো উল উৎপাদনের উপর দৃষ্টি দেয়নি। উল ছিল আন্দালুসের একটি ক্ষুদ্র পণ্য; তারা মাগরিবসহ বিভিন্ন দেশ থেকে উল আমদানি করত। একাদশ শতাব্দীতে একজন জেনিজা বনিক একটি উল ভর্তি কার্গো আলেকজান্দ্রিয়া থেকে আলমেরিয়া পাঠান, যার মূল্য ছিল ত্রিশ দিনার। তিনি বলেন, জুহরি উল্লেখ করেছেন, আন্দালুস তেলেমসেন থেকে উল আমদানি করত, এবং জেনিজা পত্রে মিশর থেকে আন্দালুসে উল শিপমেন্টের রেকর্ড পাওয়া যায়।

টেনটালি কার্পেট এর মসৃণতা ও উন্নত মানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আলমেরিয়া থেকে এই কার্পেট পূর্ব ও পশ্চিমের (উত্তর আফ্রিকা) প্রত্যেকটি স্থানে রপ্তানি হতো। স্পেনের টরটোসা থেকে প্রচুর পরিমাণে বক্সউড ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ আইভিজা থেকে অন্যান্য প্রকারের কাঠ আফ্রিকার কেন্দ্রে এবং জাতিভা থেকে আল-মাগরিব (মরক্কো) ও উত্তর আফ্রিকার অন্যান্য অংশে কাগজ রপ্তানি করা হতো। টরটোসা থেকে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে আল-মাগরিবে প্রচুর পরিমাণে সুরমা রপ্তানি করা হতো। এছাড়া টিন, স্বর্ণ, রৌপ্য, এ্যাম্বার পাথর, এমেরি পাথর, প্রবাল, বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হতো। (Imamuddin, 1963)

সাধারণভাবে স্পেনে উৎকৃষ্ট মানের এ্যাম্বার গৃহে ব্যবহৃত হতো। আর নিম্নমানেরটা মিশর ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হতো। আন্দালুসে উন্নতমানের এ্যাম্বার কমদামে এক আউন্স তিন স্বর্ণ মিসকালে অপরপক্ষে মিশরে নিম্নমানের এ্যাম্বার এক আউন্স বিশ স্বর্ণ দিনারে বিক্রয় হতো। উমাইয়া আমলে স্পেন থেকে প্রচুর অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে রপ্তানি করা হতো। (Imamuddin, 1963)

মুর্সিয়া থেকে উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে প্রচুর পরিমাণে বর্ম, বুকের বর্ম, তৈজসপত্র, স্বর্ণ দ্বারা মোড়ানো বর্ম, ঘোড়াকে গাড়ির সাথে যুক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করার সরঞ্জাম, ঘোড়ার জিন এবং পিতল ও লোহার তৈরি বিভিন্ন যন্ত্র যেমন– কাঁচি, ছুরি প্রভৃতি রপ্তানি হতো। আলমেরিয়াতে তৈরি মৃৎপাত্র ও কাঁচের তৈজসপত্র পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল এবং তা এ অঞ্চলে সব দেশে রপ্তানি হতো। (Imamuddin, 1963)

ফাতেমি সাম্রাজ্য থেকে উমাইয়া অঞ্চলে প্রচুর পণ্য আমদানি হতো। Imamuddin (1963) উল্লেখ করেছেন, মাকারির মতে, আন্দালুসিয়দের চেয়ে বার্বাররা বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেশি কামনা করতো যা আফ্রিকায় উৎপাদিত হতো না; তা তারা আন্দালুস থেকে আমদানি করত। এর ফলে দুই দেশের লোকদের মধ্যে একটি অনিবার্য সম্পর্ক বিরাজমান ছিল। জিব্রাল্টার প্রণালীর দুই তীরের মধ্যে সুদীর্ঘকাল থেকে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সিউটার গথিক গভর্নর জুলিয়ান ঘোড়া ও বাজপাখির একজন ডিলার ছিলেন। তিনি ইফ্রিকিয়া থেকে এগুলো আমদানি করে স্পেনে তার রাজা রডারিকের কাছে পাঠাতেন। এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক সমগ্র মধ্যযুগ এমনকি বর্তমান সময় পর্যন্ত বিরাজমান আছে। হাজিব আল-মানসুর ১০০৬টি ঘোড়া উত্তর আফ্রিকা থেকে আমদানি করেন। এর পরে হাজিব আব্দুল মালিক আল মুজাফফরের সময়ও (১০০২-১০০০৭ খ্রি.) ইরাক ও মিশরের বিদেশি বণিকরা সুসজ্জিত ঘোড়া ও খচ্চর কর্ডোভাতে নিয়ে আসতেন। আফ্রিকা থেকে উট আমদানি করা হতো। ৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকার জিরি বিন আতিয়াহর পক্ষ থেকে উৎকৃষ্ট জাতের ৫০টি উট উপহার হিসেবে উমাইয়া দরবারে পাঠানো হয়। সিভেট ক্যাট[৪], জাইবেথিয়ামের বিড়াল, জিরাফ, গন্ডার, হাতি, সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ, বন্য ষাঁড় এবং সুদক্ষ প্রশিক্ষিত পাখি একই বার্বার শাসক মানসুরকে উপহার দেন। (Imamuddin, 1963) স্পেনে হাতির দাঁতের কারুকাজে সমৃদ্ধ বিভিন্ন শিল্প দ্রব্য প্রচুর দেখা যায়। আন্দালুসিয়ার উন্নত প্রাসাদগুলোর দরজা এবং আসবাবপত্র অলংকরণে হাতির দাঁতের ব্যবহার ছিল প্রচুর। কর্ডোভা মসজিদের মিম্বারে হাতির দাঁতের অনেক ব্যবহার দেখা যায়। টলেডোর জু আল-নুন রাজবংশের শাসক ইয়াহিয়া আল-মামুনের (১০৪৩-৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) প্রাসাদ হাতির দাঁত ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। সে সময় স্পেনে কোন হাতি পাওয়া যেত না। তাই এসব হাতির দাঁত উত্তর আফ্রিকা ও ভারত থেকে আমদানিকৃত বলেই ধারণা করা যায়। (Imamuddin, 1963) খলিফা দ্বিতীয় হাকামের (৯৬১-৭৬ খ্রিষ্টাব্দ) সময় মূল্যবান ও দুর্লভ নতুন ও পুরাতন প্রচুর বই আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, বাগদাদ ও দামেশক থেকে কপি ও ক্রয় করা হয়েছিল। (Imamuddin, 1963)

খলিফা তৃতীয় আব্দুর রহমান তাঁর সুপ্রসিদ্ধ জাহরা প্রাসাদ নির্মাণের নিমিত্তে অনেক বড় ও ছোট মার্বেলের ব্লক ইফ্রিকিয়ার কারতাজানাহ, তিউনিস ও সাফাকাত, কন্সটান্টিনোপল, রোম ও অন্যান্য খৃষ্টান অধ্যুষিত দেশ থেকে আমদানি করেন। খলিফা মানসুরের সময় উত্তর আফ্রিকার টিনেস থেকে বর্ম আমদানি করা হতো। (Imamuddin, 1963)

উমাইয়া স্পেনের তুলনায় ফাতেমি সাম্রাজ্যে ব্যবসায়িক পরিবেশ অনুকূল ছিল বলে আভাস পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীরা ইহুদি, খ্রিষ্টান বা মুসলমান যে ধর্মের অনুসারী হোক না কেন, ফাতেমিরা আন্দালুসিদের মতো বৈষম্যমূলক শুল্ক আরোপ করেছিল বলে মনে হয় না। (Canard, 1991) যেখানে আল-আন্দালুসে তাদের ধর্ম এবং আদি দেশ অনুসারে আগত ব্যবসায়ীদের উপর শতকরা শুল্কে ভিন্নতা ছিল। আন্দালুসি মুসলমানদের জন্য তাদের সামগ্রীতে ৫.২%, অমুসলিম আন্দালুসিদের ৫% এবং অমুসলিম বিদেশিদের ১০% শুল্ক দিতে হতো। (Constable, 1994) তবে ফাতেমিরা বণিক এবং মুসলমান হজ্জযাত্রীদের এক দশমাংশ শুল্ক আদায়ের জন্য কায়রোয়ানের মধ্যদিয়ে যেতে বাধ্য করত। (Lewis, 1951)

ভূমধ্যসাগরে ফাতেমি আধিপত্য ছিল, বিশেষ করে ৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সিসিলির উপর প্রকৃত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর। সিসিলি বিজয়ের পর তারা সমুদ্রের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। সেখান থেকে তারা আল-কায়িমের সময় জেনোয়া, কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধেও অভিযান পাঠিয়েছিল। এমনকি তারা ৯১৮ ও ৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ক্যালাব্রিয়া এবং ৯২৫ সালে ওরিও আক্রমণ করেছিল। এর জন্য ইতালীয় শাসকরা যেমন ক্যালাব্রিয়ার গভর্নর ২২,০০০ সোনার টুকরো শুল্ক হিসাবে ফাতেমি খলিফাকে প্রদান করে। (Canard, 1991)

৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মিশর বিজয়ের পর, উত্তর আফ্রিকা এবং সিসিলির উপকূলীয় রেখার উপর ফাতেমিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে খারিজিদের সঙ্গে বহু যুদ্ধের পর ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তারা মরক্কোতে তাদের শাসন ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তবে একাদশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত মরক্কোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফাতেমি, উমাইয়া এবং ইদ্রিসিদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। (Aljadayel, 2019)

ইতোমধ্যে, লোহিত সাগর ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়া থেকে আগত বাণিজ্যিক চলাচলের একটি পথ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। প্রকৃতপক্ষে, বণিকদের কর্মতৎপরতায় মিশর একটি সংযোগ বিন্দু হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এটি পূর্ব থেকে আগত ভারত মহাসাগরে চালিত পার্সেলগুলোর লক্ষ্যে পরিণত হয়। মিশর থেকে পণ্য আফ্রিকা এবং আল-আন্দালুসের বাজারগুলোতে বিতরণ করা হতো এবং সেখান থেকে তারা খ্রিষ্টান ভূখণ্ডে গৌণ উপায়ে ব্যবসার জন্য অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলে। (Constable, 1994)

প্রকৃতপক্ষে, কেবল ৯৬৯ খৃষ্টাব্দের পরে উত্তর আফ্রিকা এবং আইবেরীয় উপদ্বীপের মধ্যে পণ্য বিনিময় এবং ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ উন্নত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, তিউনিস শহরটি ৯৬৯ এর আগে আন্দালুসি জাহাজের জন্য জনপ্রিয় ছিল না, সম্ভবত উমাইয়া ও ফাতেমিদের মধ্যে শত্রুতার কারণে এমনটি ঘটেছিল। যা হোক, এটি আন্দালুসি পণ্য এবং ব্যবসায়ীদের নিকট একাদশ শতকে অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠেছিল। (Constable, 1994) এ দুই অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল তাইফা[৫] আমলে। (Aljadayel, 2019)

ফাতেমি সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুসংহত ছিল। দিওয়ান আল-আমওয়াল বা অর্থমন্ত্রণালয় ছিল প্রাদেশিক কার্যালয়গুলোর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক। (Daftary, 2006)

ফাতেমি মুদ্রা কঠোর প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে ছিল, যা বিশুদ্ধতার বেশ খ্যাতি পেয়েছিল। সুতরাং টাকশালসমূহের নিয়ন্ত্রণ এবং ওজন ও পরিমাপ কাজি অথবা সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতির অধীন ছিল। তিনি মুদ্রার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ধর্মীয় আইন দ্বারা গৃহীত দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ ছিলেন। (Walker, 2002)

ফাতেমি সাম্রাজ্যে অনেক টাকশাল গড়ে উঠেছিল (সারণী ৪)। বিভিন্ন ইমামের সক্রিয়কালে ইস্যু করার কারণে তাদের মুদ্রাগুলোর বিভিন্ন তারিখ ছিল। টাকশালগুলোর মধ্যে 'আক্কা (একর), আয়লা ('আকাবা), আসকালান, বাগদাদ, বারকা, দিমিশক (দামেশক), ফেজ, প্যালেস্টাইন (রামালা), হালাব (আলেপ্পো), আল-আলেকজান্দ্রিয়া, আল-মাহদিয়াহ, আল-মানসুরিয়া, আল-মুহামদিয়াহ (মাসিলাহ), মদিনাত কুস (মিশরে কোস), মক্কা, মদিনা, মিশর (কায়রো), আল-কায়রোয়ান, সানা'স, সিজিলমাসা, সিকিলিয়াহ (পালেরমো), সুর (টায়ার), তাবারিয়াহ (টাইবেরিয়াস), তারাবুলাস (সিরিয়ায় ত্রিপোলি), তারাবুলাস (লিবিয়ায় ত্রিপোলি), জাবেদ এবং জাউইলা অন্যতম। (Walker, 2002)

বেলিয়ারিক দ্বীপ ও আইবেরিয় উপদ্বীপে প্রচুর ফাতেমি মুদ্রা পাওয়া গেছে। এগুলো সাধারণত খিলাফত ও তাইফা আমলের প্রত্নভাণ্ডারে পাওয়া গেছে। (Aljadayel, 2019) প্রাপ্ত প্রায় ২৯৪৯টি ফাতেমি মুদ্রার মধ্যে ১৭৪৯টি রৌপ্যমুদ্রা এবং ১২৬২টি স্বর্ণমুদ্রা। ১২টি মুদ্রার পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি। ২০৩৬টি মুদ্রা পাওয়া যায় শারক আল-আন্দালুসে যা মোট প্রাপ্ত মুদ্রার ৬৯%। এর মধ্যে ১০৯৩টি স্বর্ণমুদ্রা এবং ৯৩৯টি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রাগুলো আলিকান্তে, আলমেরিয়া, ক্যাসেলন, মুর্সিয়া, ভ্যালেন্সিয়া, তারাগোনা এবং বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি জেলাতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অপরদিকে গারব আল-আন্দালুস ও অন্তর্বর্তী অঞ্চলে ৯১৩টি ফাতেমি মুদ্রা পাওয়া যায়, যা মোট মুদ্রার ৩১%। এখানে ৭৭৬টি রৌপ্যমুদ্রা এবং ১৩৫টি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল। (Aljadayel, 2019)

মুদ্রাগুলো অনুসন্ধানের কালানুক্রম ৮৩৫-১০১১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। এর মধ্যে প্রাপ্ত ফাতেমি মুদ্রাগুলো ৯০৯-১১০১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যকার, যা আটজন ফাতেমি খলিফার সঙ্গে সম্পর্কিত; মুহাম্মদ আল-মাহদী (৯০৯-৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ), আল-মানসুর বিল্লাহ (৯৪৬-৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ), আল-মুইজ (৯৫৩-৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ), আল-আজিজ (৯৭৫-৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ), আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ (৯৯৬-১০২১ খ্রিষ্টাব্দ), আল-জহির লি ইজাজ দিনিল্লাহ (১০২১-১০৩৬ খ্রিষ্টাব্দ), আল-মুসতানসির বিল্লাহ (১০৩৬-১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দ) এবং আল-মুস্তালি (১০৯৪-১১০১ খ্রিষ্টাব্দ)। এক-অষ্টমী দিরহামের সঙ্গে নিজার আল-মুস্তফা (১০৯৪-১০৯৫)-এর সম্পর্কিত থাকার সম্ভবনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, আল-কায়িমের মুদ্রাগুলো (৯৩৪-৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ) অনুসন্ধানে নিখোঁজ রয়েছে। (Aljadayel, 2019)

আল-জহিরের টাকশালের মুদ্রা সর্বাধিক পরিমাণে পাওয়া গেছে। তবে এক্ষেত্রে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার গড় সমান নয়। ৪৪৮টি স্বর্ণমুদ্রা এবং ১৫০টি রৌপ্যমুদ্রা। আল-হাকিমের প্রাপ্ত মুদ্রার সংখ্যাও ভাল, তবে রৌপ্য ও স্বর্ণের প্রায় একই গড়। আল-জহিরের সময় থেকে স্বর্ণমুদ্রার শতাংশ বেড়ে যাওয়া শুরু হয়। স্বর্ণমুদ্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রৌপ্য মুদ্রা অদৃশ্য হয়ে যায়, আল-মুসতানসিরের সময়ে ৪৬৪টি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। (Aljadayel, 2019)

আইবেরীয় উপদ্বীপে ফাতেমি প্রযোজনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান ডানিয়া প্রত্নভাণ্ডার। এটি ১৯২০ সালে একটি মাটির পাত্রের মধ্যে আবিষ্কার হয়েছিল যখন হিস্টোরিয়াডোর পালাউ স্ট্রিটে নির্মাণ কাজ হয়েছিল; বর্তমানে এটি কোলন স্ট্রিট নামে পরিচিত। এখানে বিভিন্ন পণ্যের ১৮৪টি খণ্ডিত এবং সম্পূর্ণ ধাতব টুকরা ছিল। এর মধ্যে ১৪৫টি আর্কেওলজিকাল মিউজিয়াম অব ডানিয়ায় এবং বাকিগুলি এমএআরকিউ, আরকেওলজিকাল মিউজিয়াম অব আলিকান্তে সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল: একটি রঞ্জক মিশ্রণকারী, একটি তেল বাতি, একটি ব্যালেন্স কাউন্টারওয়েট, দুটি সসার বা ট্রে, "এস" প্রোফাইল এবং রিং ফুটের তিনটি বাটি বা কাপ, খোলা

দেয়ালের বা "এস" প্রোফাইল এবং সমতল বেসের দুটি বাটি। এটিতে উত্তল এবং সমতল বেসসহ দুটি ট্রাংক-নলাকার বাটি ছিল, উঁচু ও বাঁকানো দেয়াল এবং সমতল বেসের তিনটি বাটি, ট্রানেক্টেড কোনিকাল এবং সমতল বেস বা টিউলিপ আকৃতির সাতটি বাটি, সাতটি টেক্কা, সাতটি হ্যান্ডেল, নয়টি আধা-গোলাকার বাটি, এগারোটি সুগন্ধি বার্নার, চারটি সেন্সর, পনেরোটি ব্রাজিয়ার, পাঁচটি প্রদীপ, আটটি মোমবাতি, উনিশটি খণ্ডিত এবং সম্পূর্ণ হ্যান্ডল, বারোটি বেস এবং একটি পা। এগুলো একাদশ শতাব্দীতে ব্রোঞ্জে তৈরি হয়েছিল। এছাড়াও অন্যান্য প্রচুর ফাতেমি ধাতব পণ্য আইবেরীয় উপদ্বীপে পাওয়া গিয়েছিল। (Aljadayel, 2019)

জায়েন-এর আলকেলা লা রিয়েল "ইরমিতা নুয়েভা" প্রত্নভাণ্ডারে কিছু কানের দুল আবিষ্কার হয়েছে। এগুলো অর্ধ বৃত্তাকার, প্রান্তসীমায় সর্বত্র পয়েন্ট দ্বারা অলংকৃত। এই ভাণ্ডারে দশম শতাব্দীর যে মুদ্রাগুলো পাওয়া গেছে তার উপর ভিত্তি করে এগুলো একই শতাব্দীর বলে বিবেচনা করা যায়। এখানে ফাতেমি খলিফা হাকিমের দুটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। (Aljadayel, 2019)

তবে, মদিনাত আল-জাহরায় প্রাপ্ত দশম শতাব্দীর সামারার শিল্পদ্রব্যের ভাঙা টুকরোগুলো আইবেরীয় উপদ্বীপে ফাতেমি লাস্টারওয়্যার-এর প্রাচীনতম উদাহরণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ইরাকের সামারা থেকে আমদানি করা সিরামিক হিসাবে প্রথম চিহ্নিত করা হলেও, পরবর্তী গবেষণায় এর উৎস মিশরের সুসাকে নিশ্চিত করা হয়। একাদশ শতাব্দীর শুরুতেও আইবেরীয় উপদ্বীপে ফাতেমি লাস্টারওয়্যার সিরামিকের প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলো মেদিনাচেলি, ভ্যালেন্সিয়া এবং সম্ভবত টিয়ারমেসে পাওয়া যায়। (Aljadayel, 2019)

ফাতেমি রক ক্রিস্টাল-এর অনেকগুলো টুকরা স্পেনের বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এগুলো তিনটি ভাগে বিভক্তঃ পাত্র, বোটল, ও দাবার টুকরা। গবেষকরা তাদের প্রমাণ নিশ্চিত করেছেন যে, এগুলো নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে মিশরীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত। এগুলোর বড়গুলো কনভেন্ট, গির্জা, ক্যাথেড্রাল এবং ছোটগুলো ধর্মীয় বস্তু সজ্জিতকরণে ব্যবহৃত হয়েছিল। (Aljadayel, 2019) আইবেরীয় উপদ্বীপে এসব পণ্যের উপস্থিতি সে সময়ে আল–আন্দালুসে মূল্যবান দ্রব্যাদির চাহিদা পূরণে বাজারের গতিশীলতা নিশ্চিত করে।

উচ্চমানের আন্দালুসি কাপড় এবং এর রপ্তানির পরও কূটনৈতিক উপহার হিসেবে মূল্যবান তিরাজ কাপড় বিভিন্ন স্থান থেকে আইবেরীয় উপদ্বীপে আমদানি করতে হয়েছে। বাইজান্টাইন, বাগদাদি, সিসিলীয় এবং অন্যান্য মুসলিম অঞ্চলের পাশাপাশি ফাতেমি মিশর থেকেও কাপড় আমদানি করা হতো। (Aljadayel, 2019)

সান র‍্যামন দেল মন্টে, রোদা ডি ইসাবেনা ক্যাথেড্রাল, স্পেনে দশম-একাদশ শতাব্দীর কাফনের কাপড়ের কিনারে লাগানো লিনেনে তৈরি একটি ফাতেমি ব্র্যান্ড পাওয়া গেছে। এখানে আলংকারিক বর্ডার রয়েছে, যাতে গৃহসজ্জার সামগ্রীর ন্যায় সিল্ক ব্যবহৃত হয়েছে, বৃত্তাকার মেডালিয়নগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা, যা ঘরের এক-চতুর্থাংশ এবং পারস্পরিক সেলাইগুলোর উপরের দিকে গাছ-গাছালির নকশা এবং বৃত্তের নিচের দিকে ফুলেল নকশায় অলংকৃত। এই শিল্প কৌশলের রীতির স্পষ্ট প্রভাব ছিল আন্দালুসি তিরাজ এর উপর, যা দ্বিতীয় হিশামের প্রাপ্ত তিরাজে দেখা যায় (Aljadayel, 2019)

প্রথমদিকের মুসলিম রাজবংশগুলোর আমলে শিল্প উপকরণ হিসেবে হাতির দাঁত খুব কম ব্যবহৃত হত। উমাইয়া এবং আব্বাসি প্রত্নস্থলগুলোর খননকালে কোনো হাতির দাঁত পাওয়া যায়নি। তবে, খ্রিষ্টান কপটিক কারিগরদের মাধ্যমে ফাতেমিরা হাতির দাঁতের শিল্প এবং এর বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত করে তাদের একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। মাদ্রিদের ন্যাশনাল আর্কেওলোজিকাল মিউজিয়ামে ফাতেমি হাতির দাঁতের একটি কাসকেট রয়েছে। আয়তাকার এই বাক্সের পাশগুলি সবুজ ও লাল রঙে আঁকা স্ক্রোল-নকশার সীমানা দিয়ে সজ্জিত। প্যালেন্সিয়ার ক্যারিয়ন ডি লস কন্ডিজের সান জোইলো গির্জা খননের সময় বাক্সটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। এটিতে লেখা শিলালিপি থেকে জানা যায়, ফাতেমি খলিফা আল-মুইজের জন্য আল-মানসুরিয়ায় আ[হমাদ] আল খুরাসানী দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। শিয়া বাক্যাংশগুলোও এই কাসকেটে পবিত্র কুরআনের আয়াতের (৬১:১৩) পাশাপাশি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাসকেটে খোদিত লিপি ও কাপড়ের লিপি তুলনা করে দেখা যায়, লিপির রীতি মিশর বিজয়ের পূর্বের। তাই এই লিপি খোদাইর সময় ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে হবে। (Aljadayel, 2019)

ধর্মের ক্ষেত্রে স্পেনের উমাইয়ারা ছিল সুন্নি এবং ফাতেমিরা ছিল শিয়া। তাই উভয় রাজবংশের মধ্যকার উষ্ণ ধর্মীয় সম্পর্ক থাকার সুযোগ ছিল না। উল্লেখ্য যে, ফাতেমি খলিফা দ্বিতীয় হাকামের দারুল হিকমা প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ ছিল সুন্নি বিরোধী প্রচারণা। অবশ্য এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। স্পেনের হাজিদের জলপথ ও স্থলপথ উভয় ক্ষেত্রেই হজ্জব্রত পালন করতে মিশরের মধ্যদিয়ে গমন করতে হতো। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে ফাতেমিরা ইফ্রিকিয়ার মধ্যদিয়ে আন্দালুসি হজ্জ যাত্রীদের গমন নিষিদ্ধ করেছিল। (Bosworth & others, 1993) খিলাফত হলো একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এর অস্তিত্ব একক। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দিবেন একজন খলিফা। ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি খিলাফত প্রতিষ্ঠা বাগদাদের কেন্দ্রীয় খিলাফতের জন্য ছিল প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ। অবশ্য ততোদিনে বাগদাদ খিলাফতের পতন শুরু হয়ে যায়। ফলে এ অঞ্চলে ফাতেমিরা তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। কিন্তু ৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে আইবেরীয় উপদ্বীপে তৃতীয় আব্দুর রহমান উমাইয়া খিলাফত ঘোষণা করলে একক অধিকারের খিলাফত প্রতিষ্ঠানটি ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। খিলাফত অধিকারের দ্বন্দ্ব উদীয়মান দুই খিলাফতের মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করে। বিবাদমান দুপক্ষই খিলাফতের আইন সঙ্গত দাবিদার বলে নিজেদের ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় দুপক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে স্পেনের উমাইয়াদের সাথে ফাতেমিদের ব্যাপক সম্পর্ক বিরাজিত ছিল। উভয় অঞ্চল আন্তঃসম্পর্কে খুব কাছাকাছি অবস্থান করায় তাদের সংস্কৃতি পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। স্পেনের বস্ত্র শিল্প পারসিক ও কপটিক শিল্প দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। মাদ্রিদ রয়েল একাডেমিতে এর একটি নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে, যাতে কপটিক প্রভাবের সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষ করা যায়। এই অতি মূল্যবান মিহি বস্ত্রাংশ কুফিক লিপিতে কর্ডোভার খলিফা দ্বিতীয় হিশামের নাম প্রকাশ করে। হাতে সুচের ব্যবহারে রঙ্গিন পশমী সুতা দ্বারা অলংকৃত এটি একটি চিত্রিত কাপড় খণ্ড। এতে অষ্টভূজাকৃতির শিল্পকর্মের মধ্যে হালকা নীল, গাঢ় নীল ও লাল রঙের সুতায় জ্যামিতিকভাবে রীতিবদ্ধ জীবজন্তু, পাখি এবং মানুষের আকৃতি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এতে মিশরীয় আরবি উৎসের সাথে সমসাময়িক হিস্পানো-মরিস্ক রীতির হাতির দাঁতে তৈরি ক্ষুদ্র বাক্সের নকশার প্রকাশ ঘটে। (Dimand, 1930) এটা বিখ্যাত 'তিরাজ' কাপড়ের নিকটবর্তী, যা প্রথমে কর্ডোভায় এবং পরে আলমেরিয়াতে তৈরি হয়।

মূলত অতি প্রাচীনকাল থেকেই মিশরের কপটিক ও পারস্যের সাসানিরা বস্ত্র তৈরিতে-সূতা বয়নে বিখ্যাত ছিল। যখন মুসলমানরা পারস্য, সিরিয়া, মিশর এবং অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল জয় করে তখন কপটিক ও সাসানি সুচিশিল্প বিজিত মুসলিম অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। সূচিশিল্পীরা একচেটিয়া বাজারের ন্যায় এককভাবে সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বাজার দখল করেছিল। উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগে বস্ত্র তৈরি শিল্পে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল-বাইজান্টিয়াম, খ্রিষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চল এবং অন্য তিনটি মুসলিম রাষ্ট্র-মিশর, স্পেন ও সিসিলি একটি বিশেষ অবদান রাখে। এর ফলে ভূমধ্যসাগরীয় বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, ক্রেতারা এক দেশ থেকে অন্য দেশের পণ্য পৃথক করতে ব্যর্থ হত। স্পেনীয় বস্ত্র পারসিক এবং কপটিক উভয়ের প্রভাবেই প্রভাবিত ছিল। (Imamuddin, 1965) স্পেনীয় আরবরা কারুশিল্পে চমৎকার অগ্রগতি সাধন করেছিল। তন্মধ্যে একটি হলো- ব্রোঞ্জের সিংহ। এ শিল্পকর্মে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাতেমি সময়ের ব্রোঞ্জ কর্মের প্রকাশ ঘটে। সম্ভবত এ নমুনা মিশরীয় কারুশিল্পীদের থেকে নকল করা হয়েছিল। (Imamuddin, 1963)

দশম শতকে স্পেনে উমাইয়াদের স্বর্ণযুগে সাহিত্যিক কার্যকলাপ একটি সাধারণ ও জনপ্রিয় কর্মে পরিণত হয়। এ সময় শুধু শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায়ই নয় বরং সাধারণ জনগণও সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু অবদান রাখার জন্য অত্যন্ত কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু এ সময় স্পেনে কাগজের যোগান সুলভ না হওয়ায় সময়ের চাহিদা পুরণের জন্য স্পেনীয়রা শত্রু সাম্রাজ্য আব্বাসি ও ফাতেমিদের থেকে কাগজ আমদানি করতে বাধ্য হয়। (Imamuddin, 1963) উমাইয়া আমির ও খলিফাগণ বিশেষ করে দ্বিতীয় আব্দুর রহমান ও দ্বিতীয় হাকাম পুস্তক সংগ্রহের জন্য বড় ধরনের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হতে পুস্তক সংগ্রহের জন্য অনেক বণিক ও এজেন্ট নিয়োগ করেন। আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, বাগদাদ, দামেশকসহ বিভিন্ন দেশ থেকে দুর্লভ ও মূল্যবান, নতুন ও পুরাতন প্রচুর গ্রন্থ কর্ডোভায় আনা হয় এবং নকল করা হয়। (Al-Makkari, 1948) উল্লেখ্য যে, খলিফা দ্বিতীয় হাকামের প্রতিনিধিরা এমনকি নারী প্রতিনিধিরা সমগ্র আব্বাসি, ফাতেমি এবং গ্রিক সাম্রাজ্য পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির জন্য খুঁজে বেড়িয়েছিল।

দশম ও একাদশ শতকের কিছু অংশ ছিল বিলাস সামগ্রীর উন্নতির যুগ, যার অধিকাংশ কর্ডোভার উমাইয়া দরবারে পরিলক্ষিত হয়। ফাতেমিদের সময় এ অঞ্চলে মিশর, সিসিলি এবং উত্তর আফ্রিকার একটি অংশে শিল্পভাবের একটি চমৎকার বিনিময় হয়। স্পেনও এক্ষেত্রে তার বিশুদ্ধ কর্ম চালিয়ে গিয়েছিল। এ সময় স্পেনের হস্তীপণ্যসমূহ মিশরের ফাতেমি পণ্যের মান অর্জন করে। অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরের শিল্পকর্মে ভাব বিনিময় হয়েছিল। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এসময় তাদের সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে কিছুটা হলেও প্রভাবিত করেছিল। অনেক শিল্পী সাহিত্যিক প্রতিপক্ষ খলিফার নিকট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। এক্ষেত্রে ইবন হানি আল আন্দালুসির (জন্ম ৯৩২-৯৩৭, মৃত্যু ৯৭৩ খ্রি.) নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর সাহিত্য কর্মের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি প্রথমে সেভিলে লাম্পট্যপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। শহর থেকে পরিত্যক্ত হয়ে তিনি উত্তর আফ্রিকায় গমন করেন। মূলত স্পেনে ইসমাইলি বিরোধী অভিযান থেকে রক্ষা পেয়ে ৯৫৮ সালে তিনি খলিফা মুইজের দরবারে স্থান লাভ করেন। তিনি মাগরিবের সর্বপ্রথম বিখ্যাত আরবি কবি

ছিলেন। তাঁর কবিতা কর্ডোভা থেকে বাগদাদ পর্যন্ত ইসমাইলি ও অইসমাইলি সকলের কাছে ব্যাপক প্রশংসিত ছিল। খলিফা মুইজ ও খলিফা আজিজের সভাকবি হিসেবে তিনি রাজনৈতিক, সামরিক ও ধর্মীয় বিষয়ে ফাতেমি সমর্থনে কবিতা রচনা করতেন। (Kassam, 1996) পরবর্তী সময় তিনি পরিবার পরিজনসহ দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিলেও পথিমধ্যে প্রতিকূল পরিবেশে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ফাতেমি খলিফা মুইজের (৯৫২-৭৫) স্তুতিতে একটি কাসিদা রচনা করেন। যা মানের দিক থেকে পশ্চিমের (স্পেনের) সর্বশ্রেষ্ঠ কাসিদার সাথে তুলনীয় হতে পারে। অবশ্য জীবনীকার ইবন খাল্লিকানের মূল্যায়ন অনুসারে এটি এমন একটি স্তুতি গাথার উদাহরণ যাতে সহমর্মিতা ও আনুপাতিক চিন্তার অভাব ছিল। (Chejne, 1974)

মধ্যযুগের রাষ্ট্র ব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রের ন্যায় সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল না। রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ দেখা যায় না। স্পেনের উমাইয়া খিলাফত এবং উত্তর আফ্রিকা ও মিশরের ফাতেমি খিলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল মূলত বংশ কেন্দ্রিক। সেখানে সাম্রাজ্যের সাধারণ জনগণের ভূমিকা ছিল অনুল্লেখযোগ্য। ফলে বংশীয় ক্ষমতা প্রকাশের হাতিয়ার ছিল রাজনীতি। অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ছিল সাধারণ ও স্বাভাবিক বিষয়। যদিও কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। এগুলোর ধারক ও বাহক ছিল মূলত সাধারণ মানুষ। ফলে এগুলো নিয়ে মাথা ব্যাথার কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মাঝে মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তদুপরি সে সময়ে যেমনি কোনো রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সাধারণ মানুষের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়নি তেমনি সে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাদের ছিল না। উল্লেখ্য যে, এ সময় ফাতেমি ও উমাইয়া খিলাফতের মধ্যকার যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উষ্ণতা বিরাজ করছিল তাতে খলিফাদের অংশগ্রহণ অনুল্লেখযোগ্য না হলেও সাধারণ মানুষের ভূমিকাই প্রধান হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে, মধ্যযুগে ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেনের উমাইয়া এবং উত্তর আফ্রিকা ও মিশরের ফাতেমি খিলাফতের মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যুদ্ধাংদেহী মনোভাব থাকলেও অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গতিশীল থাকায় মুসলিম সভ্যতা তথা বিশ্ব সভ্যতার চমৎকার উন্নতি সাধিত হয়। অবশ্য এটা সত্যি যে, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে কিংবা সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ব্যাপকতর থাকলে মুসলিম সভ্যতার বিকাশ আরো গতিশীল, উন্নত ও স্থায়ী হতো।

অন্ত্য-টীকা

১. এমন ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর, যেখানে পণ্যদ্রব্য আমদানি, মজুত এবং রপ্তানি করা হতো। বাতাসের গতি নির্ভর জাহাজের যুগে এমন বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।

২. স্ত্রী প্রজাতির স্কেল পোকার শুকনো কুচকানো দেহ থেকে প্রাপ্ত লাল রঙ, কাপড় ও পাণ্ডুলিপি রঙ করার জন্য ব্যবহৃত।

৩. জেনিজা হলো ইহুদি উপাসনালয় বা কবরস্থানের একটি স্টোরেজ অঞ্চল যা সঠিকভাবে কবরস্থানের দাফনের আগে ধর্মীয় বিষয়গুলিতে জরাজীর্ণ হিব্রু ভাষার বই এবং কাগজপত্রের অস্থায়ী সংরক্ষণের জন্য মনোনীত হতো।

৪. আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপে প্রাপ্ত বিন্দু চিত্রিত বিড়াল-সদৃশ ক্ষুদ্রাকার জন্তু বিশেষ। এই জন্তুর কতিপয় গ্রন্থি থেকে কড়া গন্ধযুক্ত পদার্থ পাওয়া যায়।

৫. একাদশ শতাব্দীতে কর্ডোভা কেন্দ্রিক উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর আল-আন্দালুসের বিভিন্ন অঞ্চলে যে স্বাধীন শাসন চালু হয়েছিল।

উল্লেখপঞ্জি

গ্রন্থ

Aljadayel, Z.A. (2019). “Fatimid Material Culture in Al-Andalus: Presences and Influences of Egypt in Al-Andalus Between Xth and the XIIth Centuries A. D.”, Unpublished Dessertation of Masters of Archaeology, Faculdade De Ciencias Socials and E Humanas, Universidade Nova De Lisboa

Al-Makkari, A.I.M. (1948), *History of the Mohammedan Dynasties in Spain*, Vol. II, Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, Delhi

Baker, P. L. (1995), *Islamic Textiles*, British Museum Press

Chejne, A. G. (1974), *Mulsim Spain*, The University of Minnesota Press, Minnepolis

Constable, O. R. (1994). *Trade and traders in Muslim Spain. The commercial realignment of the Iberian Peninsula, 900-1500*, University of Cambridge Press, USA

Dimand, S.M. (1930). *A Hand Book of Mohammedan Decorative Art,* The Metropolitan Museum of Art

Dozy, R. (1972). *Spanish Islam*, Tra. Francis Griffin Stokes, Francess, London

Imamuddin, S.M. (1963). *The Economic Histroy of Spain under the Umayyads, 711-1031 A. C.*, Asiatic Society of Pakistan, Dacca

Imamuddin, S.M. (1965). *Some Aspects of Socio Economic and Cultural Histroy of Muslim Spain*, E.J. Brill, Leiden

Lewis, A. (1951). *Naval Power and Trade in the Mediterranean, A.D. 500-1100,* Princeton University Press, Princeton

Pryor, J. H. (1988). *Geography technology, and war: Studies in the maritime history of the Mediterraneany 649-1571*, Cambridge University Press, UK/USA

Walker, E. (2002). *Exploring an Islamic Empire: Fatimid History and Its Sources*, I.B. Tauris, London

সম্পাদিত গ্রন্থ

Kassam Q. [ed.] (1996). *Shimmering light: An Anthology of Ismaili Poetry*, tra. Hunzai, F. M., I. B. Tauris, London

Bosworth, C.E. & others [ed.] (1993). *The encyclopedia of Islam*, Vol. VII, E.J. Brill, Leiden

সম্পাদিত গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ

Canard, M. (1987). “al-Basāsīrī.” *The Encyclopaedia of Islam*, New Edition, Volume I: A–B. Brill, Leiden

Daftary, F. (2006). “Fatimids”, *Medieval Islamic Civilization*: A-K, index, Routledge, NY & London

Lightfoot, D. R. and Miller, J. A. (1996). “Sijilmassa: The Rise and Fall of a Walled Oasis in Medieval Morocco”, *Annals of the Association of American Geographers,*Vol. 86, No. 1, the Association of American Geographers, Taylor & Francis, Ltd.

Norris, H. T. (1959). *Ibn Baṭṭūṭah's Andalusian Journey,* The Geographical Journal, Vol. 125, No. 2, The Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers)

Watson, A. (1977). “The Rise and Spread of Old World Cotton,” Studies in Textile History in Memory of Harold B.

Burnham, Gervers, V. [ed.], Royal Ontario Museum, Toronto, Canada

পত্রিকা

Meyer, L. (2000). Textiles of Islamic Spain, Medieval Textile Study Group, Complex Weaver, Issue 24

পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষা : প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

মোছা. রূপালী খাতুন*

সারসংক্ষেপ : ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে বাংলায় নারী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। শুধু অভিজাত পরিবারের অল্প সংখ্যক নারী গৃহ অভ্যন্তরে পড়াশুনা করার সুযোগ পেতেন। আঠারো শতকের প্রারম্ভ থেকে ইউরোপ থেকে আগত মিশনারীরা প্রথমবারের মতো বাংলায় নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করে বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে প্রগতিশীল বাঙালিরা মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৮৭৩ সালে পূর্ব বাংলায় নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী কর্তৃক কুমিল্লায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং একই বছর ঢাকায় *ইডেন ফিমেল স্কুল* প্রতিষ্ঠা মুসলিম নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে বাঙালি মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে সমাজ সংস্কারকগণ ইতিবাচক মানসিকতা প্রদর্শন করেন। ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সরকার পূর্ব বাংলার মুসলিম নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মেয়েদের শিক্ষা সচেতনতা, বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষক নিযুক্ত করা, মেয়েদের উপযোগী শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি, বিদ্যালয় সংলগ্ন আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহে বৃত্তি প্রদান প্রভৃতি সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। অন্যদিকে বিশ শতকের শুরুতে মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃৎ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল* প্রতিষ্ঠা বাঙালি মুসলিম মেয়েদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে বেশি উৎসাহিত করে। ক্রমান্বয়ে পূর্ব বাংলায় মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের জন্য একের পর এক বিদ্যালয় স্থাপন হতে থাকে এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে নারীর জন্য বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯২১ সালে পূর্ব বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এ অঞ্চলের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ অবারিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বিষয়টি আলোচনা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের উন্নয়নে জীবনঘনিষ্ট ও যুগোপযোগী শিক্ষা অপরিহার্য। ব্রিটিশ শাসন শুরু হবার পূর্বে বাংলায় দেশি ও সনাতন শিক্ষা পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণরা গ্রাম্য 'টোলে' এবং মুসলিম মৌলভীরা মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করতেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা ও মক্তব। ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলে নানা জায়গায় আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন শুরু হয়। তবে তখনকার বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোতে মেয়েদের ঢালাওভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব ছিল না। বাংলায় নারীশিক্ষা প্রসারে প্রথম দিকে খ্রিষ্টান মিশনারিরা বিভিন্ন জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। উনিশ শতকে নবজাগরণের প্রভাবে নারীশিক্ষা প্রসারে এদেশীয় সমাজ সংস্কারক ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। বাংলায় মুসলিম নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে মুসলমান পুরুষের পাশাপাশি মুসলিম নারীর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পূর্ব বাংলায় *শুভসাধিনী সভা* কর্তৃক *ইডেন ফিমেল স্কুল* (১৮৭৩) প্রতিষ্ঠা এবং কুমিল্লায় *ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়* (১৮৭৩) প্রতিষ্ঠা নারীশিক্ষা বিস্তারে মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিশ শতকের প্রথম দশকে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) কর্তৃক *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়*

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রযাত্রা একটি নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যায়। ধীরে ধীরে পূর্ব বাংলায় মেয়েদের জন্য অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে যার মাধ্যমে মুসলিম নারীরা ব্যাপকভাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। বর্তমান প্রবন্ধে ১৮৭৩ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এখানে তৎকালীন মুসলিম নারীশিক্ষা পরিস্থিতি, নারীশিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নারীশিক্ষা পদ্ধতি এবং এর ফলাফল মুল্যায়ন করা হয়েছে।

প্রবন্ধটি আলোচনামূলক ও মুল্যায়নধর্মী। উল্লেখ্য বাংলায় নারীশিক্ষা বিষয়ে অনেক লেখক ও গবেষক আলোকপাত করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের *বঙ্গসাহিত্যে নারী* (১৯৫০), চিত্রাদেবের *ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহল* (২০১৪), প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের *বাংলার নারী জাগরণ* (১৩৫২), Jogesh Chandra Bagal রচিত *Beginnings of Modern Education in Bengal : Women's Education* (1944), Usha Chakravarty এর *Condition of Bengali Women Around the Second Half of the Ninteenth Century* (1963), Sonia Nishat Amin রচিত *The World of Muslim Women in Colonial Bengal* (1996), Ghulam Murshid এর *Reluctant Debutante : Response of Bengali Women to Modernization,1849-1905* (1983) প্রভৃতি। কিন্তু পৃথকভাবে পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপর গুরুত্বপ্রদান করে আলোচনা লক্ষ করা যায় না। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে William Adam, Priscilla Chapman সহ দেশি বিদেশি লেখকদের গ্রন্থ, সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সরকারি দলিল দস্তাবেজে বেশ কিছু প্রাথমিক উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সকল প্রাথমিক উৎস এবং আধুনিক গবেষকদের রচিত নানাবিধ তথ্যসমৃদ্ধ লেখনি দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করে বর্তমান প্রবন্ধে পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা ও মুল্যায়ন করা হয়েছে।

বাংলায় শিক্ষার ইতিহাসের ক্রমধারায় নারীশিক্ষা বিষয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, আর্য সভ্যতা (১৫০০-৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) বা বৈদিক যুগের পর মহাকাব্যের যুগে (রামায়ণ ও মহাভারত খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০-৪০০ খ্রি.) সাধারণ কুলকন্যাদের শিক্ষার কোন অধিকার ছিল না। প্রাচীন বাংলায় পাল যুগ (৭৫০-১১৭৪ খ্রি.) এবং সেন শাসনামলে (১০৭০-১২৩০ খ্রি.) শিক্ষাব্যবস্থায় নারীর জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন পরিলক্ষিত না হলেও এসময় নানা গুণে গুণান্বিতা নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। বিলাসবজ্রা নামে গৌড়ের এক বৌদ্ধ ভিক্ষু পাল রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ শাস্ত্র রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন। সেন যুগে বিজয় সেনের স্ত্রী বিলাসদেবী ও রাজ অন্তঃপুরে বেশ কয়েকজন বিদূষী নারীর অবস্থানের কথা জানা যায় (শ্যামলী ও অন্যান্য, ১৯৯৮, পৃ. ২৮-২৯)। পরবর্তীকালে চন্দ্রাবতী নামে একজন মহিলা কবি রামায়ণ গীতি, মনসাদেবীর গান, মলুয়া ইত্যাদি কাব্যকাহিনী রচনা করেন। (মুরশিদ, ২০১৬, পৃ. ২৩৯)

মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে অভিজাত পরিবারে মেয়েদের কোরআন পাঠ ও ধর্মের ক্রিয়াকর্ম ঠিকভাবে পালন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে 'বিসমিল্লহ্খানি' অনুষ্ঠানের দ্বারা অক্ষর পরিচয় শুরু হতো (রহিম, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৯)। সুলতানি ও মুঘল আমলে সাত বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা ছেলেদের পাশাপাশি মসজিদ ও মক্তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ পেত

(আরিফা, ১৯৯৮-২০০১, পৃ. ১৩৬-১৩৭)। পর্যটক ইবনে বতুতা বাংলা ভ্রমণের সময় তেরোটি মহিলা মাদ্রাসা দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন (Gibb, 1929, p. 330-331)। সুলতানি আমলে উচ্চ শিক্ষার জন্য নিয়মিত সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতার কারণে নারীরা এসময় অনেকটা পিছিয়ে পড়লেও তাঁদের সাহিত্য প্রতিভার কথা জানা যায়। মুঘল আমলে গুলবদন বেগম, নূরজাহান, মমতাজ মহল, জাহান আরা, রওশন আরা এবং জেবুন্নিসা শিক্ষিত ছিলেন। সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) ফতেহপুর সিক্রিতে রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণির মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায় (Nagendranath, 1916, p. 202)। বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের কন্যা বিবি পরি একজন শিক্ষিত নারী ছিলেন। নবাবি আমলে জিন্নাতুননেসা, নাফিসা বেগম, দুরদানা বেগম, শরফুন্নেসা, ঘসেটি বেগম, মায়মুনা বেগম, আমিনা বেগম ও লুৎফুন্নেসা সকলেই ছিলেন সুশিক্ষিত। বাংলার অনেক জমিদার জাগতিক প্রয়োজনে মেয়েদের শিক্ষিত করতেন। উইলিয়াম অ্যাডাম মন্তব্য করেন, রাজশাহী জেলার জমিদারেরা প্রায় সকলেই তাদের মেয়েদের কিছুটা গোপনে শিক্ষা দিতেন। তাদের মধ্যে রানী সূর্যমণি, রানী কোমলমণি দাসী ও রানী ভবানী অন্যতম। তাঁরা হিসাবশাস্ত্র ও বাংলাসহ নানা বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন (Anath, 1941, p. 187-189 ; মল্লিকা, ২০০১, পৃ. ৪৯)। হাজী মুহম্মদ মুহসীনের বোন মন্নুজান খানম (১৭১৭-১৮০৩) পড়াশুনা শিখেছিলেন। তৎকালে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ খুব একটা লক্ষণীয় না হলেও গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় অভিজাত শ্রেণির নারীরা শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন এবং সুশিক্ষা ও প্রতিভার বলে তাঁরা ইতিহাসের আলোয় আসতে সমর্থ হন। তবে সাধারণ ঘরের নারীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হন। (শামসুন, ১৩৪৭, পৃ. ৬৫; Murshid, 1983, p. 63-70)

বাংলায় নারী শিক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ শুরুর ক্ষেত্রে কলকাতার বাঙালি নারীরা ১৭১৭ সালে কলকাতার কুদালুরে শিশুদের জন্য একটি *অ্যাংলো ভার্নাকুলার বিদ্যালয়* স্থাপন করেন (মালেকা ও আজিজুল হক, ২০০৪, পৃ. ১৪)। এদেশে বসবাসরত *বেঙ্গল আর্মি* ও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারির সন্তানদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৭৮২ সালে মেজর জেনারেল ক্রিক প্যাট্রিক খিদিরপুরে *আপার অরফ্যান স্কুল* ও আলিপুরে *লোয়ার অরফ্যান স্কুল* নামে দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (তপতী, ১৩৯৮, পৃ. ২২৮)। ১৭৮৭ সালে একজন সুইডিস মিশনারি John Zachariah Kiernander খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষা দেয়ার জন্য কলকাতায় মেয়েদের জন্য প্রথম একটি স্কুলে বালিকা শাখা খোলেন (Amitabaha, 1968, p. 15)। এভাবে বাংলায় নারীশিক্ষার প্রতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের সূচনা হয়।

পূর্ব বাংলার ঢাকায় *ব্যাপটিস্ট* মিশনের পক্ষে রেভারেন্ড লিওনার্ড ১৮১৫-১৮২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে ৪টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। তবে মিশনারিদের বিদ্যালয়ে খ্রিষ্টান ধর্ম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রধান হওয়ায় মুসলিম মেয়েরা এমনকি উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও এ প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহী ছিল। সাধারণত নিম্ন মধ্যবিত্তের সন্তান এবং স্থানীয় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মেয়েরা এখানে পড়াশুনা করতো (Shahanara, 1978, p. 21)। তৎকালে ৩০ জন ছাত্রী নিয়ে ঢাকার নারিন্দায় একটি স্কুল শুরু হয়। চট্টগ্রামে মাদারবাড়ি, মুরাদপুর এবং ভালুয়াদিঘিতে বালিকা বিদ্যালয় ছিল বলে জানা যায় (সোনিয়া, ২০০২, পৃ. ১১৯)। অন্যদিকে শ্রীরামপুর মিশনারিরা ১৮২৪ সালের মধ্যে পূর্ব বাংলার ঢাকায় ৫টি এবং চট্টগ্রামে ৩টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে (Priscilla, 1839, p. 85-

89; Jogesh, 1944, p. 17)। এ স্কুলগুলিতে মুসলিম মেয়েরা পড়ত বলে সহজেই অনুমান করা যায়। তদানীন্তন পূর্ব বাংলার যশোর জেলার বিচারক এইচ. এম লিগুর স্ত্রী মিসেস লিগু নিজের টাকায় যশোরে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে তিনি প্রতিদিন দু'ঘন্টা করে মেয়েদের সেলাই শেখাতেন। উল্লেখ্য পরবর্তীকালে বাংলায় নারীশিক্ষা কারিকুলামের অন্যতম বিষয় ছিল সেলাই বা Needle Work (Proceeding of the Government of Bengal, 1925, p. 21-22)। তবে খ্রিষ্টান মিশনারি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির অধিকাংশই অর্থের অভাবে ১৮৩৮ সালের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় (Sonia, 1996, p. 145)। কেননা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ইতোমধ্যে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য, সমসাময়িক কলকাতার কয়েকটি শিক্ষিত অভিজাত পরিবারে বাড়িতে মেম সাহেবদের এনে তাঁদের সাহায্যে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হতো। অন্তঃপুরে মেয়েদের এই শিক্ষা 'জেনানা শিক্ষা'[১] বা 'অন্তঃপুর শিক্ষা' নামে পরিচিত ছিল এবং ধীরে ধীরে মুসলিম পরিবারেও এ শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম দিকের একটি পাঠ্যক্রম ছিল নিম্নরূপ:

> সাহিত্য : কবিতা কুসুমাঞ্জলি-দ্বিতীয় ভাগ-কৃষ্ণকিশোর শর্মা কৃত; মেঘনাদবধ কাব্য-চতুর্থ সর্গ, চারু পাঠ-তৃতীয় ভাগ।
> ব্যাকরণ : সন্ধি, লিঙ্গ, কারক, সমাস ও প্রকৃতি।
> ইতিহাস : ভারতবর্ষের ইতিহাস-প্রথমভাগ-তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃত।
> ভুগোল : ভূবিদ্যা-রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কৃত।
> অঙ্ক : শুভঙ্করী হিসাব-কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় কৃত।
> রচনা : শিশুপালন-শিবচন্দ্র দেব কৃত ও সাধারণ আহার দ্রব্যের পাক প্রকরণ।
> (বসন্তকুমার, ১৯৮৭ : ৪৪)

১৮৬৩ সালের ১১মে ১৬ জন ছাত্রী নিয়ে ঢাকার সূত্রাপুরে প্রথম সরকারি নর্মাল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মুসলিম ছাত্রীদের পড়ার সুযোগ ছিল না, স্কুলটি ১৮৭২ সালে বন্ধ হয়ে যায় এবং বন্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ১৭ জন মেয়ে প্রতিষ্ঠানটি থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন (Sharif, 1986, p. 79)। ১৮৬৩ সালে পাবনায় বাবু হরিশচন্দ্র শর্মা নিজ বাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর স্ত্রী বামাসুন্দরী এখানে শিক্ষকতা করেন এবং প্রতি মাসে ২০ টাকা করে বেতন পেতেন। এক বছরের মধ্যে এই স্কুলে ২৫ জন হিন্দু-মুসলিম মেয়ে পড়ত বলে জানা যায় (ঢাকা প্রকাশ, ১৮৬৩, পৃ. ৩)। ১৮৬৯ খ্রি. বগুড়ায় মাত্র তিন জন ছাত্রী নিয়ে 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে মুন্সি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ১৮৯৫ সালে সিরাজগঞ্জে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে খায়রুন্নেসা খাতুন (১৮৭৬-১৯১০) তাঁর জীবনের শেষ পনের বছর শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। খায়রুন্নেসা ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রথম মুসলিম চাকুরীজীবী নারী (Asha, 2015, p. 46-47; মকসুদ, ১৯৯২, পৃ. ৫৪)। উল্লেখ্য এ সময় পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় অল্প সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং সেখানে মুসলিম মেয়েরা পড়ালেখা শুরু করলেও তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে খুব বেশি অগ্রগামী হতে পারেনি। উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে (১৮৩৫ ও ১৮৩৮) দু'চার জন বিধবা নারী অথবা জমিদার কন্যা ছাড়া অধিক সংখ্যক

শিক্ষিত নারীর নাম উল্লেখ করতে পারেননি (Adam, 1940, p. 27)। অর্থাৎ মিশনারীদের এবং দেশীয়দের তৎপরতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলেও নারীশিক্ষার হার তখন পর্যন্ত তেমন একটা বৃদ্ধি পায়নি।

বাঙালি মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে পশ্চাতপদতার নানা কারণ বিদ্যমান ছিল। তখন রক্ষণশীল সমাজের ভীতি ছিল — নারী শিক্ষিত হলে পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরুষের কর্তৃত্ব কমে যেতে পারে। আবার অর্থনৈতিক দুর্বলতায় পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহ করাও দুরূহ ছিল। মনে করা হতো মেয়েরা ঘরেই অধিক উপার্জনশীল। অর্থাৎ তারা গৃহস্থালির কাজ, রান্না-বান্না, বাচ্চা লালন পালন, স্বামী ও তার পরিজনদের সেবা করবে। ধারণা করা হতো শিক্ষিত হলে মেয়েরা আর গৃহকর্ম করবে না। মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা অথবা অসতী হবে — এই বিশ্বাস উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্তও প্রচলিত ছিল (স্বপন, ১৪১২, পৃ. ৯)। নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে সমসাময়িক লেখনী ও পত্র পত্রিকায় ব্যাঙ্গাত্মক লেখা ছাপা হতো। সমাজে তখন অবরোধপ্রথা এবং কঠোর পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। তাই মেয়েদের পক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বিদ্যার্জন করা সামাজিক বিধি নিষেধের মধ্যেই ছিল। অন্যদিকে বাল্যবিবাহের কারণে মেয়েরা পড়াশুনা করতে পারেনি। বরং তৎকালে যে কয়েকজন নারী পড়াশুনা করে নারীশিক্ষা বিস্তারে ও নারী জাগরণে ভূমিকা পালন করেন তাঁদের অধিকাংশই বিয়ের পর নিজ নিজ স্বামীদের অনুপ্রেরণায় তাঁরা গৃহে শিক্ষা লাভ করেন। নারীশিক্ষার অপর এক বাধা ছিল ঠিক শিক্ষয়িত্রী না পাওয়া। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের অনুকূল শিক্ষা কারিকুলামের ঘাটতির কারণে মুসলিম নারীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশি পিছিয়ে পড়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের অসম নীতিমালাও নারীশিক্ষার অন্তরায় হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়। অন্যদিকে আলোচ্যপর্বে মুসলমানদের পুনর্জাগরণে যে সকল নেতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, যেমন- স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮৪০-১৯১২), নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৮-১৯২৮) প্রমুখ ব্যক্তি মুসলিম নারীসমাজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। যদিও এক্ষেত্রে সৈয়দ আমীর আলী কিছুটা ব্যতিক্রম ছিলেন (ওয়াকিল, ১৯৯৭, পৃ. ৪৯৬)। ফলে দেখা যায় মুসলিম মনীষীদের আগ্রহের অভাব, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাসহ নানা কারণে উনিশ শতকের শেষদিকে এসেও বাংলার মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হার অত্যন্ত নগণ্য পরিলক্ষিত হয়।

মূলত আঠারো শতকের শেষের দিকে বর্হিবিশ্বে নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার বিকাশ ঘটে। এ ক্ষেত্রে Marry Wollstonecraft (1759-1797) এর *A Vindication of the Rights of Women* (১৭৯৮) গ্রন্থটি চিন্তাশীল মহলে জাগরণের সূত্রপাত ঘটায়। তদানীন্তন কলকাতার *হিন্দু কলেজের* প্রগতিশীল শিক্ষক Henry Louis Vivian Derozio (1809-1831) ছাত্রদের মানবিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ করতেন। অন্যদিকে ১৮৬৯ সালে John Stuart Mill (1806-1873) এর *The Subjection of Women* গ্রন্থটি শিক্ষিত বাঙালি তরুণদের একাংশকে উজ্জীবিত করে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মিলের বইটি বাংলায় অনুবাদ করেন এবং সমগ্র প্রতিরোধ উপেক্ষা করে স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে বাইরের জগতে নিয়ে আসেন। এছাড়া Dorothea Beale (1831-1906), Dame (Jane) Frances Dove (1847-1942), Sophie Bryant (1850-1922), Margaret McMillan (1860-1931) প্রমুখ নারীর ইউরোপ আমেরিকায় নারীশিক্ষা প্রসারে নানা কার্যক্রম ও সফলতা বাংলার সমাজে নারীশিক্ষার বিষয়ে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলায় রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রভাবে সমাজ পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। এসময় উপলব্ধি হয় পশ্চিমা দেশের মেয়েদের সাথে বাঙালি মেয়েদের প্রথম ও প্রধান পার্থক্য হলো তাদের শিক্ষার অভাব। এরই পথ ধরে নারীশিক্ষার প্রচেষ্টায় প্রথম এগিয়ে আসেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও ব্রাহ্মসমাজ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এর সহায়তায় ১৮৫৭-৫৮ সালে বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রিষ্টান মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ আরম্ভ করেন এবং এর কয়েক দশকের মধ্যে রক্ষণশীল হিন্দু নারীরা ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তারা বুঝতে পারেন শিক্ষা ছাড়া নারীর হৃদয় সংকীর্ণ ও অমার্জিত থেকে যায়। আবার যে সকল নারীর স্বামীরা শিক্ষিত ছিলেন তারা শিক্ষিত স্বামীর যোগ্য স্ত্রী হওয়ার জন্য নিজেকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হিসেবে তৈরি করতে প্রস্তুত হন (জ্ঞানদানন্দিনী, ১২৮৮ : ২৯৩)। সমাজের অর্ধ অংশ নারী ও অর্ধ অংশ পুরুষ। তাই নারী মূর্খ, অসার ও অপদার্থ হয়ে থাকলে সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। নারীশিক্ষার সমর্থক পুরুষরা মনে করতেন সন্তানকে ঠিকভাবে লালন পালন করতে এবং শিক্ষা দিতে হলে মাকে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে। *বামাবোধিনী পত্রিকায়* এ সম্পর্কে একটি মন্তব্য নিম্নরূপ:

> ... নারীর দায়িত্বপূর্ণ জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই শিক্ষার আবশ্যকতা বিদ্যমান। আদর্শ মাতা, আদর্শ পত্নী ও সুগৃহিণী হওয়া সকলই শিক্ষাসাপেক্ষ। সন্তান পালন, সন্তানের চরিত্রগঠন, নীতিশিক্ষা এগুলি সুমাতার হস্তে হইলে যেরূপ সুফল প্রদান করে, অন্যথা সেরূপ হওয়া দুর্ঘট। শিশু সন্তানের উপর মাতার প্রভাব অপরিসীম ... সুগৃহিণী হইতে হইলে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, সেবা, নিঃস্বার্থতা, সমদর্শীতা প্রভৃতি যে সদগুনের আবশ্যক; সুশিক্ষার দ্বারা তাহা অধিকতর উজ্জল ও সহজ হয়। (বামাবোধিনী, ১৯১৫, পৃ. ২১২)

তখন উপলব্ধি হয় যে, মেয়েদের সহজ বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শেখানো দরকার, তাহলে তাঁরা পরিবারের সদস্যদের প্রথমিক চিকিৎসা দিতে পারবে। নারী শিক্ষিত হলে পরিবারের সকলের সাথে মিলে মিশে থাকবে, তারা অহেতুক ঝগড়া কলহে লিপ্ত হবে না (মুরশিদ, ২০১৬, পৃ. ৫৯)। কেননা শিক্ষা মানুষের মনকে উদার ও প্রশস্ত করে এবং সহনশীলতা বৃদ্ধি করে। যথার্থ শিক্ষা পেলে নারীরা ভালো-মন্দের পার্থক্য করার মতো জ্ঞান ও ধর্মীয় ধারণা লাভ করবে। তাদের মানসিক বৃত্তি বিকশিত হবে, গৃহকর্মে আরো পারদর্শী হবে এবং পরিবারের সুনাম বয়ে আনবে। তাই উনিশ শতকের শেষের দিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যরা নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেয়। ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজে এসকল ধারণা বিকাশ লাভ করতে থাকে।

পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মাইলফলক হিসেবে *ইডেন ফিমেল স্কুল* অগ্রগন্য। এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে দেখা যায়, ১৮৭৩ সালে ব্রাহ্ম সমাজের বয়স্ক মেয়েদের পড়াশুনার জন্য 'শুভসাধিনী সভা'র পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ স্কুল পরিদর্শক Miss Mary Carpenter উক্ত বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে এসে ঢাকায় অনুরূপ আরো একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুপারিশ করে রিপোর্ট প্রদান করেন। ফলে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরা (শ্রী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ব্রজসুন্দর মিত্রবাবু ও প্রণবকুমার দাস) শ্রী অভয়চন্দ্র দাসের বাসায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যালয় দু'টি একত্র হয়ে *ঢাকা ফিমেল স্কুল* নামে অভিহিত হয় এবং ৪৭ জন মেয়ে শিশু নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীকালে ১৮৭৮ সালে জুন মাসে Miss Carpenter এর রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্ণর স্যার অ্যাশলে ইডেনের (১৮৭৭-৮২) নামানুসারে স্কুলটির নামকরণ *ইডেন গার্লস স্কুল* হয়ে

সরকারিকরণ হয়। ১৮৮০-৮১ সালের সরকারি এক প্রতিবেদনে *ইডেন ফিমেল স্কুল* 'the best girls school' হিসেবে প্রশংসিত হয়। ১৮৯৬-৯৭ সালের শিক্ষা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ইডেনে এসময় ১৩০ জন ছাত্রী পড়াশুনা করে এবং এর মধ্যে ১ জন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় (সোনিয়া, ২০০২, পৃ. ১২২)। ঢাকা বিভাগের অন্যতম বালিকা বিদ্যালয় *ইডেন ফিমেল স্কুলে* ১৯০১ সালে ১০৭ জন ছাত্রী পড়াশুনা করে (১৩০ টি সিট ছিল, ছাত্রী স্বল্পতার কারণে সবগুলি সীট পূরণ হয়নি)। এদের মধ্যে ৮২ জন হিন্দু, ১৯ জন ব্রাহ্মসমাজের, ৪ জন খ্রিষ্টান ও ২ জন মুসলমান। এ বছর প্রতিষ্ঠানটি থেকে ৩ জন ছাত্রী এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকে তৃতীয় বিভাগে পাশ করে (General Report on Public Instruction in Bengal, 1902, p. 12)। ১৯০৭-১৯১২ সালে সরকারি রিপোর্টে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের মধ্যে *ইডেন স্কুলকে* 'Excellent High School' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উল্লেখ্য তৎকালে এ স্কুলের জন্য একটি ২০ টাকা এবং একটি ১০ টাকা মূল্যমানের দু'টি সরকারি বৃত্তি চালু ছিল। (Proceedings of the Government of Bengal, 1907-1912, p. 34)

১৯২১ সালে ঢাকার সদরঘাট এলাকায় নীলকর Wise-এর কুঠিবাড়িতে *ইডেন ফিমেল স্কুলটি* স্থানান্তর হয় এবং হাইস্কুলের পাশাপাশি কলেজ সেকশন সংযোজিত হয়ে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হয় *ইডেন গার্লস স্কুল এন্ড ইন্টারমিডিয়েট কলেজ*। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং এসময় অনেক মুসলমান ছাত্রী পড়াশুনার জন্য এ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে প্রতিষ্ঠানটি এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করে।

পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষা প্রসারে কুমিল্লা জেলার পশ্চিমগাঁওয়ের জমিদার নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী (১৮৪৭-১৯০৩) দু'টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। একটি নানুয়াদিঘির তীরে ১৮৭২ সালে (পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়টি 'শৈলরাণী[২] বালিকা বিদ্যালয়' নামকরণ হয়েছে) এবং অন্যটি ১৮৭৩ সালে শহরের কান্দিরপাড়ে। এ স্কুলটির সাথে ছাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা এবং ছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় (ফয়জুন্নেছা, ১৯৪৮, পৃ. ৯-১৬)। ইতিহাস স্বীকৃত যে, এই প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়টি ভারত উপমহাদেশে মুসলিম নারীশিক্ষার জন্য প্রথম সরকারি প্রতিষ্ঠান। এখনও স্কুলটি 'নবাব ফয়জুন্নেছা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়' হিসেবে কুমিল্লায় নারীশিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য মুসলিম নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটিতে প্রথম অবস্থায় কতজন মুসলিম মেয়ে পড়ালেখার জন্য ভর্তি হয়েছিল তার সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় না। বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত হিন্দু এবং ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা অধিক পরিমাণে এখানে পড়াশুনা করত (সোনিয়া, ১৯৯৩, পৃ. ৬৫৯)। সরকারি এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৮৭৭-৭৮ সালে ত্রিপুরা জেলায় ছয়জন ছাত্রী প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং তাদের মধ্যে একজন ছিল মুসলমান কৃষক পরিবারের সন্তান (General Report on Public Instruction in Bengal, 1878, p. 81)। তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার মধ্যে কুমিল্লাতেই মুসলিম নারীশিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। তাই এই ছাত্রীটি উক্ত *ফয়জুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ের* মুসলিম ছাত্রী ছিল।

অন্যদিকে তাহেরুন্নেসা নামক একজন মুসলিম নারী পাবনায় *বোদা বালিকা বিদ্যালয়ে* প্রথম শ্রেণিতে পড়েছেন এবং ১৮৬৫ সালে তিনি *বামাবোধিনী পত্রিকায়* মুসলিম নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা কোনো বাঙালি মুসলিম নারীর

এবিষয়ে প্রথম রচনা বলে পরিগণিত। তিনি নারী শিক্ষার উপর জোর দিয়ে বলেন,"যদি এই ধরাধামে প্রকৃতই সুখধাম দেখিতে ইচ্ছা থাকে তবে অগ্রে আপনাদের স্ত্রীগণকে বিদ্যায় ভূষিত করিতে চেষ্টা করুন" (তাহেরুন্নেছা, ১৮৬৫, পৃ. ২৭৫-২৭৭)। ১৮৭৩ সালে *আলেকজান্ডার উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়* (বর্তমানে *বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়*) নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ময়মনসিংহ শহরের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপিত হয়। ১৮৭৬ সালে পূর্ব বাংলায় উত্তরাঞ্চলের জনপদ রংপুরে "রংপুর বালিকা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়" নামক একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত উত্তরবঙ্গে নারী শিক্ষার জন্য এটি প্রথম প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে স্কুলটি "রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়" নামে বর্তমান। পূর্ব বাংলায় ১৮৭৮ সালে আনন্দচন্দ্র খাস্তগির চট্টগ্রামে একটি মধ্য ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলটি 'ড. খাস্তগির গার্লস হাই স্কুল' নামে বর্তমানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার নারী জাগরণের অন্যতম নেত্রী, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও যোদ্ধা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২) এ বিদ্যালয়ের প্যাথিতযশা ছাত্রী ছিলেন। ১৮৮০ সালে টাংগাইলে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় যা "বিন্দু বাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়" নামে বিদ্যমান। মূলত ১৮৫০ এর দশক থেকে ব্রিটিশ সরকার বাংলায় নারীশিক্ষার জন্য কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া শুরু করে। এরপরই সমগ্র বাংলায় নারীশিক্ষার প্রসার এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়, যা নিম্নরূপঃ

সারণি-১ : বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রীর সংখ্যা

বছর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রীদের সংখ্যা
১৮৬৩	৯৫	২,৪৮৬
১৮৭১	৩৪৪	৬,৭১৭
১৮৮১	১,০৪২	৪৪,০৯৬
১৮৯০	২,২৩৮	৭৮,৮৬৫

উৎসঃ *General Report on Public Instruction in Bengal for the years 1863-64, 1871-72, 1881-82 and 1890-91*

উল্লেখ্য উনিশ শতকে বাংলায় সরকারি এবং বেসরকারি প্রয়াসে প্রাথমিক শিক্ষা বিকাশ লাভ করলেও মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি অনেক পরে পরিলক্ষিত হয়। ১৮৭০ এর দশকের পর *বেথুন স্কুল*কে কেন্দ্র করে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হয়। *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* ১৮৭৮ সালে মেয়েদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ায় এ বছর চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪) প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (মুরশিদ, ২০১৬, পৃ. ২৪৯)। এভাবে উচ্চশিক্ষার দরজা খুলে যাওয়ার পর কয়েক বছরের মধ্যে ১৮৮২ সালে চন্দ্রমুখী বসু এবং কাদম্বিনী বসু (১৮৬১-১৯২৩) বি.এ পাস করেন। ১৮৮৪ সালে চন্দ্রমুখী বসু ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পাশ করেন। অন্যদিকে কাদম্বিনী বসু মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন এবং তিনিই প্রথম বাঙালি নারী চিকিৎসক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য William Hunter ১৮৮৭ সালে সমাবর্তন ভাষণে উল্লেখ করেন যে, ১৮৮৬ সালে বাংলায় ২৩ জন ছাত্রী এন্ট্রান্স, ৪ জন এফ.এ এবং ৩ জন বি.এ পাশ করেন। পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে কামিনী সেন, প্রিয়তমা দত্ত, নির্মলাবালা সোম, কুমুদিনী খাস্তগীর, সুপ্রভা গুপ্ত, লীলা সিংহ, সরলা ঘোষাল, শরৎ চক্রবর্তী,

জীবনবালা দত্ত, ইন্দিরা ঠাকুর, প্রিয়ম্বদা বাগচীসহ মোট ১২ জন বি.এ পাস করেন এবং তাঁদের অনেকে এম.এ পাস করেন। এভাবে বাংলায় মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চশিক্ষার বিস্তার ঘটে। উল্লেখ্য বিশ শতকের প্রথম দিকে সরোজিনী নাইডুর ছোট বোন মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় *কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে দর্শন শাস্ত্রে ট্রাইপস লাভ করেন এবং ১৯৪১ সালে *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে সুরমা মিত্র মেয়েদের মধ্যে প্রথম পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন (প্রাগুক্ত, ২৪৯)। তবে উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায় এ সময় বাংলায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে এমন মুসলিম নারীর পরিচয় পাওয়া কঠিন।

সারণি-২ : ১৮৮১-১৮৮২ শিক্ষাবর্ষে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সর্বমোট ছাত্রী সংখ্যা	মুসলিম ছাত্রী সংখ্যা	শতাংশ
ইংরেজি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	-	-
মধ্য ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৪	১.১
মধ্য বাংলা বালিকা বিদ্যালয়	৫২৭	৬	১.১
প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭৪৫২	১৫৭০	৮.৯
নর্মাল বালিকা বিদ্যালয় (শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)	৪১	-	-

উৎস : *Supplement to the Progress of Education in Bengal 1881-1882,* উদ্ধৃত, গোলাম কিবরিয়া, ১৯৯৫ : ৫০]

পূর্ব বাংলায় মুসলিম নারীশিক্ষা প্রসারে ১৮৮৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সম্মিলনী'। তদানীন্তন ঢাকা কলেজের কতিপয় ছাত্র যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- আবদুল আজিজ, আবদুল মজিদ, ফজলুল করিম প্রমুখ সম্মিলনীটি গড়ে তোলেন। পর্দাপ্রথার কঠোরতার কারণে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষাদান অসম্ভব ভেবে এ সম্মিলনী গৃহশিক্ষাকে অবলম্বন করে ছাত্রীদের গৃহশিক্ষক দ্বারা গৃহে পড়ানো এবং বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে (Sufia, 1996, p. 248)। এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং সম্মিলনী কর্তৃক পাঠ্যসূচী ও পুস্তক নির্ধারিত ছিল। পরীক্ষকগণ ছাত্রীদের বাড়িতে যেয়ে অভিভাবকের সহায়তায় উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষাতে পরীক্ষা নিতেন। পরবর্তীতে এই শিক্ষার স্তর ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। ১৮৮৩ সালে সম্মিলনী প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরের বার্ষিক পরীক্ষায় ৩৪ জন পরীক্ষার্থী সফলতা লাভ করে এবং তারা সকলেই ছিলেন মুসলিম কন্যা সন্তান (আল-মাসুম, ২০০৮, পৃ. ৫৩৬)। উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সার্টিফিকেট, পদক ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনটি টিকে ছিল (মুনতাসির, ১৯৮৩, পৃ. ৬৩-১২৫)। এ সম্মিলনীর অনুরূপ ১৮৭৬ সালে 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' শ্রীহট্ট শহরে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মেয়েরা এখানে পড়াশুনা করতো। এমনকি অন্তঃপুরে নারীরা সম্মিলনীর নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারতেন। ১৮৮৩ সালে ১২১ জন নারী এই সম্মিলনীর পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে ২২ জন ছিলেন মুসলমান (আল-মাসুম, ২০০৮, পৃ. ৫৩৬)। প্রকৃতপক্ষে কোনো বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত না হয়ে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শিক্ষাপদ্ধতি ছিল এটি। সমাজের জাগরণ, উন্নতি ও নারীমুক্তির সাথে

নারীশিক্ষার যে গভীর সম্পর্ক আছে, তা উপলব্ধি করে উক্ত সম্মিলনী দু'টি তাদের সামর্থ্যের মধ্যে এরূপ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে।

উনিশ শতকের শেষ দশকে সাধারণ স্কুল কলেজের পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষায়ও মেয়েদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। উল্লেখ্য এসময় ১৫টি কোরান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮৮ জন ছাত্রী ছিল (Usha, 1963, p. 39)। আবার মুসলমান মেয়েরা অন্তঃপুরে আরবি, উর্দু ও বাংলার সাথে সাথে ইংরেজি শিখতে থাকে। ১৯০১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, সে সময় পর্যন্ত ৪০০ জন মুসলিম মেয়ে ইংরেজি জানত। *মিহির ও সুধাকর* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, গৃহেই যদি এমন শিক্ষা লাভ সম্ভব তবে স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অসীম (মুস্তাফা নূরউল, ১৯৭৭, পৃ. ২২)। মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশ শতকের শুরুতে বাংলার মুসলিম নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটে। দেলোয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৩), সৈয়দ শামসুল হোদা (১৮৬২-১৯১২), সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০-১৯৩৪) প্রমুখ ব্যক্তি ১৯০৩ সালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' গঠন করেন। মুসলিম সমাজে নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা ছিল এ সমিতির অন্যতম লক্ষ্য (প্রাগুক্ত, ৪৫০)। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হওয়ায় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৫-০৬ সালে পূর্ব বাংলার নারীশিক্ষা সম্পর্কিত এক বার্ষিক রিপোর্টে মহিলা স্কুল পরিদর্শক Miss Brock-এ অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি বলেন,

> I have this year seen more of Muhammadan schools and come more into touch with Muhammadan zanana life... In the former this is undoubtedly due to the early age at which girls are withdrawn, not for marriage, but within the pardah : in the latter it is owing to the almost utter lack of training and education in the teachers. From what I have observed I consider that in the case of Muhammadans the work has not yet been attempted on the right lines for success … Muhammadan schools must be altogether pardah, and all the local male officials entirely withdrawn from the schools. A conveyance grant for the schools is necessary if high class Muhammadan girls are to be secured. Women of good family must be obtained as teachers for the schools… The text books above all should be such as are acceptable to the Muhammadans. I am convinced that if we could obtain teachers capable of giving an acceptable course of instruction, a large number of zananas would be at once available. (Sufia, 1996, p. 321)

অন্যদিকে *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির* ১৯০৬ সালে কলকাতা সম্মেলনে মুসলিম নারীশিক্ষা বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) বাংলার মুসলিম নারীর আর্থ-সামাজিক দুরাবস্থা ও শিক্ষার অন্তরায়গুলি তুলে ধরে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি নারীশিক্ষার প্রধান প্রতিবন্ধক অবরোধপ্রথার তীব্র সমালোচনা করেন এবং মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন (শ্যামলী ও অন্যান্য, ১৯৯৮ : ১০৫)। এই সম্মেলনে মুসলিম নারীশিক্ষার অগ্রগতির জন্য পর্যাপ্ত অনুদানসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানানো হয়।

বঙ্গভঙ্গের পর 'পূর্ববাংলা ও আসাম' প্রদেশে জেনানা বা অন্তঃপুর শিক্ষার উপরও গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এলক্ষ্যে ১৯০৭ সালে ২১ জানুয়ারি ঢাকায় জনশিক্ষা পরিচালক ও মহিলা পরিদর্শকদের এক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যেখানে মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে অক্ষম সেখানে পারিবারিক পরিবেশে 'জেনানা শিক্ষা' সাধারণ মেয়েদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। এভাবে দেখা যায়, ১৯০৬-০৭ সালে ঢাকার জেনানা কেন্দ্রগুলিতে ২১ জন হিন্দু ও ১৭ জন মুসলমান শিক্ষার্থী ছিল। ধীরে ধীরে এই শিক্ষাব্যবস্থা জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯১১-১২ সালের সরকারি এক রিপোর্টে জানা যায়, ১২৬ জন হিন্দু নারী এবং ১৪৫ জন মুসলিম নারী জেনানা শিক্ষা গ্রহণ করেন। *বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি* ১৯০৮ সালে ময়মনসিংহ ও ১৯১০ সালে বগুড়া অধিবেশনে স্থানীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে মুসলিম বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানায় (Report on the Progress of Education, 1913, p. 101)। ফলে সরকার মুসলিম নারীশিক্ষা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। এসময় পূর্ব বাংলার মেয়েদের জন্য উপযোগী পাঠ্যক্রম চালু করা হয় যার অন্তর্ভুক্ত ছিল — পঠন, লিখন, ভূগোল ও ইতিহাস। এসময় এই প্রদেশে বেশ কিছু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং *ইডেন বালিকা বিদ্যালয়ে* শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ময়মনসিংহের *আলেকজান্ডার বালিকা বিদ্যালয়কে* সরকারিকরণ করা হয় এবং এখানে একটি ছাত্রীনিবাস স্থাপন করা হয়। ফলে মেয়েরা পড়াশোনায় আরো বেশি অগ্রসর হওয়ার সুযোগ লাভ করে। অন্যদিকে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে ১১৪টি বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য এসব বৃত্তির মধ্যে মুসলিম ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল ৭টি বৃত্তি। (Report of the Provincial Muhammadan Education Conference, 1908 & 1910, p. 79, 122)

বিশ শতকের প্রথম দিকে পূর্ব বাংলায় মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা পালন করেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাতা খুজিস্তা আকতার বানু (১৮৭৮-১৯১৯)। তিনি ১৯০৯ সালে 'সোহরাওয়ার্দী বালিকা বিদ্যালয়' নামক একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। খুজিস্তা আকতার বানু তৎকালীন বাংলার মুসলিম নারীর মধ্যে সর্বপ্রথম সিনিয়র কেমব্রিজ (মেট্রিকুলেশন সমমান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (Anowar, 2003, p. 134)। অন্যদিকে ১৯১০ সালে নারায়ণগঞ্জ শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় *মর্গান গার্লস স্কুল*।[৩] এ স্কুলে মুসলিম মেয়েরা প্রাথমিক পর্যায় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। ২০১২ সালের মে মাসের ৪ তারিখে এই বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। তাতে দেখা যায়, মর্গান স্কুলের অনেক শিক্ষার্থী সমাজের নানা জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। স্বনামধন্য ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া এ স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে *স্কুলটি* গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বাঙালি মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। তিনি অনুধাবন করেন শিক্ষার অভাবই নারীসমাজের অধস্তন অবস্থার মূল কারণ। ১৯১০ সালের ৩ ডিসেম্বর তিনি কলকাতার ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি ছোট কক্ষে আটজন ছাত্রী নিয়ে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সমসাময়িক মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আবদুর রসুল (১৮৭০-১৯৭১৭)-এর বাসভবনে ১৯১১ সালের ২ এপ্রিল রোকেয়ার স্কুল সংক্রান্ত প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সভায় মৌলভী সৈয়দ আহমদ আলীকে সম্পাদক করে স্কুল পরিচালনা কমিটি

গঠিত হয় (শামসুল, ১৯৮৯, পৃ. ৯১)। রোকেয়ার স্কুলে প্রথম দিকে ছাত্রীদের অনেকেই পড়ালেখা করত বিনা বেতনে বা নামমাত্র বেতনে এবং ছাত্রীদের যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া মওকুফ করা হতো অনেক সময়। এ সকল সুযোগসহ পর্দার নিশ্চয়তা দিয়ে ছাত্রী সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন মুসলিম পরিবারে গিয়ে তিনি অনুরোধ জানাতেন (নাসিরউদ্দিন, ১৩৮৫, পৃ. ৯৭)। ১৯১৫ সালে পাঁচটি ক্লাস নিয়ে স্কুলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তরে পৌঁছে এবং দু'বছর পর মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। উল্লেখ্য ১৯৩১ সালে বিদ্যালয়টির উচ্চতর শ্রেণিসমূহ থেকে জোবেদা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, কায়সারী বেগম, খুরশিদী বেগম, হানিফা খাতুন ও আবেদা খাতুন প্রমুখ ছাত্রী *বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদের* (BSP) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (The Mussalman, 1932 : 16)। ১৯৩১ সালেই *সাখাওয়াত মেমোরিয়ালের* ছাত্রীরা প্রথমবারের মতো *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের* প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। রোকেয়ার প্রচেষ্টায় এসময় বাংলায় মুসলিম মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁর স্কুল থেকে বহু মহীয়সী নারী জন্ম নিয়েছিলেন যারা পরবর্তী সময়ে বাংলায় মুসলিম নারী জাগরণে ও নারীমুক্তি আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্বনামধন্য শিক্ষক অধ্যাপক লতিফা আকন্দ (১৯২৫-২০১৬) *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়* এর ছাত্রী ছিলেন।

বিশ শতকে পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন লীলাবতী রায় বা লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০)। বাংলার নারীর মধ্যে জ্ঞানের আলো বিকিরণের উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে বারোজন বন্ধু সহকর্মী নিয়ে লীলানাগ "দীপালি সংঘ" গঠন করে। এ বছরই তিনি নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে 'দীপালি হাই স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে তিন বছর শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে স্কুলটি *কামরুন্নেসা হাই স্কুল* নামে পরিচিত এবং ঢাকার টীকাটুলিতে অবস্থিত (মালেকা, ২০১৬, পৃ. ২৬)। ১৯২৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তিনি স্থাপন করেন *নারীশিক্ষা মন্দির*। বয়স্কদের শিক্ষা সহায়তাদানের জন্য এখানে ছিল সংস্কৃতি বিভাগ, কোচিং বিভাগ, শিল্প বিভাগ, আশ্রয় বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগ। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি *শের-এ-বাংলা মহিলা মহাবিদ্যালয়* নামে পরিচিত। তৎকালে পূর্ব বাংলায় নারীশিক্ষা বিস্তারে লীলানাগ ঢাকা শহরে আরো কয়েকটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যথা : (১) *নিউ হাইস্কুল* (অভয়দাস লেন) (২) *নারী শিক্ষা মন্দির* (টিকাটুলী) (৩) *শিক্ষা ভবন হাইস্কুল* (বকশীবাজার) (৪) *শিক্ষায়তন হাইস্কুল* (কয়েতটুলী) (৫) *শিক্ষালয়* (হেয়ারস্ট্রিট) (৬) *বাংলা বাজার বালিকা বিদ্যালয়* (বাহাদুর শাহ পার্ক সংলগ্ন)। এছাড়া ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (পলাশ, ২০১৫ : ১২৮-১২৯)। ১৯৩৮ সালে সিলেটে নিজ গ্রাম পাঁচগাঁয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন, যা এখন *কুঞ্জলতা প্রাথমিক বিদ্যালয়* হিসেবে বর্তমান আছে। মানিকগঞ্জ জেলার বায়রা গ্রামের দরিদ্র মুসলিম কৃষকদের মধ্যে ১৯৩৮ সালে অনিল রায়ের (লীলানাগের স্বামী) সাহায্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি হাইস্কুল ও মেয়েদের জন্য ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলায় লীলানাগ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ শতকে মুসলিম নারীশিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এছাড়া বিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকায় *পোস্তা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।* তৎকালীন স্কুল ইন্সপেক্টর মৃণালিনী সেন এবং ফাতেমা খানম স্কুলটিকে কার্যকর রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয়টি টিকে ছিল। ১৯৩২ সালে ফরিদুদ্দীন সিদ্দিকী

নামক একজন ব্যক্তি ঢাকার বেচারাম দেউরীতে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে স্কুলটির নাম *আনোয়ারা বেগম বালিকা বিদ্যালয়* (সোনিয়া, ২০০২, পৃ. ১২৬)। ওস্তাদ আম্মা ওরফে সুফিয়া খাতুন নামের একজন নারী ঘরে ঘরে গিয়ে এই স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করতেন। অন্যদিকে ১৯৩৯ সালে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার অধীনে কলকাতায় *লেডী ব্রেবোর্ন কলেজ* স্থাপিত হয়। প্রথমে কলেজটি মুসলমান মেয়েদের জন্য নির্মিত হলেও পরে অমুসলিমদের পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া হয়। তবে কলেজটির হোস্টেলে শুধু মুসলিম মেয়েরাই থাকতে পারত। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পূর্ব মুহূর্তে এই প্রতিষ্ঠানে ১৫২ জন ছাত্রী ছিল, এর মধ্যে ১২০ জন ছিল মুসলমান (প্রাগুক্ত, ১২৭)। উল্লেখ্য, পূর্ব বাংলার শামসুন্নাহার মাহমুদ এই কলেজের বাংলার শিক্ষক ছিলেন। যদিও কলেজটি কলকাতায় অবস্থিত ছিল তথাপি পূর্ব বাংলার বহুসংখ্যক মুসলিম ছাত্রী এ প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে এই ধারা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে।

পূর্ব বাংলায় এসময় দ্রুত নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪০ সালে যশোর জেলায় *মধুসূদন তারাপ্রসন্ন গার্লস হাইস্কুল* এবং খুলনাতে ছিল *খুলনা করোনেশানস গার্লস হাইস্কুল*, ময়মনসিংহে *এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউট* (মহিলা বিভাগ) ও *রাধাসুন্দরী গার্লস স্কুল*, মুন্সীগঞ্জে *এ.ভি গার্লস হাইস্কুল*, *ফরিদপুর ঈষাণ ইনস্টিটিউট* (মহিলা বিভাগ), *মাদারীপুর ডোনাভান গার্লস স্কুল*, *বরিশাল সদর গার্লস স্কুল* ও *জগদীশ সারস্বত গার্লস স্কুল*, *চট্টগ্রাম অপর্ণাচরণ গার্লস হাইস্কুল* প্রভৃতি (মালেকা ও আজিজুল, ২০০৪, পৃ. ১৮৬)। এভাবে দেখা যায় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিশ শতকের প্রথমার্ধে অসংখ্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে *সিলেট এম.সি কলেজ*, *বরিশাল বি.এম কলেজ*, *পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ*, *কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ*, *ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ*, *ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ*, *বরিশাল বি.এম কলেজ* প্রভৃতি পূর্ব বাংলার ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলি ১৯৪০ সালের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলিতে ছাত্রদের পাশাপাশি মুসলিম ছাত্রীদের সরব উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৮৫৪ সালে চার্লস উডের শিক্ষা নীতিমালায় ব্রিটিশ সরকার প্রথম বারের মতো নারীশিক্ষার বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার ফলে নারীশিক্ষায় সরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭১-৭২ সালের আগস্ট মাসে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে দেখা যায়, তখন কলকাতায় ১১০টি সরকারি সাহায্যপুষ্ট এবং ১৪টি বেসরকারি মহিলা স্কুল ছিল। মোট ছাত্রী ছিল ৭৩২, তাদের মধ্যে ৫৮ জন ছিল মুসলমান (বামাবোধিনী, ১২৯৪ : ২৯৬)। এই পত্রিকা ১৮৮০ সালের মার্চ সংখ্যায় উল্লেখ করে ঢাকার *ইডেন স্কুলে* ১৫৩ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন ছিল মুসলমান। ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশন বাংলায় নারীশিক্ষা বিষয়ে নানা ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়। এ সময় মেয়েদের শিক্ষার জন্য বৃত্তি, সিলেবাসে প্রয়োজনীয় সংস্কার, পর্দানশীন মেয়েদের জন্য অন্দর মহলে পড়িয়ে প্রাইভেট পরীক্ষার ব্যবস্থা, নারী শিক্ষক নিয়োগ, অধিক সংখ্যক স্কুল ইন্সপেক্টর নিয়োগ ইত্যাদি প্রস্তাব সরকারের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয় যার অধিকাংশই বাস্তবায়ন হয়। আবার ১৯০১ সালে দেখা যায় মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার শতকরা ১ থেকে ৩ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯০৫ সালের পর থেকে *ইডেন স্কুলে* ১২৫ জন এবং ময়মনসিংহের *আলেকজান্ডার স্কুলে (বিদ্যাময়ী স্কুলে)* ১০০ জন ছাত্রী পড়ালেখা করতো, যাদের অনেকেই মুসলমান ছিলেন। ১৯১১ সালে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলায় নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া জাগে। ফলে এ বছর ইডেনে ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৮

জন, যার মধ্যে মুসলমান ছিল ২৫ জন। উল্লেখ্য মুসলমান ছাত্রী সংখ্যা ১৯০৬ সালে ৩ শতাংশ ছিল এবং ১৯১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০ শতাংশ (সোনিয়া, ২০০২, পৃ. ১৩০)। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য বিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ সময় পূর্ব বাংলায় মেয়েদের মধ্যে পর্দাপ্রথা রক্ষা করে মফস্বল এলাকার স্কুলে পাঠদান করার মতো দক্ষ শিক্ষককের অভাব ছিল। আবার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ছিল না এবং তাদের আবাসিক ব্যবস্থার সুযোগও ছিল অপ্রতুল। একটি সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায়।

সারণি-৩ : Results of the Matriculation Examination of East Bengal

(*Eden High School, Vidyamoyee High School & Dr. Khastagir's High School*)

Year	Number of Appeared	Number Passed				Remarks
		1st Division	2nd Division	3rd Division	Total	
1913	6	5	-	-	5	Four Secured Scholarships , One obtained a Special Scholarship of Rs.10
1914	4	2	-	-	2	Two Secured Scholarships
1915	6	6	-	-	6	Three Secured Scholarships, obtained a Special Scholarship of Rs.10
1916	8	6	1	-	7	Two Secured Scholarships, One obtained a Special Scholarship
1917	Result Not Yet Published					

Source : *Quinquennial Report on the Progress of female Education(1912-13 to 1916-17)*

মূলত ঢাকার *ইডেন স্কুলকে* কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় মুসলমান মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া বৃদ্ধি পায়। এই স্কুল থেকে ১৯২১ সালে ফজিলতুন্নেসা (১৯০৫-১৯৭৬) তৎকালীন সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯২৫ সালে তিনি *বেথুন কলেজ* থেকে বি.এ পাশ করেন। তবে দেখা যায়, উচ্চ শিক্ষায় হিন্দু নারীরা মুসলিম নারীর তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিলেন অর্থাৎ ১৮৮২ সালে কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখী বি.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। অথচ এর চার দশক পর ১৯২২-২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলার প্রথম মুসলমান নারী সুলতানা বেগম মুইদজাদা বি.এ ডিগ্রি (সম্মানসহ) অর্জন করেন (তপতী, ১৩৯৮ : ২৪৮)। সাকিনা মুইদজাদা (সুলতানা বেগম মুইদজাদার বোন) প্রাইভেট পরিক্ষার্থী হিসেবে ১৯২০ এর দশকে *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে আইনশাস্ত্রে এম.এ পরীক্ষায় সমগ্র বাংলায় প্রথম স্থান অর্জন করে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম বাঙালি মুসলমান এম.এ ডিগ্রিধারী নারী এবং ১৯৩৫ সালে কলকাতা হাইকোর্টের একমাত্র নারী আইনজীবী (মালেকা ও আজিজুল, ২০০৪ : ১৮৬)। তবে উল্লিখিত এ দু'জন নারী ছিলেন কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করা। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে লীলা নাগ ১৯২৩ সালে এম.এ পাশ করেন এবং মুসলমান নারীর মধ্যে সর্ব প্রথম ফজিলাতুন্নেসা *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* থেকে অংক শাস্ত্রে ১৯২৭ সালে এম.এ পরীক্ষায়

প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। উল্লেখ্য সে যুগে মালেকুন্নেসা, সারা তৈফুর, মামলুকুল ফাতেমা, নুরুন্নেসা খাতুন, জোবেদা খাতুন, শামসুন নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামালসহ যে সকল নারীরা লেখাপড়া শিখেন, তাদের অধিকাংশই আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে শিখেছিলেন (মুরশিদ, ২০১৬, পৃ. ২৪৫)। এসকল নারীর অনেকেই শিক্ষকতার কাজে এগিয়ে আসার পর মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা বিস্তার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে পূর্ব বাংলায় শিক্ষা বিস্তারে নারীর অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় নারীশিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপক প্রসার লাভ করায় এসময় উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের সরব উপস্থিতি লক্ষণীয়। শুধু কলকাতার বিভিন্ন কলেজে ১৯৩৬ সালে ১০৯৫ জন ছাত্রী পড়ত যার মধ্যে ৮৬৭ জন হিন্দু এবং ৩৭ জন মুসলমান (মালেকা ও আজিজুল, ২০০৪ : ১৮৬)। অন্যদিকে দেখা যায় ১৯৩৮ সালে ২৬ জন বাঙালি মেয়ে এম.এ পাশ করেন। যা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে নারীশিক্ষা বৃদ্ধির ইতিবাচক ফল।

১৯২১ সালে পূর্ব বাংলায় মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার অন্যতম পাদপীঠ *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুসলিম নারীর শিক্ষার দ্বার খুলে যায়। শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলিম নারীর উচ্চ শিক্ষার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় দেখা যায় বাংলায় ১৯৪০ সালে ৪৬ জন ছাত্রী এম.এ এবং ৩ জন মেয়ে এম.এস.সি পাশ করেন। ১৯৪১ সালে আরবি ভাষায় এম.এ শ্রেণিতে সৈয়দা ফাতিমা খাতুন প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন এবং ১৯৪২ সালে উর্দু ভাষায় এম.এ শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন সৈয়দা ফাতিমা বেগম। ১৯৪৪ সালে এম.এ পাশ করেন ৬৪ জন ছাত্রী ও এম.এস.সি ১৬ জন। ১৯৪৫ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৭ ও ১২ জন। ১৯৪৫ সালে আরবি ভাষায় এম.এ শ্রেণিতে প্রথম হন লতিফা খাতুন এবং ২য় হন হালিমা খাতুন। ১৯৪৭ সালে ৮১ জন এম.এ এবং ১ জন এম.এস.সি পাশ করেন (প্রাগুক্ত, ১৮৫)। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে নানারকম নেতিবাচক ধারণা ও রক্ষণশীলদের বাধা প্রচলিত থাকলেও মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল কলেজ তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং কো-এডুকেশনের মাধ্যমে নারীশিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলতে থাকে।

সার্বিক আলোচনার শেষে বলা যায়, পূর্ব বাংলায় প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে নারীশিক্ষা কার্যক্রম প্রথমে শুরু করে খ্রিষ্টান মিশনারিরা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তারা বাংলার নানা জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে ধীরে প্রগতিশীল বাঙালিরা তাদের মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। এক্ষেত্রে প্রথমাবস্থায় মুসলিম সমাজের মেয়েরা পিছিয়ে পড়ে। উনিশ শতকের শেষ দিকে এসে এই অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মুসলিম মহীয়সী নারী নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী কর্তৃক কুমিল্লায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং ঢাকায় *ইডেন গার্লস স্কুল* প্রতিষ্ঠা বাংলায় মুসলিম নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। ক্রমে মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষা বিষয়ে শিক্ষানুরাগীদের মানসিকতার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। সরকারও মুসলমান নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আগ্রহান্বিত করে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুসলিম মেয়েদের উপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরি, বালিকা বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ, বিদ্যালয়ের সাথে বোর্ডিং (ছাত্রী ও শিক্ষক এর আবাসন ব্যবস্থা), গরিব ও মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কার দেওয়া প্রভৃতি কারণে মুসলিম মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়। এ

সময় বাংলার বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে এসকল বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯১১ সালে বাঙালি মুসলিম নারী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত *সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলটি* মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। এর পরবর্তী সময়ে বাংলার মুসলিম নারীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাধাহীনভাবে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পূর্ব বাংলায় মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করে। এই ধারায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ে পূর্ব বাংলায় অসংখ্য স্কুল কলেজ এবং *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়* প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলিম নারীশিক্ষার হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

টীকা

১. 'জেনানা' পারসিক শব্দ, এর অর্থ নারী (Women) এবং 'অন্তঃপুর শিক্ষা' হলো door to door education। ১৮৪১ সালে কলকাতায় Scotland Church নারী মিশনের Miss Saville এর দ্বারা জেনানা শিক্ষা শুরু হয়। হানা ক্যাথরিনা ম্যালেন্স উপমহাদেশের প্রথম জেনানা শিক্ষক। (Asha Islam, *From Andarmahal to Schools : Female Education in Eastern Bengal in the 19th And Early 20th Centuties*, Unpublished PhD Thesis, University of Dhaka, Dhaka)

২. শৈলরাণী দেবী (১৯১৬-১৯৪৪) কুমিল্লায় জন্মগ্রহণকারী উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ছিলেন। কলকাতায় গিরিন চক্রবর্তীর সহায়তায় তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহচর্য লাভ করেন। অপূর্ব কণ্ঠ মাধুর্যের অধিকারী এ নারীর অবয়ব দেখেই কবি শ্যামা সংগীত রচনার অনুপ্রেরণা লাভ করেন বলে জানা যায়। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কাছে গানের পাঠ গ্রহণ করা শৈলরাণী দেবী একাধারে রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত, খেয়াল, ধুমরি ও পল্লি সংগীতে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করতেন। তদানীন্তন বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানি কর্তৃক তাঁর গানের রেকর্ড প্রকাশিত হয়, যা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রতিটি গানের রেকর্ডের পিঠে তাঁর নামের শেষে নিজ শহর 'কুমিল্লা' নামটি লিখে দিতেন। এভাবে তিনি স্বদেশ প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ মহীয়সী নারীর নামে কুমিল্লায় বালিকা বিদ্যালয়ের নামকরণ হয়। বর্তমানে স্কুলটি 'শৈলরাণী দেবী পৌর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়' নামে কুমিল্লা শহরের নানুয়া দিঘী রোডে অবস্থিত।

৩. *মর্গান গার্লস স্কুলটি* ১৯১০ সালে তৎকালীন নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান মি. মর্গান এর বিদুষী পত্নী মিসেস প্যাট্রিসিয়া মর্গান এর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্কুলের প্রথম মুসলিম ছাত্রী মরিয়ম বেগম পরবর্তীতে ১৯৪৭ এর দেশভাগের পর প্রথম মুসলিম শিক্ষয়িত্রী হিসেবে যোগদান করে কৃতিত্বের সাথে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। ১৯৫২ সালে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে এ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করে ভাষা সংগ্রামীদের উপর গুলি বর্ষণের প্রতিবাদ করে এবং প্রধান শিক্ষয়িত্রী কারাবরণ করেন। (বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, আব্দুল মান্নান সম্পাদিত *নারায়ণগঞ্জের কৃতী সন্তানদের জীবন কোষ*, মশগুল মাহফিল প্রকাশনী, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৮৪)

উল্লেখপঞ্জি

আয়েশা খাতুন (২০০৫)। *ইডেন কলেজ : অঙ্কুর থেকে মহীরুহ*। প্রমা, ইডেন মহিলা কলেজ বার্ষিকী, ঢাকা

আরিফা সুলতানা (১৯৯৮-২০০১)। *উনিশ শতকে বাংলায় নারী শিক্ষা*। ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, ঢাকা

এম. এ রহিম (১৯৯৩)। *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* ১২৩০-১৫৭৬ (প্রথম খণ্ড)। [অনু. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান], বাংলা একাডেমি, ঢাকা

ওয়াকিল আহমদ (১৯৯৭)। *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*। বাংলা একডেমি, ঢাকা

গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া (১৯৯৫)। *বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

গোলাম মুরশিদ (২০১৬)। *আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

গোলাম মুরশিদ (২০১৬)। *হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি*। অবসর প্রকাশন, ঢাকা

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১২৮৮)। *স্ত্রী শিক্ষা*। ভারতী, কলকাতা

ঢাকা প্রকাশ (১৮৬৩)। ৩১ ডিসেম্বর

তপতী বসু (১৩৯৮)। *বাঙালী মেয়েদের লেখাপড়া*। শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা

তাহেরুন্নেছা (১৮৬৫)। *বামাগণের রচনা*। বামাবোধিনী পত্রিকা, কলকাতা

পলাশ মন্ডল (২০১৫)। *ঢাকার দীপালি সংঘ থেকে শ্রীসংঘ : লীলারায়ের (১৯০০-৭০ খ্রিস্টাব্দ) চিন্তা ও কর্মের বিবর্তন*। ইতিহাস সমিতি পত্রিকা (সংখ্যা ৩৫-৩৬), বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, ঢাকা

ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী (১৯৮৪)। *রূপজালাল*। [সম্পা. মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস], বাংলা একাডেমি, ঢাকা

বসন্তকুমার সামন্ত (১৯৮৭)। *হিতকরী সভা স্ত্রী-শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*। সাহিত্যলোক, কলকাতা

বামাবোধিনী পত্রিকা (১৩২২)। *স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে দু একটি কথা*। কলকাতা

মল্লিকা ব্যানার্জী (২০০১)। *উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে দুই একটি ভাবনা*। পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, কলকাতা

মালেকা বেগম (২০১৬)। 'লীলানাগ ও তাঁর জীবন সাধনা'। *নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা*-২৬, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক (২০০৪)। *আমি নারী তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা

মুনতাসির মামুন (১৯৮৩)। *উনিশ শতকের পূর্ববাংলার সভা সমিতি*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯৭৭)। *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত ১৯০১-১৯৩০*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুহাম্মদ শামসুল আলম (১৯৮৯)। *রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্যকর্ম*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম (২০০৮)। *ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (১৩৮৫)। *রোকেয়া পরিচিতি*। সওগাত, ঢাকা

মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমেদ (১৩১০)। *ইসলাম প্রচারক*, কলকাতা

যোগেশচন্দ্র বাগল (১৩৫৭)। *বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা ১৮০০-১৯৫৬*। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা

রওশন আরা বেগম (১৯৯৩)। *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

শামসুন নাহার মাহমুদ (১৩৪৭)। *মুসলিম বঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা*। মাসিক মোহাম্মদী, কলকাতা

শ্যামলী আকবর, সৈয়দা তাহ্মিনা আখতার ও জাহানআরা বেগম (১৯৯৮)। *নারীশিক্ষা উদ্ভব ও বিকাশ*। স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা

স্বপন বসু [সম্পা.] (১৪১২)। *উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষা*। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা

সৈয়দ আবুল মকসুদ (১৯৯২)। *পথিকৃৎ নারীবাদী খায়রুন্নেসা খাতুন*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

সোনিয়া নিশাত আমিন (২০০২)। *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন*। [অনু. পাপড়ীন নাহার], বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সোনিয়া নিশাত আমিন (১৯৯৩)। 'নারী ও সমাজ'। *বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৭০৪-১৯৭১*, (তৃতীয় খণ্ড) [সম্পা. সিরাজুল ইসলাম], বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

Adam William (1940). *Reports on the State of Education in Bengal 1835 & 1838,* Rabindra Bharati University, Calcutta

Ahmed Sharif Uddin (1986). *Dhaka : A Study in Urban History and Development 1840-1921,* Curzon Press, London

Ahmed Sufia (1996). *Muslim Community in Bengal 1884-1912,* University Press Limited, Dhaka

Amin Sonia Nishat (1996). *The World of Muslim Women in Colonial Bengal : 1876-1939,* E. J. Brill, Lieden

Bagal Jogesh Chandra (1944). *Beginnings of Modern Education in Bengal Women's Education*, Ranjan Publishing House, Calcutta

Basu Anath Nath [ed.] (1941). *Adam's Report on the State of Education in Bengal,* University of Calcutta, Calcutta

Chakravarty Usha (1963). *Condition of Bengali Women around the 2nd Half of the Nineteenth Century*, The Author, University of Virginia

Chapman Priscilla (1839). *Hindoo Female Education*, R.B. Seeley and W. Burnside, London

General Report on Public Instruction in Bengal for the years 1863-64, 1871-72, 1877-78, 1880-81, 1881-82, 1890-91 and 1901-02, Calcutta

Gibb H.A.R (1929). *Ibn Batuta : Broadway Travellers Series*, Vol. IV, Cambridge, London

Hossain Anowar (2003). *Muslim Women's Struggle for Freedom in Colonial Bengal (1873-1940)*, Progressive Publishers, Kolkata

Hussain Shahanara (1978). *Glimpses in the Condition of Bengali Muslim Women, During the later half of the Nineteenth Century : A Study Based on the Bamabodhini Potrika*, The Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Vol. 3, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi

Law Nagendranath (1916). *Promotion of Learning in India During Muhammadan Rule (By Muhammadans)*, Longmans (Green), London

Mukerjee Amitabaha (1968). *Reform and Regeneration in Bengal 1774-1823*, Rabindra Bharati University, Calcutta

Murshid Gulam (1983). *Reluctant Debutante Response of Bengali Women to Modernization 1849-1905,* Sahitya Samsad, Rajshahi University, Rajshahi

Nayeem Asha Islam (2015). *Women's Emancipation Through Education in 19th Century Eastern Bengal : Private Enterprise or Government Agency?,* Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities), Vol. 60 No-1, Dhaka

Proceedings of the Government of Bengal in the Education Department [Education], 1907-1912 and 1923, Bangladesh National Archives, Dhaka

Quinquennial Report on the Progress of Female Education in the Dacca, Rajshahi and Chittagong Divisions for 1912-13 to 1916-17, Calcutta

Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam 1907-08 to 1911-12, Vol-I, Calcutta

Report of the Second Session of the Provincial Muhammadan Education Conference, Held at Mymensingh on the 18th and 19th April, 1908, Calcutta; *Report of the Third Session of the Provincial Muhammadan Education Conference, Held at Bogra on the 26th and 27th March,* 1910

সেলিম আল দীনের *চাকা* : এক মহাযাত্রা

লাবণ্য মণ্ডল*

সারসংক্ষেপ : অজ্ঞাতনামা এক মানুষের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে চলার গল্প *চাকা*। নাট্যকার সেলিম আল দীনের বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে লেখা এ নাটকে ঔপনিবেশিক জাতি-রাষ্ট্রে মানবতার দুর্দশা চিত্রিত হয়েছে । বর্তমান প্রবন্ধে রাষ্ট্রের স্বার্থসর্বস্ব মনোভাব ও তীব্র দায়িত্বহীনতার প্রতি দৃষ্টি নির্দেশ করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে, কীভাবে প্রান্তবাসীরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বার্থপরতা ও দয়াহীনতার শিক্ষা নিচ্ছে। সমগ্র ঘটনা সংগঠিত হয়েছে একটি নাতিদীর্ঘ ভ্রমণের আবর্তে। আধুনিক রাষ্ট্রে গণমানুষের অবস্থান ব্যক্ত করে, উক্ত পরিস্থিতির উন্নতির উপায় অনুসন্ধান এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। কেন্দ্র-প্রান্তের ধারণা রদ এবং অনার্যের কণ্ঠস্বরের পক্ষে থেকে পাঠ-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রাককথন

আধুনিক সভ্যতা এবং সাহিত্যের অন্যতম অনুষঙ্গরূপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আবির্ভাব। সমাজের গণ্ডি ডিঙিয়ে মানুষ ক্রমে 'ব্যক্তি' হয়ে ওঠে। ব্যষ্টিক চরিত্রের অধিকারী হয়ে নিজেকে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বলে দাবি করে। সামষ্টিক পর্যায়ে অস্তিত্ববান থাকে কেবল রাষ্ট্র। ভারতবর্ষে আধুনিকতার আবির্ভাব কোনো সামাজিক বিবর্তনের ফল নয়, ইংরেজদের শেখানো-পড়ানো বুলি মাত্র; ব্যক্তির 'হয়ে-ওঠা' তেমনি একটি শেখানো প্রত্যয়। আর রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম প্রধান শর্ত যে 'জাতি' (nation) তার অস্তিত্ব ভারতবর্ষে পূর্বে ছিল না। ইংরেজিতে 'রেস' (race) বলতে যে জাতি বোঝায় তার ভিত্তিতেই ভারতবর্ষীয় সমাজ গড়ে উঠেছিল এবং অসংখ্য গোষ্ঠী-শ্রেণির সমন্বয়ে তার কালাতিপাত হচ্ছিল। তাই পাশ্চাত্যে রাষ্ট্র যে স্বরূপ নিয়ে ব্যক্তির সামষ্টিক প্রতিষ্ঠান-রূপে হাজির হয়েছিল, প্রাচ্যে বা ভারতবর্ষে তার সেই রূপ প্রকটিত হওয়ার সুযোগ পেল না। বিশ্বায়নের হাওয়া পেয়ে মানুষের আইডেন্টিটি (identity) বদলে যেতে শুরু করল। একদিকে ধ্বংসাত্মক অপরদিকে গঠনমূলক আইডেন্টিটি মানুষকে মানসিকভাবে উদ্বাস্তু করল। পূর্বের মূল্যবোধ বিপর্যস্ত অথচ নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠেনি। পূর্বের কাঠামোর ভাঙন ধরল কিন্তু নতুন কাঠামোটি সুশ্রী রূপ পেল না। রাষ্ট্র সমাজ থেকে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করল অথচ সমাজচ্যুতকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করতে, রাষ্ট্রের ধ্বজাতলে সামিল করতে ব্যর্থ হলো। বিশেষ কোনো মতাদর্শ, সংগঠন ব্যতীত এই ব্যক্তির পথচলা তাকে নিঃসঙ্গ ও ব্যক্তিসর্বস্ব করে তোলে। এমনকি ওই ব্যক্তি তার পূর্বের 'মানুষ' থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তায় পরিণত হয়। এ সম্পর্কে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন :

> ইংরেজ শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ইংরেজি শিক্ষার কল্যাণে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে যে — পঙ্গু ব্যক্তির সৃষ্টি, তার ক্ষয় শুরু হয় এই শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে।...সমাজের অবক্ষয় ও ব্যক্তির অবক্ষয় কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। তবে এর ফলে ব্যক্তি ও সমাজ দ্রুত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ব্যক্তির অবক্ষয় তাকে ছিঁড়ে ফেলে সমাজ থেকে এবং অসহনীয় নিঃসঙ্গতায় তাকে ঠেলে দেয় বিনাশের দিকে। (আখতারুজ্জামান, ২০১০, পৃ. ৪৫)

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী।

কেন্দ্রমুখী রাষ্ট্রের মোহময় আকর্ষণ প্রান্তিকজনকেও কৌতূহলী করে। স্থানীয় সংস্কৃতি বৈশ্বিক সংস্কৃতির দিকে মোড় নেয়। কিন্তু ওই বৃহৎ সংস্কৃতি আঞ্চলিক ক্ষুদ্র সংস্কৃতিকে কদাচিৎ বিবেচনায় রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা প্রান্তিকের কাছ থেকে প্রয়োজন মতো সবকিছু নিয়ে তাকে প্রান্তেই ফেলে রাখে। মাঝ থেকে কেন্দ্রের কুপ্রভাব আয়ত্ত করে নেয় প্রান্তবাসী। গবেষকের ভাষ্য : "স্থানীয় রাজনীতি, নয়া-ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়া, জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতির নানা স্রোতে মানুষ আজ দিশেহারা। আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রথাগত মানে বদলে যাচ্ছে।" (বিপ্লব, ২০১৭, পৃ. ১০১) ঠিক এই বিষয়টাই লক্ষিত হয় সেলিম আল দীনের (১৯৪৯-২০০৮) নাটক *চাকা*য় (১৯৯১)।

চাকা নাটকে দিনাজপুরের সাঁওতালপল্লিতে আধুনিক সংস্কৃতির ছায়া ও রাষ্ট্রের আগ্রাসন এবং সেই প্রভাবে সহজাত মানবিক বোধের অধঃপতন দৃষ্টিগোচর হয়– যা দর্শন করে নাট্যকথক ও বাহের গাড়োয়ানের হৃদয় কেঁদে ওঠে। ১৯৮৬-৮৭ সালের রাষ্ট্র কর্তৃক গণহত্যার নির্দয়তা প্রত্যক্ষ হয় *চাকা*তে। গণহত্যার শিকার এক যুবককে ভুল ঠিকানায় প্রেরণ করে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব-মুক্ত হয়। এতে সরকারি কাগজের দায় মেটে কিন্তু মানবতার দায় তো মেটে না। রাষ্ট্রীয় চক্রে নিহত যুবকের লাশের ঠিকানা মেলে না, পরম যত্নের-ধন মানুষ বেওয়ারিশ এক বস্তুতে পরিণত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে মানুষের নির্লিপ্ততা গাড়োয়ানের চিন্তা জগতে আলোড়ন তোলে। যাত্রাপথে চাকার আবর্তনের সাথে সাথে গাড়ির গাড়োয়ান সুউচ্চ মানবিক বোধে সিঞ্চিত হয়। রাষ্ট্র ও তার নগর থেকে দূরবর্তী সাঁওতাল প্রদেশের মেঠো পথে যাত্রাকালে মনুষ্যধর্মের নবউত্থান হয় তার চেতনায়। *চাকা* নাটকের তাৎপর্য এই উচ্চ মানবিক বোধ, যা আবিষ্কারের নিমিত্ত কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী প্রান্তিক জনপদে ভ্রমণ করতে হয় নাট্যকার তথা গাড়োয়ানকে।

মহানায়কের মহাআখ্যানের বদলে নিম্নবর্গ ও দলিতের কণ্ঠস্বরকে তুলে এনেছেন নাট্যকার সেলিম আল দীন। ইউরোপীয় জ্ঞানকাণ্ড ও শিল্পাঙ্গিক পরিহার করে নাটক পদবাচ্য দিয়ে নতুন এক আঙ্গিক নির্মাণ করেন তিনি। নাট্যকার বলেন যে, বাংলা নাটক উনিশ শতকের বিষয় নয়। তিনি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নাটকের উপাদান খুঁজে পান। নৃত্য-গীত, বর্ণনা সহযোগে উপস্থাপনাধর্মী যে পালাগান, গাথা, পাঁচালি প্রচলিত ছিল তা-ই উৎকৃষ্ট নাটক হয়ে উঠেছিল। সেই ধারা অবলম্বন করে সেলিম আল দীন নাটক রচনা করেন, ফলত নাটকগুলি হয়ে উঠেছে কথা, নৃত্য, গীত, বাদ্য, সংলাপের সমন্বয়ে অখণ্ড শিল্প-মাধ্যম; যা এক হয়েও বহুর সমাবেশ আবার বহু হয়েও এক অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। এই নবতর আঙ্গিক সৃজনের পক্ষে তাঁর বক্তব্য :

> বাংলা ভাষী অঞ্চলের জন্য একালে চাই একটি সুনির্দিষ্ট শিল্পতত্ত্ব। শিল্পতত্ত্ব বিশ্ববঞ্চিত নয় অথচ ম্যালার্মের উগরে দেওয়া তত্ত্বের অনুসৃতিও নয়। সেই মৌলিক অথচ অনিবার্য শিল্পতত্ত্বই হোক আমাদের কালের লেখকদের কাম্য। এক জীবন্ত তত্ত্ব যা জন্ম দেবে নব্য শিল্প পৃথিবীর। (সেলিম, ২০১০, পৃ. ৪৪)

শিল্পী-জীবনের শুরু থেকে যে ইচ্ছা পোষণ করে এসেছেন, যার জন্য একের পর এক নিজেকে ভেঙেছেন, নতুন করে গড়েছেন সেই ধারাটি 'কথানাট্যের শিল্পরূপ'। কথা বলতে বলতে নাটক, তাই তা 'কথানাট্য'। সেলিম আল দীন ঐতিহ্যবাহী শিল্পরীতিকে মাথায় রেখে যে 'কথানাট্য' নামক রীতি নির্মাণ করলেন তার সূচনা হয় *চাকা* থেকে। এই দুর্বল রাষ্ট্র যে প্রান্তিক আদিবাসী জনপদেও তার দূষিত নিঃশ্বাস ছড়িয়ে দিচ্ছে তার সপ্রমাণ উল্লেখ পাই এই নাটকে। অবশ্য নাট্যকার রাজনীতির চেয়ে এর অন্তঃস্থিত মানবিক সম্পর্কের প্রতি অধিক গুরুত্ব নির্দেশ করেন। তাঁর বক্তব্য :

> রাজনৈতিক অভিপ্রায় নাটকের শরীরে নেই–শিরায় হয়তো আছে।...*চাকা* নাটকের একটি নিজস্ব ও নৈসর্গিক অর্থ আছে। দর্শক শ্রোতা তাতেই তৃপ্ত হবেন। এবং লেখার পর আমারও মনে হয়েছে সমকালের বেদনা এ রচনায় বহুদূর নানা বাঁক ঘুরে ভিন্ন শিল্প ভাষায় এসেছে। ধরা যাক আমি বাস্তবেই একটি গল্প বলতে চেয়েছি — সে গল্পের শববাহী চাকার সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছি মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে।' (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৬২)

যাত্রা শুরু

সাধারণ প্রান্তিক মানুষ ও জনপদ আধুনিক রাষ্ট্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। তাই রাষ্ট্রের আইন-কানুনের বহির্ভূত মানবতার দর্শন অনুসন্ধানের জন্য সেই প্রান্তিক জনপদ তুলনামূলকভাবে উপযোগী। গ্রামীণ অঞ্চলে রাষ্ট্রের প্রবেশ মাধ্যম সাধারণত কাঁচা বা পাকা ইটের সড়ক এবং বিদ্যুতের তার। তাই নাট্যকার ভাঙা ইটের রাস্তা পার হয়ে ক্রমে গেরুয়া মাটির পথে ওঠে। এবং মেঠো পথে গরুর-গাড়িতে উপবিষ্ট থেকে গাড়োয়ান প্রত্যক্ষ করে সমাজের মানুষের অবক্ষয় — যা তাকে দংশন করে চলে অতঃপর বোধের বিমোক্ষণ ঘটায়।

মঙ্গলাচরণে সাঁওতাল দেবতা 'ধরম করম' ও ধবল দুটো ষাঁড়কে সাক্ষী রেখে নাট্যকথামালা শুরু করেন লেখক। 'নাট্যকথামালা' বলা হচ্ছে কারণ এখান থেকে সেলিম আল দীনের বহু প্রতীক্ষিত অখণ্ড নাট্যাঙ্গিকের শুভারম্ভ। *চাকা* নাটকটি বর্ণনাত্মকরীতিতে রচিত, তাই সেখানে বহুতলস্পর্শী বিষয় উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। নাটকের শুরু থেকেই প্রকৃতি-পরিবেশ-সভ্যতা-রাষ্ট্র-অর্থনীতি-সমাজনীতির খণ্ডখণ্ড অনুষঙ্গ উঠে এসেছে নাট্যকারের পটভূমির বর্ণনায়। ডমরু সহযোগে একজন কথক নাট্যকারকে বর্ণনায় সহায়তা করে অথবা নাট্যকার নিজেই সেই কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। একদিন বৈশাখের কোনো এক সকালে কাকেশ্বরী পাড় দিয়ে ভাঙা ইটের রাস্তা দিয়ে একটি গরুর গাড়ি আসে, গাড়োয়ানসহ মোট যাত্রী চারজন। তাদের আপাতলক্ষ্য দিল সোহাগীর বিলে ধান কাটতে যাওয়া। অবশ্য সঙ্গী হিসেবে সাথের ষাঁড়দুটোকে গণনা করা চলে। মানিকপীরের ষাঁড় ঐ প্রাকৃত মানুষদের শ্রদ্ধা-ভক্তি পুরোটাই দখল করে। ষণ্ডদ্বয়ের খুরের চিহ্নকে পুণ্য বলে বর্ণনা করেন নাট্যকার; গাড়ি থামানোর পূর্বে গাড়োয়ান তাদের অনুমতি প্রার্থনা করে। মানিকপীরের সেবায়িত হলাঙ্গা ফকিরের ষাঁড় বলে কেবল নয়, ফসল উৎপাদন ও পথচলার জন্য অতি প্রয়োজনীয় বাহন তাই তাদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে ভুল করে না গাড়োয়ান।

তৃতীয় তরঙ্গে এলংজানি হাসপাতাল বাহের গাড়োয়ানের এই মূল্যবোধের জগতের ভিন্নচিত্র দর্শন করায়। সরকারি হাসপাতাল, সুতরাং আধুনিক পৃথিবীর অনুপ্রবেশ সেখানে অনিবার্য। যেখানকার আয়া ভ্রূণহত্যায় পটু এবং ভ্রূণের আঠা-লাশ-মাছি-মানব-মাংস-লোলুপ কুকুরের সহাবস্থান দৃশ্যনীয়। পলেস্তারা খসা ও পোকামাকড়ের অভয়আশ্রম সে হাসপাতালের সেবা চলে পচা মাল্টিভিটামিন, ইনজেকশনের শূন্য শিশি, মরচে ধরা ব্লেড দিয়ে। ক্লোরোফর্মের ব্যবহার ব্যতীত শল্যচিকিৎসা মাঝেমাঝে নরকের আবহ নিয়ে আসে নিঃসঙ্গ সে আরোগ্য নিকেতনে। কেবল রাষ্ট্রীয় নিয়মবশত অনুন্নত সাঁওতাল পল্লিতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হলেও হাসপাতালের মহৎ-উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। হাসপাতালের ডাক্তারের কালো এশীয়-চামড়ায় সামন্তবাদী রাষ্ট্রের ম্যাপ জড়িয়ে আছে, রোগীর আরোগ্য তার ইষ্ট না হোক রাষ্ট্রের কলঙ্কের চিহ্ন লোপাটের দায়িত্ব বর্তায় তার উপর। আধুনিক রাষ্ট্র কী প্রক্রিয়ায় মানুষের রোগ-ব্যাধি তথা দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার বিস্তার ঘটায় এবং স্বার্থ সিদ্ধি করে তার নজির দেখা যায় *চাকায়*। গবেষক দীপেশ চক্রবর্তী উপনিবেশিত রাষ্ট্রের এই প্রবণতা সম্পর্কে বলেন :

> পরিবার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে মহামারি নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত সর্বত্রই দেখা যায় আমাদের এই তথাকথিত নিতান্ত 'ব্যক্তিগত' বস্তুটির (শরীর) সঙ্গে সরকারের সম্বন্ধের নজির। বুর্জোয়া সভ্যতা মানুষের শরীরকে যেভাবে ব্যবহার করে ও যে তাৎপর্য দেয়, তা প্রাক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শরীরের যে অবস্থান থাকে তার থেকে আলাদা। 'কৃষক শরীর', 'আদিবাসী শরীর'কে ভেঙে-চুরে, দুমড়ে-মুচড়ে, নতুন অভ্যাসের ফাঁদে ফেলে, নতুন রুটিনের ছাঁচে ঢেলে তবে তো তৈরি হয় শ্রমিকের শরীর, বিপণন সমাজের অসংখ্য ভোগ্যবস্তুর ক্রেতার শরীর, ফ্যাশন-ম্যাগাজিনের স্বাস্থ্য পত্রিকার শরীর। (দীপেশ, ২০১৮, পৃ. ১৬১-১৬২)

দিল সোহাগির বিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা বাহের গাড়োয়ানের গাড়ি হাসপাতাল এলাকার মধ্যে এলে হাসপাতালের কর্মচারী ধরম ডোম তাকে পাকড়াও করে। সরকারি এক লাশ পৌঁছানোর ভার অর্পিত হয় গাড়োয়ানের উপর। সাঁওতাল–ধরম ডোমের কাছে ডাক্তার 'ভগমান ঈশ্বর', সে তার কথামতো লাশের সাথি হতে আপত্তি করে না। কিন্তু গাড়োয়ান লাশ নিতে অসম্মত হয়, কারণ তখন তার চোখে নতুন সোনালি শস্যের স্বপ্ন ভাসছে। এসময় ক্রুদ্ধ ডাক্তার হাক দেয় : "অহে লাশ নিয়ে এত ক্যাচাল কিসের। সরকারী রিপোর্ট আছে পোস্ট মর্টেম হয়েছে সরকার বাহাদুর স্বয়ং বাদী" (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৩২) অর্থাৎ কোথাও কোনো সমস্যা নেই এবং সরকারের নির্দেশ অবশ্য স্বীকার্য। 'রাজা কোন ভুল করে না' ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের এই নীতির সমার্থক-নীতি গেড়ে বসে বিশ শতকের নয়ের দশকের প্রায় পুরো সময় জুড়ে। গোঁড়া স্বৈরশাসকের স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতির স্বীকার লাশ হয়ে যাওয়া যুবক। তার লাশ ঐ রাষ্ট্র ও সরকারের জন্য হুমকিস্বরূপ আর মানবতার চরম অপমান। তাই জোরপূর্বক তা গাড়োয়ানের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। লেখক ব্যাঙ্গোক্তি করেন : "কল্যাণমূলক রাষ্ট্র মানেই লাশের গন্তব্যে লাশকে পৌঁছানো।" (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৩২) আর সে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সকল সহজ-সরল মানুষকে বাড়তি মূল্য দিতে হয়। সেই মূল্য দিতে বাহের গাড়োয়ানকে যুবকের লাশ বহন করতে হয়। মানবতার অপমান হজম করে বরফ আর কাঠের-গুড়ো মাখানো পাটি-মোড়া লাশ তুলতে হয় শস্যবাহী গাড়িতে। গাড়োয়ানের যাত্রা শুরু হয় অজানা ঠিকানার উদ্দেশ্যে।

তবু এ মৃতের গল্প

চিরকাল মৃতকে ঘিরে জীবিতের কৌতূহল। মৃত্যুর খবর বাতাসের আগে চলে, তাই নৌকা পারাপারের ট্যাক্সঘরে বিচিত্র লোক সমাগম হয়। কথক বোঝে অস্বাভাবিক লাশকে ঘিরে বহু মিথ বা উপকথার সৃষ্টি হবে। এর মধ্যে কথকের পছন্দনীয় একটি মিথ যেমন : "এক অতিকায় দৈত্য এই যুবক শ্রমজীবীর বুকে নখ ফুটিয়ে প্রথমে রক্ত পরে গিলা কলজে খেয়ে নিয়েছিল... সরকারী ডাক্তারখানায়ও সে রকমের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেছে।" (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৩৩) হয়ত এই মিথ কেন্দ্র করে আরো আনুষঙ্গিক উপকথা তৈরি হবে। এমনি উপকথার জন্ম দিতে দিতে গাড়োয়ান চলে অর্ধবৃত্তাকার মাটির পথ ধরে — যে যাত্রার লক্ষ্য ছিল শস্যের ভূমি তথা নতুন জীবনের পানে, তাকে ছুটতে হয় মৃতের খবর নিয়ে। জীবন-মৃত্যুর দ্বৈত আহ্বান যুগপৎভাবে কাজ করে সেখানে, সৃষ্টি ও প্রলয় এক বিন্দুতে মিলিত হয়। বৃদ্ধ গাড়োয়ানের মনে মৃতের প্রতি সহানুভূতি জাগে। কল্পলোকে সে যেন দেখতে পায় মৃত যুবকের প্রণয়ী ও বৃদ্ধা মা কে। যারা তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছিল; মৃত্যুর সংবাদে কতই না মর্মাহত হবে তারা।

মৃত্যু অনিবার্য ও চিরন্তন ঘটনা। সবাই মরে, তবে তার ধরনটা আলাদা। গাড়োয়ান আবিষ্কার করে যে লাশ সে বহন করে চলেছে, তার অবস্থা খাঁচি-ভরা ইলিশ মাছের মতো বৈ নয়। পার্থিব-স্বার্থ

আর অপার্থিব-বোধের সংঘর্ষ যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা চন্দ্রবোড়া সাপের শীতল-বিষের ন্যায় গাড়োয়ানের ভেতর প্রবেশ করে। যার উপস্থিতি সে প্রথমেই টের পায়। গাড়োয়ান গাড়ির চাকার অঙ্কিত রেখায় চন্দ্রবোড়া সাপের কুণ্ডন দেখে, কথকের বয়ান : "গাড়োয়ান বুঝতে পারে পথের শুরুতে যে দংশন করেছে গন্তব্যে পৌঁছালে সেই তাকে গিলবে।" (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৩৯) তবে যাত্রার শুরুতে যে বিষের উদ্‌গীরণ হয় চাকার ঘূর্ণনে পথের-কল্যাণে তার স্খলন হতে থাকে। নাট্যকারের বর্ণনা :

> আজ উজ্জ্বল আলোকিত ভুবনের সকল দৃশ্য খসে গিয়ে সূর্যের পথপরিক্রমার নীচে একটি যে দৃশ্য তৈরি হলো তা সামনে দুই পৌরাণিক ষণ্ড এবং একজন গাড়োয়ান মিলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কী এক রহস্যময় অথচ শাশ্বত ঠিকানায়। গাড়ির অনেক দূরে নিকষরঙা ধরম এদিকে গাঢ় নীলের নিচে গাড়োয়ানের হৃদয় ক্রমেই বিষক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে থাকে। (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৩৯)

সরকারি আদেশ পালনার্থে লাশের ভারগ্রহণ করলেও অস্বাভাবিক মৃত্যু ও লাশের দুরবস্থা মেনে নিতে পারে না বাহের গাড়োয়ান। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ লুকানোর জন্য ময়না তদন্তের নামে মানুষের পবিত্র দেহ কাটা ছেড়াকে বীভৎস মনে হয়। পথিমধ্যে ঘুঘু শিকারীর সাথে দেখা হওয়া ও পাখি শিকারের কৌশল বর্ণনায় মৃতের রহস্যকে ব্যঞ্জিত করা হয়। বড়শিতে ফল, পাকা লাল মরিচ বেঁধে টিয়া, হরিয়াল প্রভৃতি পাখির জন্য অপেক্ষা করা হয়। সময় বুঝে টোপ গিলে নেয় সরল পাখি। শিকারীর উদ্দেশ্য সফল হয়। তেমনি রাষ্ট্রের মতাদর্শিক টোপের শিকার মানুষ যেমন : *চাকা*র মৃত যুবক।

পথের-মোড় ঘোরার সময় চাকায় আওয়াজ হয়, যা অনেকটা চাপাকান্নার মতো শোনা যায়। অপরিচিত এই লাশের আদৌ পরিচয় মিলবে কিনা, তার প্রিয় মানুষেরা তার জন্য চোখের জল ফেলতে পারবে কিনা তাই নিয়ে গাড়োয়ানের ভাবনা হয়। তার কান্নার-স্বর মিশে যায় চাকার আওয়াজের সাথে। আর কিছু না হোক প্রিয়মানুষের চোখের জলটুকু অন্তত মৃতের ন্যায্য পাওনা। "নিঃশব্দে কখনও কখনও চাকার কান্নাসহ ওদের পথ চলা শুরু হয়। সঙ্গে অজ্ঞাত নামা মৃত। গাড়োয়ান বলে... তুমার মনের মানুষ চুল ছড়ায়ে দিয়ে কানবু... মরা বুলেই কি মরা" (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৪৫) এমনি নানা ভাবনা দানা বাঁধে তার মনে। পাশ দিয়ে যাওয়া ধানের গাড়ি দেখে তার প্রত্যয় হয় : 'শস্যের চেয়ে লাশের মূল্য বেশি'। তাই শস্য বহনকারীদের চেয়ে তার অহংকার কম নয়। আজ সে এক মহান দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছে :

> নয়ানপুরের যে গৃহে আজ শোকধ্বনি উঠবে উত্তীর্ণ প্রদোষে সে শস্য সহজে ফলে না।... এ গাড়িতে এমন এক কষ্ট বহন করে নিয়ে যাচ্ছে সে যে তাতে বরং ভরা ধানের সোনার আড়ত ভূষি উড়ে যাবে... এই মৃতকে ঘিরে যে আহাজারি উঠবে পৃথিবীর কোন শস্য তাকে রুখতে পারে। (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৪২)

সভ্যতার আদি পর্যায় অতিক্রম করে নিজ প্রয়োজন অনুসারে মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে, প্রকৃতির বহুবিধ শক্তিকে উপেক্ষা করে সে বেঁচে আছে, এটাই বরং আশ্চর্য। কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য তাই তা স্বাভাবিক। জীবনচক্রের এই স্বাভাবিকতা যখন জোরপূর্বক অস্বাভাবিকতার দিকে চালিত করা হয় তখন গোটা মানবিক বোধের জগতে ধস নামে। অপরিণত বয়সে মৃত্যু নিয়ে আদিকাল থেকেই নানা ট্যাবু চালু রয়েছে। নাট্যকার সেলিম আল দীন তেমনি এক অপঘাত-মৃত্যুতে মহত্ব আরোপ করেন। অবশ্য অজ্ঞাতনামা যুবকের মৃত্যু হয়েছে স্বদেশের জন্য, দেশের অভ্যন্তরীণ

শত্রুর কোপানলে। যে লাশের দাফন হওয়া উচিত ছিল বীর শহিদের ন্যায়, কিন্তু চুপিসারে সেই লাশ লোকচক্ষুর আড়াল করার চেষ্টা চলে। প্রান্তিক এলাকা নয়ানপুরের উদ্দেশে লাশ প্রেরিত হয় শ্রদ্ধা-সম্মানহীনভাবে। কিন্তু সেই ঠিকানা যে মেকি তা জানা যায় *চাকা*র অভিযাত্রায়। নয়ানপুর, নবীনপুর প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রম করে গাড়োয়ানের গাড়ি ও লাশের গন্তব্য মেলে না। নাটকের অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি হয় গন্তব্যের ঠিকানা না পাওয়া থেকে।

নয়ানপুর পৌঁছে গাড়োয়ান ও সঙ্গী যুবক পইরাত প্রত্যেক বাড়িতে খবর দেয়। লাশ দর্শনে গ্রামীণ মানুষের মুখে মুখে অনেক গল্পের ভিড় জমে। কিন্তু গ্রামের হেডমাস্টারসহ অন্যদের বিচারে স্থির হয় যে, মৃত ব্যক্তি সে গ্রামের নয়। তাছাড়া শিক্ষিত হেডমাস্টারের মতে, তাদের গ্রামে স্কুল-মাদ্রাসা আছে, গত মাসে উপমন্ত্রীও এসেছিল সুতরাং তা ভদ্রলোকের গ্রাম। এখানে অপঘাতে লোক মরতে পারে না। গণঅভ্যুত্থানে সামরিক সরকারের গুপ্তহত্যার শিকার হওয়া যুবককে হেডমাস্টার চোর বা জুয়াড়ির পর্যায়ভুক্ত করে। শিক্ষিত সচেতন প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য :

> যাও ভুল ঠিকানায় এসেছ... তবে দু'মাইল দূরে নবীনপুর বলে এক গেরাম আছে এই পথে সোজা... হয়ত সেখানে এই লোকটার ঠিকানা মিলতে পারে। সেটা জুয়াড়ী গরুর দালাল আর সিঁধেল চোরদের গ্রাম... সে গ্রামে সবচেয়ে বেশি অপঘাতে লোক মরে। (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৪৯)

সরকার প্রদত্ত দ্বিধাপূর্ণ ঠিকানা নিয়ে বিপাকে পড়ে গাড়োয়ান। ক্লান্তি-ক্ষুধা-ক্ষোভ অর ধরম ডোমের নৃত্য-গীত সহ তাদের যাত্রা অব্যাহত থাকে। পথের মোড় ঘোরে, নতুন রাস্তায় ওঠে গাড়ি, শূন্য প্রান্তরে গাড়োয়ান চিৎকার দেয় : "হামাকের মুক্তি নাই...শাপ কাটে নাই বাহের গাড়োয়ানের... লাশের গাড়ির সঙ্গে তার পাছা সেঁইটে গেছে... সে ঘুরবে তামাম পৃথ্বিমী মুক্তি নেই।" (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৫২) সেই 'মুক্তি নেই' প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরত আসে। সামনে নবীনপুর গ্রাম থাকলেও গাড়োয়ান হয়ত বুঝতে পারে উদ্দিষ্ট লাশের ঠিকানা পৃথিবীতে কোথাও মিলবে না। নয়ানপুরের বৃদ্ধের স্বীকার করা সত্ত্বেও গ্রাম কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্র-চিহ্নিত লাশের দায়িত্ব নিতে চায়নি, সেখানে অন্য কোথাও আশা বৃথা। নবীনপুর পৌঁছে অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় লাশ বহনকারী দলকে। এদিকে লাশে পচন ধরে। পিঁপড়েরা জড়ো হয় লাশের গায়ে। এই অনামা লাশ তো মানুষের জন্য, মানবসভ্যতার জন্য লজ্জা। গাড়োয়ানের মুখে শোনা যায় : "মানষের লজ্জা মানষে লিবে পিঁপড়েরে লিতে দেমো ক্যা।" (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৫৮)

গতির দর্শন

মানুষের আবেগ ও বোধের অপমৃত্যু দর্শনে মন বিষিয়ে যায় বাহের গাড়োয়ানের। মানুষের প্রতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রস্থিত ব্যক্তির উপর বিশ্বাস হারায় সে। বরং চাকার প্রতি বিশ্বস্ততা ও সম্ভ্রম জাগে মনে কারণ জীবিত, মৃত, শস্য সকলে চাকার কাছে সমান; সবাইকে বহন করে চলে সে। কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই তার। চাকার ধর্মই গতিশীলতা। আর যা গতিশীল জড়তা তাকে স্পর্শ করে না; তা সহজে লোপ পায় না। চাকার এই গতির তরঙ্গে গাড়োয়ান নষ্টমান সমাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

চাকার ঘূর্ণনে গাড়ি এসে উপস্থিত হয় এক বাজারে। লাশ বহনকারীরা অনুরোধ জানায় অজ্ঞাতনামা ও গলিতপ্রায় লাশের দাফনের জায়গা দেয়ার জন্য। বিকৃত আচরণের মুখে পড়তে

হয় সঙ্গীসহ গাড়োয়ানের। যেন মস্তবড় পাপ করে চলেছে তারা, তাই বসে একটু জিরিয়ে নেয়ার ঠাঁই পর্যন্ত মেলে না। বাহের গাড়োয়ান এবার তার দর্শনে নিঃসংশয় হয়ে ওঠে। সে আবিষ্কার করে, পৃথিবীর সব মানুষের বাড়ি হয়ত নবীনপুর না হয় নয়ানপুর। যে ধারণা গোটা মানবসমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণা আর অবিশ্বাসের বাণী ব্যক্ত করে। বিশ্বমানবতা নবীনপুর বা নয়ানপুরের মানুষের ন্যায় আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক ও মমতারহিত বলে চিহ্নিত হয় গাড়োয়ানের কাছে। নাট্যকারের বয়ানে :

> মানব মুখের এক বিশাল বিস্ময় প্রত্যক্ষ করে তারা মৃত যুবকের মুখে... গতকাল ভোরে যে কোমল প্রশান্তি তার মুখে ছিল তা আর নাই...পৃথিবীতে অন্যায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে কোন মৃতের যদি ক্রোধ ও ধিক্কার কোনদিন প্রকাশ পায় তবে তার আকৃতি নিশ্চিতই এরকম হবে (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৬০)

লাশের প্রতি, মানবতার প্রতি মানবের অবজ্ঞা দেখে বাহের গাড়োয়ান মৃতের মুখে বিস্ময় চিহ্ন প্রত্যক্ষ করে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭) *খোয়াবনামা* উপন্যাসে কুলসুমও তমিজের বাপের নিঃসাড় মুখে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখে। উপন্যাসে উল্লেখ পাওয়া যায় :

> মণ্ডলের হাতে মার খেয়ে তমিজের বাপ কি সারটা সকাল–সারাটা দুপুর ঘুরে ঘুরে দুনিয়ার আগুন, আসমানের আগুন সব চুরি করে জমিয়ে নিয়ে এসেছে নিজের গতরের মধ্যে?...কী যেন জানার জন্যে মুখটা সে ফাঁক করে রেখেছে। হা-করা মুখে এমন প্রশ্নবোধক দাগ আগেও অনেকবার দেখেছে। (আখতারুজ্জামান, ২০১২: ৫০৫-৫০৬)

বিদেশি-বিজাতির হাতে মার খাওয়ার ইতিহাস বাংলা অঞ্চলে দুর্লভ নয়; কিন্তু স্বজাতির কাছে নিষ্পেষিত হলে সে লজ্জা লুকানোর জায়গা থাকে না। *খোয়াবনামায়* তমিজের বাপ তাই বাস্তব থেকে বিচ্যুত থাকতে শুধু ঘুমায় আর খোয়াব দেখে। নির্লিপ্ত ও প্রায়-অস্তিত্বহীন তমিজের বৃদ্ধ বাপকে তবু নির্মম বাস্তবতা মাথা পেতে নিতে হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় তার মুখে ফুটে ওঠে জোতদার আর ক্ষমতাবানদের নির্মমতা আর লোভের প্রতি চিরকালীন প্রশ্ন; হয়ত সে অনুক্ত-প্রশ্ন ব্যক্ত করে অসীম বিদ্রূপবাণ। *চাকা*তে মৃতের ঠোটের ফাঁকে যে বিস্ময়জ্ঞাপক চিহ্ন দেখে গাড়োয়ান, তা সমগ্র মানবের বিদ্যমান অস্তিত্বের প্রতি, বোধ ও দর্শনহীন দৃষ্টির প্রতি চরম বিদ্রূপাত্মকভাবের প্রকাশক।

গোষ্ঠী বা সমাজ-প্রধান মানুষের কাছে ব্যক্তি-স্বার্থ গৌণ, একজনের সুখ-সুবিধা বা দুর্বিপাকের ভাগিদার সবাই। সাঁওতাল অঞ্চলের সংস্কৃতিতে মৃতের শেষকৃত্য সম্পর্কে জানা যায় :

> সাাঁওতাল সমাজে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে গ্রামের গোডেথ বা বার্তাবাহকের মাধ্যমে পাড়ার সবাইকে খবর দেয়া হয়। গোডেথ বাড়ি বাড়ি ঘুরে সবাইকে 'গোসহান' অর্থাৎ মৃত্যুবরণের সংবাদ দেন, যে কে মৃত্যুবরণ করল কোন বাড়িতে। মৃতের বাড়ির পরিজন ছাড়াও প্রতিবেশী মেয়েরা ক্রমে কান্নাকাটি করতে থাকে। মৃত ব্যক্তিকে দেখতে কোনো মহিলা সে বাড়িতে এলে তাকে অবশ্যই কান্নকাটি করতে হবে। এটা বাধ্যতামূলক সামাজিক বিধি। (আখতার, ২০১১, পৃ. ১৬৭)

সাঁওতাল কেবল নয়, গ্রোত্রভুক্ত মানুষ গোত্রের রীতিবশত বা সরল অনুভূতির বশবর্তী হয়ে অপরের দুর্দিনে ভাগিদার হয়। সভ্যতার বৃহৎ অবদান — রাষ্ট্রে এই বোধ কাজ করে না। *চাকা* নাটক যে অঞ্চলের গল্প সেই অঞ্চল রাষ্ট্রের কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী ও সাঁওতাল-প্রধান এলাকা। রাষ্ট্রের ভালোটুকু অধিকার করার সুযোগ না পেলেও বিষটুকু ঠিকই গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। তাই বরফ দেয়া, চাটাই-মোড়া মৃতদেহ আর ক্লান্ত শববাহক তাদের অন্তর বিদীর্ণ করতে পারে না। যদিবা কারো হৃদয় আর্দ্র হয়, তবু আত্মস্বার্থ আর পরিপার্শ্ব সে অনুভূতিকে তিষ্ঠাতে দেয় না।

মানবতার দায়কে নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয় বাহের গাড়োয়ানের। রান্নার খন্তা দিয়ে জনশূন্য নদীতীরে কবর খোঁড়ে তারা। কোন দোয়া-কলমা ছাড়াই কেবল মমত্ব দিয়ে অজানা মানুষটির কবর রচনা করে। লেখকের কথায় : "দোয়া কলমা শেখেনি কিছুই ঐ এক সরল পথ দেখাবার আয়াতটি ছাড়া।" (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৬১) চাকা তাকে স্থিরতা থেকে সচল করে। স্থবিরতা থেকে মুক্তি দেয় যা বদ্ধমূল চিন্তার জগৎ ছেড়ে বেরিয়ে উন্মুক্ত-উদার ভাবনার পৃথিবীতে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। বাহের গাড়োয়ান চাকার গতির সাথে সাথে জনপদবাসীর কাছে পৌঁছে যায় এক সংকট ও দুঃখের বার্তা নিয়ে। মানুষের অসংবেদনশীল বোধ ও মানবতার চরম অবমাননা প্রত্যক্ষ করে, যা তাকে নব দর্শন রচনায় প্রয়াসী করে। চাকার দৌলতে দর্শনের ওহি তার নিকটে পৌঁছায়।

লাশ ভোক্তা বা ভোটার নয়

অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে মৃতের উপযোগ সৃষ্টির ক্ষমতা নেই। সে ভোক্তা নয় এবং রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, মৃত বা লাশ ভোটার নয় তাই পুঁজিবাদী ও কায়েমি রাষ্ট্রে লাশের কোনো মূল্যায়ন নেই। বর্তমান বিশ্ব যে একচেটিয়া পুঁজিবাদী সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আর পুঁজিবাদের দৃষ্টি একমাত্র মুনাফার দিকে। কোনো বস্তু উপযোগ সৃষ্টি করতে পারছে কি-না, ব্যক্তি মুনাফা বা পুঁজিতে ভূমিকা রাখতে পারছে কি-না, পারলে কতটুকু পারছে তার উপর নির্ভর করে ওই ব্যক্তি বা বস্তুর অবস্থান, পরিচয় বা অস্তিত্ব নির্ধারিত হয়। পুঁজির কারণ নয় এমন ব্যক্তি বা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করে না পুঁজিবাদী বিশ্ব। "বুর্জোয়া শ্রেণী বিশ্ববাজারকে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রতিটি দেশেরই উৎপাদন ও উপভোগে একটা বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে।" (মার্কস, ২০১৮, পৃ. ৩১) আর তাই আলোচ্য নাটকের অনামা ব্যক্তির মৃতদেহটিকে লাশ নাম নিয়ে উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে হয়। তার নিজের ভূমিতে সে নাই হয়ে যায়। যে মানুষটা জীবৎকালে সবার সাথে পৃথিবীর আলো-বাতাস উপভোগ করেছে, সমাজ-রাষ্ট্রের দায়িত্ববান সদস্য হিসেবে নিজ কর্তব্য পালনে রত থেকেছে, সে একটি কাহিনির পট-পরিবর্তনে দায় হয়ে দাঁড়াল। অথচ মৃত্যু তো জীবনেরই অন্যরূপ, জীবনচক্রের শেষ পর্যায়; যা মানুষের আবেগ-অনুভূতির দাবি রাখে। ফ্রিডরিক নীৎশে (১৮৭৫-১৯০০), মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬)-সহ প্রত্যেক দার্শনিক মৃত্যু নিয়ে বিস্তর আলোচনা করলেও, প্রকৃত ও নির্বিকল্প কারণ অনুসন্ধান সম্ভব হয়নি; ভাবুকেরা তাই মৃত্যুকে মহাকালের অংশ বলেন। সেলিম আল দীন *চাকা*র মৃত্যু বিষয় নিয়ে বলেন : "আমি মৃত্যুটাকে এক মহাজাগতিক জায়গায় নিতে চেয়েছিলাম। মানে বিশাল একটা প্রান্তরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে লোকটির শব–মনে হচ্ছে একটা চিত্রকলা যাচ্ছে।" (সেলিম, ২০১০, পৃ. ১০২) কিন্তু এই চিত্রকলা ছাড়িয়ে নাটকের ভাববস্তু *চাকা* নাটকটিকে মহৎ দার্শনিক উচ্চতা দান করে।

প্রাগৈতিহাসিক কালে মৃত্যুকে জীবনের একটা অংশ হিসেবে বিবেচনা করে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হতো। ক্রমে ধর্ম ও জাতিগতভাবে মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা যেমন : পুনর্জন্ম, ভূত বিষয়ক চিন্তার উদ্ভাবন হতে থাকে। ইউরোপে চার্চের আবির্ভাব ও ভারত উপমহাদেশে আর্য ও অন্যান্য জাতির প্রভাবে সংগঠন হিসেবে ধর্মের পরিবর্ধন মৃত্যু-ধারণাকে জটিল করে এবং মৃত্যুভীতি ও আত্মার ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। আধুনিক যুগ মৃত্যুকে নতুনভাবে রূপায়িত করে। চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি রোগমুক্তির মাধ্যমে সাময়িকভাবে মৃত্যুকে রোধ

করে। অন্যদিকে নিত্যনতুন মহামারী রোগের জীবাণু আবিষ্কার, যুদ্ধের ব্যাপকতা, কায়েমি শক্তির হত্যাপ্রিয়তা, পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কার মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ব-ধারণা বদলে দিয়েছে। আধুনিক মানুষের পক্ষে কোনো পূর্বানুমান সম্ভব নয়, যে কীভাবে তার মৃত্যু হবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত, যা মানুষের একান্ত নিজস্ব এবং পরিজনের গভীর-বেদনাদায়ক অনুভূতির ব্যাপার, তা আর নিজের থাকছে না। পূর্বে পরিবার-পরিজনের মাঝে মৃত্যুবরণ করা মানুষ অহরহ হাসপাতালে, রোডে, ময়দানে, শপিংমলে মৃত্যুবরণ করছে, অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হচ্ছে। জীবনের স্বাভাবিক চক্র না হয়ে তা অস্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হচ্ছে। আর রাষ্ট্র চায় সেই লাশ ও মৃত্যুর কারণ লোপ করতে। এই বিলোপকারীদের প্রতি লেখকের বচন :

> শ্রোতৃমণ্ডলী... এখন করুণা জাগে তাদের জন্য যারা তাকে হত্যা করেছে যারা তাকে ভুল ঠিকানায় দিকে দিকে প্রেরণ করেছে... করুণা জাগে তাদের জন্য যারা তার পেট চিরেছে হত্যার কারণ গোপন করেছে... যারা অন্যায়ভাবে মানব কষ্টের সহস্র বর্ষের সঙ্গী যুদ্ধ জয়ী ষাঁড়কে অন্যায়ভাবে আঘাত করেছে। (সেলিম, ২০০৯: ১৬০)

নাট্যকার যে প্রাকৃতের দর্শন রচনা করেন সেখানে রীতি-পদ্ধতি ও ধর্মীয় আচার তুচ্ছ হয়ে যায়, মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় মানুষের অনুভূতি। গলিত লাশের সামনে কারবালার 'পুঁথি' পাঠকে দোষের মনে হয় না। গাড়োয়ানের যুক্তি, কারবালার কাহিনি যেমন দুঃখের, ঠিকানাবিহীন মানুষের লাশ তেমনি দুঃখের। শত্রুর হাতে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের অন্যায় মৃত্যু এবং পবিত্র মৃতদেহের অবমাননার চিত্র যেন তিনি চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছেন যুবকের লাশের মাঝে। এমনকি গাড়োয়ান লাশকে স্বজন ভাবে, আর তার অনুভবের প্রণেতা হিসেবে চাকাতে কৃতিত্ব আরোপ করে। কথকের বর্ণনায় :

> মাইলের পর মাইল একসঙ্গে চলেছে ওরা কাজেই এই মৃতকে আর অপরিচিত ঠেকেনা... চাকার আবর্তনে আবর্তনে অপরিচিত থেকে পরিচয় ক্রমে গাঢ় ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠে। চাকা যত পথের ভেতরে প্রবেশ করেছে লাশটিও ওদের অন্তরের ততদূরে ভেতরে চলে গেছে। (সেলিম, ২০০৯, পৃ. ১৫৫-১৫৬)

গাড়োয়ান তাই তার খোরাকের চিন্তা ভুলে চিরায়ত মানব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। সমাজ-রাষ্ট্রের দায় নিজ কাঁধে তুলে নেয়।

পরিশেষ

আধুনিক রাষ্ট্র যে ব্যর্থ এবং 'ব্যক্তিবাদ' একটি ভুল তত্ত্ব – একথা বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু ভারত উপমহাদেশে আধুনিকতা, ব্যক্তিবাদ, রাষ্ট্র প্রভৃতি ব্যাপারগুলো স্বাভাবিক নিয়মে নয়, বিকারগ্রস্তভাবে বেড়ে উঠেছে। তা আবার কেন্দ্রের মানুষজনের ভেতর আবদ্ধ থেকেছে; তার সুফল সুষমভাবে বণ্টিত হয়নি। অথচ পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে গেছে সর্বস্তরে। এর কারণ নিরূপণ করে সেলিম আল দীন বলেন : "বাঙালির সহস্র বৎসরের সামাজিক বিকাশ, ইউরোপীয় নগর ধারণার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলো না। নগর মানব শোষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়াল।" (সেলিম, ২০১৫, পৃ. ৪৮১) মানুষ যে সামাজিক জীব তা ভুলে গেল, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনভাবনাকে প্রাচীনতার নামে অস্বীকার করল। এদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে জন্য যে দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্ববোধের প্রয়োজন তা অর্জনের সামর্থ্য তার ছিল না। তাই *চাকা*তে এক মৃত যুবককে বেওয়ারিশ হয়ে, গলিত শব হয়ে পল্লির পথে পথে ঘুরতে হয়। বাহের গাড়োয়ান মানুষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও

মানবতাবোধহীনতায় ব্যথিত হয়। শস্যের সন্ধানে পথে বের হয়ে মানবের অধঃপতন দৃষ্টে সে নতুন দর্শন নির্মাণ করে। যে দর্শনের মাঝে বিদ্যমান সমাজ-সংসার, আইন এবং ধর্ম বিরাজ করে না। সে-দর্শন প্রাকৃতের দর্শন, তথাকথিত সভ্য জগতের বাইরের অনার্যের দর্শন।

উল্লেখপঞ্জি

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ২০১০। "উপন্যাস ও সমাজবাস্তবতা", *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

– ২০১০। "খোয়াবনামা" *আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচনাসমগ্র-২*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আখতার উদ্দিন মানিক, ২০১১। "সাঁওতালি নৃতত্ত্ব ও লোকাচার", *আদিবাসী ভূমি ও সঙ্গত প্রসঙ্গ*, সম্পাদনাঃ বিলু কবীর, গতিধারা, ঢাকা।

কার্ল মার্কস, ২০১৮। "পুঁজিবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ" *পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র*, সম্পাদকঃ রতনতনু ঘোষ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

দীপেশ চক্রবর্তী, ২০১৮। "শরীর, সমাজ, রাষ্ট্রঃ ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারি ও জনসংস্কৃতি", *নিম্নবর্গের ইতিহাস*, সম্পাদকঃ গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টপাধ্যায়, আনন্দ, কলকাতা।

বিপ্লব মাজী, ২০১৭, 'আইডেন্টিটিঃ একটি উত্তরাধুনিক পাঠ', *উত্তরাধুনিকতা*, সম্পাদকঃ রতনতনু ঘোষ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সেলিম আল দীন, ২০০৯। "চাকা" *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৪*, সংকলন ও গ্রন্থন : সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

– ২০০৯। "চাকা (কথাপুচ্ছ)", *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৪*, সংকলন ও গ্রন্থন : সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

– ২০১০। ড. খালেকুজ্জামান ইলিয়াস ও অন্যান্য কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, *সেলিম আল দীন-এর নির্বাচিত সাক্ষাৎকারঃ কহন-কথা*, সংকলন ও গ্রন্থনঃ সোহেল হাসান গালিব ও নওশাদ জামিল, শুদ্ধস্বর, ঢাকা।

– ২০১৫। "শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতা ও বাঙালির অন্বেষণঃ নাট্যপর্ব" *সেলিম আল দীন রচনাসমগ্র-৯* সংকলন ও গ্রন্থন : সাইমন জাকারিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

ওরা রাবেয়া নয়, *ওরা কদম আলী*

উম্মে সুমাইয়া*

সারসংক্ষেপ : স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা নাটকে মামুনুর রশীদ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে শ্রেণিসংগ্রামের নাট্যকারও বলা হয়। এই প্রবন্ধে নাট্যকার হিসেবে মামুনুর রশীদের সৃজন *ওরা কদম আলী* নাটকের নারী চরিত্রের নির্মাণ পদ্ধতি যাচাই করা হয়েছে। নাটকের নাম *ওরা কদম আলী*, কিন্তু কারা কদম আলী [,] কেন ওরা কদম আলী [,] এই বিষয়গুলো যাচাই করবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। *ওরা কদম আলী* শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রেণিভাবাদর্শ দিয়ে নির্মিত নাটক, ফলে এখানে একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ পাওয়া যায়। নারীর চিত্রায়ন, নারীর অবস্থান ও পরিচয়ের সম্ভাবনা থাকছে বলেই এই নাটক গুরুত্বপূর্ণ। একজন নাট্যকার অনেকগুলো পুরুষপ্রধান চরিত্রের মধ্যে নারী চরিত্র কীভাবে চিত্রিত করেন এই মনস্তাত্ত্বিক চিত্রায়ন নিরীক্ষা করা জরুরি। যার মধ্য দিয়ে নাট্যকারের সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকের কাছে পরিষ্কার ধরা পড়ে। মামুনুর রশীদ নাট্যকার হিসেবে শ্রেণিসংগ্রামে আস্থা রেখেছেন। সেই আস্থা থেকে যখন উনি নাটক লিখছেন, সেই *ওরা কদম আলী* নাটকে মামুনুর রশীদ নারী চরিত্রের উপস্থাপন কীভাবে করেছেন তা-ই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের নাট্যকার অর্থাৎ নাটকের মধ্য দিয়ে যাদের আবির্ভাব তাঁদের মধ্যে চার জন নাট্যকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা পরবর্তী চৌদ্দ বছরের মধ্যে যাঁদের নাটক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং "যাঁদের রচনা বহুল অভিনীত, তাঁরা হচ্ছেনঃ সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল্লাহ আল মামুন, মামুনুর রশীদ ও সেলিম আল-দীন" (মজুমদার, ১৯৮৭, পৃ. ৭৮)। এঁদের মধ্যে "আবদুল্লাহ আল মামুন, সৈয়দ শামসুল হক ও মামুনুর রশীদের নাটকে প্রতিবাদী সংলাপ ও ক্রিয়ার যথেষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়" (রহমান, ১৯৯৫, পৃ. ৭৫)। একজন নাট্যকার তার সমকালীন সমাজের সচেতন ব্যক্তি। তাই, তার কাজের মধ্যে সমাজ-বাস্তবতার খুঁটিনাটি দিকসমূহ এবং সমাজের তথা ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণি ও রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলো ওঠে আসে। বিদ্যমান সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রভাব ফেলে নাট্যকারের কাজে। নাট্যকার তাই নিজের অজান্তেই এক ধরনের সচেতন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে নাটক রচনা করেন। সমাজ সচেতনতা ছাড়া নাটক লেখা অসম্ভব। সমাজে যে ভূমিকা পালন করা হয়, সাধারণত সেই ভূমিকাতেই নারী ও পুরুষ চরিত্র নাটকে চিত্রিত হয়। সংস্কৃতিতে, ঐতিহ্যে এবং ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে নারী, পুরুষের মধ্যে যে সম্পর্ক-ব্যবস্থা তৈরি হয়ে আছে, তাকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করানোকে অনেকে ভয়ের চোখে দেখেন। কিন্তু কাজটি করা দরকার (আউয়াল, ১৯৯৯, পৃ. ১৭-২১)। এই কাজটি করতে হয় লেখককে। একজন লেখকই পারেন সমাজের পরিবর্তনের সম্ভাবনার দোয়ার খুলে দিতে। আবদুল্লাহ আল মামুনের ভাষ্যে– মামুনুর রশীদ শ্রেণি সংগ্রাম, সামাজিক-অর্থনৈতিক শোষণ, মধ্যস্বত্বভোগী টাউট দালাল, দুর্নীতিপরায়ণ আমলা, নৈতিকতাহীন রাজনীতিবিদ এবং মৌলবাদী চক্রান্ত নিয়ে লিখেছেন সফল এবং জনপ্রিয় নাটক *ওরা কদম আলী*, ওরা আছে বলেই, ইবলিশ, গিনিপিগ, সমতট, মানুষ, এখানে নোঙর, পাথর, জয়জয়ন্তী (সূত্রঃ আউয়াল, ১৯৯৯, পৃ. ৪৫)। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর কালে নাটকের মধ্য দিয়ে যাদের আবির্ভাব হয়েছে এবং যাদের নাটক বাংলাদেশের দর্শককে বিপুলভাবে সঞ্চালিত করেছে, এদেশে স্বাধীনতা-উত্তর নাট্যসংস্কৃতি নির্মাণে যাদের নাটক ভূমিকা রেখেছে, তাদের মধ্যে মামুনুর রশীদের নাটক *ওরা কদম আলী* একটা বৃহৎ শ্রেণিকে উপস্থাপন করে। সঙ্গত বিশ্লেষকের মন্তব্য উপস্থাপন করা যেতে পারেঃ

* প্রভাষক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> প্রতিক্রিয়ার শক্তি চিরকালই নাটক ও শিল্পকে করে তোলে বিনোদন। শিল্পের এই উৎকট বাজারী প্রকৃতির জন্য সামাজিক উপযোগিতা হারিয়ে সে শুধুই প্রমোদ। মানুষের মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধের উত্তরণে সে কিছুতেই কাজে লাগতে পারছে না। বরং উদ্দেশ্যহীন এক সমাজকে সেবা করছে মাত্র। *ওরা কদম আলী* নাটকের ভূমিকায় মামুনুর রশীদের কথার মধ্যে পরিষ্কার উঠে আসে নাট্যকার হিসেবে মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা, বিশেষ করে সমাজ ও শোষিত মানুষের প্রতি। নাট্যকারের শ্রেণী সচেতন দৃষ্টি দিয়ে নির্মিত নাটক *ওরা কদম আলী*। মামুনুর রশীদ এর যে নাট্যচর্চা এটা শ্রেণী সংগ্রাম কে সুতীক্ষ্ণ হাতিয়ার করার লক্ষ্য থেকে তাঁর নাট্যচর্চা ও নাটক (খান, ২০০৩. পৃ. ১৪৯)।

নাটকের ঘটনা বিন্যাস

নাটকের ঘটনাটি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী সদরঘাটে বসবাসরত শ্রমজীবী এবং আরেক পক্ষ সুবিধাভোগী মানুষকে নিয়ে। খেয়াঘাটের এক 'পানিওয়ালী মাতারি' রাবেয়া ও ফুটপাতের বোবা হকার কদম আলী। সেখানে আরো আছে চা'য়ের দোকানদার আলিমুদ্দি ও তার কর্মচারী, লঞ্চের সারেং, বই বিক্রেতা আনিস, মলম বিক্রেতা, ঘাটের ইজারাদার নায়েব আলী ব্যাপারী, তার চেলা আব্দুল্লাহ, মন্সুর, দারোগা, কুলি সর্দার, পথচারী ও অসহায় শিশু তাজু। তাজু পিতৃ-মাতৃ হীন শিশু। তাজু একদিন ভোরে মা-বাবার সাথে ঘাটে এসে নেমেছিল। প্রসব বেদনায় কাতর তাজুর মা এবং তাজুকে আলিমুদ্দির চায়ের দোকানে রেখে তাজুর বাবা রিক্সা আনার নামে চলে যায়, আর ফেরে না। অনেকক্ষণ না ফেরায় রাবেয়া তাজুর মায়ের প্রসবের ব্যবস্থা করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে তাজুর মা-ও মারা যায়। এই ঘটনার পরই রাবেয়া তাজুকে তুলে নেয় নিজের কোলে। পিতৃস্নেহে তাজুকে বুকে টেনে নেয় বোবা কদম আলী। মাটির হাঁড়ির দোকানদার বোবা কদম আলী তাজু শিশুটিকে লালন-পালন করতে শুরু করে। কিন্তু ইজারাদার ঘাটের নায়েব আলী তাজুকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়। কদম আলীর স্ত্রী, সংসার কিছুই নেই। অথচ রাবেয়া সম্ভ্রম বাঁচাতে ঠাঁই নেয় বিশ্বস্ত কদম আলীর কাছে, এরপর ঠাঁই পেল তাজু। লঞ্চ ও হোটেলের মালিক এবং ইজারাদার নায়েব আলী শোষণের বিরুদ্ধে যে কথা বলে তার উপর হামলে পড়ে। সে ঘাটের চুক্তির চেয়ে যাত্রীদের কাছে বেশি পয়সা আদায় করে নেয়। মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়ে সারেং কে বেতন না দিয়ে মারধর করে এবং তাড়িয়ে দেয়। অসহায় শিশুদের কম মজুরি দিয়ে হোটেলে কাজ করায়। তাছাড়া সরকারের চোখে ফাঁকি দিয়ে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে। তাজুকে নেয়ার জন্য নায়েব আলী মরিয়া হয়ে ওঠে কিন্তু কদম আলী তাজুকে দেয় না। আলিমুদ্দির চায়ের দোকানে তাজুকে বসিয়ে ভাত আনতে যায় কদম। এর মধ্যে নায়েব তাজুকে মিষ্টি খাইয়ে ফোসলাতে থাকে, তা দেখে কদম আলী ক্ষুব্ধ হয় এবং তাজুকে জোর করে নিয়ে যায়। আব্দুল্লা গিয়ে কদম আলীকে ধরে রাখে এবং ব্যাপারী তার জুতা দিয়ে মারে। রাবেয়া ইন্সপেক্টর কে অনুরোধ করে কিন্তু সে কিছুই করে না। এতেও নায়েব শান্তি না পেয়ে কদম আলীর দোকান তুলে নিয়ে যায়। কদম আলী ক্ষিপ্ত হয়ে ব্যাপারীর গুরুত্বপূর্ণ হিসাবের খাতাটি ছিনিয়ে নিয়ে আসে। ব্যাপারী বাধ্য হয়ে কদম আলীর হাঁড়ি পাতিল ফেরত দেয় এবং ক্ষতিপূরণ দেবার আস্থা দেয়। কিন্তু কদম তাকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে। এরপর দেখা যায় ব্যাপারী নজর দেয় রাবেয়ার উপর। কিন্তু রাবেয়া প্রতিবাদী নারী। বারবারই নিজেকে সে কৌশলে বাঁচিয়ে রাখে। নাটকের শেষে তাজুর বাবা ফিরে আসে। রিক্সা আনতে গিয়ে ঝামেলা বেঁধেছিল পুলিশের সাথে। এরপর দৌড়ে পালাতে গিয়ে ট্রাকের ধাক্কায় আহত হয়, একটা পা হারিয়ে সুস্থ হবার পরই ফিরে আসে। এরপর তাজু তার বাবার সাথে বাড়ি চলে যায়। কদম আলী তার সবকিছু– বই, খেলনা দিয়ে দেয় এবং বিদায় দেয়। কদম আলী কান্নায় ভেঙে পড়ে। সর্দার কদম

আলীকে সামলায়। এই সময় দেখা যায় নায়েব আলী চূড়ান্ত আক্রমণ চালায়, ইন্সপেক্টর কদম আলীকে ধরতে আসে এবং সবাই একত্র হয়, রাবেয়া থেকে শুরু করে সবাই বলতে থাকে 'আমি কদম আলী'।

নারীর চরিত্রের দ্বান্দ্বিক রূপায়ণ

"নাটকে নারী-পুরুষের সবধরনের সম্পর্ক, উভয়ের সুখ-দুঃখ, সমাজ ও পরিবারে তাদের অবস্থা ও অবস্থান, উভয়ের প্রতি উভয়ের বিশেষত নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন, নারীর প্রতি ধর্মীয় ও সামাজিক নিপীড়নের ইতিহাস–সব কিছুই প্রতিফলিত হয়ে থাকে। [...] সমাজবাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাটকে নারী, পুরুষের সামাজিক ও নৈতিক সম্পর্কের ধরনটি বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কারণ সমাজে বিদ্যমান নানামুখি দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয় নাট্যসাহিত্যে। একটি সমাজের বহুবিচিত্র দিক উঠে আসে নাটকে-বাংলাদেশের নাটকও এর ব্যতিক্রম নয়" (আউয়াল, ১৯৯৯, পৃ. ৪৪)। এই নাটকে দুইটি নারী চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে– একজন তাজুর মা, যে স্বামী ও পুত্র তাজুসহ সদরঘাটে আসে হাসপাতালে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, কিন্তু স্বামী ফিরে না আসায় প্রসবকালে তাজুর মা মারা যায়। দ্বিতীয়জন রাবেয়া। প্রতিবাদী ও সাহসী নারী চরিত্র। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে যে মৃত্যুকেও তোয়াক্কা করে না– "খুনাখুনির ডর আমরা করি না। আমরা ডর করি ইজ্জতের" (রশীদ, ১৯৯৪, পৃ. ৭৭৯)। বিশ্বস্ত কদম আলীর আশ্রয়ে থেকেও রাবেয়া বার বার পুরুষের হামলার স্বীকার হয়। রাবেয়া সর্দারকে বলে – "তগো মতো মাইনষের কাছ থিকা আমার ইজ্জত বাঁচানের লাইগা একটু জায়গা– যেহানে রাইতে ঘুমাইতে পারি" (রশীদ, ১৯৯৪, পৃ. ৭৮৩)

সর্দার রাবেয়াকে ভোগের আশায় নেশা করে বারংবার তার কাছে আসে কিন্তু রাবেয়া প্রতিবারই সর্দারকে তাড়িয়ে দেয়, এমনকি সর্দারের বিয়ের প্রস্তাবেও রাবেয়াকে অসম্মতি প্রদান করতে দেখা যায়।

> সর্দার – রাবেয়া, তর কি ঘর বানাইবার ইচ্ছা করে না? আমার কথা গুলি বুঝ তুই।
>
> রাবেয়া – যে আমারে ঘোর আকালের মধ্যে, হায়রে আকাল – যহন মাইনষে মাইনষেরে খায়, তার মধ্যে এইহানে ফেলাইয়া থুইয়া চইলা গেলো – কত গুলি জানুয়ারের মুখে থুইয়া গেলো আমারে – কেমনে আমি বাঁচছি – কেমনে আমি দুইবেলা দুইডা খাইছি – খবর নিছে কোনোদিন? হেও আমারে তোর মত মিঠা কথা কইছিলো – খালি কইতো আমি নাকি তার কলিজার টুকরা – হে কলিজার টুকরারে যে শিয়াল-শকুনের মত এই ঘাটে কত মানুষ টুকরা টুকরা কইরা খাইতে চাইছে – তার হিসাব কেডা রাহে? ঐ কদম আলী না থাকলে কোথায় যে ভাইসা যাইতাম – ঘর বানাইতে আমার আর ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করে দুইবেলা দুইডা খামু আর ইজ্জতের সঙ্গে বাচুম। (রশীদ, ১৯৯৪, পৃ. ৭৮৪)

এখানে রাবেয়ার পুরুষের প্রতি অবিশ্বাসের কারণ উপস্থাপিত হয়। এক পুরুষের প্রত্যাখ্যানের পর রাবেয়া আরেক পুরুষের কাছে যেতে চায় না। সে পুরুষকে আর বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু রাবেয়া আবার আশ্রয় নিয়েছে আরেক পুরুষের কাছে, যে-বোবা। অনেক পুরুষ থেকে বাঁচতে ঠাঁই নিতে হয় আবার এক পুরুষের কাছে। কিন্তু সর্দার হুমকি দেয়, তাজুকে ব্যাপারীর হাতে তুলে দিবে এবং কদম আলীকে হত্যা করবে। এতেও দেখা যায় এই নারী ভয় না পেয়ে সর্দারকে কথায় আঘাত করে- "তা তো দিবিই, সেও তো তোর মতই বেওয়ারিশ মাল। তুই যেমুন কালাচানের মায়ের ঘরে মানুষ হইছস, ব্যাপারী বানাইছে তরে জানোয়ার–মানুষ মারার জানোয়ার–আর আমরা যে তাজুরে মানুষ করবার চাই–তর মত জানোয়ারগো শায়েস্তা করতে–তা তুই অইতে দিবি ক্যান?" (রশীদ, ১৯৯৪, পৃ. ৭৮৪)।

এরপরও সর্দার মানতে না চাইলে রাবেয়া তার জন্ম পরিচয় এবং সর্দারের কুকর্ম সব তুলে ধরে। সর্দার তা মেনে নিতে না পেরে চিৎকার করে চলে যায়। কারণ সর্দার তার বাবা-মা'র পরিচয় জানে না। এখানে রাবেয়া তাকে মনে করিয়ে দেয় "হুনতে আইবো তর-আমারে তরা পাগল বানাইয়া দিছস। দিনের পর দিন, রাইতের পর রাইত– এই ঘাটে ঐ হারামখোর ব্যাপারী, রমিজুদ্দি, আব্দুল্লাহ, মনসুর, তুই তরা সবাই গাঙ্গের পানির মত বানাইছস আমাগোজান, আমাগো ইজ্জত" (রশীদ, ১৯৯৪, পৃ. ৭৮৫)।

যেসব নারীদের সাথে সর্দার অপকর্ম করেছে তারা তার বোনও হতে পারে। পুরুষের হাত থেকে নিজেকে, বৃহৎ অর্থে নিজের শরীর বাঁচাতে পুরুষকে তার মা-বোনদের কথা মনে করিয়ে দেয়া বাঙালি নারীর সহজাত। রাবেয়াকে এখানে তাই করতে দেখি, যা বলার পর সর্দার চলে যায়। এর পরপরই দেখা যায় রাবেয়া আর এক পুরুষের হামলার স্বীকার হয়। তাজুকে খুঁজতে গিয়ে ব্যাপারীর সাথে দেখা হয় রাবেয়ার। রাবেয়া ব্যাপারীর সাহায্য চায় আর বিনিময়ে ব্যাপারী রাবেয়ার শরীর কামনা করে এবং হামলে পড়ে। এরপর প্রতিরোধে রাবেয়া ব্যাপারীর কান কেটে দেয়। নাটকে রাবেয়া চরিত্রকে নাট্যকার সাহসী করে উপস্থাপন করেন, কিন্তু রেখে দেন পুরুষের আশ্রয়ে। নারী নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তার দরকার হয় একজন পুরুষের আশ্রয়। ফলে নারীর এক দ্বান্দ্বিক উপস্থাপন ঘটেছে এই নাটকে। এখানে নারীর শরীরের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ বৃহৎভাবে ওঠে এসেছে। নারীর শরীরের প্রতি লোলুভ দৃষ্টি, আবার রক্ষাকারীও পুরুষ। ফলে রূপায়ণের দিক থেকে দ্বান্দ্বিকতা লক্ষ করা যায়।

সমাজ বাস্তবতার নিরিখে পরিস্থিতি কীভাবে নির্মিত হয়, সে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কীভাবে নিচুতলার মানুষেরা নিপীড়নের শিকার হয়, সেই শোষিত মানুষের অন্তর্ভুক্ত রাবেয়া চরিত্রই হলো এই নাটকের নারী চরিত্র। একদিকে বিত্তের কারণে যে শ্রেণি বৈষম্য আছে সমাজে, সেই বৈষম্যের নিরিখে অন্যান্য নিপীড়িত মানুষের মতোই, পুরুষ মানুষের মতোই সেও নিপীড়িত। ফলে সেই পুরুষদের মধ্যে এই নারীর দ্বৈত রূপায়ণ উপস্থাপিত হয়। পুরো নাটকে একজন শক্তিশালী নারী চরিত্র রাবেয়া। এই নিপীড়িত মানুষের মধ্যে রাবেয়ার চিত্রন নাট্যকার সুকৌশলে উপস্থাপন করলেও এই চরিত্রের রূপায়ণে নাট্যকারের চিন্তার দ্বৈত অবস্থান লক্ষণীয়।

নারী সমাজে নির্বাক। সে সমাজ যদি হয় নিম্নবিত্ত, শোষিত, তাহলে নারী হলো নিম্নেরও নিম্ন এবং শোষিতেরও শোষিত। এই প্রসঙ্গে যদি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের আলোচনা টানি তাহলে দেখা যায়ঃ

> Can the subaltern speak? What must the elite do to watch out for the continuing construction of the subaltern? The question of women seems most problematic in this context. Clearly, if you are poor, black and female you get in three ways…. The assumption and construction of a consciousness or subject sustains such work and will, in the long run, cohere with the work of imperialist subject-constitution, minging epistemic violence with the advancement of learning and civilization. And the subaltern women will be as mute as ever. (Spivak, 1994, p. 90)

ব্যাপারী যেমন তার অর্থনৈতিক সুবিধাজনক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে অন্যদেরকে প্রতারিত করে, ঠকায়, শোষণের ব্যবস্থা কায়েম করে ঠিক একইভাবে নারীকে সে সেই শোষিতেরও অধম মনে করে। নারী যেন নিম্নতর থেকেও আরও নিম্নতর। ঘটনায় বা নাটকের আখ্যান কল্পিত হয়েছে নিম্ন শ্রেণি বা শোষিত শ্রেণি নিয়ে, সেই শোষিত শ্রেণির মধ্যে আরও শোষিত হচ্ছে নারী। স্পিভাকের প্রতিরূপায়ণের সূত্র এবং তাঁর প্রবন্ধ 'Can the subaltern Speak' এর সূত্র ধরে বলা

যেতে পারে, নারী নিম্নবর্গের মধ্যেও নিম্নবর্গ, নারী যেন অধীনদের মধ্যেও আরও অধীন। কিন্তু সেই অধীন শ্রেণির হয়েও নাট্যকার রাবেয়া চরিত্রের বিপ্লবী দিক উপস্থাপন করেন। "তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদী'রা [যেমন] কেবল প্রতিরোধে আগ্রহী" (স্পিভাক, ২০১১, পৃ. ৮৬) সেই প্রতিরোধের অস্ত্রও রাবেয়ার হাতে তুলে দেন নাট্যকার। এখানে ব্যাপারীর কান কেটে দেয়ার মধ্য দিয়ে রাবেয়ার বলিষ্ঠতা প্রকাশ পায়। সে কেবল আবদুল্লাহ আল মামুন রচিত *কোকিলারা* নাটকের কোকিলাদের মতো ঘৃণা প্রকাশে সক্রিয় না, সমাজের দ্বন্দ্বই কেবল উপস্থাপন করছে তা না, বরং সে এখানে প্রতিরোধ করছে। শুধু প্রতিরোধই করছে না, প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে আঘাতকে গ্রহণ করছে, আঘাতের ভাষা গ্রহণ করছে। এই আঘাতের ভাষা গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সে এক বিদ্রোহী সত্তা হয়ে ওঠে। একদিকে সে যেমন তার উচ্চতর শ্রেণিকে আঘাত করছে, অন্যদিকে নারীর শরীরের প্রতি উর্ধ্বত পুরুষের যে অহংকার, সে অহংকারের প্রতীক হিসেবে কান কেটে নিচ্ছে। কান কেটে নেওয়া মানে, পুরুষের লজ্জায় আঘাত করা, পুরুষের অহংয়ে আঘাত করা। সামাজিক বাকবিধি অনুযায়ী কান হচ্ছে সমাজের অহংকার, পৌরুষের প্রতীক। ফলে এখানে কান কেটে নেওয়ার একটা প্রতীকী অর্থ রয়েছে। যেমনঃ মনসুর বলে– "কাইল যহন সুরুজ উডবো, মাইনষে দেখবো, ব্যাপারীর কান নাইক্যা। দুনিয়ার মাইনষে জানবো, ব্যাপারীর কান কাটা, মাইনষে কইবো, কান-কাটা ব্যাপারী" (রশীদ, ১৯৯৪, পৃ. ৭৮৭)। পুরুষের যে অহং, ব্যাপারীর যে ব্যাপার করা অর্থাৎ ব্যবসা করার মাধ্যমে তার যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, প্রাচুর্য, এবং সে প্রাচুর্যের পরিপূরক হিসেবে তার যে পুরুষালি অহং এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে তার যে শ্রেণিগত অস্তিত্বের অহংকার সেটাকেই চূর্ণ করে দেওয়ার একটা আয়োজন হচ্ছে রাবেয়ার এই কান কাটা বলে বিদিতকরণ।

নারীকে উদ্দেশ করে প্রদেয় গালি

এই নাটকে উচ্চারিত গালির পেছনে যে আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছে তা হলো পুরুষের ভোগ বাসনা। এই ভোগ বাসনার লক্ষ্য হলো রাবেয়া। কারণ রাবেয়া শ্রেণিগত ভাবে অধস্তন। এখানে গালি নিহিতার্থ হিসেবে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন "বাংলা ভাষায় এমন অনেক শব্দই পাওয়া যায় যার কোনো পুরুষবাচক শব্দ নেই, কিংবা থাকলেও তা সমার্থক নয়। এসব শব্দ থেকে সমাজে নারীর প্রতি সমাজপতিদের (এখানে মেয়েদের স্থান নেই) মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, সতী, অসতী, বেশ্যা, মাগী, কুলটা, কলঙ্কিনী, যৌবনবতী, লাস্যময়ী, পতিতা, ধর্ষিতা, ছলনাময়ী, মায়াবিনী, লীলাবতী, রক্ষিতা, রূপোপজীবিনী, সতীন, বন্ধ্যা, রমণী, বিমাতা, লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী, অপয়া, পোয়াতি, পোড়াকপালি, দ্বিচারিণী, লজ্জাবতী, ছিনাল, গণিকা, পরিণীতা, বেওয়া, দুশ্চরিত্রা, মুখরা, হাড়জ্বালানি, সর্বনাশী, অবলা, পতিব্রতা, কোকিলকণ্ঠী, সুনয়না, বুয়া, আয়া, সধবা, ত্রয়ো, পাড়াবেড়ানি, ছিঁচকাঁদুনী, মক্ষীরাণী ইত্যাদি। এসব শব্দ থেকে নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। (আরা, ২০১৪, পৃ. ১৫১)

সারণী

চরিত্র	গালি
সর্দার	হারামজাদী
	ছিনাইলা
নায়েব আলী	মাগী
	হালায় মাতারি

নাটকে আরও কিছু শব্দ যেমন– ভাতার, লাং –এই শব্দ গুলোর মধ্যে প্রকাশ করছে পুরুষ নারীর শরীরকে ভেদ করে। ফলে নারীর শরীর যে ভেদ্য, আর পুরুষ যে ভেদক তা গালির মধ্যে প্রকাশ পায়। তার মানে নারী হচ্ছে এমন অক্রিয় জমিন যেখানে পুরুষের শিশ্ন ভেদ করতে পারে। ফলে এখানে নারীর শরীর একান্ত ভোগ্য সামগ্রী হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

ওরা কদম আলী কেন?

নাট্যকার মামুনুর রশীদের "মানুষকে দেখবার দৃষ্টিটা তাঁর দেশ কাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি সমাজের সূক্ষ্ম-বৃহৎ ঘটনাগুলোকে শনাক্ত করে তারপর নির্যাতিতের পক্ষে চলে যান" (মোজাহার, ২০০৮, পৃ. ৩২)। আমার প্রশ্ন হলো, নারীর যে নির্যাতিত রূপ আমাদের সামনে ধরা পড়ে সেটার পক্ষে নাট্যকারের অবস্থান নাটকে উঠে আসছে কি-না। তিনি আরও বলেন– "নির্যাতিতের ভূমি থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সত্যকে কিংবা তার প্রকৃত রূপকে ঠিকভাবে চেনা যায়" (মোজাহার, ২০০৮, পৃ: ৩২)। চরমভাবে নির্যাতিত যে নারী, তাহলে কি সেই নারী নাট্যকারের ভূমি থেকেই কেবল নারীর কণ্ঠস্বর পাওয়া সম্ভব! "মামুনুর রশীদের নাটকে কোনো নারী চরিত্র প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠতে দেখা যায় না অর্থাৎ শেষপর্যন্ত নারী চরিত্র বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপিত হলেও প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে না। তবে এর কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে *ইবলিশ*-এর আতশী চরিত্রের ক্ষেত্রে। আবার দেখা যায় কিছু নাটকে সম্ভাবনা ছিল অনেক" (বালা, কালাম এবং শাহরিয়ার, ২০০৫, পৃ. ৮৪)। এই প্রসঙ্গ নিয়ে আজাদ আবুল কালাম মামুনুর রশীদকে প্রশ্ন করেন, নাটকে নারী চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে নাট্যকার পুরুষ হয়ে যায় কি-না। এর উত্তরে নাট্যকার প্রকাশ করেন তাঁর অভিব্যক্তি– "না, আমি সচেতনভাবে কখনোই পুরুষ নাট্যকার হিসেবে লিখি না। কারণ নারীদের প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতা আছে হাঃ হাঃ" (বালা, কালাম এবং শাহরিয়ার, ২০০৫, পৃ. ৮৪)। তবে "মামুনুর রশীদ 'পাণ্ডুলিপি নির্বাচনে'র ক্ষেত্রে শুধু শ্রেণি সংগ্রামকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এমন নয়। তিনি পাণ্ডুলিপি নির্বাচনে দর্শকের 'বিনোদনে'র প্রত্যাশাও কোনোভাবে ক্ষুণ্ন করেননি" (কবির, ২০১৮-২০২০, পৃ. ৩২)। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষকে প্রাধান্য দিয়ে আনন্দ পায়, যেখানে নারীকে প্রাধান্য দেওয়া সমাজের দর্শনের বিপরীতে অবস্থান নেয়ার সামিল। একজন সৃজনশীল কর্মী হিসেবে একজন নাট্যকার সমাজ বদলে কাজ করতে পারে কিন্তু এই নাটকে মামুনুর রশীদ সমাজের দর্শনের বিপরীতে না দাঁড়িয়ে বরং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিনোদনের পক্ষে কাজ করেন। যার কারণে নাটকের নাম ওরা রাবেয়া নয়, *ওরা কদম আলী*। কিছু নাটকের নামের দিকে যদি লক্ষ করি যেমন- *বৌবসন্তী*, *কইন্যা*, *মেহেরজান*, *কোকিলারা*, *মেরাজ ফকিরের মা*, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, *বিনোদিনী*, *গোলাপজান*, *নভেরা*, *মাধব মালঞ্চি কইন্যা*, *পঞ্চনারী আখ্যান*, *কহে বীরাঙ্গনা*, *খনা*, *শকুন্তলা*, *নাথবতী অনাথবৎ*, *শিবানী সুন্দরী*, *কমলা সুন্দরী*, *ভানু সুন্দরী*, *সুলতানার স্বপ্ন*, *মহুয়া সুন্দরী*, *লীলাবতী আখ্যান*, *রূপচান সুন্দরী*, *তপস্বী ও তরঙ্গিনী*, *ভেলুয়া সুন্দরী*, *বেহুলার ভাসান* ইত্যাদি, যেখানে নারীসত্তার সামগ্রিক বোধ প্রকাশ পেয়েছে এবং চরিত্র হিসেবে নারীই প্রধান যা নাটকের নামকরণের ক্ষেত্রেও কার্যকর।

ওরা কদম আলী নাটকের গঠন কাঠামো যদি লক্ষ করি তাহলে ঘটনার ক্লাইম্যাক্স বা চূড়ান্ত ক্রিয়া হলো রাবেয়ার নায়েব আলী ব্যাপারীকে আঘাত করা। রাবেয়া কান কেটে নেওয়ার মধ্য দিয়ে, একদিকে পুরুষের কান কেটে নিয়েছে আবার একই সঙ্গে সমাজের উচ্চতর শ্রেণিরও কান কেটে নিয়েছে। এখানে রাবেয়া গুরুত্বপূর্ণ কর্তা হয়ে ওঠে। কানে ধরা, কান কেটে দেওয়া এটা পৌরুষে আঘাত করার একটা অ্যাকশন বা ক্রিয়া। কিন্তু আবার রাবেয়ার সর্দারের সাথে কথা বলতে গিয়ে তাজু হারিয়ে যায় এটা শুনে কদম আলী রাবেয়াকে মারতে যায়। কিন্তু রাবেয়া আবার এখানে

নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে এখানে একটা রেভ্যুলেশনারি আচরণ আছে। নায়েব আলীর কান কেটে ফেলার মধ্য দিয়ে রাবেয়ার এই বিদ্রোহী কাজকে অন্য চরিত্রগুলো খুন করার শামিল বলে মনে করে। তার মানে শত্রু নিধনের কাজটি রাবেয়া গুরুত্বপূর্ণভাবে করে ফেলার পরেও শেষ পর্যন্ত এই নাটকের নাম হচ্ছে *ওরা কদম আলী*, ওরা রাবেয়া নয়। বিদ্রোহের প্রতীক আরোপ করার ক্ষেত্রেও নাট্যকার পুরুষকে অবলম্বন করেন। ফলে এখানে রাবেয়া চরিত্রের যে দ্রোহ, যে বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটতে পারত, সেই বৈপ্লবিক বিকাশ কিন্তু ঘটেনি। ফলে এখানে নাট্যকার পুরুষতান্ত্রিক ভাবাদর্শের ফাঁদে আটকা পড়ে যায়।

উপসংহার

নাট্যকার মামুনুর রশীদের মতে "স্বাধীনতার পর নাট্যচর্চাটা আমাদের বেশ এগিয়ে নিয়ে গেছে, সুস্থ ভাবনা-চিন্তার আগ্রহ তৈরি করেছে। আর তৈরি করেছে 'মানুষ' হবার আকাঙ্ক্ষা" (বালা, কালাম এবং শাহরিয়ার, ২০০৫, পৃ. ৬১)। মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা নাট্যকারের ভাষ্যে প্রকাশিত হলেও নারীকে তিনি মানুষ নয় বরং নারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সোনিয়া নিশাত আমীন এর ভাষ্যে "… it is not the sex of the playwright which makes a play feminist but the perspective" (সূত্র. আউয়াল, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৩)। "প্রশ্ন জাগে নাটকে নারীরা যেভাবে সমাজ থেকে উঠে আসে, তাতে কি বলা চলে যে নাটককাররাও রাষ্ট্রের মতন নারীকে কেবল 'উপকরণ' হিসেবেই ব্যবহার করেন?" (আউয়াল, ১৯৯৯, পৃ. ৫৫)। কারণ বুলডজার দিয়ে সমাজের পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু একজন লেখক পারেন পরিবর্তন যে সম্ভব তা তার লেখায় প্রকাশ করতে। লেখা মানে এক অর্থে দেখা। এখানে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে লেখক হিসেবে মামুনুর রশীদ পুরোপুরি শ্রেণি সংগ্রামের লেখক নন। রাবেয়ার দায়ের কোপে ব্যাপারির কান কাটা যায়, এর পরের দৃশ্যে পুলিশ এসে কদম আলীকে খোঁজে। এখানে দেখা যায় অপরাধ করে রাবেয়া আর পুলিশ খুঁজে কদম আলীকে। নাট্যকার নাটকের নামকরণ এবং সেই নামকে গুরুত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে নাটকের ঘটনার একটা বৈপরিত্য তৈরি হয়। "নাট্যকাহিনীর ঘটনা-সংঘাত, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তার প্রকাশ যে সুসামঞ্জস্য কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত থাকলে নাটকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে সমর্থ হয় তা এখানে পরিপূর্ণভাবে অনুপস্থিত। ফলে নাট্যকারের তত্ত্বাক্রান্ত ইচ্ছাপূরণের কাহিনী যথাযথ অভিঘাত সৃষ্টিতে ব্যর্থ" (খান, ২০০৩, পৃ. ১৪৫)। নারীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে নারীকে তার বর্তমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে এনে মুক্তির চর্চায় উপস্থাপন করে নাটকের নামকরণ হতে পারত 'ওরা রাবেয়া', কিন্তু নাট্যকারের সেই দৃষ্টিভঙ্গি এখানে অনুপস্থিত। সমাজে আপাততভাবে আমরা যা দেখছি নারীর হীনতর অবস্থা— সেইটাই রূপায়িত হয়েছে। ফলে নাট্যকার দ্বারা আপাত দৃষ্টিগ্রাহ্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর যে অবস্থান সেটি রূপায়িত হয়েছে।

গ্রন্থপুঞ্জি

আউয়াল, সাজেদুল (১৯৯৯)। *বাংলা নাটকে নারী*, পুরুষ ও সমাজ। ঢাকা: অনন্ত প্রকাশন।

আরা, গুলশান (২০১৪)। ক্ষমতা ও নারীর ভাষা। *প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা*, চতুর্থ সংখ্যা, ১৪৫-১৫৬।

কবির, আহমেদুল (২০১৮-২০২০)। মামুনুর রশীদ : এক সৃজনশীল নাট্য-নির্দেশক। *কলা অনুষদ পত্রিকা*, খণ্ড ১০(১৪-১৫), ৩১-৪০।

খান, আলমগীর (২০০৩, মার্চ)। মামুনুর রশীদের নাটক। *থিয়েটার*, ৩২(১), ১৪০-১৪৯।

বালা, বিপ্লব, কালাম, আজাদ আবুল এবং শাহরিয়ার, হাসান (২০০৫)। আলাপনে মামুনুর রশীদ। *থিয়েটারওয়ালা*, ৭(৪), ৬১-৮৯।

মজুমদার, রামেন্দু (১৯৮৭)। *বিষয়: নাটক*। ঢাকা: মুক্তধারা প্রকাশনী।

মোজাহার, সেলিম (২০০৮)। *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকা কেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজ বাস্তবতা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রশীদ, মামুনুর (১৯৯৪)। *ওরা কদম আলী*। সৈয়দ শামসুল হক ও রশীদ হায়দার, (সম্পা), *শতবর্ষের নাটক: দ্বিতীয় খণ্ড* (পৃ: ৭৪৭-৭৯২)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রহমান, আতাউর (১৯৯৫)। *নাট্যপ্রবন্ধ বিচিত্রা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

স্পিভাক, গায়ত্রী চক্রবর্তী (১৯৯৪)। Spivak, G. C. (1994). Can the subaltern speak? In Patrick williams & Laura chrisman (Eds.), Colonial discourse and colonial theory: A reader. New York: Columbia University Press.

স্পিভাক, গায়ত্রী চক্রবর্তী (২০১১)। দলিতরা কথা বলতে পারে? আলী আজগর (অনু), *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-উপনিবেশিক পাঠ* (পৃ: ৮৩-৯৪)। ঢাকা : আগামী প্রকাশনী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনয় ও অভিনয় ভাবনা : ভাবসত্যের অন্বেষণ

তানভীর নাহিদ খান*

সারসংক্ষেপ : সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় নাট্যসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃপ্ত পদচারণা বাংলা নাট্যকে সমৃদ্ধ করেছে। নাটক লেখার পাশাপাশি তিনি অভিনয়, নির্দেশনা ও পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হলেও সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না। অন্যদিকে ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে নাটক দেখার অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘদিনের নাট্যচর্চার ফলে বিভিন্ন সময়ে অভিনয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ভাবনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাচিকাভিনয়, আঙ্গিকাভিনয়, মঞ্চ পরিকল্পনা, দর্শক-অভিনেতা সম্পর্ক ও পাশ্চাত্যের বাস্তববাদী নাট্যের উপস্থাপন বিষয়ক মতামত আলোচনা দ্বারা রবীন্দ্র নাট্যভাবনার নিহিতার্থ অনুসন্ধান করা হবে।

বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান নানাভাবে তাৎপর্যময়। গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কাব্যনাট্য, রূপক-সাংকেতিক নাট্য, পাঁচ অংকে রচিত বিয়োগান্তক নাট্য, ঋতুনাট্য, প্রহসন ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের নাটক বিষয়, ভাষা ও গঠনে স্পষ্টতই স্বতন্ত্র। পূর্বেকার প্রচলিত নাট্য থেকে রবীন্দ্রনাট্য স্বমহিমায় নিজস্ব পথে বিকশিত। কেবল নাটক লিখেই তিনি ক্ষান্ত হননি বরং নাটকের নানা বিষয়, মঞ্চভাবনা, অভিনয় কৌশল সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর মতামত বাংলা নাট্য ও থিয়েটারকে ঋদ্ধ করেছে। তিনি তাঁর রচিত অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন। তবে নাটক লেখার বহু পূর্বে শৈশবেই নাটকের সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ঔপনিবেশিক আধুনিক শহুরে সংস্কৃতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ১৮১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত চৌরঙ্গী থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। এছাড়াও 'সাঁ-সুসী' থিয়েটারের অন্যতমপৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৬৫ সালে ঠাকুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা'। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় মুখ্য উদ্যোগ নেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এখানে প্রযোজিত নাটক ও নাটকের পাঠ, মহড়া, অভিনয়, গান ইত্যাদি শিশু রবীন্দ্রনাথের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। পারিবারিক ঐতিহ্য ও নাট্যিক আবহ মুখ্যত তাকে নাটকের প্রতি উৎসাহিত করেছে।

১.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনয়

রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেছেন মূলত ঠাকুর বাড়ির থিয়েটার, সংগীত সমাজের থিয়েটার ও শান্তিনিকেতনে। সেসময় কলকাতায় পেশাদার থিয়েটারের স্বর্ণযুগ। তবে পেশাদার থিয়েটারে তিনি অভিনয় করেননি, বরং শুভানুধ্যায়ী, আমন্ত্রিত দর্শক, আত্মীয়স্বজন, শান্তিনিকেতনের ছাত্র-শিক্ষক দর্শকদের উপস্থিতিতে অভিনয় করেছেন।

বাড়ির আঙিনায় নাট্যচর্চা কিশোর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অভিনয়ের সুযোগ করে দেয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *'হঠাৎ নবাব'* নাটকে তিনি প্রথমবার অভিনয় করেন। এরপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর *'অলীকবাবু'* নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন। সাধারণ দর্শকের সামনে নিজের লেখা নাটকে

* প্রভাষক, থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তিনি প্রথম অভিনয় করেন যুবক বয়সে, ১৮৮১ সালে। ড. সোমনাথ সিংহ বলেন "১৬ ফাল্গুন ১২৮৭ (১৮৮১) বিদ্বজ্জন সমাগম উপলক্ষে কবিকে আমরা মঞ্চে অবতীর্ণ হতে দেখি তাঁর রচিত বাল্মিকিপ্রতিভা গীতিনাট্যে বাল্মিকির ভূমিকায় যা এই সমাগম উপলক্ষেই রচিত হয়েছিল।" (১৯৯৯, পৃ. ১৫৯) এই নাটকে বনের পরিবেশ তৈরির জন্য মঞ্চে গাছের ব্যবহার হয়েছিল। পরের বছর ১৮৮২ সালে তিনি '*কালমৃগয়া*' নাটকে অন্ধমুণির চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৮৮৮ সালে দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মহিলা সমিতি'র জন্য রচিত '*মায়ার খেলা*' নাটকে প্রথমে কেবল নির্দেশনা প্রদান করলেও পরবর্তীকালে নাটকটিতে তিনি একবার বসন্ত চরিত্রে অভিনয় করেন।

এরপর রবীন্দ্রনাথ '*রাজা ও রানী*'–তে বিক্রমদেব চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৮৯০ সালে প্রথমবার এই নাটক অভিনীত হয়। অভিনেতারূপে তাঁর পূর্ণ পরিচয় মূলত এই নাটকেই প্রথম পাওয়া যায়। এরপর হয় '*বিসর্জন*' নাটকের অভিনয়। নাটকে তিনি রঘুপতি ও জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন। উল্লেখ্য, তরুণ রবীন্দ্রনাথ ১৮৯০ সালে অভিনয় করেন বৃদ্ধ রঘুপতি চরিত্রে, অন্যদিকে ১৯২৩ সালে বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করেন তরুণ জয়সিংহ চরিত্রে। যুবক বয়সে অভিনীত রঘুপতি চরিত্রায়ন সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। অজিতকুমার ঘোষ বলেন—

> পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে অভিনয় দেখে একজন দর্শক লিখেছিলেন, 'অভিনয়স্থলে আগরতলার মহারাজা, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত এবং সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রবাবু রঘুপতি সাজিয়া এমন চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন যে সঞ্জীবনী সম্পাদক মহাশয় একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (অজিতকুমার, ১৯৮৮, পৃ. ৪২)

আবার বৃদ্ধ বয়সে জয়সিংহ চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনয়ও ভীষণ প্রশংসিত হয়। কিরণময় রাহা উল্লেখ করেন—

> জয়সিংহ চরিত্রে (বিসর্জন) ৬২ বছর বয়স্ক রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখে 'ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় ৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৩ অমৃতলাল বসু লিখেছেন : "নাটক যত চলতে লাগল দেখলাম থিয়েটারে আমার মত পুরনো লোকেরও অভিনয়ের কলা প্রতি মুহূর্তে তাঁর কাছ থেকে শিখতে হচ্ছে। এই মহান কবি এক মহান অভিনেতাও বটে, মঞ্চের কলাকৌশল যার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে।" (কিরণময়, ১৯৮৫ : ১১৭)

তাছাড়া শারদোৎসব নাটকে অভিনয়েরও প্রশংসাও পাওয়া যায় একই লেখকের বর্ণনায়—

> তবে সকলেরই সাক্ষ্য এই যে তিনি ছিলেন এক প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা। 'শারদোৎসব'- এ তাঁর অভিনয় বিষয়ে এডওয়ার্ড থম্পসন বলেছেন : "এই সন্ধ্যার সেরা অভিনয়ের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরই কাছ থেকে চন্দ্রশেখর এবং অন্ধ বাউল- এর দ্বৈত ভূমিকায়। দুটি চরিত্রেই তাঁর অভিনয় ছিল সারাক্ষণ উচ্চমানের। বিশেষ করে বাউলের চরিত্রায়নে তিনি যে ট্র্যাজিক মহত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন তা অবিস্মরণীয়।" (কিরণময়, ১৯৮৫, পৃ. ১১৭)

বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনয় প্রসঙ্গে উল্লেখিত উক্তি দ্বারা অভিনেতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৭ সালে '*বৈকুণ্ঠ*' প্রহসনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেদারের চরিত্রাভিনয় করেন। অন্যদিকে রূপক সাংকেতিক নাটকগুলোর মধ্যে '*মুক্তধারা*'য় ধনঞ্জয় বৈরাগী, '*ফাল্গুনী*'-তে অন্ধবাউল চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯১০ সালে শান্তিনিকেতনে '*রাজা*' নাটকটি অভিনীত হয়। '*রাজা*' নাটকে তিনি রাজা ও ঠাকুরদা উভয় চরিত্রে অভিনয়

করেন। পরের বছর '*শারদোৎসব*' নাটকে অভিনয় করেন সন্ন্যাসী চরিত্রে। ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয় '*ডাকঘর*' নাটকটি। ১৯১৭ সালে নাটকটির দ্বিতীয় অভিনয় হয় জোড়াসাঁকোতে। সরোজিনী নাইডু, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখের উপস্থিতিতে অভিনীত নাটকে রবীন্দ্রনাথ প্রহরী ও ফকির চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯১৪ সালে মঞ্চস্থ হয় '*অচলায়তন*' নাটক। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে গুরু চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৩৫ সালে '*অরূপরতন*' নাটকে সর্বশেষ মঞ্চে অভিনয় করেন তিনি।

শঙ্খ ঘোষ বলেন "অসিতকুমার হালদারকে অভিনয়ে টানতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বুঝিয়েছিলেন তাঁকে : 'Self-conscious হলে অভিনয় হয় না- কোনো আর্টই হয় না। নিজেকে ভুলে যেতে হবে অভিনয়ের সময়। (শঙ্খ, ১৯৬৯, পৃ. ১৩৫) অথচ মঞ্চে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্পর্কে ঠিক বিপরীত কথা শোনা যায়। এ বিষয়ে ড. অজিতকুমার ঘোষ বলেন—

> রবীন্দ্রনাথের অভিনয়ের একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে তিনি যে চরিত্রে অভিনয় করুক না কেন, সেই চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বই প্রকাশ পেত। সৌমেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যে অংশই গ্রহণ করুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থেকে যেতেন, রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত সচেতন সত্তা বিলীন হতে পারতো না যে চরিত্রে অভিনয় করতেন তার মধ্যে। (অজিতকুমার, ১৯৮৮, পৃ. ৩৬)

অন্য একটি প্রবন্ধেও একইরকম তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়—

> অবশ্য রাজাই নয় রবীন্দ্রনাটকে ঠাকুরদা নাচ ও গানের অপূর্ব মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে ঘটনাকে অগ্রসর করেন। '*রাজা*' নাটকের স্মৃতিচারণে সীতাদেবী জানাচ্ছেন, "রাজা অভিনয় দেখিয়া একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদা সাজিয়াছিলেন। আড়াল হইতে রাজার ভূমিকায় তিনিই অভিনয় করিয়াছিলেন। ... একটা জিনিস আমার সর্বদা মনে হইত, যখনি তাঁহার অভিনয় দেখিতাম তিনি যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হোন, তিনি যে রবীন্দ্রনাথ ইহা কিছুতেই ভুলিতে পারিতাম না। আত্মগোপন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। (তানভীর, ২০১১, পৃ. ১৯)

তাছাড়া শঙ্খ ঘোষ মনে করেন—

> অভিনীত ভূমিকাগুলির সঙ্গে একটা সমীকরণও থাকত তাঁর নিজের চরিত্রের। ঠাকুর্দার ভূমিকায় তো বটেই, এমন-কী জয়সিংহেরও গভীরতম আবেগমুহূর্তগুলি রবীন্দ্রনাথের কবিতার জগৎকেই আনে টেনে, যে অভিনয় দেখে বলতে পারেন সাহানা দেবী : 'এখানে কবি রবীন্দ্রনাথ আর অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ এক হয়ে গেলেন। এক হয়ে যাবার এই আবেগে কখনো কখনো যে একেবারে আত্মহারাও হয়ে যান তিনি, তারও ইঙ্গিত আমরা পাই কোনো-কোনো অভিনয়ের অন্তরঙ্গ বিবরণে। (শঙ্খ, ১৯৬৯, পৃ. ১৩৭)

তবে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্পর্কে নেতিবাচক উক্তিও পাওয়া যায়। ইন্দিরাদেবীর কথা অনুযায়ী (শঙ্খ কর্তৃক উল্লেখিত)

> Either on or off the stage তিনি নিজে কখনোই ভালো অভিনয় করতে পারেন না, কিন্তু অভিনয় যে বোঝেন তার পরিচয় আছে এই মন্তব্যে যে 'অভিনয় করতে করতে ভূমিকার সঙ্গে অভিনেতা যদি একেবারে অভিন্নহৃদয় হয়ে পড়েন তবে তো অভিনয় করা মুশকিল হয়'। (শঙ্খ, ১৯৬৯, পৃ. ১৩৭-১৩৮)

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ অভিনয় জীবনে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। দীর্ঘ গড়ন, স্বরের সহজাত ব্যবহার, সুরেলা কণ্ঠ ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে উপযোগী চরিত্রায়ন করার পাশাপাশি নিজেকে

ভেঙেচুরে বয়স, মনস্তত্ত্বের সীমা পেরিয়ে ভিন্নতর চরিত্রেও অভিনয় করেন। '*বিসর্জন*' কিংবা '*রাজা রানীর* মতো' ট্র্যাজেডিতে যেমন তিনি গাম্ভীর্যপূর্ণ চরিত্রায়ন করেন তেমনি '*বৈকুণ্ঠের খাতা*', '*গোড়ায় গলদ*' ইত্যাদি নাটকে হাস্যরসাত্মক কেন্দ্রীয় চরিত্রেও অভিনয় করেন। তবে, বিশেষ করে শান্তিনিকেতনে যাওয়ার পর '*মুক্তধারা*'য় ধনঞ্জয় বৈরাগী, '*ফাল্গুনী*' তে অন্ধবাউল, '*রাজা*' নাটকে রাজা ও ঠাকুরদা, '*শারদোৎসব*' নাটকে সন্ন্যাসী এবং '*অচলায়তন*' নাটকে গুরু প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয়ের অন্তরালে নাটকের বুননে যেন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথই প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যেতেন। চরিত্রগুলো যেন ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের দর্শন আওড়াচ্ছে। ফলে দর্শকের নিকট চরিত্রের অভিনয়ে অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকেই দেখতে পাওয়ার ভিত্তি সম্ভবত এই চরিত্রগুলোর অভিনয় দ্বারা অধিকতর দৃঢ় হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনয় সম্পর্কে একদিকে যেমন প্রশংসা রয়েছে অন্যদিকে কিছু সমালোচনাও পাওয়া গেছে। যে চরিত্রেই তিনি অভিনয় করেন, মনে হয় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথই যেন সেখানে অভিনয় করছেন — অভিনয়কালে নিজেকে ভুলে যাওয়ার কথা বললেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিনয় সম্পর্কে এরকম মন্তব্যের কারণ হতে পারে যে, দর্শক নাটক দেখার সময় হয়ত অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকেই দেখতে চাইত এবং মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের নাট্যক্রিয়ার তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মোহময় ব্যক্তিত্ব তাদের মানসে রেখাপাত করত।

২.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনয় ভাবনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান কেবল নাটক লেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং অভিনয় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে মঞ্চের আতিশয্য, অভিনয়ের আতিশয্য, আরোপিত শারীরিক ও বাচনিক ভঙ্গি এবং অতি নাটকীয়তা অপছন্দ করতেন।

রবীন্দ্রনাথের অভিনয় বিষয় ভাবনাকে বিশ্লেষণ দ্বারা কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করে দেখা যায়- বাচিক অভিনয়, আঙ্গিক অভিনয়, মঞ্চ ব্যবস্থাপনা, অভিনেতা-দর্শকের সম্পর্ক, পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক বাস্তববাদিতার সমালোচনা ইত্যাদি।

২.২ বাচিক অভিনয় ও আঙ্গিক অভিনয়

পথের সঞ্চয় গ্রন্থের '*অন্তরবাহির*' প্রবন্ধে **১৯১২** সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন—

> রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু এ সম্পর্কে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আরভিঙের হ্যামলেট ও ব্রাইড অফ লামারমুর দেখিতে গিয়েছিলাম। আরভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। এরূপ অসংযত আতিশয্য অভিনতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৪, পৃ. ৬৯২)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এখানে বাচিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের আতিশয্যের প্রতি নিরুৎসাহ প্রকাশ করেন। বাহ্যিক আরোপিত প্রয়োগ দ্বারা ভেতরের সহজাত ভাবসত্য উন্মোচিত হবার অবকাশ পায় না। এই ভাবসত্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজন সহজাত আঙ্গিক ও বাচিকের ব্যবহার।

তাছাড়া বাচিকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সনাতনী রীতির টেনে টেনে সুর করে কথা বলা পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে এই ঢং কৃত্রিম মনে হতো। অভিনয়ে অঙ্গভঙ্গিমার অত্যধিক কসরতও অপ্রয়োজনীয় মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও রবীন্দ্রনাথের এই বোধ পরিণত বয়সের, কেননা তরুণ বয়সে লাইসিয়াম থিয়েটারে আরভিংয়ের এই অস্পষ্ট উচ্চারণ ও অসুন্দর অঙ্গভঙ্গি সত্ত্বেও এই অভিনয়েরই তিনি প্রশংসা করেছিলেন —

> Lyceum Theatre এ যাওয়া গেল। Bride of Lammermoor অভিনয় হল। চমৎকার লাগল। কী সুন্দর scene। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বরাবর ধীর স্বরে বিচিত্র ভাবের concert বাজে, সেটাতে খুব জমিয়ে তোলে। Ellen Terr খুব ভালো অভিনয় করেছিল, Irving এর অভিনয়ও খুব ভালো- কিন্তু এমন mannerism, এমন অস্পষ্ট উচ্চারণ, এমন অসুন্দর অঙ্গভঙ্গি। কিন্তু তবুও ভালো অভিনয়- সেই আশ্চর্য। (শঙ্খ, ১৯৬৯, পৃ. ১৩১)

বাচিক অভিনয়ের ক্ষেত্রে উচ্চারণের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। অভিনয়ে তেজস্বিতা থাকার ব্যাপারে তিনি জোর দিয়েছেন। উচ্চারণে কোন ত্রুটি থাকলে শুরু থেকেই তা সংশোধন এবং শব্দের শেষ অক্ষরও স্পষ্টভাবে উচ্চারণের অভ্যাস করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। সংগীত সমাজের থিয়েটারে অনেকের উচ্চারণগত ত্রুটি ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাদের বাড়িতে গিয়ে উচ্চারণ ও অঙ্গভঙ্গি শেখাতেন।

২.৩ মঞ্চ পরিকল্পনা

কলকাতায় নাটক মঞ্চায়নের যে পরিবেশ, আবহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে সেরকমটি ছিল না। মঞ্চ নেই, দৃশ্যসজ্জা নেই আবার এগুলো প্রস্তুতের অর্থও নেই তবু নাটক মঞ্চায়ন থেমে থাকেনি। এসময় ছাত্রছাত্রীদের অভিনয়ের জন্য পুরনো অনেক নাটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নতুনভাবে প্রকাশ করেন। *'শারদোৎসব'* নাটক নতুন নামে *'ঋণশোধ'*, *'রাজা'* নতুন নামে *'অরূপরতন'*, *'অচলায়তন'* নতুন নামে *'গুরু'*, *'গোঁড়ায় গলদ'* থেকে *'শেষরক্ষা'*, *'রাজা ও রাণী'* নাটকের নতুন নাম হয় *'তপতী'*। মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জা বাদে, আড়ম্বরহীন এই সময়ের নাটক মঞ্চায়ন রবীন্দ্রনাট্যের দর্শনে প্রভাব ফেলে।

'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তাঁর অভিনয় ও মঞ্চ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি মুখ্যত শকুন্তলার উদাহরণ প্রয়োগ করে দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা ও কৌশল এবং দর্শকের আসন প্রভৃতিকে পাশ্চাত্য তথা বিলাতের রীতি হিসেবে আখ্যায়িত করে এগুলো বর্জন করে দেশীয় রীতির প্রতি ভালো লাগা প্রকাশ করেন যেখানে দৃশ্যপটের বালাই ও মঞ্চকৌশলের আধিক্য থাকবে না এবং দর্শক-অভিনেতার নৈকট্য থাকবে।

> দুষ্মন্ত গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সখীদের সহিত শকুন্তলার কথাবার্তা শুনিতেছেন। অতি উত্তম। কথাবার্তা বেশ রসে জমাইয়া বলিয়া যাও। আস্ত গাছের গুঁড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি, এতটুকু সৃজনশক্তি আমার আছে। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার চরিত্রানুরূপ প্রত্যেক হাবভাব এবং কণ্ঠস্বরের প্রত্যেক ভঙ্গি একেবারে

> প্রত্যক্ষবৎ অনুমান করিয়া লওয়া শক্ত, সুতরাং সেগুলি যখন প্রত্যক্ষ বর্তমান দেখিতে পাই তখন হৃদয় রসে অভিষিক্ত হয়; কিন্তু দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়- সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৪, পৃ. ৭৪৭)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *'তপতী'* নাটকের ভূমিকাতেও দৃশ্যপটের বাড়াবাড়ির বিপক্ষে অভিমত প্রদান করেন। তাঁর মতে সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে এটি অহেতুক গায়ের জোর। নাট্যকাব্য সহজাতভাবেই দর্শকের কল্পনার উপর দাবি রাখে, চিত্র বরং তাতে ব্যাঘাত ঘটায়। মানুষের চোখে ভ্রম তৈরির এই কৌশল তাঁর কাছে ছেলেমানুষি মনে হয়েছে। বিলেতের থিয়েটারের অন্ধ অনুকরণের বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ মত দিয়েছেন। তিনি মঞ্চকৌশলের অধিক আয়োজনের ভারে মূল অভিনয়ই হারিয়ে যাওয়ার আশংকা করেন। অবশ্য শুরুর দিকের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ দৃশ্যপট ও দ্রব্যাদির সংশ্লেষ ঘটিয়ে প্রতিরূপাত্মক কৌশলে নাট্যরূপায়ণ করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষ করে শান্তিনিকেতন পর্বে তিনি এটি বর্জন করে প্রতীকী কৌশল প্রয়োগ করেন। প্রতিরূপাত্মক কৌশলের প্রতি আস্থা রাখার কারণ হলো, যুবক অবস্থায় বিলাতের থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতায় দৃশ্যপটে তিনি মুগ্ধ ছিলেন। তাইতো ১৮৯১ সালে 'ব্রাইড অব ল্যামারমুর' দেখে, কি সুন্দর Scene! বলে মত প্রদান করেন। পরবর্তীকালে এটি তার কাছে বাহুল্য মনে হয়েছে এবং 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে দৃশ্যপট বর্জনের কথা বলেন। মূলত 'শারদোৎসব' নাটক থেকেই তিনি চিত্রিত দৃশ্যপট বর্জন করে স্বাভাবিক দৃশ্যপটের প্রচলন করেন। শান্তিনিকেতনে নির্মিত নাটকসমূহে ব্যয়সাধ্য মঞ্চনির্মাণও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে মঞ্চ কৌশল সম্বন্ধেও তিনি নতুন করে চিন্তা করেন।

বস্তুগত উপাদান, কৃত্রিম চিত্র সত্য প্রকাশে অহেতুক ব্যাঘাত ঘটায়। মুক্ত কল্পনায় নাট্যকাব্যের রস আস্বাদন দ্বারা এই সত্য আবিষ্কার সহজাত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বস্তুগত উপাদানের চেয়ে বরং ভাবসত্যের অন্বেষণ করেছেন।

২.৪ দর্শক-অভিনেতা সম্পর্ক ও পাশ্চাত্যের বাস্তববাদীতার সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দর্শক-অভিনেতা সম্পর্কের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ে ভালো লাগা প্রকাশ করে রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধে তিনি বলেন—

> "আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।" (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৪, পৃ. ৭৪৭)

পাশ্চাত্যের নাট্যে দর্শক-অভিনেতার ব্যবধান সুস্পষ্ট। প্রসেনিয়াম মঞ্চের গঠন কৌশলের ফলে দর্শক-অভিনেতার স্থানিক দৃশ্যমান দূরত্ব দেখা যায়। মঞ্চ থেকে দর্শকের বসার স্থান সুনির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত এবং বাস্তববাদী নাট্যের ক্ষেত্রে উক্ত বৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্মতর বিবরণ- মঞ্চ, আলো, পোশাক, প্রপস ও অন্যান্য অনুষঙ্গ দ্বারা অভিনয় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে দর্শকের সাথে অভিনেতৃর ব্যবধান দুস্তর। দুটো জগত পৃথক। অভিনেতা তার জগতে ক্রিয়া সম্পাদন করে এবং দর্শক তার জগতে থেকে সেই ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে।

অন্যদিকে এ অঞ্চলের যাত্রা, পালা, লীলা, গীত, সঙ সহ ঐতিহ্যবাহী নাট্যের নানা পরিবেশনায় দর্শক, অভিনেতা- অভিনেত্রীর চারপাশে অবস্থান করে। দৃশ্য অনুযায়ী মঞ্চ কৌশলে কোন স্থাপনা বা চিত্র দ্বারা কৃত্রিম আবহ তৈরি করা হয় না। অভিনেতার ক্রিয়া দ্বারা দর্শক ঠিক বুঝে নেয় কোন স্থান বা প্রেক্ষাপটে দৃশ্যটি সম্পন্ন হচ্ছে। এতে করে দর্শক অভিনেতার ব্যবধান ঘুচে যায়। মঞ্চের কৃত্রিম উপাদানের আবরণ ছাড়াই তিনি যা বোঝাতে চান, দর্শক কল্পনা দ্বারা তা বুঝে ওঠার জন্য উদগ্রীব থাকেন। ফলে দর্শকও অংশগ্রহণ করছে। তাই যা দেখার জন্য দর্শক এসেছেন সেই মূল কাব্যরস আস্বাদনে তিনি পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন। পাশ্চাত্যের বাস্তববাদিতার সমালোচনা করে 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন "য়ুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নয়। কল্পনা যে তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্পনিককে অবিকল বাস্তবিকের মতো করিয়া বালকের মতো তাহাদিগকে ভুলাইবে।" (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৪, পৃ. ৭৪৭)। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী নাট্যের পরিবেশনায় বালকের মতো মন ভোলানোর খেলা চলে না বরং কল্পনার দ্বার উন্মুক্ত থাকে। হুবুহু বাস্তবতার প্রতিরূপায়ন দেখে নয়, বরং অভিনয়ের সাথে কল্পনার মিশেল যোগ করে সত্য অনুধাবন করেন। দর্শক ও অভিনেতার পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস পরিবেশনাকে পরিপূর্ণ করে।

রবীন্দ্রনাথের অভিনয়চর্চা এবং অভিনয় ভাবনাকে কলকাতা ও (মুখ্যত) শান্তিনিকেতন দুই পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে বিলাত ফেরতের পর পাশ্চাত্যের নাট্য দর্শনের অভিজ্ঞতার ফলে তরুণ বয়সে ঠাকুরবাড়ি ও সংগীত সমাজে তাঁর অভিনয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগীয় প্রকাশ দেখা যায়। অন্যদিকে শান্তিনিকেতন পর্বে অভিনয়ে আবেগের তীব্রতম প্রকাশ বর্জন করে সহজাত স্বাভাবিক অভিনয়ের প্রতি মনোযোগী হন। বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হলেও ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এর উর্ধ্বে তিনি চরিত্রায়ন করতে পারেননি, এরকম মতও তাঁর অভিনয় সম্পর্কে পাওয়া যায়। তবে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন অভিনয়ের সময় নিজেকে ভুলে যেতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনয় ভাবনায় দেখা যায় আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের প্রতি জোর দিয়েছেন। অভিনয়ের অঙ্গেভঙ্গে আতিশয্য তিনি অপছন্দ করতেন। কৃত্রিম স্বরকে পরিহার করে উচ্চারণের প্রতি জোর দিয়েছেন। যৌবনের শুরুতে নাট্যভাবনায় রবীন্দ্রনাথ মঞ্চ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দৃশ্যপট ও প্রতিরূপায়ন পছন্দ করলেও পরবর্তীকালে বিশেষ করে শান্তিনিকেতন পর্যায় থেকে দৃশ্যপট বর্জন ও দেশীয় রীতির প্রতি ভালো লাগা প্রকাশ করেন, যেখানে দর্শক-অভিনেতার নৈকট্য থাকে। উপরিতলের চাকচিক্য পরিহার করে ভেতরের কাব্যরস আস্বাদনের প্রতি মুখ্যত দৃষ্টিপাত করেন। অভিনয়কে তিনি যাবতীয় বাহ্যিক আড়ম্বর — দ্রব্য, আলো, শব্দ, দৃশ্যপট,সজ্জা প্রভৃতি থেকে মুক্তি দিয়ে সহজাত সত্য অভিনয় অন্বেষণ করেছেন। বাচিক অভিনয়, আঙ্গিক অভিনয়, মঞ্চ পরিকল্পনা, দর্শক- অভিনেতার সম্পর্ক, বিলাতি রীতি বর্জন, দেশীয় রীতির প্রতি ভালো লাগা ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করে বলা যায় — আতিশয্য, কৃত্রিমতা, অবিকল প্রতিরূপায়ন বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অভিনয় ও অভিনয় ভাবনায় ভাবসত্যের অন্বেষণ করেছেন।

সহায়কপঞ্জি

অজিতকুমার ঘোষ (১৯৮৮)। *ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়*। রবীন্দ্র-ভারতী সোসাইটি, কলকাতা।
কিরণময় রাহা (১৯৮৫)। *বাংলা থিয়েটার*, (কুমার রায় অনূদিত), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লি।
তানভীর আহমেদ সিডনী (২০১১)। *অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ*। মঞ্চকথা, ঢাকা।
ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১০)। *রবীন্দ্রনাথের অভিনয়*। মঞ্চকথা, ঢাকা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৪)। *অন্তরবাহির*। রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৪)। *রঙ্গমঞ্চ*। রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড। ঐতিহ্য, ঢাকা।
রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী (১৯৯৫)। *রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ*। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা।
শঙ্খ ঘোষ (১৯৬৯)। *কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
সোমনাথ সিংহ (১৯৯৯)। *রবীন্দ্রনাথ: অভিনেতা ও প্রযোজক*। দুই বাংলার থিয়েটার, কলকাতা।

অবরুদ্ধ সময়ের কবিতায় বঙ্গবন্ধু
সাহসী উদ্যোগসমূহের নিবিড় পর্যবেক্ষণ

ইসমাইল হোসেন সাদী*

সার-সংক্ষেপ: স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক *টাইমস* পত্রিকা অভিহিত করেছিল 'পয়েট অব পলিটিকস' হিসেবে। তাঁর নেতৃত্বে বাঙালি স্বাধিকার আন্দোলন সংগঠিত করে, সত্তরের নির্বাচনে অংশ নেয় এবং ভূমিধস জয় লাভ করে। তাঁরই নির্দেশনায় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পঁচাত্তরে তাঁকে সপরিবার হত্যার পর দেশ এক ভীতিকর খাদে পর্যবসিত হয়। তাঁর নামে কোনো স্লোগান দেওয়া কিংবা জনসমক্ষে তাঁর ভাষণ প্রচারও ছিল 'গর্হিত অপরাধ'। ফলে তাঁকে নিয়ে রচিত কবিতা ও সংকলনের সংখ্যা ছিল নগণ্য। অবরুদ্ধ সেই সময়ে বাংলা ভাষায় রচিত শিল্পিত কবিতা ও ছড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কতটা নির্মোহ ও নিঃস্বার্থভাবে চর্চিত হয়েছেন, আর তুলনামূলক 'সুবিধাজনক সময়ে' কতটা দায়িত্বের সঙ্গে চর্চিত হয়েছেন, তার কিছু দৃষ্টান্ত ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ উপস্থাপনই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাঙালি জাতির গর্বিত সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন প্রতিকূলতায় বিদীর্ণ ছিল। তাঁকে হত্যার পর 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটিও ছিল অবরুদ্ধ। সেই অবরুদ্ধ সময়ে তাঁর নামে মিছিল-সভা ছিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। তাঁর সম্মানে যেকোনো ধরনের আয়োজন ছিল রীতিমতো অপরাধের শামিল। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার পর গণমাধ্যম ছিল মোশতাক সরকারের নিয়ন্ত্রণে। কতটা নিখুঁত পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল, গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে পরিস্থিতিকে কতটা ঘাতকদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল, তা বোঝা যায় পঁচাত্তরের ১৬ আগস্ট প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলোর শিরোনাম দেখে। দৈনিক *ইত্তেফাক*-এ 'খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর শাসনক্ষমতা গ্রহণ' শীর্ষক প্রধান শিরোনামের সংবাদের প্রথম দুটি বাক্যে বলা হয়, 'রাষ্ট্রপতি খোন্দকার মুশতাক আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী জাতির বৃহত্তর স্বার্থে গতকাল প্রত্যুষে সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। শাসনভার গ্রহণকালে শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসভবনে নিহত হইয়াছেন।' (ইত্তেফাক, ১৬ আগস্ট ১৯৭৫) এরপর উল্লেখ করা হয়, সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানগণ সরকারকে সমর্থন দিয়েছেন। *ইত্তেফাক* পত্রিকার সেদিন রীতি ভেঙে প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় ছাপা হয়। "ঐতিহাসিক নবযাত্রা" শিরোনামে এক কলামের পুরো পৃষ্ঠায় ছাপা সেই লেখায় বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ না করে এবং বঙ্গবন্ধুর সপরিবার নিহত হওয়ার প্রসঙ্গে একটি বাক্যও না লিখে একধরনের উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়। অন্য সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকাও ছিল অভিন্ন। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার অপচেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। এমনকি সামরিক সরকারের আদেশে আওয়ামী লীগের নথিপত্রেও বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ করা হয়। সেই

* প্রভাষক, বাংলাভাষা ও সাহিত্য, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সময় আওয়ামী লীগকে জানানো হয়, 'যেহেতু আওয়ামী লীগের জমাকৃত দলিলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম রয়েছে, সেহেতু আওয়ামী লীগ এদেশে রাজনীতি করার অযোগ্য। এইজন্যে ১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলবিধির ১০ ধারায় মৃতব্যক্তির মাহাত্ম্য প্রচার নিষিদ্ধ করে এক ঘোষণাও দেওয়া হয়।' (হাননান, ২০১৩, পৃ. ১৩৫) বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি প্রচারেও ছিল কড়া নিষেধাজ্ঞা। গণতন্ত্রকামী সাধারণ মানুষের জন্য এ অবস্থা ছিল এক ভয়াল অন্ধকার যুগের নামান্তর। দীর্ঘ দুই দশকের (১৯৭৫-১৯৯৬) এই সময়পর্বকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্ব ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৮১ সাল, দ্বিতীয় পর্ব ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল এবং তৃতীয় পর্ব ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম পর্বে, সামরিক শাসনামলে রাষ্ট্রীয়ভাবে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একেবারে নিষিদ্ধ এক নাম। দ্বিতীয় পর্বে নতুন সামরিক শাসনামলে সাহিত্য-সংস্কৃতিকর্মী ও রাজনীতিকদের মধ্যে প্রতিকূলতার বাঁধ ভাঙার প্রয়াস স্পষ্ট। ফলে প্রতিকূলতা কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। তৃতীয় পর্বে গণতান্ত্রিক শাসনামলেও বঙ্গবন্ধুকে অস্বীকার করার প্রয়াস ছিল স্পষ্ট। তবে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এ-সময় বঙ্গবন্ধু-চর্চায় তুলনামূলক বেশিসংখ্যক কবি-সাহিত্যিকের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়।

তবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর প্রথম অর্ধদশকে রাজনৈতিক মতপ্রকাশের প্রকট বৈরী পরিস্থিতি এবং 'বঙ্গবন্ধু' নামের ওপর প্রবল নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও কবি-সাহিত্যেকেরা কখনো কিঞ্চিৎ সংঘবদ্ধভাবে, কখনো-বা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পনেরো আগস্টের বিয়োগাত্মক ঘটনার পর বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাংলাদেশে কোন কবি প্রথম কবিতা লেখেন, তা নিয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে। অনেকেই বিভিন্ন মাধ্যমে নিজেকে প্রথম কবিতা-লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। অনেকেই নির্মলেন্দু গুণকে সেই কৃতিত্ব দিতে চেয়েছেন। নির্মলেন্দু গুণ (জ. ১৯৪৫) বলেছেন, 'দোষে-গুণে মিলে তিনি ছিলেন আমার কবিতার নায়ক। ফলে, নির্মম হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়ে তাঁর জীবনাবসানের পর তাঁকে নিয়ে প্রথম তো আমারই কবিতা লেখার কথা।' (গুণ, ২০১২, পৃ. ৫৬) তবে তাঁর মতে, বঙ্গবন্ধু শহিদ হওয়ার পর প্রথম কবিতা লেখেন মৌলভি শেখ আবদুল হালিম। ১৯৯০ সালে কবি টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধি দর্শনে গেলে সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ পান।

শেখ আবদুল হালিম 'টুঙ্গিপাড়ার কিশোর-মুজিবের কাছের একজন। সৈনিকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি বঙ্গবন্ধুর মরদেহ পাকসাফ করে কাফনের কাপড়ে মুড়িয়ে যথাযথভাবে সমাধিদানের ব্যবস্থা করেন। তারপর শিল্পবোধ ও শক্তিময়তার প্রকাশ ঘটিয়ে আপন হৃদয়ানুভূতি রূপ দেন কাব্যে, আরবিতে লেখেন কবিতা।' (মফিদুল, ২০১৯, যুগান্তর) শুধু তা-ই নয়, সৈনিকেরা ন্যূনতম নিয়মকানুনও মান্য না করে বঙ্গবন্ধুর মরদেহ দাফন করতে চেয়েছিলেন। শেখ আবদুল হালিমই কৌশলে তাদের বাধা দিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে কবি নির্মলেন্দু গুণ মৌলভির বয়ানে লিখেছেন:

> মেজর সাহেব আমাকে বলেছিলেন কফিনসহই জানাজা পড়ে মাটি দিতে। আমি তা চাইছিলাম না। মেজর সাহেবকে বললাম— 'আই জাস্ট সী দ্য ডেড বডি।' মেজর সাহেব বললেন, 'ডু ইউ নট বিলিভ আস?' আমি বললাম— 'আই বিলিভ ইউ, বাট ওয়ান্ট টু সি ফর মাই স্যাটিসফেকশন।'... তারপর মেজর সাহেবকে বলি, 'ওনাকে গোসল দেয়া হয়নি। বিনা গোসলে কোন মুসলমানের জানাজা পড়া জায়েজ নয়।' (গুণ, ২০২০, পৃ. ৪৬)

শেখ আবদুল হালিমই তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ঘটিয়ে ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর মরদেহের দাফন সম্পন্ন করেন। নির্মলেন্দু গুণের কবিপরিচয় জানতে পেরে তিনি জানান, তিনিও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এ নিয়ে নির্মলেন্দু গুণের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

> তিনি বললেন বঙ্গবন্ধুকে কবর দেয়ার পর বাড়ি ফিরে গিয়ে আমি একটি কবিতা লিখি।... কবি শেখ আবদুল হালিম স্মৃতি থেকে বলে যেতে থাকলেন, আর হাবিবুর রহমান বিশ্বাস সাহেব তা লিখতে শুরু করলেন। ছোট্ট কবিতা, তাই দ্রুতই শেষ হয়ে গেল। কবি কবিতার নিচে তাঁর নাম স্বাক্ষর করলেন। পরে আমি কবিকে অনুরোধ করলাম কবিতার প্রতিটি পঙ্ক্তির অর্থ বাংলায় বলবার জন্য। তিনি বললেন। আমি তা বাংলায় লিখলাম। কবিতার মূল পাণ্ডুলিপি কবির কাছে নেই। তিনি বললেন, ঐ কবিতাটি বঙ্গবন্ধুর কবরের পাশে তিনি টানিয়ে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন। পরে তা ঝড়ে-জলে নষ্ট হয়ে গেছে। তবে আছে তাঁর স্মৃতিতে। (সূত্রঃ লিয়াকত, ২০১২, পৃ. ৬০)

আরবি থেকে বঙ্গানুবাদ করার পর কবিতাটির কয়েক পঙ্ক্তি নিম্নরূপ:

> পঙ্ক্তি ১
> হে মহান, যার অস্থি-মজ্জা, চর্বি ও মাংস এই কবরে প্রোথিত
> পঙ্ক্তি ২
> যাঁর আলোতে সারা হিন্দুস্তান, বিশেষ করে বাংলাদেশ আলোকিত হয়েছিল
> পঙ্ক্তি ৩
> আমি আমার নিজেকে তোমার কবরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিতেছি, যে তুমি কবরে শায়িত
> পঙ্ক্তি ৪
> আমি তোমার মধ্যে তিনটি গুণের সমাবেশ দেখেছিঃ ক্ষমা, দয়া ও দানশীলতা—
> পঙ্ক্তি ৫
> নিশ্চয়ই তুমি জগতে বিশ্বের উৎপীড়িত এবং নিপীড়িতদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলে
>
> (সূত্রঃ লিয়াকত, ২০১২, পৃ. ৬০)

শেখ আবদুল হালিমের সেই কবিতা উদ্ধার করতে পেরে নির্মলেন্দু গুণ নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছেন। ঘটনাটিকে তাঁর জীবনের অন্যতম স্মরণীয় অভিহিত করে তিনি লিখেছেন, 'Sometimes, I am amazed to think of how the first poem written about Bangabandhu after his death was discovered through me. This discovery was one of the greatest experiences of my life. It was an experience that held both great joy and great grief.' (Goon, 15 August 2018, *Dhaka Tribune*)

একজন মৌলভির লেখা আরবি কবিতাটির আবিষ্কার বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত 'প্রথম কবিতা-তর্কে' অবশ্যই নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিষয়টি অনেকটা প্রতিষ্ঠাও পেয়ে গেছে। তবে নতুন তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী, বঙ্গবন্ধু শাহাদাত বরণের পর প্রথম কবিতা রচনা করেন বাংলাদেশের বামপন্থি ও প্রগতিশীল উর্দু-কবি নওশাদ নূরী[১] (১৯২৬-২০০০)। কবিতাটির রচনাকাল ১৫ আগস্ট ১৯৭৫; নাম "উত্থান-উৎস"। আমরা জানি, বঙ্গবন্ধুর মরদেহ টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছায় ১৬ আগস্ট দুপুরনাগাদ। ওই দিনই দাফন করা হয়। ধরে নেওয়া যায়, মৌলভি শেখ আবদুল হালিম বঙ্গবন্ধুকে দাফনের পর ১৬ আগস্ট বিকেল বা রাতে 'শিল্পবোধ ও শক্তিময়তার প্রকাশ ঘটিয়ে আপন হৃদয়ানুভূতি'কে তিনি কবিতায় রূপ দেন। সুতরাং প্রথম রচিত কবিতা বাংলায় নয়, আরবিতেও নয়; রচিত হয় উর্দু ভাষায়। ১৭ আগস্ট নওশাদ নূরী রচনা করেন "নজম-টুঙ্গিপাড়া"

নামে আরেকটি কবিতা — অনূদিত হয় "টুঙ্গিপাড়া" নামে। দুটি কবিতাই অনুবাদ করেছেন কবি আসাদ চৌধুরী (জ. ১৯৪৩)। নওশাদ নূরীর প্রথম কবিতা "উত্থান-উৎস" এবং দ্বিতীয় কবিতা "টুঙ্গিপাড়া"র কয়েকটি করে পঙ্ক্তি:

১. সে তো নিজেই উত্থান, উত্থানের অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত
সে আছে, সে আছে—
সর্বদা হাজির সে যে, অফুরান শক্তি হয়ে
সে আছে, সে আছে—
সে অমর, সে মৃত্যুঞ্জয়ী, মৃত্যু নেই তার।' (আসাদ, ২০১৮, মননরেখা)

২. তোমরা কি জানো? তোমরা কি জানো?
পথের শুরুটা হয়ে এইখানে।
হে আমার প্রিয় অবোধ শিশুরা
যুদ্ধ-মাঠের সাহসী সেনানী
শক্ত বাজুর নৌকার মাঝি
মুক্ত দেহাতি নওজোয়ানেরা
তোমরা কি জানো? তোমারা কি জানো?' (আসাদ, ২০১৮, মননরেখা)

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর ওই বছরই বাংলা ভাষায় দুটি কবিতা রচিত হওয়ার তথ্য একটি সংকলনগ্রন্থ (সূত্র: আখতার, ২০০৫) থেকে পাওয়া যায়। কবিতা দুটি যথাক্রমে সুফিয়া কামালের (১৯১১-১৯৯৯) "ডাকিছে তোমারে" (সূত্র: আখতার, ২০০৫, পৃ. ৩৬) এবং সন্তোষ গুপ্তর (১৯২৫-২০০৪) "রক্তাক্ত প্রচ্ছদের কাহিনি" (সূত্র: আখতার, ২০০৫, পৃ. ৫০)। সেই অবরুদ্ধ সময়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর তেমন কোনো সুযোগ ছিল না সাধারণ মানুষের সামনে। তবে ১৯৭৭ সালে বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশের অনুষ্ঠানে নির্মলেন্দু গুণ প্রথম জনসমক্ষে "আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি" কবিতাপাঠের মধ্য দিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। কারণ, ঘটনাটি কেবল কবিতাপাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কবির সাহসিকতা ও আবেগ ছড়িয়ে পড়ে দেশের শোকাহত সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে:

সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপ ফুল খুব ভালোবাসি,
রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেইসব গোলাপের একটি গোলাপ গতকাল
আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তাঁর কথা বলতে এসেছি।

শহীদ মিনার থেকে খসে-পড়া একটি রক্তাক্ত ইট
গতকাল আমাকে বলেছে, আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।...
আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি,
আমি আমার ভালোবাসার কথা বলতে এসেছিলাম। (গুণ, ২০২০, পৃ. ১৩৪)

জনসমক্ষে পাঠ করা হয়েছিল বলে দ্রুত কবিতাটি পাঠকপ্রিয়তা পেয়ে যায়। সবাই যেন সেদিন বুকভরে শ্বাস নিয়ে সমস্বরে উচ্চারণ করতে পেরেছিল কবি-রচিত সাহসী শব্দাবলি। ফলে অনেকেই কবিতাটিকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর প্রথম বাংলা কবিতা হিসেবেও বিবেচনা করে থাকেন। অবরুদ্ধ সময়ে কবি সেদিন যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ছিল গভীর

তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, 'তখন সামরিক শাসনের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে বঙ্গবন্ধুর কথা এই প্রথম এবং প্রকাশ্যে শিল্প-সাহিত্যে উচ্চারিত হয়। যে সময়ে নির্মলেন্দু গুণ বঙ্গবন্ধুর নাম নিয়েছিলেন সেই সময় বঙ্গবন্ধুর নাম নিতে শুধু সাহসের প্রয়োজন হত না, দুঃসাহসও প্রয়োজন ছিল। নির্মলেন্দু গুণ জাতির ক্রান্তিকালে সেই দুঃসাহসিক ঘটনার পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন।' (হাননান, ২০১৩, পৃ. ১০২)

"সেই রাতের কল্পকাহিনী" (১৯৭৯) নামে অবরুদ্ধ সময়েই আরও একটি কবিতা লিখেছেন নির্মলেন্দু গুণ। এতে বঙ্গবন্ধু সপরিবার শহীদ হওয়ার পর তাঁর পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের প্রসঙ্গ অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী শব্দব্যঞ্জনায় ধরা পড়েছে। কবিতার প্রতিটি শব্দে যেন তিনি অনিঃশেষ আবেগ গেঁথে দিয়েছেনঃ

> সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে তুমি শেষবারের মতো
> পাপস্পর্শহীন সংবিধানের পাতা উল্টিয়েছো,
> বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে একমুঠো মাটি তুলে নিয়ে
> মেখেছো কপালে, ঐ তো তোমার কপালে আমাদের হয়ে
> পৃথিবীর দেয়া মাটির ফোঁটার শেষ-তিলক, হায়! (গুণ, ২০২০, পৃ. ১৪৪)

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত প্রথম কবিতা হিসেবে আরও দুটি কবিতার নাম পাওয়া যায়। তার একটি ১৯৭৬ সালে রচিত কিন্তু ১৯৭৭ সালে (১৩৮৪ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে) *সমকাল* পত্রিকায় প্রকাশিত মোহাম্মদ রফিকের[২] (জ. ১৯৪৩) "ব্যাঘ্র বিষয়ক"; আরেকটি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ১৯৭৭ সালের একুশের সংকলন *জয়ধ্বনি*তে প্রকাশিত কামাল চৌধুরীর "জাতীয়তাময় জন্মমৃত্যু"। তাঁর দাবি, কবিতাটি ৯ ফেব্রুয়ারি রচিত। (কামাল, ১৯৯৮, পৃ. ২৮)

দুই

ব্যক্তিগত ও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের বাইরে বঙ্গবন্ধুহত্যার সাহিত্যিক প্রতিবাদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। ১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতিশীল পাঁচ তরুণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে 'সূর্য তরুণ গোষ্ঠী'র নামে বঙ্গবন্ধুকে উপলক্ষ্য করে রচিত কবিতা সংগ্রহ করে একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশ করেন *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়*। এ-সংকলনটিই প্রথম প্রতিবাদী কবিতা-সংকলন হিসেবে বিবেচিত। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এখন রাশি রাশি সংকলন প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ-সংকলনের মাহাত্ম্য সব সংকলনের চেয়ে আলাদা এবং ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এর বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। প্রথমত, সংকলনটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটিই লেখাই ছিল স্বনামে প্রকাশিত। কারণ এর আগে, ১৯৭৬ সালেও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে *অমর একুশে '৭৬* নামে একটি গোপন সংকলন বেরিয়েছিল বটে। কিন্তু এর প্রকাশক, লেখক, সম্পাদক — সবাই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। (হাননান, ২০১৯, পৃ. ৭৩) এ বছর বেনামে বা ছদ্মনামে শতাধিক একুশে সংকলন প্রকাশিত হওয়ার তথ্য পাওয়া যায়। এগুলোতে খুব কৌশলে, বঙ্গবন্ধুর নাম অনুল্লেখ রেখে মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন ইত্যাদিকে বিষয় করে রচিত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ত্রিশটি কবিতার মধ্যে প্রায় সবই এ-সংকলন উপলক্ষ্যে রচিত। তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক এ-সংকলনে নেই কোনো নির্দিষ্ট সম্পাদক, ছিল না সম্পাদকীয়। উদ্যোগের মধ্যেই এর মাহাত্ম্য নিহিত; কোনো বক্তব্য নিষ্প্রয়োজন। চতুর্থত, এর নেই কোনো সূচিপত্র। এমনকি পৃষ্ঠাগুলোর শরীরে

কোনো সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়নি। হয়ত সেই তরুণেরা জাতির বেদনাকে কোনো পৃষ্ঠায় বন্দি করতে চাননি। কারণ, এর প্রতিটি কবিতাই অবরুদ্ধ পরিস্থিতির প্রতিনিধিত্বকারী কালের স্বাক্ষরবাহী — স্বমহিমায় ভাস্বর। সংখ্যায় এ তাৎপর্য ধরা অসম্ভব। হয়তো সে-কারণে খুব সচেতনভাবেই কোনো সূচিপত্র কিংবা সংখ্যা দিয়ে এর পৃষ্ঠা চিহ্নিত করতে চাননি 'সূর্য তরুণ গোষ্ঠী'। কেননা, সূচিপত্র বা পৃষ্ঠাসংখ্যার উল্লেখ স্বাভাবিক পরিস্থিতির পরিচায়ক। এ-সংকলনের প্রকাশনাকালে পরিস্থিতি ছিল অস্বাভাবিক ও অগণতান্ত্রিক।

এ-কারণে *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়* সংকলনে যাঁরা লেখা দিয়ে সাহসী এই উদ্যোগকে সফল করতে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন এবং স্বনামে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে সেই যাত্রায় শামিল হয়েছিলেন, ইতিহাসে তাঁরাও এ দুঃসাহসিক কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশীদার হয়ে রয়েছেন। সংকলনটি প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা ছিল দৈনিক *সংবাদ*-এর শিশুসংগঠন খেলাঘরের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবদুল আজীজের। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের তৎকালীন আবাসস্থল ১০২ নম্বর কক্ষে বসে বঙ্গবন্ধুর ওপর সংকলন প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হন আলতাফ আলী হাসু, মানিক দে, সিরাজুল ফরিদ ও ভীষ্মদেব চৌধুরী। অত্যন্ত ভীতিকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেও তাঁরা সফল হয়েছিলেন। সংকলনের জন্য গোপনে লেখা সংগ্রহ করা ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। দেশে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকেও সংকলনটিতে 'অনেক বড় কবিই সে-দিন বঙ্গবন্ধু-স্মরণে কবিতা লিখতে অপারগতা বা উন্নাসিকতা প্রদর্শন করেন — যাঁদের প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে রাজনৈতিক হাওয়া বদলের আনুকূল্যে বঙ্গবন্ধু-স্মরণে কবিতা লিখে দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন।'[৩]

কেবল সংকলনের উদ্যোক্তারা নন, এর প্রত্যেক লেখক স্বনামে কবিতা প্রকাশের অনুমতি দিয়ে সেদিন সুনির্দিষ্ট প্রতিবাদ-লড়াইয়ে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়* সম্পর্কে এর অন্যতম উদ্যোক্তা ভীষ্মদেব চৌধুরী রচিত প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, সংকলনটির শুরু থেকে লেখা সংগ্রহ, মুদ্রণ প্রস্তুতি এবং তা প্রচার পর্যন্ত এর পরতে পরতে ছিল দুঃসাহসিক ও তারুণ্যদীপ্ত এক পরিভ্রমণ; ছিল সীমাহীন ঝুঁকি। তিনি সংকলনে লেখা প্রকাশের সাহসিকতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন লেখকদের:

> ১৯৭৮ সালে বঙ্গবন্ধু-স্মরণে কবিতা সংকলন প্রকাশের পরিকল্পনা ও তার সফল বাস্তবায়ন ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো নিঃসন্দেহে। এই ঝুঁকির অবিচ্ছিন্ন অংশীদার এই সংকলন-এর লেখকবৃন্দও। তাঁরা বিরুদ্ধ বর্তমানে দাঁড়িয়ে শুদ্ধ অস্তিত্বে অস্তিত্ববান হয়ে যে-সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিরল। বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও তাঁরা নির্দ্বিধায় বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াতে অকুণ্ঠিত থেকেছেন, জাতির কাছে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা তাঁদের প্রাপ্য।' (ভীষ্মদেব, ১৯৯৮, পৃ. ৪০)

সংকলনটির প্রচ্ছদ বিন্যস্ত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর চশমার ফ্রেম দিয়ে। প্রচ্ছদ মুদ্রণকাজের সঙ্গে যুক্ত একজনের মাধ্যমে খবর পেয়ে ছাপাখানায় গোয়েন্দা পুলিশ হানা দিয়েছিল। গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের কৌশলে মোকাবিলা করেছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তা ও মুক্তিযোদ্ধা আবদুল আজীজ। এত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করেও 'একুশের সূর্যোদয়ের অনেক পূর্বেই' সূর্য তরুণ গোষ্ঠীর সদস্যরা সংকলন ছাপানোর কাজ সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। সংকলনে কবিতা দিতে অপারগতা[৪] জানালেও শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) কাব্যগ্রন্থ *নিজ বাসভূমে*-র (১৯৭০) একটি কবিতা থেকে এর নামকরণের প্রস্তাব করেন ভীষ্মদেব চৌধুরী। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য:

> শামসুর রাহমানের মূল কবিতায় শিরোনামার জিজ্ঞাসা মীমাংসায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা আমাদের সংকলনের শিরোনামে ধৃত অনন্ত জিজ্ঞাসাকে মীমাংসায় আবদ্ধ করতে চাইনি। বঙ্গবন্ধুর এ লাশ কোথায় রাখবো আমরা? জাতির পিতার স্থানতো জাতির অন্তস্তলে অমোঘভাবেই সুনির্ধারিত। তবু অনন্ত অনাগত ইতিহাসের কাছেই আমাদের সশ্রদ্ধ সবিনয় জিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক এই সংকলনটির শিল্পিত প্রচ্ছদ ও শিরোনামায়। (ভীষ্মদেব, ১৯৯৮, পৃ. ৪২)

বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় স্মারক এই সংকলনের অন্যতম বিশেষত্ব হলো, যাঁরা কবিতা চর্চায় নিয়মিত ছিলেন না — অন্তত কবি হিসেবে একেবারেই পরিচিতি ছিল না যাঁদের, তাঁরাও কেবল এ সংকলনের প্রকাশ উপলক্ষ্যে কবিতা রচনা করেছেন। এর উদ্যোক্তাদের দাবি, ত্রিশটির মধ্যে ব্যতিক্রম কেবল অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতাটি[৫]। তাঁর কবিতাটি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত *বাংলার মুখ*[৬] কবিতা-সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয় (কিন্তু কবিতাটির প্রকাশকাল[৭] নিয়ে পরবর্তী সময়ে নানা বিভ্রান্তিও ছড়িয়েছে)। তাঁরা জানতেন, বাকি কবিতাগুলোর প্রতিটিই এ-সংকলনের প্রকাশ উপলক্ষ্যেই রচিত। কিন্তু মোহাম্মদ রফিক ও খালেক বিন জয়েনউদদীনের কবিতা দুটি তাঁদের অজ্ঞাতসারে[৮] পুনর্মুদ্রিত হয়। কবিদ্বয়ের কবিতা দুটি ১৯৭৭ সালের *সমকাল* পত্রিকার ভিন্ন দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তবুও বলা যায়, বঙ্গবন্ধুকে বিষয় করে (সাতাশটি) 'নতুন ও অপ্রকাশিত কবিতা' নিয়ে প্রকাশিত *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়*ই বাংলাদেশের একমাত্র কবিতা-সংকলন। খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে এ-সংকলনে লিখেছিলেন দিলওয়ার, মোহাম্মদ রফিক, মাশুক চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, তুষার কর, সুকুমার বড়ুয়া, আখতার হুসেন, মহাদেব সাহা, আলতাফ আলী হাসু, লুৎফর রহমান রিটন, কামাল চৌধুরী প্রমুখ। আর যাঁরা কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন না, কেবল বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়েই কবিতা লিখেছিলেন, তাঁরা হলেন হায়াৎ মামুদ, রাহাত খান, মাহমুদুল হক, আবদুল আজীজ, ভীষ্মদেব চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম বেদু প্রমুখ।

যুগের হাওয়া পরিবর্তিত হলে এবং আওয়ামী লীগ আবার রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হলে অনেকেই এ-সংকলন নিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির অপচেষ্টা করেছেন। সম্প্রতি অত্যন্ত পরিচিত একটি অনলাইন-পোর্টালের একটি প্রবন্ধেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। লেখক[৯] সেখানে উল্লেখ করেছেন:

> এই ঐতিহাসিক ও দুঃসাহসিক সংকলনের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তখনকার সময়ের দেশসেরা কোনো কবি নন। আলতাফ আলী হাসু। বইটির সাম্প্রতিক সংস্করণের ভূমিকায় আমিনুল ইসলাম বেদু জানাচ্ছেন, 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি মতো একটি তরুণ এসে আমাকে বাসস অফিসে বলল আপনি আমাকে চিনেন না, আমি আইনশাস্ত্রে লেখাপড়া করি। আমরা কয়জন ঠিক করেছি, আমরা বঙ্গবন্ধুর উপর একটি ছোট্ট কবিতার সংকলন বের করে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করবো।' তাঁরই উদযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ক্লাস কক্ষে বেশ কয়েকজন কবি বসেন। আমিনুল ইসলাম বেদু জানাচ্ছেন, সেদিন বৈঠকে তিনি ও হাসুসহ উপস্থিত ছিলেন দিলওয়ার, হায়াৎ মামুদ, রাহাত খান, মাশুক চৌধুরী, ফরিদুর রহমান বাবুল, সুকুমার বড়ুয়া, মোহাম্মদ মোস্তফা, মাহমুদুল হক, নির্মলেন্দু গুণ, তুষার কর, মোহাম্মদ রফিক, আবদুল আজিজ, শান্তিময় বিশ্বাস, আখতার হুসেন, ভীষ্মদেব চৌধুরী, জিয়াউদ্দিন আহমদ, জাহিদুল হক, ইউসুফ আলী এটম, সিরাজুল ফরিদ, ফজলুল হক সরকার, মহাদেব সাহা, জাফর ওয়াজেদ, লুৎফর রহমান রিটন, নূর উদদীন শেখ, ওয়াহিদ রেজা, কামাল চৌধুরী ও

> খালেক বিন জয়েনউদ্দিন। এঁরা সকলে একটি করে কবিতা তিন দিনের ভেতর আলতাফ আলী হাসুর কাছে জমা দেন। (মোজাফফর, ১৫ আগস্ট ২০১৯, বিডিনিউজ২৪ডটকম)

প্রকৃতপক্ষে আমিনুল ইসলাম বেদু সংকলনের উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না।[১০] তাছাড়া সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ক্লাসকক্ষে বসে এ-ধরনের বৈঠকে সমবেত হওয়ার মতো অনুকূল পরিস্থিতিও ছিল না। পরিস্থিতি কতটা প্রতিকূল ছিল, তার কিছুটা অনুমান করা যায় নির্মলেন্দু গুণের স্মৃতিচারণা থেকে:

> ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারির কথা। বঙ্গবন্ধুর ওপর কবিতা পড়ে নাম করার পরের বছর। সংবাদ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে বসে আছি–একটা লেখা তৈরি করতে হবে দ্রুত।...এমন সময় দু'জন তরুণ ছড়াকার ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সিরাজুল ফরিদ, এলো আমার কাছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটা ছোট কবিতা বা ছড়া লিখে দিতে হবে। পত্রিকায় প্রেসে এসে গেছে, সুতরাং দেরি করলে চলবে না। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তারা এ সংকলনটি প্রকাশ করছে।...ওরা আমাকে একদিন সময় দিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলো। আমি বললাম দাঁড়াও এক্ষুণি লিখে দিচ্ছি, মনে হয় কবিতাটি হয়ে যাবে।... আমি লিখে দিলাম 'মুজিব মানে আর কিছু না মুজিব মানে মুক্তি' ...কবিতাটি। ওরা খুব খুশি হয়ে কবিতাটি নিয়ে চলে যায়। পরে 'এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়' নামক সেই চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী একুশের সংকলনে লেখাটি ছাপা হয়েছিল। (গুণ, ২০২০, পৃ. ৬৪-৬৫)

আদতে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রকাশিত ওই সংকলনের মাধ্যমে আত্মগৌরব প্রচারের লোভে অনেকে এর কৃতিত্ব নিতে চান। এসব কারণেই সংকলনটির উদ্যোক্তাদের পক্ষে ভীষ্মদেব চৌধুরী "এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়: বঙ্গবন্ধু স্মরণে কবিতা-সংকলন প্রকাশনার ইতিহাস"[১১] শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখতে বাধ্য হন। নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে সেই সময়ের পরিস্থিতি এবং কীভাবে অত্যন্ত সাহসী সংকলনটির প্রকাশনা সম্পন্ন হয়েছিল, কতটা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তা সানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৯৭ সালে রচিত প্রবন্ধটি প্রথমে দৈনিক *সংবাদে*, পরে শিশুসাহিত্যিক লুৎফর রহমান রিটনের সম্পাদনায় আগামী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত *নেপথ্য কাহিনী* গ্রন্থসহ বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সে-প্রবন্ধে এ ধরনের আশঙ্কা থেকেই বলা হয়েছিল:

> সম্প্রতি বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ধারক রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক দীর্ঘ ২১ বছর পর গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদও বঙ্গবন্ধু-চর্চার অবাধ পরিবেশ পুনসৃষ্টি হয়েছে। এরই ক্রমধারায় আজ বিভিন্ন মহলে আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার বালখিল্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সম্ভবত সরকার প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সরকারী আনুকূল্য লাভের স্বার্থেই সুযোগসন্ধানী ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এ-ধরনের আচরণে অত্যুৎসাহ প্রদর্শন করছেন। (ভীষ্মদেব, ১৯৯৮ : ৩৯)

বঙ্গবন্ধু হত্যার পর গুরুত্বপূর্ণ একটি সংকলনগ্রন্থ ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে। কবি মিনার মনসুর ও দিলওয়ার চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম *শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ*। মিনার মনসুরের দাবি, *এ লাশ আমরা কোথায় রাখবো* প্রথম সংকলন। কিন্তু তা গ্রন্থাকারে নয়, হয়েছিল লিটল ম্যাগাজিন আকারে। তাই বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তাঁকে নিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম সংকলন গ্রন্থ এটিই। অনেক দিন ধরে অনেককে অনুরোধ করে তিনি লিখিয়ে নিয়েছিলেন। (জামিল, ১৬ আগস্ট ২০১৯: *কালের কণ্ঠ*)

তিন

পঁচাত্তর-পরবর্তী প্রথম স্বৈরশাসকের পতন হলে শাসনভার চলে যায় দ্বিতীয় স্বৈরশাসকের হাতে। এ-সময় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন-সংগ্রাম কিছুটা গতি পেতে থাকে। ফলে বিভিন্নভাবে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণের ক্ষেত্রেও জনতা অবরুদ্ধতা ভাঙতে শুরু করে। তাই কালের বিচারে *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়* সংকলনের সাহসী ভূমিকাও দৃঢ়ভাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। এ-সংকলনে মহাদেব সাহার (জ. ১৯৪৪) কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের "আবার আসিব ফিরে"র অনুকরণে লেখা: 'আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়/ কোনো শঙ্খচিল নয়, শেখ মুজিবের বেশে,/ হেমন্ত কুয়াশা আর এই প্রিয়/ মানুষের দেশে।' (*এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়*) তিনি পরবর্তী সময়েও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন।

এ-সংকলনের প্রতিটি কবিতার শরীরে আষ্টেপৃষ্ঠে রয়েছে মর্মভেদী আর্তনাদ, শৈল্পিক সহমর্মিতা, জাতির পিতাকে হারানোর হাহাকার। কবিরা কখনো যেন ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন, কখনো প্রতিশোধ স্পৃহায় সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন। যেমন কবি দিলওয়ারের (১৯৩৭-২০১৩) কবিতায় আমরা দেখি, 'বল্‌রে খুনী, আরাম তোর—/ রাখবি এবার কোন্ জালায়?/ দেখ্ না ওরা বাণ চালায়/ বঙ্গবন্ধু আট কোটি/ খুল্‌বে এবার দাঁত ক'টি।' (*এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়*)

হায়াৎ মামুদ লিখেছেন, 'আমরা দেবতা নই। তুমিও কি ছিলে?/ ভুল—সে তো করে মানুষেই/ অপার ক্ষমার ভুলে যে—মাশুল দিলে/ তার দায় আমাদের শুধতে হবেই।' (*এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়*) মাশুক চৌধুরী কবিতায় বলতে চেয়েছেন, 'আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম:/ জয় বাংলা।/ এক দিন মনে হলো আমার ভিতর থেকে/ বাংলাদেশ খুলে নিল কেউ/ রক্তাক্ত বাংলাদেশে/ স্বপ ভেঙে গেল।/ যেন বিপ্লবের পরিপক্ব মাঠে আজ/ বাংলাদেশে ডাকাত পড়েছে।' (*এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়*) বাংলাদেশের কবিরা শোকে মূহ্যমান না হয়ে শোককে শক্তিতে পরিণত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

সে-কারণেই নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় স্থান পেয়েছে ক্ষোভ ও শোককে ভুলে সাহস সঞ্চারের প্রয়াস: 'মুজিব অর্থ আর কিছু না/ মুজিব অর্থ মুক্তি;/ পিতার সাথে সন্তানের/ না লেখা প্রেম চুক্তি।/ মুজিব অর্থ আর কিছু না/ মুজিব মানে শক্তি,/ উন্নত শির বীর বাঙালীর/ চিরকালের ভক্তি।' (*এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়*)

ছড়াকার তুষার কর লিখেছেন, 'বাংলা জুড়ে আঁধার নামে কী হারালো কী?/ হারিয়ে গেছে কাছের মানুষ, সোনার মানিকটি।' (*এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়*) মাহমুদুল হক কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এক নাম। তিনিও লিখেছেন জেগে থাকার প্রতিজ্ঞায়, 'জেগে থাকে বাঘের চোখে/ লক্ষ মুজিব দামাল ছেলে/ জেগে থাকে ধানের খেতে/ ঘূর্ণিঝড়ে বানের জলে।' (*এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়*) শিশুসাহিত্যিক আখতার হুসেনের ছড়ায় উপলব্ধি করা যায় বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতির হাহাকার: 'সোনার বরণ ছেলে/ কোন্ সুদূরে গেলে?/ তোমার হাঁকে ডাকে/ জাগাও শহর গাঁ কে।' (*এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়*)

সেই সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এ-সংকলনের সহ-উদ্যোক্তা ভীষ্মদেব চৌধুরীও কবিতাচর্চায় অভ্যস্ত ছিলেন না। অথচ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রণয়ন করেছেন এক কবিতা-স্মারক: 'নদী ছলো ছলো নাম বহমান, বাঁধ দিতে আসে কে?/ বাতাস বৈরী গুমোট হাওয়া

তবু গাবো তাঁর জয়/ ফুলের জলসা তোমার জন্যে রক্ষিত আছে পিতা/ জয় বাংলার বঙ্গবন্ধু অবিনাশী অক্ষয়।' (*এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়*)

শিশুসাহিত্যিক লুৎফর রহমান রিটন কোনো রাখঢাক না রেখেই তাঁর ক্ষোভ, ঘৃণা ও প্রতিশোধের স্পৃহা ব্যক্ত করেছেন এভাবে: যেই ছেলেটা আলোর শিখা/ দেখিয়ে ছিলো অন্ধকারে/ সেই ছেলেকেই করলো কে খুন/ কোনসে ঘাতক, খন্দকারে?/ (*এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়*) যেহেতু বঙ্গবন্ধুর শহীদ হওয়ার মাত্র তিন বছরের মাথায় প্রকাশিত কবিতাগুলোর বেশির ভাগই এ-সংকলনকে উপলক্ষ্য করেই রচিত, তাই দেশের তখনকার প্রেক্ষাপট বুঝতে, সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে কবিদের মন বুঝতে কবিতাগুলো নতুন প্রজন্মের পাঠকের কাছে বড় আধার হয়ে উঠতে পারে।

লুৎফর রহমান রিটন পরবর্তী সময়ে রচিত এক ছড়ায় শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছিলেন। এ নিয়ে তাঁর বক্তব্য: 'সময়কাল মধ্য আশি। শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন কয়েক বছর আগে। ১৫ আগস্ট পালন উপলক্ষ্যে আগস্টের শুরুতে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বাড়ির সামনের সড়কে মঞ্চ বানিয়ে শামিয়ানা টানিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অসংখ্য শ্রোতা আর দর্শকের উপস্থিতিতে শেষ বিকেলে "শেখ মুজিবের নামতা" নামে সদ্য লেখা নতুন একটা ছড়া পাঠ করলাম আমি।'[১২]

> এক এক্কে এক–
> শেখ মুজিবের নামের আগে
> জাতির পিতা ল্যাখ...
>
> দুই এক্কে দুই–
> শেখ মুজিবের জন্যে ফোটে
> শাপলা গোলাপ জুঁই। (রিটন, ২০০৮, পৃ. ১৭১)

ছড়াটি সেই সময় খুব আলোড়ন তুলেছিল। বঙ্গবন্ধু তখন সাংবিধানিকভাবে জাতির জনক ছিলেন না, বরং পরিস্থিতি তখনো কিছুটা বৈরী। জাতীয় শোক দিবসও তখন জাতীয়ভাবে পালন করা সম্ভব হতো না।

চার

১৯৭৮ সালের পর ১৯৮৮ সালের পনেরো আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে *বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ছড়াগুচ্ছ* শিরোনামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক মন্টি রহমান ও মোশাররফ হোসেন ভূইয়া।[১৩] সময় তখনো কিছু বৈরী, তবে অবরুদ্ধ নয়। বিরুদ্ধস্রোত বিরাজমান থাকলেও একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের দাবিতে মানুষ তখন সোচ্চার। সংকলনটির বিশেষত্ব হচ্ছে, উনত্রিশটি ছড়ার প্রতিটিতেই দৃষ্টিনন্দন অলংকরণ করে দিয়েছিলেন আনিসুল হক মিটুন (হালের কথাসাহিত্যিক-সাংবাদিক আনিসুল হক)। এর বেশির ভাগ ছড়া পূর্বপ্রকাশিত। বেশ কয়েকটি ছড়া-কবিতা *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়* থেকে নেওয়া। সংকলনটির অন্যতম উদ্যোক্তা আকমল হোসেন খোকনের (অন্যতম সহকারী সম্পাদক) কাছ থেকে জানা যায়, মিনার মনসুর, আনিসুল হক মিটুন, মন্টি রহমান, কেম এম আজমল হোসেন, আকমল হোসেন খোকন লিখেছিলেন এ-সংকলনের প্রকাশ উপলক্ষ্যেই। সংকলনটির সম্পাদকদ্বয়ের সম্পাদকীয়তে

প্রতিফলিত হয়েছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, '১৯৭৫। সেই রাত দীর্ঘ হতে হতে রাহুর চন্দ্রগ্রাসের মতো গিলে ফেলেছে আমাদের চেতনার বিস্তীর্ণ আকাশ। আমরা আলোর পথযাত্রী। শিল্পের সন্তান। শিল্প মানে সত্য–তিমির বিনাশী আলো। আমরা শিল্পের আলো দিয়ে পুড়ে ভস্ম করে দিতে চাই এই জমাট অন্ধকার।' (মন্‌টি ও মোশাররফ, ১৯৮৮, পৃ. ৪)

উল্লেখিত সংকলনসমূহ বিবেচনায় নিয়েই বলা যায়, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শিল্পিত ও নির্মোহ কবিতার অধিকাংশই অবরুদ্ধ সময়ে রচিত। তবে ড. বিশ্বজিৎ ঘোষের মন্তব্য ভিন্ন বাস্তবতার ইঙ্গিতবহ: 'পঁচাত্তরের পনের আগস্ট ঘাতকের হাতে নির্মমভাবে নিহত হবার পর থেকে তাঁকে নিয়ে বাংলা ভাষার কবিরা কবিতা রচনায় ব্রতী হন। তবু পঁচাত্তর থেকে পঁচানব্বই — এই বিশ বছর অবরুদ্ধ পরিবেশে তাঁকে নিয়ে কবিতা রচনায় অনেকেই দুঃসাহসী হন নি, তাঁদের সাহসের বাঁধ খুলে যায় উনিশ শ' ছিয়ানব্বইতে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠার পর।' (বিশ্বজিৎ, ২০১৮: ২৬-২৭) এখানে 'সাহসের বাঁধ খুলে যায় উনিশ শ ছিয়ানব্বইতে' শব্দসমূহ প্রতিকূল অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি এবং সংঘের সাহসী উদ্যোগের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

কারণ, বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে সপরিবার হত্যার মধ্য দিয়ে জাতির অর্জন ও অগ্রগতিকে পশ্চাতে ঠেলে দেওয়ার অপচেষ্টা রুখতে কবি-সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা ছিল পথপ্রদর্শকের। এ ক্ষেত্রে নির্মলেন্দু গুণের ভূমিকা ছিল পথিকৃতের। তিনি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি কবিতা রচনা করেছেন। বেশির ভাগ সময়ই তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে দেশপ্রেমিক সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের প্রতিবাদের প্রেরণা। ১৯৭৭ সালের একুশের অনুষ্ঠানে কবিতাপাঠের মধ্য দিয়ে যে প্রতিবাদী অবস্থানের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, তা পরবর্তী সময়েও অব্যাহত ছিল। সাতই মার্চের ভাষণের প্রত্যক্ষদর্শী এ-কবি ১৯৮০ সালের সামরিক সরকারের ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধেও শিল্পিত কবিতার মাধ্যমে সরব হয়েছিলেন। এ-সময় তিনি রচনা করেন "স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো"। কবিতাটির পটভূমি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

> ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সেই ভাষণটি মঞ্চের সামনে থেকে শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি একটি পত্রিকার জন্য রিপোর্ট করতে সেখানে গিয়েছিলাম। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর ইতিহাসবিকৃত হওয়া শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণাকে এমনভাবে নিয়ে আসা হয়, যেন জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন! তখন আগামী প্রজন্মের কাছে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্য কবিতাটি লেখার তাগিদ অনুভব করি। (গুণ, ৬ মার্চ ২০১৫, পৃ. *??? কালের কণ্ঠ*)

বঙ্গবন্ধুর মহাকাব্যিক সেই ভাষণের জন্য হাজার বছরের পরাধীন জাতির সন্তানদের প্রতীক্ষাকে কবি শিল্পিত পদাবলিতে চিত্রিত করেছেন বহুল পঠিত সেই কবিতায়:

> একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্যে কী ব্যাকুল
> প্রতীক্ষা মানুষের: 'কখন আসবে কবি?'
> 'কখন আসবে কবি?'
> শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
> রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
> অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
> তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,

হৃদয়ে লাগিল দিল দোলা,
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা।
কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী? (গুণ, ২০২০, পৃ. ১৫৫)

নির্মলেন্দু গুণই বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় তাঁকে নিয়ে প্রথম কবিতা রচনা করেন। ১৯৬৭ সালের ১২ নভেম্বর দৈনিক *সংবাদ*-এর ক্রোড়পত্রে তাঁর রচিত "প্রচ্ছদের জন্য" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু উপাধি পাওয়ার পর তাঁকে নিয়ে জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-১৯৭৬) লেখেন "বঙ্গবন্ধু"।[১৪] সিকান্‌দার আবু জাফরের "ইতিহাসচারিণী বাঙলা" ও "ফিরে আসছেন শেখ মুজিব", আবুবকর সিদ্দিকের "বঙ্গবন্ধুর বাংলায় ফেরা", কাজী রোজীর "১৯৭১", কামাল চৌধুরীর "১০ জানুয়ারি" প্রভৃতি কবিতাও বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় রচিত। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে দৈনিক *পূর্বদেশ* পত্রিকায় জাহিদুল হকের "আপনি ফিরে আসবেন কবে" শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হয়।[১৫]

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী কবিদের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় রচিত কবিতাসমূহে রয়েছে তাঁর প্রশংসা ও বীরত্বের জয়জয়কার। আর তাঁর শাহাদাতের পর রচিত বেশির ভাগ কবির কবিতায় রয়েছে তাঁর জন্য হাহাকার, আর্তনাদ, শূন্যতার উপলব্ধি, ক্ষোভ, হন্তারকদের প্রতি ঘৃণা। যেমন বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় জসীমউদ্‌দীন রচিত কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে বীরোচিত প্রশংসা: 'মুজিবুর রহমান/ ওই নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি-উগারী বান/ মিলাতে পারেনি প্রেম-বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান/ তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে ধর্মে আর,/ জাতিতে জাতিতে ভুলিয়াছে ভেদ সন্তান বাঙলার' (সূত্র: আখতার; ২০০৫, পৃ. ৩৩)। অন্যদিকে তাঁর শাহাদাতের পর রচিত সুফিয়া কামালের কবিতায় ধরা পড়েছে হাহাকার: 'তোমার শোণিতে রাঙানো এ-মাটি কাঁদিতেছে নিরবধি/ তাইত তোমারে ডাকে বাংলার কানন, গিরি ও নদী' (সূত্র: আখতার; ২০০৫, পৃ. ৩৬)। সানাউল হকের কবিতাতেও ধরা পড়েছে শোকবিহ্বল হাহাকার আর বঙ্গবন্ধুর কৃতিত্বকে ভাষায় প্রকাশ করতে না পারার খেদ, 'কবিতায় কতোটুকু বলা যায় কথা/ যে-মানুষ দেশের প্রতিভূ/ যে-মানুষ গল্প ও কাহিনী/ যে-মানুষ মুক্তির সেনানী/ রমনার মাঠের সৌরভ।' (সূত্র: আখতার; ২০০৫, পৃ. ৪৪)

ঘোর অমানিশা কেটে যাওয়ার পর কিছুটা 'শিথিল সময়ে' শামসুর রাহমানও অত্যন্ত শিল্পিত কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেছেন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে। তাঁর কবিতায়ও ফুটে উঠেছে আর্তনাদ। তাঁর "ইলেকট্রার গান"-এ (১৯৮২) গ্রিক পুরাণের এ্যাগামেমননের সঙ্গে একাকার করেছেন বঙ্গবন্ধুকে। বেদনাহত কবি কবিতাটির প্রথম দিকে তুলে এনেছেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির দৃশ্যাবলি। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ — মহাকালের খাতায় ব্যবধানটি বড় সামান্য হলেও এ কবিতায় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের উচ্ছ্বাস আর শোকাহত (১৫ আগস্টের) বেদনার সংশ্লেষ পাঠককে অশ্রুসিক্ত করে। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া বঙ্গবন্ধুর দুই দুহিতার হয়ে কবি লিখেছেন:

আড়ালে বিলাপ করি একা একা, ক্ষতার্ত পিতা
তোমার জন্যে প্রকাশ্যে শোক করাটাও অপরাধ।
এমন কি, হায়, আমার সকল স্বপ্নেও তুমি
নিষিদ্ধ আজ; তোমার দুহিতা একি গুরুভার বয়!...

পিতৃহন্তা চারপাশে ঘোরে, গুপ্তচরের
চোখ সেঁটে থাকে আমার ওপর, আমি নিরুপায় ঘুরি।
নিহত জনক, এ্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ। (শামসুর, ২০০১, পৃ. ১৮০)

"অমর নাম" নামে শিল্পিত একটা ছড়াতেও শামসুর রাহমান তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধুর শাশ্বত এক রূপকে। আর সৈয়দ শামসুল হকের "আমার পরিচয়" কবিতায় যেন গোটা জাতির পক্ষ থেকে নিজের পরিচয় দিতে চেয়েছেন। কবিতাটিতে বাঙালির শিকড়-সংশ্লিষ্ট নানা বিষয় উঠে এসেছে। বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে গিয়ে কবি জাতিগত নানা অনুষঙ্গ বিন্যস্ত করেছেন। বাঙালি জাতির সমস্ত ঐতিহ্যকে ধারণের যে প্রয়াস এ কবিতায় তিনি পেয়েছেন, তাতে বঙ্গবন্ধুকে বিস্মৃত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন এভাবে:

এই ইতিহাস ভুলে যাব আজ, আমি কি তেমন সন্তান?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান;
তাঁরই ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি–
চোখে নীলাকাশ, বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি।'
(সূত্র: বেবী ও আসলাম, ২০০১, পৃ. ২২)

বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার খবর জেনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের যেকোনো মানুষেরই শোকে মূহ্যমান হওয়ার কথা। কবি হাসান হাফিজুর রহমানও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর কবিতায় সেই সময়ের মানসিক অবস্থা উঠে এসেছে বলে মনে হয়:

আমার হাঁটু ভেঙে আসছে, আমি কি পরাভবের মধ্যে
পিতৃপুরুষের স্রোতে রুদ্ধ হতে দেখে যাব অবশেষে?
কিছুই আমার সপক্ষে বলে না, কেবল প্রতিটি
শোণিত কণার সমস্বরে ভেতরে ঝাঁঝাঁ ক'রে বেজে উঠছে:
না না তুমি অবিনাশ, তুমি অবিনাশ। (হাসান, ২০১৭, পৃ. ২৪৮)

এভাবেই বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের কবিরা তাঁদের অনবদ্য রচনায় শোকান্বিত অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন — নিজেদের আবেগ দিয়ে ক্রোধ, ক্ষোভ, ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন স্বকীয় শিল্পিত কবিতা-সৃজনের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশের পঞ্চাশের দশকের কবিদের মধ্যে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, ওমর আলী প্রমুখ কবিও পরবর্তী সময়ে কবিতা রচনা করেছেন। অনুজ কবিদের মধ্যে সেই ধারা এখনো অব্যাহত।

পাঁচ

ছিয়ানব্বই-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে পরিবেশ দ্রুত বদলাতে থাকে। অনুকূল সেই সময়ে এরপর থেকে রাশি রাশি কবিতা ও কবিতার সংকলন প্রকাশিত হতে থাকে। এ-সময় মানসম্মত কিছু সংকলন যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি মানহীন ও কেবল সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত সংকলনে বাজার সয়লাব হয়ে গেছে। ২০০১ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি ট্রাস্ট থেকে বেবী মওদুদ ও আসলাম সানীর সম্পাদনায় বিভিন্ন কবির পূর্বপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় *অমর তোমার*

নাম। সম্ভবত শিশু-কিশোরদের বিবেচনায় রেখে সংকলনটির আয়োজন করা হয়েছিল। ২০০৫ সালে শিশুসাহিত্যিক আখতার হুসেনের সুচিন্তিত সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *দুই বাংলার কবিতায় বঙ্গবন্ধু*। বিভিন্ন কবির প্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ করে প্রকাশিত সংকলনের মধ্যে এ-সংকলনকেই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়। "ভূমিকার পরিবর্তে" শীর্ষক নাতিদীর্ঘ কিন্তু চিন্তাশীল নিবন্ধটিতে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর প্রতি আন্তরিকতা ও আবেগের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ।

এ ছাড়া ২০০৭ সালে ১০০ জন কবির ১০০টি কবিতা নিয়ে কাজল রশীদের সম্পাদনায় যুক্তরাজ্যের প্রবাস প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় *বাংলাদেশের আকাশ* শীর্ষক মুদ্রণ সৌকর্যে আকর্ষণীয় এক কবিতা সংকলন। এ-সংকলনের কবিদের মধ্যে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সৈয়দ শামসুল হক, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মুহম্মদ নূরুল হুদা, অসীম সাহা ব্যতীত প্রায় সবাই আশি ও নব্বইয়ের দশকের কবি। এর কবিতাসমূহও বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া। তবে আখতার হুসেন সম্পাদিত সংকলনের চেয়ে এ-সংকলন বেশ আলাদা। এর ভূমিকায় জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেছেন:

> এই কবিতাগুচ্ছে সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে বঙ্গবন্ধুর প্রতি — বাংলাদেশের ইতিহাসের এই ট্র্যাজিডির নায়কের প্রতি ব্যথিত মনের উচ্ছ্বাস।...আমি এই কবিতাগুচ্ছকে বরণ করছি, আর কোনো কারণে নয়। বঙ্গবন্ধু মুজিব যে এখনো, স্বদেশে ও প্রবাসে, সকল বাঙালির প্রাণের সম্রাট, এই সত্যটির এক প্রবল ও আন্তরিক উচ্চারণ, এই বিবেচনায়।' (জিল্লুর: ২০০৭, পৃ. ৬)

আর 'সম্পাদক কথন' হিসেবে সম্পাদক লিখেছেন একটি কবিতা, 'রাজনীতির ক্ষুদ্র চাদরে আমরা ঢাকি না মুজিবের পরিচয়ের বিশালতা।/ মুজিব/ মুক্তিযুদ্ধ/ মাতৃভূমি/ এ যে আমাদের আত্মপরিচয়! জন্মের নিবিড়তায়!/ আসুন, আমাদের সকল প্রার্থনা জমা করি শেখ মুজিবের নামে।' (রশীদ, ২০০৭, পৃ. ৮)

২০১০ সালে উৎস প্রকাশন থেকে বদরুল হায়দারের সংকলন ও সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে *বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত কবিতাঞ্জলি* নামের সংকলন। এই সংকলনের বেশির ভাগ কবিতা *দুই বাংলার কবিতায় বঙ্গবন্ধু* সংকলন থেকে নেওয়া। শিল্পকলা একাডেমি ২০১২ সালে এবং ২০২০ সালে যথাক্রমে *কবিতায় বঙ্গবন্ধু* এবং *শত কবিতায় বঙ্গবন্ধু* নামে দুটি পৃথক সংকলন প্রকাশ করেছে। *কবিতায় বঙ্গবন্ধু* সংকলনের সব কবিতাই *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়* থেকে শুরু করে পূর্বপ্রকাশিত বিভিন্ন সংকলন ও কাব্যগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। তাদের দ্বিতীয় সংকলনটি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত। এর মুখবন্ধে দাবি করা হয়েছে, 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত প্রথিতযশা কবিদের লেখা অপ্রকাশিত নতুন একশত কবিতা নিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করছে।' (লিয়াকত, ২০২০, পৃ. ৮) আর সম্পাদকের দাবি, 'বাংলাদেশের প্রবীণ ও নবীন কবিদের বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা অপ্রকাশিত নতুন কবিতা নিয়ে গ্রন্থিত হয়েছে বর্তমান কবিতা সংকলন শত কবিতায় বঙ্গবন্ধু।' (রুবী, ২০২০, পৃ. ১০) কিন্তু আদতে দুজনের অভিন্ন এই দাবি পুরোপুরি যৌক্তিক নয়। কেননা, এ সংকলনে কিছু নতুন কবিতা স্থান পেলেও অনেক কবির কবিতাই বিভিন্ন সাময়িকীতে পূর্বপ্রকাশিত। যেমন, নির্মলেন্দু গুণের কবিতা "বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষের গান" ২০১৯ সালের অক্টোবরে 'ডেইলি হান্ট' নামক বহুভাষী এক ওয়েব পোর্টালে, মুহাম্মদ সামাদের কবিতা "এই বাংলা মুজিবময়" ২০১৫ সালে সাহিত্যপত্রিকা মাসিক *কালি ও কলমে*, আনিসুল হকের কবিতা "৩২ নম্বর মেঘের ওপারে" ২০১৬ সালে *প্রথম আলোয়*, সোহরাব

হাসানের কবিতা "কারা-কুসুম" প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৮ সালের সরকারি ক্রোড়পত্রে। সত্যাসত্য যাচাইয়ে অন্তর্জালে খোঁজ করলে হয়তো পূর্বপ্রকাশিত আরও অধিকসংখ্যক কবিতার তথ্য পাওয়া যাবে।

এ ছাড়া ২০১৫ সালে পারিজাত প্রকাশনী থেকে শেখ নজরুলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে *কবিতায় বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর কবিতা* শীর্ষক কবিতার সংকলন। 'সুসময়ে' প্রকাশিত এ-সংকলনেও তেমন কোনো নতুনত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এসব সংকলন যেন 'সাহসের বাঁধ খুলে' যাওয়ার অত্যুৎসাহী ফল।

ছয়

ব্যক্তিত্বের বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিপ্লবী চে গুয়েভারার (১৯২৮-১৯৬৭) তুলনা চলে। চে যেমন সারা বিশ্বের বিপ্লবীদের আদর্শ, তেমনি বঙ্গবন্ধু সারা বিশ্বের নিপীড়িত ও স্বাধীনতাপ্রয়াসী মানুষের কাছে অনুকরণীয় এক নাম। দুজনই মানুষের মুক্তির জন্য জীবনভর সংগ্রাম করেছেন। আজন্ম বিপ্লবী সশস্ত্র যোদ্ধা চে সুযোগ পেলেই জঙ্গলে বসেও সময়ের সেরা কবিদের কবিতা পাঠ করতেন। কবিতা রচনার চেষ্টাও করতেন। তাঁকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন চীন, রাশিয়া, কিউবা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চিলি, ফ্রান্স, জার্মানিসহ সারা বিশ্বের প্রায় সব ভাষার কবি। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে বলিভিয়ার গহীন অরণ্যে গুপ্তচরের হাতে ধরা পড়েন চে। মার্কিন গুপ্তচরদের ইচ্ছায় চে-কে হত্যা করা হয়, যাতে পৃথিবী থেকে তাঁর নাম-নিশানা মুছে ফেলা যায়। কিন্তু হয়েছে উল্টো। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত দেশে দেশে তুমুল জনপ্রিয় চে-র আদর্শ রাজনৈতিক চেতনা, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে। প্রাণহীন চে যেন আরো বেশি জীবন্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। (মনজুরুল ও মতিউরঃ ২০১৭, পৃ. ১০৫)

জনগণের কল্যাণে আত্মোৎসর্গকারী বঙ্গবন্ধুও শহিদ হওয়ার প্রায় অর্ধশতাব্দী পর বাঙালিদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক দর্শন আরও বেশি সময়োপযোগী ও গ্রহণযোগ্য আদর্শ হিসেবে চর্চিত হচ্ছে। জীবনের বেশির ভাগ মূল্যবান সময় কারাপ্রকোষ্ঠে[১৬] কাটালেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সময় অপচয় করেননি। মাত্র পঞ্চান্ন বছরের জীবনে বিভিন্ন মেয়াদে চৌদ্দ বছরের দীর্ঘ কারাজীবনে তিনি জনগণের কল্যাণ-সাধনার পাশাপাশি প্রখ্যাত লেখকদের গ্রন্থ যেমন পড়েছেন, তেমনি লিখেছেনও। সম্প্রতি প্রকাশিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (২০১২), *কারাগারের রোজনামচা* (২০১৬), *আমার দেখা নয়াচীন* (২০২০) — গ্রন্থ তিনটি তারই প্রমাণ। *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা বলেছেন, 'স্বাধীন বাংলাদেশ ও জাতি হিসেবে মর্যাদা বাঙালি পেয়েছে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই সংগ্রামে অনেক ব্যথা বেদনা, অশ্রু ও রক্তের ইতিহাস রয়েছে। মহান ত্যাগের মধ্য দিয়ে মহৎ অর্জন করে দিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।' (শেখ মুজিবুর, ২০১৭, পৃ. ১৬)

এত অর্জন, অথচ এতটা বিয়োগাত্মক পরিণতি যাঁর জীবনের, তিনি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সব মাধ্যমের উপাদান হবেন, সেটি অননুমেয় নয়। কারণ, 'স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব প্রসঙ্গিত [প্রসঙ্গে] যে-কোনও আলোচনায় খুবই স্বাভাবিকভাবে মহীরুহের সঙ্গে মাটি ও শেকড়ের সম্পর্কের মতো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের সম্পৃক্তি ও উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য। বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু অথবা বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ এবং মুক্তিযুদ্ধ এক ও অভিন্ন সত্তায় একাকার।' (আখতার, ২০০৫, পৃ. ৭)

ইতিহাসের অমর নায়কেরা বারবার ফিরে আসেন জনতার কাছে। পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের পর প্রায় দুই দশক যিনি ছিলেন 'নিষিদ্ধ' এক নাম, ২০২০ সালে তাঁরই জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয় সাড়ম্বরে — রাষ্ট্রীয়ভাবে। বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর অবরুদ্ধ সেই সময়ে যাঁরা 'নিষিদ্ধ' বঙ্গবন্ধুকে উপলক্ষ্য করে সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চার দুয়ার খোলা রেখে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, আর যাঁরা তুলনামূলক 'শিথিল' বা 'অনুকূল' সময়ে ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিকদের মতো আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় ছিলেন — এই দুই গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে একটা ব্যবধান সুস্পষ্ট। জাতির সংকটকাল উপস্থিত হলেও মুষ্টিমেয় 'সূর্য তরুণ'ই সাহসে বুক বেঁধে অতন্দ্র প্রহরায় থাকেন। তাঁদের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই বঙ্গবন্ধুর মতো দেশপ্রেম ও মানবকল্যাণে জীবন উৎসর্গকৃত ব্যক্তি দেহান্তরিত হলেও তাঁর আদর্শ কখনো অপসৃত হয় না। বরং তাঁর আদর্শের মহিমা কালান্তরে ছড়িয়ে পড়ে জগৎময় প্রতিষ্ঠিত হয় কাব্যের সত্য।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. বিহারের বামপন্থি কবি ও সর্বভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সংঘের বিহার রাজ্য কমিটির সেক্রেটারি নওশাদ নূরী উর্দুভাষী হলেও বাঙালির প্রতিটি আন্দোলনে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৪৯ সালে নেহরুর মার্কিন-প্রীতির বিরুদ্ধে সংঘ প্রতিবাদ করে। নূরী রচনা করেন "ভিখারি" নামক কবিতা। নেহরু সরকার হুলিয়া জারি করলে ১৯৫১ সালে পালিয়ে ঢাকায় আসেন। সান্নিধ্য পান রণেশ দাশগুপ্ত, কামাল লোহানী প্রমুখের। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে রচনা করেন "মহেঞ্জোদারো"। কবিতাটি রচনার কারণে পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হন। তাজউদ্দীন আহমদের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পাদনা করেন উর্দু সাপ্তাহিক *জারিদা* (১৯৬৯-১৯৭১)। সেখানে ছয়দফা প্রচারে উর্দুতে স্লোগান ছাপা হয়, 'তেরি নাজাত মেরি নাজাত, ছে নুকাত ছে নুকাত' অর্থাৎ তোমার মুক্তি আমার মুক্তি, ছয়দফা ছয়দফা। পঁচিশে মার্চের প্রেক্ষাপটে রচনা করেন "লহুমে শারাবোর দিন" (রক্তেভেজা দিন)। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* উপন্যাসের নামকরণ করা হয় তাঁরই পরামর্শে।

২. ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় কবি মোহাম্মদ রফিক বলেছেন, তিনি কবিতাটি রচনা করেছিলেন ১৯৭৬ সালে; ছাত্র ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিতব্য একটি সংকলনের জন্য। সংকলনটি প্রকাশিত হয়নি। পরে তিনি এটা সমকালকে দেন প্রকাশের জন্য। প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে। এরপর আলতাফ আলী হাসু ১৯৭৮ সালে *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়* সংকলনের জন্য কবিতাটি জমা দেন। ফলে এটি এ-সংকলনে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়। তবে তথ্যটি সংকলনটির উদ্যোক্তাদের জানা ছিল বলে মনে হয় না। তাঁরা কবিতটি নতুন হিসেবেই ছেপেছিলেন।

৩. ভীষ্মদেব চৌধুরীর "'এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়': বঙ্গবন্ধু স্মরণে প্রথম কবিতা-সংকলন প্রকাশনার ইতিহাস", শীর্ষক প্রবন্ধটি ১৯৯৮ সালে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা প্রশাসন (সম্পা. কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী) কর্তৃক প্রকাশিত জাতীয় শোক দিবসের বিশেষ আয়োজন *জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি* নামের স্মরণিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এর আগে-পরে প্রবন্ধটি আরও কয়েকটি সংকলনেও স্থান পায়।

৪. সূর্য তরুণ গোষ্ঠীর দুই সদস্যের সঙ্গে আলাপচারিতায় জানা যায়, সেই সময় দেশের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমানসহ অনেক প্রতিষ্ঠিত কবির কাছে কবিতা চেয়ে বিমুখ হয়েছেন। তাঁরা কেউ সময়ের বিবেচনায় সাহস নিয়ে এগিয়ে আসেননি। কোনো ঝুঁকিও নিতে চাননি।

৫. তবে অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতাটির একটি ভুল পাঠ ছাপা হয় আলোচিত এ-সংকলনে। সময়ের প্রতিকূলতায় হয়তো যাচাই করারও সুযোগ ছিল না এর উদ্যোক্তাদের। পরবর্তী সময়ে ভুল পাঠটিই সবাই অনুসরণ করতে থাকে। কারণ, বাংলাদেশে *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়* সংকলনেই প্রথম ছড়া-কবিতাটি মুদ্রিত হয়। **মূলপাঠ:** 'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা/ গৌরী মেঘনা বহমান/ ততকাল রবে কীর্তি তোমার/ শেখ মুজিবর রহমান।/ দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা/ রক্ত গঙ্গা বহমান/ তবু নাই ভয়, হবে হবে জয়/ জয় শেখ মুজিবর রহমান।' **উল্লিখিত সংকলনে মুদ্রিত পাঠ:** 'যত দিন রবে পদ্মা মেঘনা/ গৌরী যমুনা বহমান/ তত দিন রবে কীর্তি তোমার/ শেখ মুজিবুর রহমান।/ দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা/ রক্ত গঙ্গা বহমান/ নাই নাই ভয় হবে হবে জয়/ জয় মুজিবর রহমান।' সন্দীপন মল্লিকের পিএইচডি অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ *অন্নদাশঙ্কর রায়: সাহিত্য ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা*তেও (বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪) কবিতাটির একটি ভুলপাঠ ছাপা হয়েছে।

৬. *বাংলার মুখ* ছড়া-কবিতার সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার অনির্বাণ প্রকাশনী থেকে। সম্পাদক ছিলেন বামপন্থি কবি দিনেশ দাসের পুত্র শান্তনু দাস। প্রথম প্রকাশ ১৭ ভাদ্র ১৩৭৮ (অর্থাৎ ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে)

৭. মোহাম্মদ হাননান এক নিবন্ধে লিখেছেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান লেখক অন্নদাশঙ্কর রায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটি কবিতা লেখেন। (২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১, প্রথম আলো) তিনি *বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ প্রথম মিছিল প্রথম সাহিত্য প্রতিক্রিয়া গ্রন্থে* লিখেছেন, কবিতাটি ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়* সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। দুটি তথ্যের কোনোটিই সঠিক নয়।

৮. *এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়* সংকলনের সহ-উদ্যোক্তা ভীষ্মদেব চৌধুরীর কাছে দুটি কবিতার পুনর্মুদ্রণ নিয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অন্নদাশঙ্কর রায়ের কবিতাটি এর তাৎপর্যের কারণেই তাঁরা জ্ঞাতসারে পুনর্মুদ্রিত করেছিলেন। সংকলনের অন্যান্য কবিতার মতো মোহাম্মদ রফিক ও খালেক বিন জয়েনউদদীনের কবিতাকেও তাঁরা নতুন হিসেবেই জানতেন। এগুলো যে পূর্বপ্রকাশিত, তা জানতেন না।

৯. বাংলাদেশের অত্যন্ত পরিচিত নিউজ পোর্টাল বিডিনিউজ২৪.কমে ১৫ আগস্ট ২০১৯-এ মোজাফফর হোসেনের "কবিতায় বঙ্গবন্ধু, প্রসঙ্গ সত্তর দশক" শীর্ষক একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটিতে যাচাই ছাড়াই অনেক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। ঐতিহাসিক সংকলনটি নিয়ে আমিনুল ইসলাম বেদু-সম্পর্কিত তথ্যটিও লেখক যাচাই না করেই উপস্থাপন করেছেন।

১০. বিষয়টি নিয়ে কথা হয় সংকলনটির প্রধান উদ্যোক্তা ও খেলাঘরের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবদুল আজীজের সঙ্গে। তিনি বলেন, এ ধরনের প্রকাশ্য আয়োজনের বিষয়টি একেবারেই কাল্পনিক। আমিনুল ইসলাম বেদু এ-সংকলনের প্রকাশনার সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত ছিলেন না। সুতরাং তাঁর পক্ষে পুরো ঘটনা জানাও সম্ভব নয়।

১১. প্রবন্ধটি ভীষ্মদেব চৌধুরী রচনার করলেও প্রথমদিকে পত্রিকায় ও সংকলনে এটি পাঁচ উদ্যোক্তার নামে ছাপা হয়। পরে আবদুল আজীজের পরামর্শে *নেপথ্য কাহিনী* গ্রন্থে ভীষ্মদেব চৌধুরীর একক নামে সংকলিত হয়।

১২. শিশুসাহিত্যিক লুৎফর রহমান রিটন ১৭ জানুয়ারি ২০২০ ব্যক্তিগতভাবে জানান, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর, আশির দশকের মাঝামাঝিতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে এক জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে তিনি ছড়াটি পাঠ করেন।

১৩. *বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ছড়াগুচ্ছ* সংকলনে দুজন সম্পাদকের পাশাপাশি ছিলেন দুজন সহকারী সম্পাদক। নাম আকমল হোসেন খোকন ও হোসনে আর সোমা।

১৪. অনলাইন পোর্টাল বিডিনিউজটুয়েন্টিফোরডটকম-এ ২০১৫ সালের ১৬ আগস্ট 'প্রথম দিন শেখ মুজিব আমাকে আপনি করে বললেন' শীর্ষক নির্মলেন্দু গুণের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। এ সাক্ষাৎকারে রাজু আলাউদ্দিনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি লিখছি সিক্সটি সেভেনে ১২ই নভেম্বরে, সংবাদে (পত্রিকায়) প্রকাশিত হইছে। বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে রচিত ওটাই ছিল প্রথম কবিতা। তার পূর্বে বাংলাদেশের কোন কবি বঙ্গবন্ধুকে সচেতন বিবেচনায় নিয়ে কোনো কবিতা লেখেননি। আমার পরে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা রচনা করেন কবি জসীমউদ্দীন এবং সম্ভবত বেগম সুফিয়া কামালও।'

১৫. ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় কবি বলেন, বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারি প্রায় সব গণমাধ্যমই বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। একমাত্র দৈনিক *পূর্বদেশ* পত্রিকার উপসম্পাদকীয়তে ছাপা হয়েছিল একটি কবিতা।

১৬. তোফায়েল আহমেদ ১৬ মার্চ ২০১৯ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে বলেন, "বঙ্গবন্ধু ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাগারে ছিলেন"। দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৬ মার্চ ২০১৯

উল্লেখপঞ্জি

অন্নদাশঙ্কর রায় (২০১০)। *কাঁদো প্রিয় দেশ*, ঢাকা: অন্বেষা প্রকাশন।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৩৭৮)। "বঙ্গবন্ধু", *বাংলার মুখ* (সম্পা. শান্তনু দাস), কলকাতা: অনির্বাণ প্রকাশনী।

আখতার হুসেন [সম্পা.] (২০০৫)। *দুই বাংলার কবিতায় বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আসাদ চৌধুরী (২০১৮)। "উত্থান-উৎস", "টুঙ্গিপাড়া", *মননরেখা*, (সম্পা. মিজানুর রহমান নাসিম), ডিসেম্বর ২০১৮।

ইত্তেফাক (১৯৭৫)। 'খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীর শাসনক্ষমতা গ্রহণ' ১৬ আগস্ট ১৯৭৫।

ইত্তেফাক (১৯৭৫)। 'সম্পাদকীয়: ঐতিহাসিক নবযাত্রা', ১৬ আগস্ট ১৯৭৫।

এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় (১৯৭৮)। সূর্য তরুণ গোষ্ঠী, একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮।

কাজল রশীদ [সম্পা.] (২০০৭)। *বাংলাদেশের আকাশ*, লন্ডন: প্রবাস প্রকাশনী।

নওশাদ জামিল (২০১৯)। 'বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ হয়েছিল শিল্প-সাহিত্যে', *কালের কণ্ঠ*, ১৬ আগস্ট ২০১৯।

নিমাই সরকার (২০১৯)। "বঙ্গবন্ধু আর কবিতা এক হয়ে যায়", প্রথম আলো, ২১ আগস্ট ২০১৯।

নির্মলেন্দু গুণ (২০১৫)। "স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো কবিতার প্রেক্ষাপট", *কালের কণ্ঠ*, ৬ মার্চ ২০১৫।

নির্মলেন্দু গুণ (২০২০)। *নির্বাচিতা*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী।

নির্মলেন্দু গুণ (২০১২)। "বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর তাঁকে নিয়ে লেখা প্রথম কবিতা", *কবিতায় বঙ্গবন্ধু* (সম্পা. লিয়াকত আলী লাকী), ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

নির্মলেন্দু গুণ (২০২০)। *মুজিবসমগ্র*, ঢাকা: বিভাস।

প্রথম আলো (২০১৯)। 'বঙ্গবন্ধু ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাগারে ছিলেন', ১৬ মার্চ ২০১৯

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৮)। *বাংলাদেশের সাহিত্য*, ঢাকা: আজকাল প্রকাশনী।

বেবী মওদুদ ও আসলাম সানী [সম্পা.] (২০০১)। *অমর তোমার নাম*, ঢাকা: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি ট্রাস্ট।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৯৮)। "'এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়': বঙ্গবন্ধু স্মরণে প্রথম কবিতা-সংকলন প্রকাশনার ইতিহাস", *জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি* [কে এইচ মাসুদ সিদ্দিকী সম্পা.], টুঙ্গিপাড়া: টুঙ্গিপাড়া উপজেলা প্রশাসন।

মনজুরুল হক ও মতিউর রহমান (২০১৭): *চে: বন্দুকের পাশে কবিতা*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

মন্টি রহমান ও মোশাররফ হোসেন ভূইয়া [সম্পা.] (১৯৮৮)। *বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত ছড়াগুচ্ছ*, ঢাকা: বঙ্গবন্ধু ছড়া সংসদ।

মফিদুল হক (২০১৯)। "নওশাদ নূরী ও তার একটি কবিতা ", *যুগান্তর*, ২৬ জুলাই ২০১৯।

মোহাম্মদ হাননান (২০১১)। "একটি কবিতার শুদ্ধ পাঠ", *প্রথম আলো*, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১।

মোহাম্মদ হাননান (২০১৯)। *বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ: প্রথম মিছিল প্রথম সাহিত্য প্রতিক্রিয়া*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

মোহাম্মদ হাননান (২০১৩)। *শত্রুর চোখে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা : অনিন্দ্য প্রকাশনী।

লিয়াকত আলী লাকী ও রুবী রহমান [সম্পা.] (২০২০)। *শত কবিতায় বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

লুৎফর রহমান রিটন (২০০৮)। *ছড়াসমস্ত*, ঢাকা: অবসর।

শামসুর রাহমান (২০০১)। *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০২০)। *আমার দেখা নয়াচীন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান (২০১৭)। *কারাগারের রোজনামচা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হাসান হাফিজুর রহমান (২০১৭)। *কাব্যসমগ্র*, ঢাকা: সময় প্রকাশন।

Nirmalendu Goon (2018). "Who wrote the first poem about Bangabandhu after his death?", *Dhaka Tribune,* 15 August 2018

দ্য আগলি আমেরিকান বনাম *দ্য আগলি এশিয়ান* : 'নব্য উপনিবেশবাদ' প্রশ্নের উত্তর-ঔপনিবেশিক মীমাংসা

মাফরুহা সিফাত*

সারসংক্ষেপ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যক্ষ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেলেও অনেকটা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই জড়িয়ে পড়েছিল নব্য ঔপনিবেশিক কূটজালে। তবে এর বিপরীতে ঔপনিবেশিকতার প্রায় সমান বয়সী উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিও প্রগাঢ়রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছিল মূলত ঐ সময় থেকেই, অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই। তাই একদিকে রাশিয়ার সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনালগ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে সাম্রাজ্যবাদ তথা নব্য ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তারের কৌশলী কূটনীতির নকশা আঁকছিল, অন্যদিকে দীর্ঘদিন উপনিবেশিত থাকার পর সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকগণ তখন আত্ম-খনন ও আত্ম-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নবতর আত্মোপলব্ধিতে রচনা করছিলেন উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানভাষ্য। বিশ্ব ইতিহাসের ঐ উত্তাল কালপর্বে যে-সকল উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক প্রাচ্যকে দেখার পাশ্চাত্যের চিরায়ত রীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, তাদের তালিকায় প্রাসঙ্গিকভাবেই যুক্ত হতে পারে বাংলাদেশের সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাম। কারণ নানামুখী পঠনে উঠে আসে, আমেরিকান লেখক উইলিয়াম জে. লেডারার এবং ইউজিন বারডিক রচিত নব্য উপনিবেশবাদী চিন্তাধারার উপন্যাস *দ্য আগলি আমেরিকান (The Ugly American)* পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় ষাটের দশকের প্রারম্ভে রচিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *দ্য আগলি এশিয়ান (The Ugly Asian)* উপন্যাসে সুতীক্ষ্ণ উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। এই প্রবন্ধের অভীষ্ট, তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতিতে *দ্য আগলি আমেরিকান* উপন্যাসের সঙ্গে পরিপ্রেক্ষিতগত বৈপরীত্য ও কার্যকারণসূত্র বিবেচনায় *দ্য আগলি এশিয়ান* উপন্যাসের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ। পাশাপাশি উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার সমান্তরাল ইতিহাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য অনুসন্ধানেরও একটি প্রয়াস থাকবে বর্তমান প্রবন্ধে।

১

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) পরপরই এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে পর্যায়ক্রমে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটতে শুরু করে। কিন্তু খোলনালচে পাল্টে, চল্লিশের দশকের শেষ থেকেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদ । এরই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার নয়া কৌশল বাস্তবায়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের (সম্ভাব্য ১৯৪৭-১৯৯১) সূচনা ঘটতেই নতুন ধরনের ঔপনিবেশিক শাসনের বিস্তার ঘটতে শুরু করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে:

> As I shall be using the term, "imperialism" means the practice, the theory, and the attitudes of a dominating metropolitan center ruling a distant territory; "colonialism," which is almost always a consequence of imperialism, is the implanting of settlements on distant territory…In our time, direct colonialism has largely ended; imperialism, as we shall see, lingers where it has always been, in a kind of general cultural sphere as well as in specific political, ideological, economic, and social practices. (Said, 1994, p. 36)

---

* প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

অ্যাডওয়ার্ড সাঈদের এই বক্তব্য অনুযায়ী বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসনের নয়া এই রূপ অধিগ্রহণে সবচাইতে ক্রিয়াশীল ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশেষত পঞ্চাশের দশকের শুরুতে তাদের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম কৌশলই ছিল সরাসরি শাসনপ্রক্রিয়া বিস্তার নয় বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। "France and Britain no longer occupy center stage in world politics; the American imperium has displaced them." (Said, 1979, p. 381) তবে ঐ সময়ে এই নতুন ধারার সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার রোধে, মুদ্রার অপর পিঠ হিসেবে বিশ্বজুড়ে অ্যাডওয়ার্ড সাঈদের মতো বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকরাও সরব হয়ে উঠেছিলেন উপনিবেশোত্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষণে। তাই 'উপনিবেশায়ন' প্রক্রিয়ার প্রশমন ঘটতে না ঘটতে যখন নব্য ঔপনিবেশিক (Neo-colonial) শক্তিগুলো কূটজাল বিস্তার করেছিল, প্রায় তখনই সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর বুদ্ধিজীবীদের হাতে রচিত হচ্ছিল উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানভাষ্য।

> একটি দেশে একই সময়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক (আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে) এবং নয়া ঔপনিবেশিক (অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে) পরিস্থিতি থাকতে পারে। যে-সব অসম ঔপনিবেশিক-শাসন-সম্পর্ক বর্তমান যুগে 'প্রথম বিশ্ব' ও 'তৃতীয় বিশ্ব'র মধ্যে বৈষম্য জিইয়ে রাখছে, তা-ও অব্যাহত আছে। নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ শাসনের ওপর নির্ভরশীল নয়, বর্তমানে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে কিছু দেশ অন্য দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। আকার আঙ্গিকগত উপনিবেশ উত্তর-ঔপনিবেশিককালে অবয়বহীন ছদ্মরূপ ধারণ করেছে। নয়ারূপে বিদ্যমান সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশ ঘাপটি মেরে শাসন করছে পৃথিবী। পশ্চিমা শাসনের অনুষঙ্গ হিসেবে তথাকথিত গোলকায়ন, বিশ্ব বাণিজ্য, মুক্তবাজার উপনিবেশবাদের অতিসাম্প্রতিক কীর্তি। বিশ্বব্যাপী 'আমেরিকায়ন' প্রক্রিয়া চলছে। অর্থাৎ শোষণের ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের সঙ্গে উপরি হিসেবে যুক্ত হয়েছে আমেরিকায়নের যাঁতা। এসব নিয়েই উপনিবেশোত্তর দেশসমূহের বাস্তবতা। আর এইসব বাস্তবতা ও পরিস্থিতির প্রভাব, পর্যালোচনা, প্রশ্ন উত্থাপন, ইতিহাসগত ভিত্তি অনুসন্ধান উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠের অন্তর্ভুক্ত। (ফকরুল, ২০১১, পৃ. ১৭)

অ্যাডওয়ার্ড সাঈদের সমগোত্রীয় অন্যান্য উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকের আলোচনায়ও শুরু থেকেই প্রাচ্যকে দেখার পাশ্চাত্যের চিরায়ত রীতিপদ্ধতির কড়া সমালোচনা পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন ভাষায় ও আঙ্গিকে। এসবের মধ্যে ফ্রান্‌জ ফানোঁ (১৯৬৩, ১৯৮৬), এইমে সিজার (২০০০), গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক (১৯৯৯), হোমি কে ভাবা (২০০৪) এবং নাগুগি ওয়া থিয়াঙ্গোর (২০০৭) গ্রন্থগুলো উপনিবেশ-বিরোধী চিন্তা ও উত্তর-উপনিবেশবাদী চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সমাদৃত। "Post-colonialism (or often post colonialism) deals with the effect of colonization on cultures and societies." (Ashcroft, Griffiths and Tiffin, 2007, p. 168) তবে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেও কখনও কখনও দেখা যায় জোরালো উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রকাশ। সেক্ষেত্রে শুধু সরাসরি পাশ্চাত্যের হীন পরিপ্রেক্ষিতের বিশ্লেষণ নয় বরং সেটার জবাবে প্রাচ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত জ্ঞানভাষ্য নির্মাণ প্রক্রিয়াটিও উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে ফয়েজ আলমের (২০০৭) বক্তব্যে পাওয়া যায়, পোলিশ-ইংরেজ লেখক জোসেফ কনরাডের (১৮৯৯) *হার্ট অব ডার্কনেস (Heart of Darkness)* উপন্যাসের ঔপনিবেশিক বয়ানকে (উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠা ও সেই উপনিবেশকে নিকৃষ্টরূপে চিত্রিত করা) পাল্টে দিয়েছিলেন কেনীয় লেখক নাগুগি ওয়া থিয়াঙ্গো (১৯৬৫) তাঁর *দ্য রিভার বিটুইন (The River Between)* এবং আরব লেখক তাইয়্যেব সালিহ তাঁর *সিজন অব মাইগ্রেশন টু নর্থ* (১৯৬৬)

(Season of Migration to North) উপন্যাসদ্বয়ে। উপনিবেশিত অঞ্চলের একটি নদীকে কেন্দ্র করে লেখা উপন্যাস *হার্ট অব ডার্কনেস*, যেখানে নদীটির মৃত ও নিকৃষ্ট রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতীকধর্মী এই উপন্যাসে, নদীটি দ্বারা লেখক উপনিবেশ-শাসিত জনগণের অবস্থার কথা ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। আর এই আলোচিত উপন্যাসটিতে প্রতিফলিত, ঔপন্যাসিকের একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির পাল্টা জ্ঞানভাষ্য (Counter Discourse) হিসেবেই রচিত হয়েছিল নাগুগি ওয়া থিয়াঙ্গো এবং তাইয়েবে সালিহর উপন্যাসটি। নাগুগি *হার্ট অব ডার্কনেসের* মরা নদীটির নামকরণ করেন ও সেটিকে স্থানীয়দের জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তোলেন তাঁর উপন্যাসে। আর সালিহ কনরাডের উপন্যাসের ঔপনিবেশিক অভিযাত্রার গতিধারা বদলে দেন, তাঁর রচিত উপন্যাসটির চরিত্রসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীতগামী অবস্থান দেখানোর মাধ্যমে।

জোসেফ কনরাডের উপন্যাসটি পুনর্পাঠ ও পুনর্লিখনের মাধ্যমে উক্ত লেখকদ্বয় উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির যে বৈচিত্র্যময় পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচন করে আলোচিত হয়েছিলেন, বাংলাদেশের সাহিত্যে ঐ একই ধারার নির্মাণ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) ইংরেজি ভাষার উপন্যাস *দ্য আগলি এশিয়ান (The Ugly Asian)*[১]। উপন্যাসটি তিনি প্রকাশ করে যেতে না পারলেও সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, ষাটের দশকের প্রায় শুরুতেই লেখক এই উপন্যাসটি রচনা শেষ করেন। পাশাপাশি বর্তমানে নানা গবেষণায় দেখা যায়, তিনি এই উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন আমেরিকান লেখক উইলিয়াম জে. লেডারার (১৯১২-২০০৯) এবং ইউজিন বারডিক (১৯১৮-১৯৬৫) রচিত *দ্য আগলি আমেরিকান (The Ugly American)* (১৯৫৮)[২] উপন্যাসের বিপরীত-পাঠ হিসেবে। এই প্রসঙ্গে *কদর্য এশীয়* নামে প্রকাশিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় সাজ্জাদ শরীফ (২০১৮) লিখেছেন:

> এ ব্যাপারে সন্দেহের প্রায় কোনো অবকাশই নেই যে *দি আগলি এশিয়ান* উইলিয়াম জে লেডারার এবং ইউজিন বারডিকের *দি আগলি আমেরিকান* নামের তীব্র কমিউনিস্টবিদ্বেষী উপন্যাসটির গরিব দুনিয়ার মানুষের পক্ষ থেকে লেখা এক দুর্মুখ প্রত্যুত্তর। এ উপন্যাস দুটির মিল শুধু তাদের নামের সাযুজ্যে নয়, অন্তরঙ্গেও। ওয়ালীউল্লাহ্‌ কেবল মূল উপন্যাসের উল্টো দৃষ্টিভঙ্গিটি *দি আগলি এশিয়ানে*-এ সোজা করে দিয়েছেন।

২

উইলিয়াম জে. লেডারার এবং ইউজিন বারডিক *দ্য আগলি আমেরিকান* উপন্যাসের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রনীতির ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরেছেন এবং সেগুলো সমাধানের সম্ভাব্য পথ বাতলে দিয়েছেন। আর সেজন্য এই উপন্যাসটিকে এখন পর্যন্ত আমেরিকার সর্বাধিক বিক্রীত রাজনৈতিক উপন্যাসের তকমা দেওয়া হয়। তবে গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, উপন্যাসটি এশিয়ার গণমানুষের সহায়তা প্রসঙ্গে আমেরিকার ভূমিকার যে চিত্র দাঁড় করিয়েছিল, তা ছিল মূলত চলমান স্নায়ুযুদ্ধে প্রভাব বিস্তার করার জন্য কিছু পদ্ধতিগত কৌশল চিত্রণ। যার মাধ্যমে আমেরিকা যতটা না এশিয়ার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সহযোগিতা করতে সক্ষম হতো, তার থেকেও বেশি পারত রাশিয়ার বিরুদ্ধচারণ করতে। অবশ্য ঔপন্যাসিকদ্বয়ের উদ্দেশ্যও ছিল সেটা। তাই উপন্যাসের মাধ্যমে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের লড়াইকে উসকে দেওয়া হয়েছে বলা চলে। কিন্তু উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য বিচারে এটি সুস্পষ্ট, যেহেতু উপন্যাসটি রচিত হয়েছে কেবল পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে, সুতরাং এটি আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত সমগ্র উপন্যাস হয়ে উঠতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে:

> For *The Ugly American* is not merely a comment on the Cold War. It is itself the product of the Cold War, and particularly of a half-covert campaign to remake Asia from the villages up. *The Ugly American* is thus an onion of a book, with multiple layers. And by peeling it, we can see quite a lot about u.s. designs on the Third World and the secret means used to pursue them. (Immerwahr, 2019, p. 9)

তবে সাহিত্যমূল্য বিবেচনায় যেমনই হোক, আমেরিকার তৎকালীন রাজনীতিতে এই উপন্যাস অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। যেহেতু পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি রাশিয়ার (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) হাইড্রোজেন বোমা তৈরির বিষয়টি সকলের নজরে এসেছিল এবং ১৯৫৭ সালে তারা সফলভাবে সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ *স্পুটনিক ১* উৎক্ষেপ করেছিল, ফলে আমেরিকা মরিয়া হয়ে উঠেছিল বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি হয়ে ওঠার পথে নিজেদের গতি আরও বৃদ্ধি করতে। সুতরাং, বিশ্বব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া দেশগুলোকে সাহায্য করার নামে নিজেদের এই আগ্রাসনধর্মী নব্য ঔপনিবেশিক কৌশল বাস্তবায়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে তারা। কিন্তু মিয়ানমার (তৎকালীন বার্মা), ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোতে তখন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া এবং চীনও নিজেদের মতাদর্শ প্রচারে বেশ সক্রিয় ছিল। তাই ভৌগোলিক দূরত্ব এবং সংস্কৃতির বিশাল ব্যবধানের কারণে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে পুঁজিবাদী কৌশল বাস্তবায়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বেশ বেগ পোহাতে হচ্ছিল এবং তারা এই অঞ্চলে সক্রিয় ও তুলনামূলক শক্তিশালী অন্য দেশগুলোর সঙ্গে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়ছিল। বিষয়গুলোকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে নিজেদের মতামত সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতেই উইলিয়াম জে. লেডারার এবং ইউজিন বারডিক উপন্যাসটি রচনা করেন। আর হেলম্যানের (১৯৮৩) বর্ণনায় পাওয়া যায়, উপন্যাসটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, আমেরিকার তৎকালীন সিনেট সদস্য ও পরবর্তীকালে নির্বাচিত পঁয়ত্রিশতম প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি অন্যান্য সিনেট সদস্যদের প্রত্যেককে এটির একটি করে কপি বিতরণ করেন। পাশাপাশি ওয়াটস (Walts, 2016) উল্লেখ করেছেন, নিজের দলের নির্বাচনী ইশতেহারে এই উপন্যাসটিতে প্রস্তাবিত পররাষ্ট্রনীতিগত সমস্যার সমাধান অনুযায়ী *পিস করপ্স্ (Peace Corps)* নামক আমেরিকান স্বেচ্ছাসেবীদের একটি দল গঠন করার ঘোষণা দেন কেনেডি; যাদের কাজ ছিল এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে গিয়ে সেসব দেশের জনগণের সঙ্গে মিশে, তাদের ভাষায় কথা বলতে শিখে, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের কাছে আমেরিকার জয়গান গাওয়া। আর প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরপরই ১৯৬১ সালে তিনি এটি গঠনও করেন।

২.১

দ্য আগলি আমেরিকান উপন্যাসটিতে *সারখান* নামক একটি কল্পিত রাষ্ট্রের বর্ণনা পাই এবং ধরে নিতে পারি, এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন সংলগ্ন কোনো দেশ। কারণ উপন্যাসটিতে উল্লেখিত দেশসমূহের নাম এবং তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সরাসরি বর্ণিত হতে দেখা যায়। মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হলেও ইউজিন বারডিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং উইলিয়াম জে. লেডেরার ছিলেন নৌবাহিনীরই একজন চৌকস কর্মকর্তা। তাই উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট হিসেবে যেসব ঘটনা বা চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, সেগুলো সরাসরি বাস্তব না হলেও বাস্তবতা

দ্বারাই অনুপ্রাণিত। এমন ব্যাখ্যা তাঁরা নিজেরাই দিয়েছেন উপন্যাসের শেষে 'কল্পিত সংলাপ' অংশে । পাশাপাশি পুরো উপন্যাসজুড়েই ফুটে উঠেছে ঔপন্যাসিকদ্বয়ের চিরায়ত পাশ্চাত্যমুখী দৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে যুগ্ম-বৈপরীত্যজাত (Binary Opposition) অপরতাবোধ (Otherness) ছিল সদা তৎপর। সুন্দর-অসুন্দরের প্রচলিত সেই দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসের নামকরণেও। এশিয়ানরা তাদের কাছে সবসময়ই 'কদর্য' (Ugly)। সুতরাং এশিয়া বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আমেরিকা তখনই নয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, যখন তারাও এশিয়ানদের মতো কদর্য হতে পারবে; উপন্যাসের শেষে এমনটাই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই কদর্যতার অর্থ হলো এশিয়ানদের মতো জীবনযাপন করা, তাদের ভাষায় কথা বলা এবং তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশতে পারা:

> In my tenure here at Haidho perhaps three hundred Americans have passed through the Embassy in one capacity or another. Only five of them were at all valuable in our struggle against Communism. One of them was a Catholic priest, one was an engineer, one an Air Force Colonel, one a Major from Texas, and one a private citizen who manufactures powdered milk. From this tiny handful of effective men I learned some principles. I am not sure that they are applicable in all countries around the world in which the battle is taking place; but I suspect that they are. The little things we do must be moral acts and they must be done in the real interest of the peoples whose friendship we need— not just in the interest of propaganda. The men I mentioned above, men who have sacrificed and labored here, are not romantic or sentimental. They are tough and they are hard. But they agree with me that to the extent that our foreign policy is humane and reasonable, it will be successful. To the extent that it is imperialistic and grandiose, it will fail. In any case, I am now prepared to ask you in all humility to allow me to do several things in Sarkhan. If you do not see your way clear to permit these actions, I shall regretfully resign from the Foreign Service. If you are able to grant them, I think there is a better than even chance that I can save Sarkhan from Communism. If I am successful, perhaps my experience will serve as a model. (Lederer and Burdick, 1999, p. 209-210)

উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র সারখানে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত গিলবার্ট ম্যাকহোয়াইটের উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা লেখকদ্বয় যেন তাদের পর্যবেক্ষণকেই লিখিত রূপ দিয়েছেন। তাঁরা নিঃসন্দেহে এশিয়ায় আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিগত ব্যর্থতার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন, তবে সমাধান প্রয়োগে তাঁদেরকে উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যর্থ বলতে হবে এই কারণে যে, এশীয়দের মূল সমস্যাটাই তাঁরা ধরতে পারেনি। এছাড়া তাঁদের উদ্দেশ্য যতটা না দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাধারণ জনগণকে সহায়তা করা ছিল, তার থেকেও বেশি ছিল এসব অঞ্চলে কমিউনিজমের বিস্তার রোধ করা তথা রাশিয়ার বিরোধিতা করা:

> If we cannot get Americans overseas who are trained, self-sacrificing, and dedicated, then we will continue losing in Asia. The Russians will win without firing a shot, and the only choice open to us will be to become the aggressor with thermonuclear weapons. (Lederer and Burdick, 1999, p. 211)

গিলবার্ট ম্যাকহোয়াইটের এই উক্তিই আমেরিকার মূল উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করে তোলে। তবে লেখকদ্বয়ের সার্থকতা এখানেই যে, সম্পূর্ণ সম্ভবপর না হলেও সাহিত্যিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই উপন্যাসের মাধ্যমে তাঁরা আমেরিকার তৎকালীন রাজনৈতিক কার্যক্রমজনিত স্থূলতার যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন অনেকটা সরাসরিই:

> All over Asia we have found that the basic American ethic is revered and honored and imitated when possible. We must, while helping Asia toward self-sufficiency, show by example that America is still the America of freedom and hope and knowledge and law. If we succeed, we cannot lose the struggle. (Lederer and Burdick, 1999, p. 224-225)

উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উক্ত বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হয়ত লেখকদ্বয়ের উদ্দেশ্য পুরোপুরি নেতিবাচক ছিল না; কিন্তু এই যে তাঁরা ধরেই নিয়েছেন, এশিয়ানদের কাছে আমেরিকানরা সদা সম্মানের পাত্র, এই বিষয়টিই তো পুরোপুরি ঠিক নয়। উপন্যাসজুড়ে নানাভাবে দেখানো হয়েছে, আমেরিকান কূটনীতিকরা এশিয়ায় এসে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা এশীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সফল হয় না। অর্থাৎ, উপন্যাসে ঘুরেফিরে যোগাযোগ দক্ষতাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এমনকি এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের শেষের দিকে 'কল্পিত সংলাপ' অংশে নিজেদের বক্তব্যকে জোরদার করতে ঔপন্যাসিকদ্বয় বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের সমাবেশ ঘটিয়েছেন:

> In his masterful analysis of the Foreign Service, John Osborne states that the most important element in a good Foreign Service officer is "the faculty of communication." Yet, as James Reston reported in the New York Times of March 18, 1958, "fifty percent of the entire Foreign Service officer corps do not have a speaking knowledge of any foreign language. Seventy percent of the new men coming into the Foreign Service are in the same state." (Lederer and Burdick, 1999, p. 215)

আমরা ধরে নেই, কমিউনিজমের বিস্তার রোধের পাশাপাশি লেখকদ্বয় হয়তো সত্যিই চেয়েছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষদের সহায়তা করতে। তাই ভাষাশিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করতে জোর দেওয়া হয়েছে বারবার। তবুও এশীয়দের আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পেছনে তাঁদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা সম্ভব:

> The authors of this book gathered statements from native economists of what projects were "most urgently needed" in various Asian countries. These included improvement of chicken and pig breeding, small pumps which did not need expensive replacement parts, knowledge on commercial fishing, canning of food, improvement of seeds, small village-size papermaking plants (illiteracy in many countries is perpetrated by the fact that no one can afford paper), sanitary use of night-soil, and the development of small industries. These are the projects which would not only make friends, while costing little, but are also prerequisite to industrialization and economic independence for Asia. (Lederer and Burdick, 1999, p. 221-222)

এটা বোঝা যায়, এশীয়দের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন বলেই উপন্যাসটি লেখার আগে তাঁরা এতটা গবেষণা করেছেন। উপন্যাসে আলোচিত অঞ্চলসমূহে কর্মরত আমেরিকান কূটনীতিকদের ‘আমেরিকান’ জীবনযাত্রা ছেড়ে আঞ্চলিকদের মতো হতে পরামর্শ দিয়েছেন ঔপন্যাসিকদ্বয়। তবে এশিয়ানদের মতো হওয়ার অভিপ্রায়ে যা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সেটি প্রায় ‘কাক হয়ে ময়ূরের পেখম পরা’র প্রবাদটির মতোই অযৌক্তিক। উপর্যুক্ত বক্তব্যটি বিশ্লেষণেই এটি বুঝতে পারি। কারণ সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত এশিয়ান দেশগুলোর মানুষের তখন বড় আকারের শিল্প ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আগে প্রয়োজন ছিল দৈনন্দিন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি।

উক্ত উপন্যাসে আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির সবচাইতে বড়ো যে ব্যর্থতা চিহ্নিত করা হয়েছে, তা হলো আমেরিকার কূটনীতিকরা বিভিন্ন দেশে গিয়েও নিজেদের ‘আমেরিকান’ ভাব বজায় রাখে। অর্থাৎ লেখকদ্বয় মনেই করছেন, আমেরিকানরা জাতিগতভাবে শ্রেষ্ঠ আর এই শ্রেষ্ঠত্বের ভাব পরিহার করতে হবে এশীয়দের সঙ্গে মেলামেশার সময়। তাই ফাদার ফিনিয়ান, জন কলভিন কিংবা হোমার অ্যাটকিনসের মতো মানুষগুলোকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিনিধিত্বশীল আমেরিকানদের আদর্শ হিসেবে ধরা হয়েছে। তবে উপন্যাসের এই চরিত্রগুলোকে নির্মাণে লেখকদ্বয় যে অবয়ব বেছে নিয়েছেন, তা যেন তাঁদের কথিত কল্পিতরাষ্ট্রের মতোই কল্পনাপ্রসূত। চরিত্রগুলোর কার্যকলাপ, সংলাপ এবং উপন্যাসের বক্তব্যের মধ্য দিয়েই এটি বোঝা যায়। উপন্যাসের এক পর্যায়ে, হোমার অ্যাটকিনস যখন গিলবার্ট ম্যাকহোয়াইটের আমন্ত্রণে সারখানের একটি গ্রামে এসে সেই গ্রামের হেডম্যানের সঙ্গে তার নতুন উদ্ভাবিত সেচ যন্ত্রের বর্ণনা দিচ্ছিল এবং কূটনীতিক কৌশলের অংশ হিসেবে হেডম্যানকে অনুরোধ করেছিল তার সঙ্গে একজন সারখানিজকে কাজ করতে দিতে, তখন আমরা উপন্যাসের পটভূমিতে আদর্শ ‘কদর্য এশীয়’ রূপে জিপো নামক চরিত্রের আবির্ভাব দেখি:

> Jeepo looked like a craftsman. His fingernails were as dirty as Atkins', and his hands were also covered with dozens of little scars. Jeepo looked back steadily at Atkins without humility or apology, and Atkins felt that in the mechanic's world of bolts and nuts, pistons and leathers, and good black grease he and Jeepo would understand one another. And Jeepo was ugly. He was ugly in a rowdy, bruised, carefree way that pleased Atkins. The two men smiled at one another. (Lederer and Burdick, 1999, p. 169-170)

এই যে, প্রাচ্যকে দেখার পাশ্চাত্যের চিরায়ত অবমাননাকর ভঙ্গি, যেখানে প্রাচ্যের লোকেরা সবসময়ই অসুন্দর, সেই ভঙ্গিকে আপন করে নিয়েছিল বলেই হোমার অ্যাটকিন এবং তার স্ত্রী এমা সারখানে জনপ্রিয় হতে পেরেছিল, এমনটাই মনে করেছিলেন লেখকদ্বয়। এছাড়া, তাঁরা এটাও ধরে নিয়েছিলেন যে, এরকম ‘কদর্য’ হতে পারলেই বোধহয় এশীয়দের মনে স্থান দখল করা যাবে:

> This American is different from other white men. He knows how to work with his hands. He built this machine with his own fingers and his own brain. You people do not understand such things. But men that work with their hands and muscles understand one another. Regardless of what you say, I will enter into business with this man if he will have me. (Lederer and Burdick, 1999, p. 174)

জিপো কথিত এই উক্তিটি শুনেই মনে হয়, এটা কতোটা আরোপিত! কারণ ইতিহাস সাক্ষী, এশিয়ার সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর সহজ-সরল গ্রামীণ মানুষেরা নিজেদের তিনবেলা আহার জোটানোর কাজেই এত ব্যস্ত থাকত যে, এভাবে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আমেরিকানদের ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য বা ইচ্ছে কোনোটাই তাদের ছিল না।

এদিকে যদিও লেখকদ্বয় শিক্ষিত ও শহুরে এশীয়দের দৃষ্টি দিয়ে আমেরিকানদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করাতে সমর্থ হয়েছিলেন উপন্যাসে, কিন্তু সেটার মূল কারণও ছিল কমিউনজমের বিরোধিতা করা। তাই একজন এশীয় সাংবাদিক উ মং স্যুই যখন আমেরিকা ও রাশিয়ার তুলনা করেন, সেটিও যেন হয়ে ওঠে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিজাত:

> Poor America. It took the British a hundred years to lose their prestige in Asia. America has managed to lose hers in ten years. And there was no need for it. In fact, she could get it all back in two years, if she wanted to. (Lederer and Burdick, 1999, p. 108)

অথচ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক শ্রেণির সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী ছাড়া অধিকাংশ মানুষই কিন্তু তখন বিশ্ব রাজনীতি কিংবা পুঁজিবাদ-সমাজতন্ত্রের লড়াই নিয়ে চিন্তাই করত না। হতে পারে, এশিয়ার দেশগুলোর মোট জনসংখ্যার দশভাগের মধ্যে হয়তো একভাগ ছিল বৈশ্বিক হালচাল নিয়ে সচেতন, তাই তারা সেই ধারায় নিজ নিজ দেশের উন্নতি ও প্রগতি চাইত। কিন্তু লেখকদের বর্ণনায় আমরা সচেতন এশীয়দের যে উপলব্ধি দেখি, তাও উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টি দিয়ে খারিজ করে দেওয়া যায়:

> And yet, I believe firmly that the Americans could drive the Communists out of Asia in a few years if you really tried and were willing to live life out here on our level. (Lederer and Burdick, 1999, p. 115)

ঔপন্যাসিকদ্বয়ের এমন পর্যবেক্ষণের উত্তর দিতে গিয়ে বলা যায়, এশীয় দেশগুলো থেকে কমিউনিস্ট প্রভাব কমবে এবং আমেরিকার প্রভাব বাড়বে, তা আমেরিকান দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করলে সেখানে গলদ মিলবেই। তাছাড়া উপন্যাসে প্রতিফলিত চিন্তাধারায়, এশীয়দের সহায়তা করার চাইতে এশিয়া থেকে কমিউনিস্ট প্রভাব সরানোই বেশি প্রতিফলিত হয়েছিল বলে উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য এশিয়া-বান্ধব হয়ে ওঠেনি মোটেই। এই প্রেক্ষাপটে রাশিয়ান কূটনীতিক লুইজ ক্রুপিটজিনের ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা যায়। সারখানে দুর্ভিক্ষ চলাকালে খাদ্যদ্রব্য সহায়তা নিয়েও আমেরিকা ও রাশিয়ানদের দ্বন্দ্বে ক্রুপিটজিনের কৌশলে আমেরিকার পরাস্ত হওয়ার ঘটনাটি উপন্যাসে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা অপেক্ষা বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। এছাড়া ফাদার ফিনিয়ানের ধর্ম প্রচারের ঘটনার আড়ালে কমিউনিস্ট বিরোধী সক্রিয় ভূমিকাও ঔপন্যাসিকদ্বয়ের উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

পাশাপাশি যদি উপন্যাসের শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে কিছু ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়, তাহলে নিরপেক্ষভাবে এটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব যে, নিজেদের নব্য সাম্রাজ্যবাদী নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে লেখা এই উপন্যাসে ইউজিন বারডিক ও উইলিয়াম জে. লেডারার কীভাবে কিছুটা জেনে এবং অনেকটাই অজ্ঞাতসারে এশীয়দের নানাভাবে অপদস্থ করে গেছেন। যেমন, আমেরিকান কূটনীতিক লুইস সিয়ারস সারখানে এসে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন কারণ তিনি 'কালো'দের

সঙ্গে কাজ করতে পারেন না। আবার পাউডার দুধের প্রচারক জন কলভিনের সঙ্গে সারখানিজ ডিয়ংয়ের লড়াইয়ে নারীদের দ্বারা কলভিনকে দুর্নাম করানোর অভিসন্ধি দেখানো হয়েছে। এও এশীয়দের জন্য অবমাননাকর। এদিকে উপন্যাসের একটি চরিত্র *সেটকিয়া ডেইলি হেরাল্ডের* সাংবাদিক রুথ জ্যোতির বর্ণনায় উঠে এসেছে, আমেরিকার সংবাদপত্রগুলোতে সত্তর শতাংশেরও বেশি জায়গাজুড়ে কমিকস এবং বিজ্ঞাপন ঠাঁই পেলেও এশিয়ান কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয় না। আমেরিকান অ্যাম্বাসিতে কর্ম-সহযোগী হিসেবে কাজ করা দুজন এশিয়ান ডোনাল্ড ও রজারকে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করা হয় 'কমিউনিস্ট' সন্দেহে। কিংবা জর্জ সুইফট এবং ম্যারি ম্যাকিনটোশের বর্ণনায় ব্যঙ্গচ্ছলে এশীয়দের জ্যোতির্বিদ্যাপ্রীতি উঠে আসে। এই ঘটনাগুলো কিন্তু প্রাচ্যকে সহযোগিতা করার নামে হেয় প্রতিপন্ন করা।

২.২

সারখানে 'আমেরিকায়ন' প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গিলবার্ট ম্যাকহোয়াইটের ফিলিপাইন ও ভিয়েতনাম ভ্রমণ, সেখানে ফিলিপাইনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী র‍্যামন ম্যাগসেসাই, আমেরিকান কর্নেল হিলানডেন, মেজর জেমস (টেক্স) ওলচেক এবং ফরাসি মেজর মনেটের সঙ্গে সাক্ষাতে ঐ দেশসমূহের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার যে চিত্র পাওয়া যায়, সেটিও যতটা না সত্যভাষণ, তার থেকেও বেশি লেখকদ্বয়ের আত্ম-বিশ্লেষণ:

> The simple fact is, Mr. Ambassador, that average Americans, in their natural state, if you will excuse the phrase, are the best ambassadors a country can have," Magsaysay said. "They are not suspicious, they are eager to share their skills, they are generous. But something happens to most Americans when they go abroad. Many of them are not average . . . they are second-raters. Many of them, against their own judgment, feel that they must live up to their commissaries and big cars and cocktail parties. But get an unaffected American, sir, and you have an asset. And if you get one, treasure him—keep him out of the cocktail circuit, away from bureaucrats, and let him work in his own way. (Lederer and Burdick, 1999, p. 78)

র‍্যামন ম্যাগসেসাইয়ের এই উক্তি সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন নয়। তাছাড়া ভিয়েতনামের ফরাসি উপনিবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার পেছনে ম্যাকহোয়াইট যেভাবে মাও সে তুংয়ের ভূমিকা তথা কমিউনিজমকে সরাসরি দায়ী করেছেন, লেনিন, চৌ এন লাই, মার্কস এবং অ্যাঙ্গেলসের কথা তুলে ধরেছেন, তা একটি রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে উপন্যাসটির সার্থকতাকে ম্লান করে দিয়েছে কিছুটা হলেও:

> Mao is a clever man. I've read his political things. He's a Communist to his fingertips, and he's also a shrewd student of men. The kind of fight he made in China may have become the model by which all Asian Communists fight. (Lederer and Burdick, 1999, p. 94)

তবে এই উপন্যাসের কিছু কিছু বর্ণনায় ঔপন্যাসিকদ্বয় আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির তীর্যক ব্যবচ্ছেদে সফল হয়েছেন। এছাড়া ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে ঐ সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার অবস্থা আরও নড়বড়ে হয়ে উঠেছিল বলে লেখকদ্বয় উপন্যাসে যেভাবে বর্ণনা

দিয়েছেন, তা-ও অনেকটা সত্য। কম্বোডিয়ায় বসবাসকারী আমেরিকান টমাস এলমার নক্সের (টম নক্স) প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে বোঝা যায়। টম নক্স যখন স্থানীয়দের জীবনমানে পরিবর্তন আনতে মুরগি ও মুরগির ডিমের ব্যাপক উৎপাদন শুরু করে, সেটি আমেরিকা ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ায় তারা সম্মিলিতভাবে টম নক্সকে পথভ্রষ্ট করে যেন আমেরিকায় ফিরে গিয়ে সে কম্বোডিয়ায় আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতির সমালোচনা না করতে পারে।

২.৩

দ্য আগলি আমেরিকান উপন্যাসে বারবারই উঠে এসেছে, কীভাবে আমেরিকানরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বড়ো বড়ো রাস্তাঘাট, কলকারখানা নির্মাণসহ আড়ম্বরপূর্ণ নানা কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়ে বারবার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। এমনকি সর্বাধিক তৎপরতা সত্ত্বেও আমেরিকা অসফল হয় হংকংয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এশিয়ার সদ্য স্বাধীন দেশগুলোর সঙ্গে অস্ত্রচুক্তি করতে। উপন্যাসে দেখানো এই বাস্তবতাগুলো ঐতিহাসিকভাবে অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রধান সমস্যা লেখকদ্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাঁরা উপন্যাসে উল্লেখিত দেশসমূহ এবং কল্পিত রাষ্ট্র সারখানে আমেরিকার কূটনৈতিক ব্যর্থতার পেছনে কখনও প্রত্যক্ষ এবং কখনও পরোক্ষভাবে দায়ী করেছেন কমিউনিজমের বিস্তারকে। কিন্তু এটি সর্বাংশ সত্য নয়, কথাটি নানাভাবে প্রমাণিত। আর লেখকদ্বয়ও সেই সত্যটি সম্পর্কে সজাগ ছিলেন অল্পমাত্রায়। তাই উপন্যাসের চরিত্র মার্কিন সিনেটর জোনাথন ব্রাউনের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সফরের অসারতার চিত্র উপন্যাসে ফুটে ওঠে। ইউজিন বারডিক এবং উইলিয়াম জে. লেডেরার দেখিয়েছেন, আর্থার আলেকজান্ডার গ্রে, স্যালি ভিনসেন্ট, মেজর আর্নেস্ট ক্র্যাভাথ এবং ড. হ্যানস ব্যারের মতো স্বার্থান্বেষী একচক্ষু আমেরিকান ও ফরাসি কূটনীতিকদের কারণে কীভাবে আমেরিকার পররাষ্ট্রকৌশল প্রণেতারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষদের প্রকৃত মনোভাব জানতে ব্যর্থ হয়। জোনাথন ব্রাউন ভাষাজনিত দুর্বোধ্যতার কারণে তার ভ্রমণে শুধু সেসবই দেখতে বা শুনতে বাধ্য হয়, যা উল্লেখিত আমেরিকান ও ফরাসি কূটনীতিক এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যরা তাকে দেখায় এবং শোনায়। বিভিন্ন স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলেও, ব্রাউন ইংরেজিতে কেবল তার জন্য 'রূপান্তরিত' উত্তরটিই শুনতে পায়। ভিয়েতনামের একজন সাধারণ নারী তাদের প্রকৃত অবস্থার কথা জানালেও, সেই কথার যে সম্পূর্ণ উল্টো রূপটি ড. বারে ব্রাউনকে অনুবাদ করে বলে তা এরকম:

> Senator, she says it's safer in the city. She says that the French will take care of her while the Communists would probably slaughter her. She says she would rather leave the Delta forever than live there under Communism," Dr. Barre said. What the woman had actually said was that the French and the Communists were both dogs. The Communists had cruelly slaughtered her eldest son six months before. The French, just as cruelly, had burned down her hut to open a firing lane through her village. Then, she had commented bitterly, the French had abandoned the village without even fighting. She was going to Hanoi because there was food there and there was also the promise of shelter. It was that simple. (Lederer and Burdick, 1999, p. 203)

সুতরাং, সিনেটর ব্রাউন যখন আমেরিকায় ফিরে গিয়ে তার দেখা অসম্পূর্ণ ও তাকে দেখানো অসত্য অবস্থার বর্ণনা করে, আরেকজন সিনেটর করোনার সঙ্গে তার বক্তব্য সাংঘর্ষিক হয়ে ওঠে। ফলে সিনেটর করোনা, তার কাছে থাকা গিলবার্ট ম্যাকহোয়াইটের পাঠানো গোপন নথিতে দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আমেরিকার প্রকৃত অবস্থা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা সিনেটে পাঠ করে শোনালে সেটির প্রতিক্রিয়ায় ম্যাকহোয়াইটকে শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এই উপন্যাসে কূটনীতিক গিলবার্ট ম্যাকহোয়াইট যেন ঔপন্যাসিকদ্বয়েরই প্রতিনিধি। তাই ম্যাকহোয়াইটের উদ্দেশ্য হয়তো সঠিক ছিল, কিন্তু এশীয়দের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকায়, উপন্যাসে তার চরিত্রটির পরিণতিও ইতিবাচক হয়ে ওঠেনি। যদিও ঔপন্যাসিকদ্বয় তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিতে আমেরিকানদের শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রমাণ করতে কোনো তৎপরতাই বাদ রাখেননি উপন্যাসে। তাই সারখানিজদের সহযোগিতার প্রসঙ্গে 'কদর্য' আমেরিকানের প্রতিনিধি হিসেবে হোমার অ্যাটকিনের পাশাপাশি তার স্ত্রী এমার ভূমিকাও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসে এমার আবিষ্কৃত লম্বা হাতলওয়ালা ঝাড়ু সারখানিজদের মাজা বাঁকা হওয়া যেভাবে প্রতিরোধ করেছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি মূলত ইঙ্গিতধর্মী পরিচর্যায় আমেরিকানদের সফলতা প্রমাণেরই চেষ্টা। তাই আমেরিকায় হোমার অ্যাটকিন এবং তার স্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে সারখানের একটি গ্রামের হেডম্যান যেভাবে তাদের প্রশংসা করেছে, তার মাধ্যমে যুগ্ম-বৈপরীত্যজাত শ্রেষ্ঠত্বের প্রচলিত পাশ্চাত্য বয়ানই যেন ধ্বনিত হয়:

> This is a small thing, I know, but for our people it is an important thing. I know you are not of our religion, wife of the engineer, but perhaps you will be pleased to know that on the outskirts of the village we have constructed a small shrine in your memory. It is a simple affair; at the foot of the altar are these words: "In memory of the woman who unbent the backs of our people." And in front of the shrine there is a stack of the old short reeds which we used to use. (Lederer and Burdick, 1999, p. 184-185)

৩

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লেখকসত্তা গড়ে উঠেছিল নিবিড় বিশ্ববীক্ষণ এবং স্বদেশচিন্তার সমন্বয়ে। ফলে পুরো বিশ্বের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সম্পর্কে তিনি যতটা সচেতন ছিলেন, ঠিক ততটাই প্রাসঙ্গিক ছিল তাঁর সৃষ্টিগুলো। তাই বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার যে ফল্গুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, সেই স্রোত বাংলাদেশের সাহিত্যেও প্রবাহিত করাতে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। সেই ধারাবাহিকতায় *দ্য আগলি এশিয়ান* উপন্যাসটি একই সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক:

> দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে উপনিবেশবাদের প্রত্যক্ষ শাসনের অবসান ঘটলেও নব্য উপনিবেশবাদী শোষণশৃঙ্খলে আমরা যে নতুনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে কদর্য এশীয়তে। নব্য উপনিবেশবাদীরা কীভাবে আমাদের রাজনীতি, রাজনীতিবিদ ও শাসকদের নিয়ন্ত্রণ করছে এবং লিপ্ত থাকছে কল্যাণকর রাজনৈতিক চিন্তা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে তারই গুরুত্বপূর্ণ আখ্যান হিসেবে তাৎপর্য অর্জন করেছে এ উপন্যাস। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৭, পৃ. ১৪৩)

সমাজসচেতন লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্; ইউজিন বারডিক ও উইলিয়াম জে. লেডেরারের উপন্যাসটি হয়তো পাঠ করেছিলেন প্রকাশের পরপরই। সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১৫) উল্লেখ করেছেন, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর থেকেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আমৃত্যু ছিলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তাই উত্তর-উপনিবেশবাদী চেতনা দ্বারা তিনি এই

উপন্যাসে *দ্য আগলি আমেরিকানে* বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনারই বিপরীত-ভাষ্য রচনা করেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রাজনীতিসচেতন মানসের প্রতিফলন হিসেবে:

> ১৯৪৭-পূর্বকালে এদেশের শাসক-শোষক ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা দ্বারা পুষ্ট এদেশীয় জমিদার বুর্জোয়া ও প্রশাসনিক মধ্যবিত্ত যারা সবাই ছিল বাংলার উপনিবেশিত দরিদ্র পশ্চাৎপদ মুসলমানদের বিপক্ষে এবং তাদের দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। ১৯৪৭-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের উপনিবেশিত এই দরিদ্র-পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর শত্রু হয়ে দাঁড়াল পাকিস্তানি শাসকশক্তি এবং তাদের সমর্থনকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। ওয়ালীউল্লাহ্ যেহেতু বরাবর এদেশের নিম্নবর্গীয় শোসিত-বঞ্চিতদের কল্যাণকামনায় নিবেদিত সেহেতু এ পর্বেও তিনি উপনিবেশবাদের বিপক্ষে তাঁর অবস্থানকে অব্যাহত রেখেছেন। উপনিবেশবাদের বাহ্যিক পরিচয় ও রূপের পরিবর্তন ঘটলেও অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর সাধিত হয়নি। সুতরাং ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যমানসে বরাবরই অক্ষুণ্ন থেকেছে একটি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর প্রতি সুতীব্র কল্যাণকামনা এবং এই পশ্চৎপদতার জন্য দায়ী উপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ঘৃণা। (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৭, পৃ. ১৩১)

আর এই ঘৃণাই যেন প্রতিবাদী রূপ পেয়েছে *দ্য আগলি এশিয়ান* উপন্যাসে। যার দ্বারা একজন এশীয় হিসেবে তিনি আমেরিকানদের চিরায়ত ভঙ্গি এবং নব্য সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাপ্রসূত 'আমেরিকায়ন' প্রক্রিয়ার তীব্র সমালোচনা করেন। এছাড়া এই উপন্যাসের গঠনকৌশল হিসেবেও বেছে নেওয়া হয়েছে *দ্য আগলি আমেরিকানের* কাঠামোকেই। প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য এর থেকে ভালো পদ্ধতি বোধহয় আর হয় না। উপন্যাসটিতে একটি নামহীন রাষ্ট্রের পটভূমিতে কাহিনির অগ্রসরতা দেখা যায়:

> যদিও তিনি নির্দিষ্ট করে দেশটির নাম উল্লেখ করেননি কারণ তৃতীয় বিশ্বের যেকোনো দেশই এই দেশটির অনুরূপ হতে পারে, তবু তদানীন্তন পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বসংঘাত, সামরিক শাসনের উপস্থিতি, শ্রমিক অসন্তোষ, শোষণ দমন ষড়যন্ত্র ইত্যাদির কাহিনি, সর্বোপরি বাঙালি চরিত্রগুলিই প্রমাণ করে যে এই কাহিনি তখনকার পূর্ব পাকিস্তানেরই। (খালিকুজ্জামান, ২০১৪, পৃ. ২৪২)

পাশাপাশি তিনি দেশীয় সেই শ্রেণিটিরও মুখোশ উন্মোচন করেন, যারা ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারে জাতীয় স্বার্থ নিয়ে ছেলেখেলা করার ঝুঁকি নেয় এবং অন্য রাষ্ট্রকে নাক গলাতে দেয় নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে।

৩.১

প্রথমত, উপন্যাসটি ওয়ালীউল্লাহ্ প্রকাশ করে যেতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, এটি রচনার সময় তিনি আবু শরিয়া নামক ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন সঙ্গত কারণেই। তাছাড়া, এর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের সময় নানা হাত ঘুরে আসায় মূল পাণ্ডুলিপির খুব অল্প কিছু অংশ খোয়াও গিয়েছিল। তাই, উপন্যাসটির রচনাকাল নিয়ে দেখা দিয়েছিল কিছু সংশয়।[৩] কিন্তু, উপন্যাসটির নিবিড় পাঠ এটি প্রমাণ করে, এই উপন্যাসটি অবশ্যই *দ্য আগলি আমেরিকান* পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় লেখা। বিশেষত উপন্যাসে ঘুরেফিরে আমেরিকান পিস কোরের সদস্যদের নানামুখী প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। যা এটি প্রমাণ করে, উপন্যাসটি রচনা হয়েছিল এদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) পিস করপ্স্ তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে শুরু করার পর। এই প্রসঙ্গে পিস করপ্সের (১৯৬১) প্রকাশিত সূত্র[৪]

মতে বলা যায়, তারা তৎকালীন পাকিস্তানে সক্রিয় ছিল ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত। তাই উপন্যাসটি কোনোভাবেই ১৯৬১ সালের আগে রচিত হওয়া সম্ভব নয়। উপন্যাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পিস কর্‌পসের একজন সদস্য সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে:

> মার্কিন তরুণের নাম এন্ড্রু। এ দেশে শিক্ষক, সমাজ-উন্নয়নকর্মী, রাজমিস্ত্রি, ছুতোর, মেকানিক, কৃষিবিদ এবং আরো বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত প্রায় দু শ পিস কোর স্বেচ্ছাসেবীর সে একজন। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৮, পৃ. ৭৬)

দ্য আগলি আমেরিকানে ঔপন্যাসিকদ্বয় নানামুখী 'মহৎ' এবং 'কদর্য' চরিত্রগুলোর মাধ্যমে এশীয়দের সহযোগিতা করতে চাওয়ার যে প্রবণতা দেখিয়েছেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সেসব চরিত্রদের প্রকৃত অভিসন্ধি বর্ণনা করেছেন তাঁর উপন্যাসে প্রায় সেই ধরনেরই কিছু চরিত্র নির্মাণ করে। তাই এই উপন্যাসে জনসন কিংবা অ্যান্ডারসন চরিত্রগুলোকে ইতিবাচকভাবে দেখানো হলেও 'রাজনৈতিক মিশনারি' নামকরণের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে:

> এদিকে অ্যান্ডারসন যেন এ যুগের মিশনারি, রাজনৈতিক মিশনারি। নিজ দেশ থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন পশ্চাৎপদ মানুষজনকে ধর্মান্তরিত করতে নয়, এক নতুন রাজনৈতিক ধারণায় দীক্ষিত করতে-সেই ধারণার নাম গণতন্ত্র। সম্পূর্ণ নতুন একটি শ্রেণী যেন এই অ্যান্ডারসনদের। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৮, পৃ. ৩৭)

উপন্যাসটির মাধ্যমে লেখক ষাটের দশকের প্রারম্ভে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) প্রকৃত অবস্থা কৌশলে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা যদি ঐতিহাসিক দিক বিবেচনা করি, তাহলেও সময় হিসেবে ঐ দশক বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম উত্তাল সময়। যে সময়ের শ্লোগানধর্মিতার স্রোত কিছুটা অন্যভাবে এই উপন্যাসে বয়ে চলেছে। আবার যদি উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করি, তাহলেও উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য অনস্বীকার্য:

> সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও নব্য-উপনিবেশবাদের উপর্যুক্ত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পৃথিবীর দেশ-দেশে ক্রমে দেখা দেয় প্রবল প্রতিরোধ চেতনা। উপনিবেশীর সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এই প্রতিরোধ চেতনারই তাত্ত্বিক নাম Post-colonialism বা উত্তর-উপনিবেশবাদ। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো উপনিবেশিতদের ঐতিহ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি ধ্বংসের যেসব প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে, সেগুলো চিহ্নিত করা এবং নিজেদের আধিপত্যমুক্ত করার মানসে জ্ঞানচর্চার পথ-নির্মাণ করা এবং সজ্ঞচেতনায় জাগ্রত হওয়ারই তাত্ত্বিক প্রণোদনা ও উপায় হল উত্তর-উপনিবেশবাদ। (বিশ্বজিৎ, ২০১৩, পৃ. ১৩)

এই বিবেচনায় বলা যায়, *দ্য আগলি এশিয়ান* উপন্যাসটি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সকল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লেখকের প্রকৃষ্ট প্রতিবাদ। আর উপন্যাসটি রচনার মাধ্যমেই যেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সমসাময়িক অন্যান্য আলোচিত উত্তর-ঔপনিবেশিক ধারার লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

৩.২

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে উত্তর-ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা বেগবান হয়েছে ষাটের দশক থেকে। পাশ্চাত্যের প্রচলিত চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করে, তাদের স্বার্থান্বেষী মনোভাবকে তুলে আনতে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশে দেশে যখন তোলপাড় চলছিল, তখন আমাদের সাহিত্যেও সেই চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এই উপন্যাসটি রচনা

করেছিলেন। এছাড়া উপন্যাসটি একটি বিশেষ দেশের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হলেও, এখানে তিনি যে দর্শন প্রতিফলিত করেছেন, তা ঐ সময়ে স্বাধীন হওয়া তৃতীয় বিশ্বের যেকোনো দেশের জন্যই প্রযোজ্য ছিল। তাই উত্তর-ঔপনিবেশিক ধারার অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক থেকে লেখা এই উপন্যাসটির নামও উচ্চারিত হওয়ার দাবি রাখে:

> তৃতীয় বিশ্বের একজন ভাবুক এবং উপন্যাস-নির্মাতা রূপে এই উপন্যাসে আমরা তাকে উপস্থিত হতে দেখি; সমগ্র বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব, অনন্য। আর তৃতীয় বিশ্বের কথা তুলে আনায় এটি হয়ে উঠেছে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধিত্বমূলক একটি উপন্যাস, পড়তে পড়তে মনে হয় এত এই সময়ের কথা, তৃতীয় বিশ্বের রাজনৈতিক ডিসকোর্স। (মাসুদুজ্জামান, ২০১৪, পৃ. ২৬৪)

একটি সফল রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে উপন্যাসটিকে বিশ্লেষণ করার শুরুতেই উপন্যাসটির শেষে *একজন এশীয়র সংলাপ* নামক অংশে একজন মার্কিন নাগরিকের সঙ্গে উপন্যাসের কল্পিত দেশটির সাধারণ একজন কৃষকের সংলাপ লক্ষ করা যায়:

> মার্কিনি : আমি চাই তোমরা ভালো থাকো, কারণ আমি চাই না কমিউনিস্টরা তোমাদের নাগাল পাক।
>
> কৃষক : কমিউনিস্ট আবার কারা?
>
> মার্কিনি : ওরা খারাপ লোক। মানুষের জমি কেড়ে নেয়।
>
> কৃষক : আমার কাছ থেকে তো কাড়তে পারবে না। আমার জমি নেই।
>
> মার্কিনি : কোনোদিন জমি হলে তখন কেড়ে নেবে। একদিন তো তোমার জমি হবেই।
>
> কৃষক : ওরা কি আমাদের জোতদারদের চেয়েও খারাপ?
>
> মার্কিনি : (চারপাশে তাকিয়ে) তার চেয়েও জঘন্য। ওরা মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাও কেড়ে নেয়। ওরা মানুষকে দাস বানায়।
>
> কৃষক : আমার ছেলে-মেয়েগুলিকে ওরা খেতেটেতে দেবে না?
>
> মার্কিনি : (বিরক্ত ভঙ্গিতে) খাওয়া-দাওয়াই সবকিছু নয়। মানুষের আরো চাহিদা আছে, তাই না? (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৮, পৃ. ১৭১)

ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন, মার্কিন নাগরিক কিন্তু কৃষকের ভাষায় কথা বলেছে, কিন্তু তবুও তার কথার মর্মার্থ বুঝতে কৃষক ব্যর্থ। সুতরাং, *দ্য আগলি আমেরিকান* উপন্যাসে যে বারবার বলা হয়েছে, এশিয়ার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হলে তথা তাদের ভাষায় কথা বলতে পারলেই এশীয়রা আমেরিকানদের নিজেদের হৃদয়ে স্থান দেবে, বিষয়টি ঠিক নয়। এই সত্যটিই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যৌক্তিকভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে: "এশিয়ার বিপুল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যর্থ হওয়ার কারণ ভাষার প্রতিবন্ধকতা নয় বরং নিঃসন্দেহে তাদের বক্তব্য; তাদের এ লড়াইয়ের উদ্দেশ্য বুঝতে দরিদ্র এশীয়াবাসী ব্যর্থ।" (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৮, পৃ. ১৭১)

দ্য আগলি আমেরিকানে ঔপন্যাসিকদ্বয়ের বিভিন্ন বিশ্লেষণে কারণে-অকারণে এটিই ফুটে উঠেছে যে, তাদের মূল লড়াই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। আর সেটির কাউন্টার ডিসকোর্স হিসেবে ওয়ালীউল্লাহও তাঁর উপন্যাসে নানাভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, এশীয়দের মূল সমস্যা কমিউনিজমের বিরোধিতা নয়। কিন্তু তাই বলে কমিউনিজমের প্রসার যে তাদের লক্ষ্য; সেটিও সার্বিকভাবে সত্য নয়। বরং এশিয়ার বিপুল সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থান এই ধরনের তত্ত্বীয় রাজনৈতিক

প্রেক্ষাপট থেকে যোজন যোজন দূরে। তাই নিজেদের দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসারিত স্বার্থান্বেষী সহযোগিতার হাতকে পুরো উপন্যাসজুড়েই তিনি প্রতিহত করেছেন উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান চরিত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আহসানসহ অন্যান্য শিক্ষিত ও সচেতন চরিত্রগুলোর মাধ্যমে:

> তিনি বলেন, 'সহযোগিতা কীসের জন্য? এখানে সামান্য অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে ব্যস্ত লাখ লাখ মানুষের কাছে আপনাদের অর্থনৈতিক মতাদর্শের কানাকড়ি অর্থও নেই। এদের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য সহযোগিতা? আমাদের মানুষজনের একটিই ভয়: খেতে না পেয়ে মৃত্যু। আপনাকে বলি, এক দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র আমাদের আলাদা করে রেখেছে। আপনারা চান আমাদের সামন্তবাদীদের দু-একজনকে পুঁজিবাদী বানাতে। কিন্তু আমাদের হতদরিদ্র লোকজনের দুর্দশা আরো না বাড়িয়ে তা কি আদৌ করা সম্ভব? তাদের নিয়ে তো আপনাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আপনারা শুধু চান এমন একটি শ্রেণী তৈরি করতে যারা আপনাদের বুঝতে পারবে, সমর্থন করবে। যারা আপনাদের মতাদর্শে বিশ্বাস করে তাদের শক্তিশালী করাই আপনাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তারপর আপনাদের কোনো ক্ষতি না করে থাকলেও আমরা আপনাদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করি, আমাদের যা নেই তা রক্ষা করার জন্য জীবন বিসর্জন দেই। (ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৮, পৃ. ৪২)

জনসনকে বলা আহসানের এই কথার মাধ্যমে আরও একটি গূঢ় সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এশিয়ার দেশগুলোর তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যেটিও আলোচিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়েই এশিয়া বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো জড়িয়ে যায় নব্য ঔপনিবেশিক চক্রান্তে, এটি আলোচনার শুরুতেই বলা হয়েছে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রে কেবল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো বাহ্যিক শক্তি জড়িত ছিল, তা নয়। বরং দেশগুলোর অভ্যন্তরে সক্রিয় অনেক রাজনৈতিক শক্তিও 'জাতীয়তাবাদে'র নামে নিজেদের স্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত ছিল। ফলে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাশীল দলগুলোর যৌথ দুরভিসন্ধিতে নাস্তানাবুদ হয়েছে সাধারণ মানুষ। আর তাই সেই সময়ে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়ার বদলে আরও অবনতি ঘটছিল ক্রমশ।

৩.৩

উপন্যাসের এক পর্যায়ে দেখা যায়, পিস কর্পসের সদস্য এন্ড্রু উপন্যাসে বর্ণিত দেশটির একজন জেলা কর্মকর্তার কাছে নিজেদের কাজের সাফাই গায়:

> এ দেশে আমরা অনেক কাজ করছি। আমরা কঠোর পরিশ্রম করি, আপনাদের জনগণকে সত্যিই সাহায্য করতে চাই। কমিউনিস্টরা আমাদের পছন্দ করে না, আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারলে তারা খুশি, ঠিক আছে। কিন্তু আপনার কি মনে হয়, মানুষজন আমাদের কাজকর্মে সত্যি খুশি? (ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৮, পৃ. ৮০)

এই বক্তব্যের পেছনের সত্যতা ঔপন্যাসিক অস্বীকার করেননি। কিন্তু তিনি এই সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ তাঁর মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সাহায্যে লাভবান হচ্ছে কেবল সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণি। এই প্রসঙ্গে ঐ দেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হথর্নের উন্নয়ন পরিকল্পনাটি একনজর দেখে নেওয়া যায়:

> অর্থনীতির ক্ষেত্রে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলি হলো: দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার জন্য দুটি বৃহৎ শস্যাগার, বিনামূল্যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বিতরণ, একটি সার কারখানা ও একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হাসপাতালে ক্রান্তীয় অঞ্চলে রোগশোক মোকাবেলার উপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ গবেষণাগার নিয়ে একটি পৃথক শাখা প্রতিষ্ঠা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ বছর তরুণ-তরুণীদের তিনটি পৃথক দলকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হবে, আরো এক শত লোককে দেওয়া হবে ফেলোশিপ, একটি মার্কিন ব্যালে দল এ দেশে সফর করবে, স্থানীয় সাহিত্য বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন থাকছে-আর এ সবকিছুর খরচ বহন করবে আমেরিকার সুপরিচিত একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৮, পৃ. ১০৪)

পরিকল্পনাটি শুনতে যতটা আকর্ষণীয়, ঐ সময়ের বাস্তবতায় উল্লিখিত দেশটির জনগণের জন্য সেটি ছিল ততটাই অনুপযোগী। একে তো দেশটি মাত্রই দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে, তারপর আবার নিজেদের রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার রেষারেষিতেও তাদের অবস্থা ছিল বিপর্যস্ত। এরকম ভঙ্গুর অবস্থায় কৃত্রিম উন্নয়নের যে খোলস তাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল, সেটি তাদের মানসিক শান্তির অন্তরায় ছিল। কারণ ঐসব দেশসমূহের সাধারণ মানুষদের স্বস্তির জায়গা মূলত দুবেলা পেটভরে দুমুঠো ভাত খেতে পারার নিশ্চয়তা। মার্কিন নাগরিক ও কৃষকের কল্পিত সংলাপেও আমরা কিন্তু কৃষকের কণ্ঠে সেই সুর প্রতিধ্বনিত হতে দেখি। তবে জনগণের চাহিদা পূরণের সংকল্প করে, জনগণের সমর্থনে ক্ষমতায় এসে, দেশটির প্রধান রাজনৈতিক দলকেও সব প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে নব্য ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখি উপন্যাসটিতে। *দ্য আগলি আমেরিকান* উপন্যাসে আমরা যেমন সমাজসত্য সম্পর্কে সচেতন কিছু মার্কিনির পরিচয় পাই, এই উপন্যাসটিও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই আমেরিকান পত্রিকা *অপিনিয়নের* প্রতিনিধি যখন দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটিতে নিযুক্ত আমেরিকান কূটনৈতিক স্যামুয়েল কনডনের কাছে দেশটির রাজনৈতিক হালচালের প্রকৃত রূপটি উন্মোচন করছিল, সেই বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের দেশীয় ইতিহাসের সেই সময়ের কিছু প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে দেখা যায়:

> দেখতে পাচ্ছি, নির্বাচনের সময় যেসব রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা উসকে দেওয়া হয়েছিল, সেসব পুরোপুরি মরে যায়নি বরং সেসব বাস্তবায়নের জোরদার চেষ্টা চলছে। এসব চেষ্টা ব্যর্থ করতে আপনাদের জাতীয়তাবাদী নেতা আবদুল কাদের শুধু কঠোর ব্যবস্থাই নিতে পারেন। কাতারে কাতারে লোকজন ধরে জেলে পাঠিয়েছেন, কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। আমার মনে হয়, আরেকটু কম নিষ্ঠুর ব্যবস্থা নিলেও চলত। প্রধানমন্ত্রী সংবাদপত্র আর বিরোধী দলেরও কণ্ঠরোধ করেছেন। সরকারপ্রধান হিসেবে এই অল্পসময়ের মধ্যে তিনি প্রমাণ করেছেন, তার পূর্বসূরির চেয়েও তিনি স্বৈরাচারী, অথচ তার পূর্বসূরিকে কেউ জাতীয়তাবাদীই মনে করত না। তাছাড়া তার পূর্বসূরির আমলে আমেরিকা শব্দটির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাভক্তি কিছু ছিল। এখন সেটি ক্রমে একটি নোংরা শব্দে পরিণত হচ্ছে। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৮, পৃ. ৯৬)

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় আসার পূর্বে নির্বাচনী ইশতেহারে নানারকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং ক্ষমতায় আসার পরপরই সেসব বাস্তবায়নের কোনোরূপ চেষ্টা না করেই স্বার্থান্ধে পরিণত হওয়ার যে ইতিহাস, তারও প্রমাণ আলোচ্য বক্তব্যে সুস্পষ্ট। এছাড়া গণতন্ত্রের কেবল তাত্ত্বিক নামটি ধারণ করে, এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বেচ্ছায় অজ্ঞ থাকা এই দলগুলো নিজেদের সমালোচনা শুনতে ভয় পায়। তাই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য দলগুলো বিপরীতগামী ও বিরোধী অন্য যেকোনো দলেরই কণ্ঠরোধ করতে চায়

বিদেশি শক্তির সহায়তায়। আর সেটি করতে গিয়ে যদি নিজেদের সার্বভৌমত্ব বিকিয়েও দিতে হয় কিংবা দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ মানুষদের জানমাল ক্ষতিগ্রস্তও হয়, তবুও তারা একটুও বিচলিত হয় না। এই উপন্যাসেও প্রধানমন্ত্রী আবদুল কাদের, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশ প্রধান, গোয়েন্দা প্রধানসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের চালিকাশক্তি যে শ্রেণি, তাদের এরকম অন্যায় আচরণ পরিলক্ষিত হয়। কোকো নদী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারবিরোধী বক্তব্য দেওয়ায় নিজেদের জোটেরই অন্য শরিক আবদুর রবসহ অন্যান্য নেতাকর্মীদের কারাগারে পাঠানো, *স্বাধীনতা দলের* নেতাকর্মীদের হয়রানি ও হত্যা, সামরিক বাহিনীতে চালানো গুপ্তহত্যার পাশাপাশি ছাত্র ও জনসাধারণের আন্দোলনকে সর্বাংশে প্রতিহত করার চেষ্টা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলমান পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়নকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। নানাভি ও আবদুল কাদেরের মতো রাজনীতিকরা যেমন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের প্রতিনিধিত্ব করে উপন্যাসে, ঠিক তেমনি আহসানের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা শিক্ষিত ও প্রগতিশীল এবং সমাজ ও রাজনীতি সচেতন মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আহসানের মতো এরকম অসংখ্য সাহসী মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণ দেখা যায়। আর উপন্যাসের চরিত্র তিন্নিদের মতো ছাত্রনেতারা ঐ সময়ে অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিল বলেই, উপন্যাসটি লেখার কয়েকবছরের মধ্যেই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্ম নেয়।

> তবে মূল কথাটা হলো জনগণের চরম দারিদ্র্য এবং স্বাধীনতার প্রশ্ন। পশ্চাদপদ দেশগুলো যে মার্কিনিদের মতোই স্বাধীন থাকতে চায় এটা তো সত্য। তারা বৃহৎ শক্তির দানদাক্ষিণ্যে বেঁচে থাকতে অবমাননা বোধ করে। দেশ ও জনগণের এই আত্মসম্মানের প্রশ্নটি ওয়ালীউল্লাহ্‌র চেতনায় ছিল প্রখর। এ সূত্রে তিনি প্রশংসা করেন কিউবার ফিদেল কাস্ত্রোকে যিনি স্পর্ধা দেখিয়েছেন দারিদ্র্য সত্ত্বেও আমেরিকাকে বর্জন করার। (বেগম আকতার, ২০১৪, পৃ. ২৫৩)

উপন্যাসের শেষের দিকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ফিদেল কাস্ত্রোর রাজনৈতিক বিচক্ষণতাকে আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়ে দেখিয়েছেন, কিউবার সাধারণ জনগণও কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের মতোই অবস্থান করতো রাজনীতির মূলমঞ্চ থেকে যোজন যোজন দূরে। তাই কাস্ত্রো পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ের থেকেও বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নয়নে। উপন্যাসে লেখকের প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র আহসানকেও দেখা যায় অনেকাংশেই সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে । তিনি যে বৈশ্বিক পটভূমি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন তা নয়, কিন্তু তার মূল লক্ষ্য ছিল নিজ দেশের সাধারণ মানুষদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীভূত করা:

> বলি, আমি কমিউনিস্ট নই। তবে সেই সঙ্গে আরেকটি কথাও বলি। বলি যে, দুনিয়াকে সাদা ও কালোয় চট করে ভাগ করে ফেলার পক্ষপাতী আমি নই। এ জন্য সমাজতন্ত্র বিষয়ে পড়ালেখা করতে আমার আপত্তি নেই। আমি খুঁজে দেখার চেষ্টা করি সেখানে পশ্চাৎপদ দেশের উপকৃত হওয়ার মতো কিছু আছে কিনা। আমি সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক তত্ত্বের ব্যাপারে অবশ্যই আগ্রহী। (ওয়ালীউল্লাহ্‌, ২০১৮, পৃ. ৪১)

জনসনকে বলা আহসানের এই উক্তি দ্বারা আহসানের মননে উত্তর-ঔপনিবেশিক সত্তার সুস্পষ্ট অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব। যেহেতু উপন্যাসে আহসানকে লেখকেরই প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নেওয়া যায়, তাই তার কণ্ঠে লেখকেরই স্বরের প্রতিধ্বনি শোনা যায় । *দ্য আগলি আমেরিকানে* সারখানে দুর্ভিক্ষকালীন যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ দেখা যায় এই উপন্যাসে। আমেরিকার মদদপুষ্ট ক্ষমতাসীন দল গ্রামগঞ্জে হঠাৎ শুরু হওয়া কৃত্রিম খাদ্যাভাবের

সময়ও নিজেদের দেশের লোকদের কথা চিন্তা না করে 'আমেরিকায়ন' প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নির্বোধের মতো কমিউনিজমের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে:

> চরম খাদ্যাভাবের কারণে জনগণ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে দক্ষিণের এমন কোনো গ্রামে মার্কিন খাদ্যের চালান যাবে, কিন্তু কমিউনিস্টরা সে খাদ্য পুড়িয়ে ফেলবে। এ যে চরম ক্ষুধার্থ মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার শামিল! এমন নিষ্ঠুর কাজ কেন তারা করতে যাবে? ওরা যে কমিউনিস্ট, ওদের কাছে মানুষের জীবন গণ্য নয়। কারণ তারা চায় না জনগণ জানুক আমেরিকা দয়ার্দ্র, সদাশয়, আমেরিকা কাউকে না খেয়ে মরতে দিতে চায় না। এরপর এমন জঘন্য অপকর্মের হোতাদের বিরুদ্ধে সরকারকে একটি পদক্ষেপ তো নিতেই হবে।
>
> এ হলো এক ঢিলে দুই পাখি শিকার। এর ফলে জনমনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগ্রত হবে।
>
> তাছাড়া কমিউনিস্টরা বাদে আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ওইসব স্থানে দ্রুত নতুন করে চালের বস্তা নিয়ে যাওয়া হবে এবং দুর্ভিক্ষকবলিত মানুষের জীবন রক্ষা করা হবে। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৮ : ১৪০)

মার্কিনিদের বন্ধু হতে চেয়ে ক্রমশ দেশীয় জনগণের বিরাগভাজন হয়ে ওঠা প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই পরিকল্পনায়, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক হিসেবে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতার প্রমাণ মেলে। কিন্তু সাধারণ জনগণ নির্বোধ ও নিশ্চুপ থাকে না শেষ পর্যন্ত। তাই এই উপন্যাসের শেষেও আমরা গণবিপ্লবের সূচনা দেখি। ষাটের দশকের ঐতিহাসিক সত্য এটি। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া, রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে গণজোয়ার সৃষ্টি, প্রাণভয় উপেক্ষা করে প্রতিবাদ-সংগ্রামে মুখরিত হওয়া, বিদেশি শক্তির দেশীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা– এসব ছিল তখনকার দিনের প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সুতরাং, সম্পূর্ণরূপে *দ্য আগলি আমেরিকানের* কাউন্টার ডিসকোর্স হিসেবে রচিত হওয়ার মাধ্যমে, উপন্যাসটিতে ওয়ালীউল্লাহ্‌র দ্বিমাত্রিক দর্শন প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথমত, তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং এশিয়ার দেশগুলোর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। তাই তারা যদি সৎভাবেও এশীয়দের সহযোগিতা করতে চায়, সেটির ফলও সুদূরপ্রসারী হবে না।

> বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখানে সম্পদশালী হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। শুধু কুৎসিত শকুনের মতো ক্ষুধার স্থলে তাদের সন্তানের মুখে হাসি ফোটানোর মতো সামর্থ্যটুকু হলেই তাদের চলে।
>
> এ জন্য এশিয়া ও অন্যত্র কোটি কোটি মানুষের প্রধান দুশ্চিন্তা নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্রের হাত থেকে নয়, ক্ষুধা ও অনাহারের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৮ : ১৭২)

দ্বিতীয়ত, আমেরিকার নব্য ঔপনিবেশিক কৌশলের বিরোধিতা করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উপন্যাসটিতে দেখাতে চেয়েছেন, পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনার যে পদ্ধতিসমূহ *দ্য আগলি আমেরিকানে* বর্ণিত হয়েছে, সেটিও পুরোপুরি কার্যকর নয়। এই প্রসঙ্গে ইউজিন বারডিক এবং উইলিয়াম জে. লেডারারের উপন্যাসটির মতো নিজের উপন্যাসের নামকরণেও 'আগলি' *(Ugly)* শব্দটি ব্যবহার করেই তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, হোমার অ্যাটকিনসের মতো দেখতে কদর্য হলেই আমেরিকানরা এশীয়দের আপন হতে পারবে না। আর সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে নাক গলালে আমেরিকান তো বটেই নিজেদের দেশের ষড়যন্ত্রকারী কোনো শক্তিও গণবিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

তাছাড়া এটি আমাদের নিজেদের দেশ নিজেদের সমস্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি আমাদের বন্ধুত্বের প্রস্তাব গ্রহণ করতে না চায়, তারা চলে যেতে পারে। যদি না যায়, আমাদের জনগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্যক্তিস্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাঁবেদারি করা গুটিকয়েক লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব কিছু হাস্যকর ধ্যান-ধারণার কারণে আমাদের জনগণ সম্পূর্ণ দারিদ্র্যে বসবাস করতে পারে না। (ওয়ালীউল্লাহ্, ২০১৮, পৃ. ১৬৫)

আহসানের এই উক্তিই 'কদর্য' এশীয়দের শক্তি ও সক্ষমতা বোঝাতে যথেষ্ট। *দ্য আগলি আমেরিকানে* এশিয়ার লোকজনদের নানাভাবে দুর্বল ও আমেরিকার সহযোগিতা ছাড়া অচল প্রমাণে লেখকদ্বয় যে তৎপরতা দেখিয়েছেন, *দ্য আগলি এশিয়ানে* ঠিক তার পাল্টা জ্ঞানভাষ্য হিসেবে এশীয়দের মানসিক শক্তি ও বিদ্রোহী সত্তার জয়গান গাওয়া হয়েছে।

৪

দ্য আগলি আমেরিকান এবং *দ্য আগলি এশিয়ান*—দুটো উপন্যাসই সফলতর রাজনৈতিক উপন্যাস, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ উপন্যাস দুটি যেমন সমকালকে ধারণ করেছে, ঠিক তেমনই বর্তমানেও সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

> একটি বিশেষ সময়ের সাময়িক নির্মাণ প্রসারিত হয়, বহমান হয় কালে-কালোত্তরে। অন্য দেশ, অন্য সময়ের পাঠকও তাই উপন্যাস-পাঠে তাঁর সময়ের দ্বন্দ্ব-আততি, নিজ সত্তা ও বাস্তবের বিচ্ছিন্নতার সমাধান-দিক-নির্দেশ পেতে পারেন উপন্যাসে, যা একই সঙ্গে সাময়িক ও বহমান। পাঠকের নিজ কনজাংচারে, উপন্যাসটি নতুন অর্থ পায়, নতুন করে জন্মলাভ করে। এই পলিটিকস্ আর রিডিং-এর মধ্য দিয়ে উপন্যাস অর্জন করে এক রাজনৈতিক মাত্রা। (পার্থপ্রতিম, ১৯৯১, পৃ. ১১)

রাজনৈতিক উপন্যাস নিয়ে বলতে গিয়ে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় উপরিউক্ত যে বিশ্লেষণ করেছেন, আমাদের আলোচ্য উপন্যাসদ্বয়ের ক্ষেত্রেও সে কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপন্যাস দুটির তুলনামূলক আলোচনা। তারই ধারাবাহিকতায় বলা যায়, যদিও *দ্য আগলি আমেরিকান* উপন্যাসটি ঔপন্যাসিক ইউজিন বারডিক এবং উইলিয়াম জে. লেডারারের অত্যন্ত সফল সৃষ্টি এবং পাঠকপ্রিয় উপন্যাস, তবে কেবল একপক্ষের দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়েছে বলে রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে উপন্যাসটির সাহিত্যমূল্য কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অপরদিকে জীবদ্দশায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *দ্য আগলি এশিয়ান* উপন্যাসটি প্রকাশ করে যেতে পারেননি বলে, এই উপন্যাসটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব পর্যালোচনা শুরুই হয়েছে অনেক পরে। তবে উপন্যাসের পটভূমি যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে এর স্থান ভিন্নমাত্রায় চিহ্নিত করা সম্ভব। পাশাপাশি এটি বলাও যুক্তিসংগত যে, উত্তর-ঔপনিবেশিক জ্ঞানচর্চার উত্তাল কালপর্বে লিখিত অন্যান্য তাত্ত্বিক আলোচনা ও বহুমাত্রিক সাহিত্যিক উপাদানসমূহের সঙ্গে নানামুখী কার্যকারণ সূত্রে এই উপন্যাসটির নামও একই কাতারে উচ্চারিত হতে পারে।

টীকা

১. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লিখে রেখে যাওয়া ইংরেজি উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে ২০১৩ সালে নিয়াজ জামানের সম্পাদনায়। তবে এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতিগুলো *দ্য আগলি এশিয়ান* উপন্যাসের বাংলা রূপান্তর থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। *কদর্য এশীয়* নামে শিবব্রত বর্মনের করা অনুবাদটি অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারি ২০০৬-এ। উক্ত প্রবন্ধের উদ্ধৃতিগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে ফেব্রুয়ারি ২০১৮-এ প্রকাশিত গ্রন্থটির তৃতীয় মুদ্রণ থেকে ।

২. *দ্য আগলি আমেরিকান* উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কের নরটন (W. W. Norton & Company) প্রকাশনা সংস্থা থেকে। বর্তমান আলোচনার উদ্ধৃতিগুলো ব্যবহার করা হয়েছে গ্রন্থটির ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত পুনর্মুদ্রণ থেকে।

৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্ত্রী আন-মারি ওয়ালীউল্লাহ্ বিভিন্ন সময়ে তাঁর লেখা চিঠিপত্রে এবং তাঁর কাছে থাকা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কিছু চিঠিপত্রের বরাত দিয়ে এটি বলতে চেয়েছিলেন, হয়ত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ *দ্য আগলি এশিয়ান* উপন্যাসটি লেখা শুরু করেছিলেন ১৯৫৪ বা ১৯৫৫ সালের দিকে। কিন্তু উপন্যাসে বারবার পিস করপ্সের কথা উঠে এসেছে, যেটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কার্যক্রম শুরুই করেছিল ১৯৬১ সাল থেকে। আবার *দ্য আগলি আমেরিকান*ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। সুতরাং, এই দুটি তথ্য বিশ্লেষণে এই ধারণা সুস্পষ্ট হয় যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উপন্যাসটি ষাটের দশকের প্রথমাংশে লেখা শুরু করেছিলেন ।

৪. তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পিস করপ্স্ যখন থেকে বা যেভাবে কাজ শুরু করেছিল, তার প্রমাণ মেলে তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট Peace Corps Worldwide- এ নথিভুক্ত নানা তথ্যের মাধ্যমে। তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য তথ্যসূত্র এটি-

https://peacecorpsworldwide.org/pe,,ace-corps-profile-of-original-plan-for-volunteers-in-pakistan-west-and-east/

উল্লেখপঞ্জি

গ্রন্থ

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯১)। *উপন্যাস রাজনৈতিক*। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা

সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৭)। *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সৈয়দ আবুল মকসুদ (২০১৫)। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য। মনন প্রকাশ, ঢাকা

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (২০১৮)। *কদর্য এশীয়* (অনুবাদ: শিবব্রত বর্মন)। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth and Tiffin, Helen (2007). *Post-colonial studies: the key concepts*. Routledge, London

Bhabha, Homi K. (2004). *The Location of Culture*. Psychology Press, East Sussex

Cesaire, Aime (2000). *Discourse on Colonialism*. Translated by Joan Pinkham, Monthly Review Press, New York

Fanon, Frantz (1986). *Black Skin White Mask*. Translated by Charles Lamm Markmann and Paul Gilory, Pluto Press, London

Fanon, Frantz (1963). *The Wretched of The Earth*. Translated by C. Farrington, Grove Press, New York

Lederer, William J. and Burdick, Eugene (1999). *The Ugly American*. W. W. Norton & Company, New York, London

Said, Edward W. (1994). *Culture and Imperialism*. Vintage, London

Said, Edward W. (1979). *Orientalism*. Vintage Books Edition, New York

Spivak, Gayatri Chakravorty (1999). *A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present*. Harvard University Press, Cambridge

Thiong'o, Ngugi Wa (2007). *Decolonising the Mind*. Worldview Publications, Delhi

Watts, Steven (2016). *JFK and the Masculine Mystique: Sex and Power on the New Frontier*. St. Martin's Publishing Group, New York

সম্পাদিত গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধ

ফকরুল চৌধুরী (২০১১)। 'উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পরিস্থিতি'। *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ* [সম্পা. ফকরুল চৌধুরী], আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

ফয়েজ আলম (২০১১)। 'উত্তর-উপনিবেশী মন'। *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ* [সম্পা. ফকরুল চৌধুরী], আগামী প্রকাশনী, ঢাকা

পত্রিকা

খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (২০১৪)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ইংরেজি লেখা*। নান্দীপাঠ, ঢাকা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৩)। *উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব ও নজরুলসাহিত্য*। সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বেগম আকতার কামাল (২০১৪)। *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কদর্য এশীয়: ক্ষুধা ও রাজনৈতিক মতাদর্শ*। নান্দীপাঠ, ঢাকা

মাসুদুজ্জামান (২০১৪)। *কদর্য এশীয়: ঠান্ডাযুদ্ধের তপ্ত বয়ান*। নান্দীপাঠ, ঢাকা

অনলাইন পত্রিকা

Hellmann, J. (1983). *Vietnam as Symbolic Landscape: The Ugly American and the New Frontier*. Peace & Change, https://doi.org/10.1111/j.1468-0130.1983.tb00494.x

Immerwahr, Daniel (2019). *The Ugly American: Peeling the Onion of an Iconic Cold War Text*. *The Journal of American-East Asian Relations*, 10.1163/18765610-02601003, Brill Publishers